মানরক্ষা

[উপন্যাস]

নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

মূল্য ২৲ টাকা





মানরক্ষা

প্রথম পরিচ্ছেদ

"শুনছ গা, আস্‌চে মাঘী পূর্ণিমায় নতুন বাড়ীতে যাবার দিন, পুরুত মশায় ব'লে গিয়েছেন।"

রাত্রি নয়টার সময় সায়ংসন্ধ্যা শেষ করিয়া মহেন্দ্রনাথ সবেমাত্র হুঁকাটি লইয়া বসিয়াছেন, এমন সময় গৃহিণী ভবসুন্দরী আসিয়া বলিলেন, "শুনছ গা, আস্‌চে মাঘী পূর্ণিমায় নতুন বাড়ীতে যাবার দিন, পুরুত মশায় ব'লে গিয়েছেন।"

মহেন্দ্রনাথ হুঁকা হইতে মুখটা সরাইয়া এমনভাবে গৃহিণীর মুখের দিকে চাহিলেন, যেন তিনি গৃহিণীর কথাটা আদৌ বুঝিতে পারেন নাই। গৃহিণী তখন কথাটার পুনরুক্তি করিয়া বলিলেন, "শুনতে পেয়েছ, আজ পুরুত মশায় এসেছিলেন। তিনি ব'লে গেলেন, আস্‌চে মাঘী পূর্ণিমায় নতুন ঘরে যাবার ভাল দিন আছে।"

গম্ভীরস্বরে "হুঁ" বলিয়া মহেন্দ্রনাথ পুনরায় হুঁকার ছিদ্রে ওষ্ঠ সংলগ্ন করিলেন। ভবসুন্দরী বলিলেন, "ফাগুনের ৭ই পূর্ণিমে, এখনো এক মাসের বেশী সময় আছে। এর মধ্যে বাকির কাজটাজ যা বাকী আছে সব সেরে ফেল।"

মহেন্দ্রনাথ কোন উত্তর দিলেন না, শুধু একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ভবসুন্দরী তাহা লক্ষ্য না করিযাই সহাস্তে মস্তক আন্দোলনপূর্ব্বক বলিলেন, "ও বাড়াতে না গেলে কিন্তু বীণার বিয়ে হবে না। বোশেখ মাসে ত ওর বিয়ে দিবে ?"

বিষাদগম্ভীরকণ্ঠে মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "বিধাতার ইচ্ছা।"

বলিয়া তিনি হুঁকায় ঘন ঘন টান দিতে লাগিলেন। ভবসুন্দরী স্বামীর চিন্তামলিন মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ গা, তোমার আজ হ'য়েছে কি ?"

মহেন্দ্রনাথ ললাট কুঞ্চিত করিয়া উত্তর দিলেন, "কৈ, কি হ'য়েছে ?"

ভবসুন্দরী বলিলেন, "তবে তুমি ভাল ক'রে কথা কইচো না, মুখ ভার ক'রে আছ। কি ভাবছ ?"

অন্ধকার আকাশের দিকে চাহিয়া মহেন্দ্রনাথ ভগ্নস্বরে বলিলেন, "ভাবচি বড় বৌ, বাবু ব'লেছিলেন গৃহ-প্রবেশের দিন তিনি নিজে ব'সে—"

উচ্ছ্বসিত অশ্রুভারে কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল। ভবসুন্দরী এতক্ষণে বুঝিতে পারিলেন, কোন্ দুঃখময় স্মৃতি স্বামীর চিরপ্রফুল্লমুখে বিষাদের গাম্ভীর্য্য আনিয়া দিয়াছে। তিনিও ছল-ছল-চোখে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া আর্দ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "আহা, এমন মানুষ কি হয় ?"

মহেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি দৃষ্টি ফিরাইয়া অশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠে বলিলেন, "মানুষ ! সাক্ষাৎ শিব বড় বৌ, সাক্ষাৎ শিব। শিব শিবলোকে চ'লে গেছেন, আর অভাগা আমি এই নরকে পড়ে রইলাম।"

হুঁকায় মুখ রাখিয়া মহেন্দ্রনাথ স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন। ভবসুন্দরী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্বামীর পাশে বসিযা পড়িলেন, এবং ধীর সান্ত্বনাসূচকস্বরে বলিলেন, "কি ক'রবে বল, পোড়া যমের তো বিচার নাই, ভাল লোককেই আগে বেছে বেছে নেয়।"

মহেন্দ্রনাথ নীরবে হুঁকায় মৃদু মৃদু টান দিতে লাগিলেন। ভবসুন্দরী বলিলেন, "আচ্ছা, যোগেশ কি বাপের নাম রাখতে পারবে না ?"

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ইচ্ছা করলে পারবে না কেন। কিন্তু আজকালকার ছেলে, বলা তো যায় না। তা ছাড়া যে রকম সঙ্গী সামন্ত জুটেছে।"

ব্যস্তভাবে ভবসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুসঙ্গে মিশেছে নাকি ?"

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কুসঙ্গ ঠিক বলা যায় না। তবে কি জান, ছেলেমানুষ, মানুষ চিনবার ক্ষমতা তো নাই।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ভবসুন্দরী বলিলেন, "আচ্ছা, বিয়ের কথাটা একদিনও তার কাছে তুলেছিলে ?"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ছিঃ, আগে বছর ঘুরুক।"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া ভবসুন্দরী বলিলেন, "তা বিয়ে যেন বছর ঘুরলেই হবে, কিন্তু কথাটা তুলতে দোষ কি। তাতে তার মতটাও জানা যেতো।"

মহেন্দ্রনাথ এবার হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "একেই বলে মেয়েলী কথা। তার আবার মতামত কি? বাপের কথার উপরে কি তার মত? আর আমাকেই বা সে কথা তুলতে হবে কেন, সে কি শোনে নি? বাবু তো শুধু আমার কাছেই ব'লে যাননি, সেখানে আরও পাঁচজন ছিল, তারা অবশ্যই যোগেশকে বলেছে।"

ভব। যদি না ব'লে থাকে?

মহে। না বলে, আমিই বলবো। ওগো, তোমার ভয় নাই, জমিদারের শাশুড়ী হওয়া তোমার কোষ্ঠীর ফল, বুঝলে। এখন এই গরীবের কুঁড়ের ভিতর হাতী জামাই নিয়ে কি করবে তাই ভাব।

মস্তক আন্দোলনপূর্ব্বক সগর্ব্বে ভবসুন্দরী বলিলেন, "ভাববো আবার কি, রাম না হতে রামায়ণ হয়ে আছে। জামাই হ'বার আগে তার উপযুক্ত বাড়ী তৈরী হ'য়েছে। এই তরেই তো বল্‌ছি, বাড়াটা ঠিক্ ক'রে ফেল। এতদিন কোন্ কালে ঠিক্ হ'য়ে যেতো, কিন্তু কর্ত্তাবাবু মারা যাওয়া অবধি তো তুমি ওদিকে আর ফিরে চাহিলে না।"

মহেন্দ্রনাথের হাস্যপ্রফুল্ল মুখখানা পুনরায় ম্লান হইয়া আসিল। তিনি বিষাদগম্ভীরস্বরে বলিলেন, "যাঁর সাধের বাড়ী, তিনিই যখন চলে গেলেন, তখন কে আর ওর দিকে ফিরে চাহিবে বড বৌ? ঐ বাড়ীই তাঁর কাল হ'লো। যাক্, সকলই তাঁব ইচ্ছা। আচ্ছা, কাল আবার মিস্ত্রীদের ডেকে পাঠাচ্চি।"

মহেন্দ্রনাথ হুঁকায় ঘন ঘন টান দিতে লাগিলেন। কৃষ্ণপক্ষের আকাশে চাঁদ ছিল না, অসংখ্য নক্ষত্র উজ্জ্বল দৃষ্টিতে কৃষ্ণবসনা ধরণীর দিকে চাহিয়াছিল। মাঝে মাঝে এক একটা উল্কাপিণ্ড কার্ম্মুকনিক্ষিপ্ত তীরের ন্যায় শূন্যপথে ছুটিয়া আসিতেছিল। মহেন্দ্রনাথ সেই দিকে স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন।

গৃহিণী খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "হাঁগা, ব'সে ব'সে তামাকই টান্‌বে? খাবে কখন্?"

মহেন্দ্রনাথ সে কথার উত্তর না দিয়া অন্যমনস্কভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, নিমির বয়স কত হ'লো বল দেখি?"

ভবসুন্দরী বলিলেন, "হ'লো বৈকি, গেল আশ্বিনে ষেটের কোলে তেরোয় পা দিয়েছে।"

মহেন্দ্রনাথ যেন নিতান্ত আশ্চর্য্যের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "বল কি, তেরো? না না, তোমার হিসাবে ভুল হয়েছে।"

ভবসুন্দরী অপ্রতিভভাবে বলিলেন, "ওমা, হিসাবে ভুল হবে কেন? যে বছর তোমার প্রথম চাকরী হয়, সেই বছর তো নিমি পেটে। সে আজ ক'বছর হলো?"

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সে তো এই সে দিনকার কথা। বারোশো আটানব্বই সালে প্রথম কাজে ঢুকি।"

পরে একটু ভাবিয়া বলিলেন, "হাঁ, তা হ'লে তেরোই হবে বটে।"

হুঁকায় আর গোটা-দুই টান দিয়া হুঁকাটা রাখিয়া মহেন্দ্রনাথ চিন্তিতভাবে বলিলেন, "ওঃ, মেয়ে তো মস্ত হয়ে উঠেছে।"

ভবসুন্দরী বলিলেন, "তা আর হয় নি? ওর বয়সী যারা তাদের কবে বিয়ে হ'য়ে গিয়েছে।"

মহেন্দ্রনাথ একটু জোর গলায় বলিলেন, "ওগো, তোমার মেয়েরও বিয়ে হবে, হবে। তোমাকে আমাকে বেচলেও যা হ'তে পারতো না, তাই হবে। মেয়ে রাজরাণী হবে।"

প্রফুল্লমুখে ভবসুন্দরী বলিলেন, "আর তুমি হবে রাজার শ্বশুর। কিন্তু সত্যি বল্‌তে কি, তোমাকে জমিদারের শ্বশুর ব'লে আদৌ মানাবে না। এই তালপাতার সেপায়ের মত চেহারা।"

মহেন্দ্রনাথ একটু হাসিলেন। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, তোমার কি মনে হয়?"

"কিসের কি মনে হ'বে?"

"আমার নিমিকে কি যোগেশের মনে ধর্‌বে না?"

"কেন মনে ধর্‌বে না?"

মাথাটা একবার নাড়িয়া মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমিও তো তাই বলি! রূপই না হয় তেমন নাই, কিন্তু গড়ন তো মন্দ নয়।"

ভবসুন্দরী বলিলেন, "মন্দ! শুধু কটা চামড়াটা নাই, নইলে মেয়ে আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-প্রতিমা।"

গৃহিণীর মুখের দিকে প্রফুল্লদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "মুখের গড়নটি আরো চমৎকার; হুবহু তোমার মুখের মত; কে যেন তোমার মুখখানা কেটে বসিয়ে দিয়েছে।"

ভবসুন্দরী যেন একটু লজ্জিতভাবে মুখটা একটু ঘুরাইয়া ঠোঁট ফুলাইয়া বলিলেন, "তোমার যেমন কথা! ওর মুখে আমার মুখে তুলনা?"

সহাস্যে মহেন্দ্রনাথ বলিলেন "কেন, তোমার মুখখানা কি মন্দ! এমন মুখ তো প্রায় দেখা যায় না।"

কৃত্রিম কোপে মুখখানা গম্ভীর করিয়া ঝঙ্কার দিয়া ভবসুন্দরী বললেন, "হাঁ, দেখা যায় না! তা

ভাল হোক মন্দ হোক, তোমার আর এত ঠাট্টা কত্তে হবে না। এখন খাওয়া-দাওয়া কত্তে হয় তো উঠে পড়।”

বলিয়া ভবসুন্দরী নিজেই উঠিয়া পড়িলেন, এবং আলো লইয়া রন্ধনশালার দিকে অগ্রসর হইলেন। মহেন্দ্রনাথ নক্ষত্রখচিত নীলাকাশের দিকে চাহিয়া গুন্ গুন্ করিয়া, গান ধরিলেন—

“সকলি তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।”

—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মেলাহাটীর ছোট তরফের জমীদার গোবিন্দ চৌধুরীর জমিদারীটা বড় তরফের সহিত মামলা-মোকদ্দমায় ঋণগ্রস্ত হইয়া যখন অষ্টমের নীলামে উঠিবার উপক্রম করিয়াছিল, প্রজারা খাজনা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল, কর্ম্মচারীরা শুষ্ক বৃক্ষ ত্যাগ করিয়া শাখা-পল্লব-সমৃদ্ধ বৃহৎ বৃক্ষান্বেষী বিহঙ্গকুলের ন্যায় ছোট তরফকে পরিত্যাগ করিয়া একে-একে বড় তরফের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছিল, এবং গোবিন্দবাবু আর কোন উপায় না দেখিয়া হতাশভাবে নিরুপায়ের উপায়কে প্রাণপ্রণে ডাকিতেছিলেন, তখন বারো টাকা মাহিনার মুহুরী মহেন্দ্র মুখুজ্যে আসিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, “ভয় কি বাবু, এখনো চেষ্টা করিলে জমিদারী রক্ষা হয়।”

সামান্য মুহুরীর কথায় যেন দৈববাণীর আভাস পাইয়া আশান্বিত চিত্তে গোবিন্দবাবু বলিলেন, “পারবে মহেন্দর?

উৎসাহের স্বরে মহেন্দ্রনাথ বলিল, “আপনি হুকুম দিলে চেষ্টা দেখতে পারি।”

অকুল-সমুদ্রে মজ্জমান ব্যক্তি সামান্য তৃণখণ্ডকেও জড়াইয়া ধরিতে চায়। গোবিন্দবাবুও এই বারো টাকা মাহিনার মুহুরীকে উপেক্ষাও করিতে পারিলেন না। তিনি গদ্গদ-কণ্ঠে বলিলেন, “তা যদি পার মহেন্দর, গোবিন্দ চৌধুরী তোমার কেনা হ'য়ে থাকবে।”

প্রভুর পদতলে প্রণত হইয়া মহেন্দ্রনাথ সবিনয়ে বলিল, “অমন কথা বলবেন না বাবু, আপনি অন্নদাতা পিতা।”

প্রভুর পদধূলি লইয়া শেষ চেষ্টা দেখিবার জন্য মহেন্দ্রনাথ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল।

তাহার চেষ্টা নিষ্ফল হইল না। সে মহলে মহলে ঘুরিয়া প্রজাদের বুঝাইয়া শান্ত করিল, এবং সদ্ব্যবহারে ও সুমিষ্ট কথায় নিরন্তর প্রজাবর্গের হৃদয় জমিদারের দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া দুই-তিন বৎসরের বাকী খাজনা এক মাসের মধ্যে আদায় করিতে সমর্থ হইল। তারপর কালেক্টার কিস্তীর আগেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ আনিয়া প্রভুর পদপ্রান্তে রক্ষা করিলেন। গোবিন্দবাবু গদ্গদ-কণ্ঠে বলিলেন, “গোবিন্দ চৌধুরীর মানইজ্জৎ আজ তুমিই বাঁচালে মহেন্দর।”

মহেন্দ্রনাথ লজ্জানত-মস্তকে প্রভুর পদধূলি গ্রহণ করিল। গোবিন্দবাবু সেই দিনই তাহাকে একশত টাকা বেতনে দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করিলেন। মহেন্দ্রনাথ কিন্তু সহজে এত বড় পদটা স্বীকার করিয়া লইল না। প্রতিবাদ করিয়া বলিল, “আপনি ভুল করবেন না বাবু, ছোট যে, সে ছোট অবস্থা থেকে বেশ কাজ কত্তে পারে, কিন্তু তাকে উঁচুতে তুলে দিলে সে নিজের মাথা ঠিক্ রাখতে পারে না, কাজ কর ব কি?”

কৃত্রিম কোপ প্রদর্শন করিয়া গোবিন্দবাবু বলিলেন, “মূর্খ প্রজাগুলাকে কোন রকমে বুঝিয়ে খাজনাটা আদায় করেছ বলে মনে ক'রো না মহেন্দর, আমার চেয়ে তুমি বুদ্ধিমান্। আর আমি এতই নির্ব্বোধ যে, দেশ শাসন করবার শক্তি যার আছে, তাকে পাঠশালার গুরুমশায় ক'রে রাখ্‌বো”

ইহার পর মহেন্দ্রনাথ আর কিছু বলিতে পারিল না, তাহাকে দেওয়ানী গ্রহণ করিতে হইল।

তারপর জমিদারীর উপর দিয়া কত ঝড় বহিয়া গেল; কত মামলা-মোকদ্দমা, কত দাঙ্গা-হঙ্গামা বাধিল; বড় তরফের কর্ত্তার মৃত্যুতে তদীয় সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী ভাগিনেয় বরদাবাবু এই পাঁচ আনা সাত গণ্ডা অংশের সম্পত্তিটাকে আপনার দশ আনা তের গণ্ডা সম্প'ত্তির সহিত এক করিয়া লইবার জন্য বুভুক্ষিত রসনা প্রসারিত করিলেন। কিন্তু মহেন্দ্রনাথের কার্য্যদক্ষতায় গোবিন্দবাবুর জমিদারী সকল বিপদ অতিক্রম করিয়া মেঘ-নির্ম্মুক্ত দিবাকরের ন্যায় শোভা বিস্তার করিতে লাগিল, এবং দিনে দিনে তাহা বর্দ্ধিতায়তন হইয়া বড় তরফের সহিত প্রতিযোগিতায় উদ্যত হইল।

ক্রমে গোবিন্দবাবু মহেন্দ্রনাথের উপরে জমিদারীর সকল ভার অর্পণ করিয়া কেবল তপ জপ আর শাস্ত্রচর্চ্চা লইয়া পরকালের উপায় সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। স্ত্রী অনেকদিন পূর্ব্বেই গত হইয়াছিলেন। পুত্র যোগেশচন্দ্র কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে পড়িতেছিল। সংসারের দিকে ফিরিয়া চাহিবার মত গোবিন্দবাবুর কিছু ছিল না। সুতরাং তাঁহার লক্ষ্যটা ইহলোক ছাড়িয়া পরলোকের দিকেই একটু বেশী আকৃষ্ট হইয়াছিল।

মহেন্দ্রনাথই জমিদারী দেখিত, সময়ে সময়ে কোন জটিল বিষয়ের পরামর্শ লইবার জন্য প্রভুর নিকট যাইত। গোবিন্দবাবু কখন পরামর্শ দিতেন, কখন বা এই সকল বৈষয়িক ব্যাপারে মনোযোগ দিতে অনিচ্ছা-প্রকাশ করিয়া বলিতেন, "আর কেন মহেন্দর, পঞ্চাশ বছর তো জমিদারী নিয়ে কাটালাম, এখন পরকালের সম্বল কিছু কত্তে দাও। সেখানে তো জমিদারী নিয়ে যেতে পারবো না।"

মহেন্দ্রনাথের এতটা প্রভুত্ব কিন্তু অনেকেই প্রসন্নভাবে দেখিতে পারিত না। মহেন্দ্রনাথের কার্য্যে গোবিন্দবাবু কোন দোষ দেখিতে না পাইলেও অপরে কিন্তু নীচ উচ্চ পদ পাইয়া কিরূপে ক্ষমতার অপব্যবহার করে, নূতন দেওয়ানের ব্যবহারে তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইত, এবং বারো টাকা মাহিনার মুহুরীকে এত বড় উচ্চ পদে বসাইয়া দিবার জন্য তাহারা গোবিন্দবাবুর বিবেচনারও প্রশংসা করিতে পারিত না। বিশেষতঃ অন্যান্য কর্ম্মচারীদিগের নিকট মহেন্দ্রনাথের এই অবাধ প্রভুত্ব সম্পূর্ণ অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। কেন না নূতন দেওয়ানের তত্ত্বাবধানে যদিও তাহাদের বেতন কিছু কিছু বাড়িয়াছিল, কিন্তু আমলাদের উপরি পাওনাটা একেবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। প্রজাদের মধ্যে কোনরূপ গোলমাল ছিল না, তাহাদের অভাব অভিযোগ মহেন্দ্রনাথ নিজেই শুনিয়া তাহার প্রতিকার করিতেন। কোন আমলা প্রজার উপর অত্যাচার করিয়াছে শুনিলে মহেন্দ্রনাথ সেই আমলাকে এমনভাবে শাসন করিয়া দিতেন যে, অন্যান্য আমলারা তাহা দেখিয়া প্রমাদ গণিত।

তাহাদের মধ্যে কেহ যদি গোবিন্দবাবুর নিকট আসিয়া অভিযোগ করিত, "বাবু, দেওয়ানজীর মেজাজ বড্ডই কড়া হ'য়ে উঠেছে।"

তাহা হইলে গোবিন্দবাবু কৃত্রিম কোপ প্রদর্শন-পূর্ব্বক বলিতেন, "তা তো হবেই হে, আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হ'য়েছে কি না। এখন আমাকেই মানে না, তা তোমাদের মানবে কি।"

যে বুদ্ধিমান্ সে প্রভুর উক্তির তাৎপর্য্য বুঝিয়া নিরস্ত হইত। কিন্তু যে নির্ব্বোধ, সে প্রভুকে আরও অধিক উত্তেজিত করিবার অভিপ্রায়ে বলিত, "বাবু, আপনি কিছু দেখা-শোনা না করাতেই দেওয়ানজী এতটা বেড়ে উঠেছেন, আপনি যদি একটু লক্ষ্য-নজর দেন।"

সহাস্যে গোবিন্দবাবু বলিতেন, "তোমরা বুঝি মনে কর, আমি কিছুই দেখি না। ওহে এইখানে ব'সে আমি শুধু ভাগবত পড়ছি না, সকল দিকেই আমার লক্ষ্য আছে। কে কত বাড়ে বাড়ুক না, তারপর একদিনে সব বেটার বাড় কমিয়ে দেব।"

প্রভুর কথায় কর্ম্মচারী দেওয়ানজীর অচিরে অবনতির সম্ভাবনায় আশ্বস্তচিত্তে প্রস্থান করিত।

গোবিন্দবাবু মহেন্দ্রনাথকে ডাকিয়া বলিলেন, "বড়র অনেক শত্রু থাকে তা জান তো?"

মহেন্দ্রনাথ বলিল, "অপকার করলেই লোক শত্রু হয়।"

গোবিন্দবাবু বলিলেন, "দেখ্‌ছি তোমার বুদ্ধিটা এখনো সেই বারো টাকার মুহুরীর মতই আছে। ওহে, অপকারের চেয়ে উপকারেরর বেশী শত্রু হয়। একটু সাবধানে চল্‌বে।"

নির্ভীকস্বরে মহেন্দ্রনাথ উত্তর করিল, "যেদিন একটুও অন্যায় করবো, সেইদিনই সাবধান হ'তে শিখবো।"

গম্ভীরমুখে গোবিন্দবাবু বলিলেন, "দেখছি, দেওয়ানগিরি তোমার অদৃষ্টে বেশী দিন নাই।"

প্রশান্তস্বরে মহেন্দ্রনাথ বলিল, "আমি দেওয়ানও নই, মুহুরীও নই। আমি আপনার চাকর মাত্র।"

গোবিন্দবাবু হাসিয়া উঠিলেন, "বল কি হে, কিন্তু লোকে যে বলে, দিন দিন তুমিই আমার মনিব হয়ে দাঁড়িয়েছ, আমার সর্ব্বস্ব লুটে-পুটে খাচ্চো। আমি তোমার কথায় উঠ্‌চি-বস্‌চি।"

সঙ্কুচিতভাবে মহেন্দ্রনাথ বলিল, "এ কথার উত্তর দিবার শক্তি আমার নাই বাবু।"

গম্ভীরভাবে গোবিন্দবাবু বলিলেন, "শক্তি থাকবে কোথা হ'তে হে, উত্তর দিতে হ'লে যে সত্য কথা বলতে হয়।"

মহেন্দ্রনাথ নিরুত্তরে নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল। গোবিন্দবাবু বলিলেন, "যাক্, রাজচকের প্রজারা যে ধর্ম্মঘট ক'রেছিল তার কি হ'লো?"

মহেন্দ্র বলিল, "সে সব মিটে গিয়েছে।"

একটু বিস্মিতভাবে গোবিন্দবাবু বলিলেন, "এরি মধ্যেই মিটে গেল কি রকমে?"

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "প্রজারা আপনার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে ধর্ম্মঘট করে নি, নায়েবের জুলুমেই এই কাজ করেছিল।"

"তারপর?"

"তারপর নায়েব প্রজাদের সাক্ষাতে নিজের দোষ স্বীকার করায়, আর ভবিষ্যতে কোন জোর জবরদস্তি করবে না প্রতিজ্ঞা করায় প্রজারা সন্তুষ্ট হ'য়েছে।"

"নায়েবকে বোধ হয় বরখাস্ত ক'রেছ ?"

"না ।"

"তবে ত খুবই বুদ্ধিমানের কাজ ক'রেছ । আবার যদি সে গোলযোগ বাধায় ?"

"খুব সম্ভব তা বাধাবে না। যদিই বাধায় তখন আর সে ক্ষমা পাবে না ।"

"তার চাইতে তাকে বরখাস্ত করলেই তো গোল চুকে যেতো ।"

"বোধ হয় তা যেতো না ! সেটা সম্ভব হ'ত যদি আমি নিজে গিয়ে নায়েবী কত্তে পারতাম। তাকে জবাব দিয়ে অন্য লোককে পাঠালে সেই লোকই যে অন্যায় অত্যাচার কত্তো না তারই বা প্রমাণ কি ?"

গোবিন্দবাবু বিস্ময়স্তব্ধদৃষ্টিতে ক্ষণকাল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ধীর-প্রশান্তকণ্ঠে বলিলেন, "তুমি দেখ্‌ছি দ্বিতীয় যুধিষ্ঠির হ'য়ে পড়েছ। কিন্তু মনে রেখ মহেন্দর, এটা কলিকাল ।"

স্থিরস্বরে মহেন্দ্রনাথ বলিল, "যে কালই হোক বাবু, সত্যের জয় সর্ব্বত্র, এ বিশ্বাস যেন অটুট থাকে ।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সোণাহাটী হইতে আধ মাইল দূরে গোঁসাইচকে মহেন্দ্রনাথের বাড়ী। বাড়ীখানি ছোট ; দেখিলে কেহ মনে করিতে পারিত না যে, ইহা জমিদার গোবিন্দ চৌধুরীর দেওয়ানের বাড়ী। মেটে ঘর, খড়ের চাল, মাটীর প্রাচীরে ঘেরা। যেমন ছোট বাড়ী, তেমনি পরিজনের সংখ্যাও অল্প। গৃহিণী ভবসুন্দরী, কন্যা নির্ম্মলা, আর কনিষ্ঠ পুত্র দেবীচরণ। এই ক্ষুদ্র পরিজন লইয়া ছোট বাড়ীখানিতে বাস করিতে মহেন্দ্রনাথ কিছুমাত্র কষ্ট বোধ করিতেন না। পাঁচজনে কিন্তু কষ্ট বোধ করিত। তাহারা একখানা পাকা বাড়ী করিবার জন্য মহেন্দ্রনাথকে উপদেশ দিত। মহেন্দ্রনাথ কিন্তু তাহাদের উপদেশ শুনিয়া শুধু হাসিতেন। পাঁচজনে বলাবলি করিত, "ওহে, চাপা লোক, বাড়ীর ফাঁদা দিলে পাছে জমিদারের নজর পড়ে, তাই চেপে যাচ্ছে ।"

মহেন্দ্রনাথ কিন্তু অধিক দিন চাপিয়া যাইতে পারে নাই। শয়ন-গৃহখানা যখন ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল, এবং তাহার আর সংস্কারের উপায় নাই দেখিয়া মহেন্দ্রনাথ সেখানাকে ভাঙ্গিয়া নূতন ঘরের পত্তন দিবার সংকল্প করিলেন। কিন্তু গৃহিণী ধরিয়া বসিলেন "দেখ আমার বড় সাধ একখানা পাকা ঘর কর ।"

মহেন্দ্রনাথ ইহাতে অনেক আপত্তি জানাইলেন, দেনদার হইবার ভয় দেখাইলেন, গৃহিণী কিন্তু কিছুতেই জেদ ছাড়িলেন না। অনেক আন্দোলন বাক-বিতণ্ডার পর অবশেষে তাঁহাকে গৃহিণীর মতেই মত দিতে হইল। বাড়ীর বাহিরে অনেকটা জায়গা পড়িয়াছিল, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মহেন্দ্রনাথ সেইখানে দুইখানা একতালা ঘরের পত্তন দিলেন। পাঁচজনে ইহা দেখিয়া মহেন্দ্রনাথের সম্মুখে যথেষ্ট আহ্লাদ প্রকাশ করিলেও পরোক্ষে এই দুই তিন বৎসরের মধ্যে সে জমিদারের কত হাজার টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে অনুমানের দ্বারা তাহারই হিসাব করিতে লাগিল।

এ সংবাদটা অচিরেই গোবিন্দবাবুর কাণে উঠিল। তিনি শুনিলেন, মহেন্দ্রনাথ তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লুণ্ঠিত অর্থে এক বৃহৎ ইমারতের পত্তন দিয়াছে। ' গোবিন্দবাবু শুনিয়া মনে মনে হাসিলেন। তিনি মহেন্দ্রনাথকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কতগুলি টাকা জমিয়েছ মহেন্দর ?"

মহেন্দ্রনাথ বিস্মিতভাবে প্রভুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। গোবিন্দবাবু বলিলেন, "হাজার দশেকের বেশী জমেছে কি ?"

মহেন্দ্রনাথ সবিস্ময়ে বলিলেন, "এত টাকা কোথায় পাব বাবু ? মাইনের—"

বাধা দিয়া গোবিন্দবাবু বলিলেন, "ওহে, জমিদারের আমলাদের আবার মাইনে কি ? তারা কি মাইনের তোয়াক্কা রাখে ? আট টাকা মাইনের গোমস্তার বাড়ীতে দোল-দুর্গোৎসব হয় ।"

মহেন্দ্রনাথ চুপ করিয়া রহিলেন। গোবিন্দবাবু সহাস্যে বলিলেন, "এত বড় জমিদারীর দেওয়ান তুমি, এই তিন বছরে যে অন্ততঃ তিন-পাঁচে পনেরো হাজার টাকার সংস্থান কর নি, এ কথা এক-গলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বল্‌লেও বিশ্বাস করি না ।"

শঙ্কিতস্বরে মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আপনি প্রভু, অন্নদাতা, পিতা, আপনার পা ছুঁয়ে—"

একটা জোর ধমক দিয়া গোবিন্দবাবু বলিলেন, "খবরদার শপথ ক'রো না। আমি কি তোমাকে দিব্যি করতে বল্‌ছি। ভাল, টাকা যদি জমাও নি, তবে এত বড় ইমারতের পত্তন দিলে কোন্ সাহসে ?

মহেন্দ্রনাথ বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, "ইমারত ? ইমারত কোথায় বাবু ?"

গম্ভীরভাবে গোবিন্দবাবু বলিলেন, "কোথায় তোমার ইমারত, কোথায় তোমার বালাখানা কে

তা দেখ্‌তে গিয়েছে বল। লোকে বলছে, আমি শুনেছি এই মাত্র।"

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "শোবার ঘরখানা একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে—"

মস্তক আন্দোলন পূর্ব্বক গোবিন্দবাবু বলিলেন, "তাই মাথা গুঁজে থাকবার জন্য একটা ইমারতের পত্তন দিয়েছ, না?"

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সে ইমারত নয় বাবু, সত্যই মাথা গুঁজে থাকবার কুঁড়ে। আর তাও আমার নিজের ইচ্ছায় হয় নি।"

গোবিন্দবাবু বলিলেন, "তোমার ইচ্ছায় যে হয় নি সেটা বুঝতে আমার বাকী নাই, কেন না এত তৎপর পাকা বাড়ী তুলে আমার কাছে ধরা দেবার ছেলে তুমি নও। অবশ্য পাঁচজনের জেদেই তোমাকে এমন কাজটা কত্তে হ'য়েছে।"

মহেন্দ্রনাথ স্থির-গম্ভীর-কণ্ঠে বলিলেন, "পাঁচজনের নয় বাবু, একজনের ইচ্ছাতেই হয়েছে। সে আমার কাছে কখনো কিছু চায় নি, কিন্তু তার বড় সাধ, একান্ত জেদ, পাকা ঘরে বাস করবে।"

একটু গম্ভীর হাসি হাসিয়া গোবিন্দবাবু বলিলেন, "বটে। গোবিন্দ চৌধুরীর মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে মা লক্ষ্মীর সাধটা পূর্ণ ক'রে দিচ্ছ। আচ্ছা, আচ্ছা, আমিও গোবিন্দ চৌধুরী, সহজে কাউকে ছাড়বো না। আমার পয়সা হজম করা বড় শক্ত।"

ইহার কয়েকদিন পরে একদিন অপরাহ্নে গোবিন্দবাবু কাছারীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আকস্মিক আবির্ভাবে আমলারা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। গোবিন্দবাবু কিন্তু তাহাদের দিকে লক্ষ্য না করিয়া একেবারে মহেন্দ্রনাথের সেরেস্তায় উপস্থিত হইলেন, এবং মহেন্দ্রনাথকে উঠিয়া অভ্যর্থনা করিবার অবসর না দিয়াই বলিলেন "তোমার হাতে কি এখন জরুরি কাজ আছে মহেন্দর?"

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন "আজ্ঞে না, এই খাতাটা—"

গোবিন্দবাবু বলিলেন, "খাতাটা এখন থাক্, এস, একটু বেড়িয়ে আসি।"

বলিয়াই তিনি অগ্রসর হইলেন। মহেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

গল্প করিতে করিতে উভয়ে গ্রাম ছাড়াইয়া মাঠে পড়িলেন। মাঠে তখন ঘাস ছিল না, শুধু শ্যামল তৃণরাজি সবুজবর্ণ গালিচার মত আস্তৃত হইয়া ক্ষুদ্র মাঠটাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। মাঠের পরপারে গোঁসাইচক গ্রাম। গোবিন্দবাবুর এত দূরে বেড়াইতে আসিবার উদ্দেশ্য কি বুঝিতে না পারিলেও মহেন্দ্রনাথ সে কথাটা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। গ্রামে প্রবেশ করিলে জমিদারকে দেখিয়া লোকে সসম্ভ্রমে অভিবাদনপূর্ব্বক পথ ছাড়িয়া দাঁড়াইতে লাগিল।

যাইতে যাইতে গোবিন্দবাবু বলিলেন, "এই দিকেই না তোমার বাড়ী মহেন্দর?"

মহেন্দ্রনাথ উত্তর দিল, "আজ্ঞে।"

গ্রামের লোকের সম্ভ্রম দৃষ্টির মধ্য দিয়া উভয়ে যখন মহেন্দ্রনাথের বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন নারিকেল বৃক্ষশীর্ষে অস্তোন্মুখ সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হইতেছিল; গ্রাম্যবধূরা আবক্ষ অবগুণ্ঠন টানিয়া জলপূর্ণ কলসকক্ষে গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল; তাহারা ঘোমটার অন্তরাল হইতে জমিদারবাবুর বিশাল বপুর দিকে বক্র কটাক্ষপাত করিতে করিতে শঙ্কা-জড়িত ধীর-মন্থর পদে অগ্রসর হইতেছিল।

সম্মুখেই মহেন্দ্রনাথের নবারব্ধ গৃহ। তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া গোবিন্দবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আস্তাবল তৈরি কচ্চে মহেন্দর?"

সলজ্জ হাস্যে মহেন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন, "আস্তাবল নয় বাবু, আমার বাসের ঘর।"

গম্ভীর হাস্য-সহকারে গোবিন্দবাবু বলিলেন, "বুড়োকে তুমি এতই নির্ব্বোধ মনে করেছ যে, আমাকে যা বোঝাবে তাই বুঝবো? তা হ'লে গাড়ী ঘোড়াও রাখ্‌বে দেখ্‌ছি। কতগুলি পয়সা ক'রেছ?"

মহেন্দ্রনাথ মৃদু হাসিয়া মস্তক নত করিলেন। গোবিন্দবাবু ইতস্ততঃ দৃষ্টি-নিক্ষেপ-পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "জায়গাও তো অনেকটা দেখ্‌ছি। ইমারত না হোক, একখানা মস্ত বাড়ী হ'তে পারবে। কিন্তু মহেন্দর, বুড়োর একটা কথা শোন, আমার যখন গাড়ী ঘোড়া নাই, তখন তোমারও ও-সব রাখা ভাল দেখায় না, লোকে বলবে কি? তার চেয়ে এক কাজ কর, এই ঘর দু'খানাকে বাড়ীর মধ্যেই ফেলে রান্না-ঘর বা ভাঁড়ার-ঘর ক'রে ফেল। ঐ দিকে দোতালা তুলবে, আর এই সামনে দক্ষিণদ্বারী বৈঠকখানা হবে। বুঝেছ?"

বলিয়া তিনি মহেন্দ্রনাথের মুখের উপর সহাস্য কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "এত টাকা কোথায় পাব বাবু?"

গোবিন্দবাবু বলিলেন, "তুমি যতই ছাপাও হে ধর্ম্মের ঢাক আপনি বাজে। দেশশুদ্ধ সকলেই জানে যে, তুমি দশ-বিশ হাজার হাত ক'রে পাকা বাড়ীর পত্তন দিয়েছ। তা দেওয়াও তো উচিত। ধর না,

আমার এষ্টেটে দেওয়ানী ক'রে এই রকম ভাঙ্গা খড়ো বাড়ীতে বাস কর্‌বে তা'তে আমারও নিন্দা।"

বলিয়া তিনি পুরাতন বাড়ীখানার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "বাস্তবিক মহেন্দর, এই ভাঙ্গা বাড়ীতে কি রকমে বাস কচ্ছিলে ?"

মহেন্দ্রনাথ একটু হাসিলেন। গোবিন্দবাবু বলিলেন,"চল, তোমার পুরাণ বাড়ীখানা দেখা যাক্।"

বলিয়া তিনি মহেন্দ্রনাথের অপেক্ষা না করিয়াই দ্রুতপদে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং দরজা পার হইয়াই ডাকিলেন, "মা লক্ষ্মী কোথায় গো ?"

ভবসুন্দরী গৃহকার্য্যে নিরত ছিলেন। হঠাৎ একজন অপরিচিত পুরুষকে বাড়ী ঢুকিতে দেখিয়া মাথার কাপড় টানিতে টানিতে ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন। নির্ম্মলা ছোট ভাইটিকে লইয়া উঠানের একপাশে খেলা করিতেছিল। সে বিস্ময়পূর্ণ-দৃষ্টিতে আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। গোবিন্দবাবু হাসিতে হাসিতে তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "কি গো, মা তো ছুটে পালিয়ে গেলেন। এখন তুমি বুড়োকে একটু খাতির ক'রে বসাবে, না তাড়িয়ে দেবে ?"

বালিকা এই উন্নতকায় প্রশান্তমূর্ত্তি পুরুষের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাঁহার পায়ের কাছে টিপ্ করিয়া একটা গড় করিল। গোবিন্দবাবু হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

ইত্যবসরে মহেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি আসিয়া দাবার উপর আসন পাতিয়া দিলেন। গোবিন্দবাবু কিন্তু বসিলেন না; তিনি হাত ধরিয়া নির্ম্মলাকে উঠাইলেন, এবং মহেন্দ্রের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এইটিই কি তোমার বড় মেয়ে মহেন্দর ?"

তারপর নির্ম্মলার দিকে ফিরিয়া সহাস্যে বলিলেন, এ যে দিব্যি মেয়ে মহেন্দর, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী যে। তোমার এ মেয়ে রাজরাণী হ'বে।"

বলিয়া তিনি নির্ম্মলার হাত ধরিয়া আসনে গিয়া বসিলেন। ভবসুন্দরী গলা পর্য্যন্ত ঘোমটা টানিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার পায়ের কাছে প্রণত হইলেন। গোবিন্দবাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "প্রণাম আজ নেব না মা, যে দিন ঐ আস্তাবল ভেঙ্গে নূতন বাড়ীতে মা লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা কত্তে পারবো, সেইদিন বাপের প্রাপ্য প্রণাম আদর ক'রে নেব।"

মহেন্দ্রনাথ বিস্ময়স্তব্ধ-দৃষ্টিতে প্রভুর মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইহার কয়েকদিন পরে যখন রাশি-রাশি ইট কাঠ আসিয়া পড়িতে লাগিল, তখন লোকের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। গোবিন্দবাবু যেদিন বেড়াইবার অছিলায় মহেন্দ্রনাথের নূতন বাড়ী দেখিয়া আসিলেন, সেই দিন অনেকেই স্থির করিয়াছিল, দেওয়ানজীর এই নূতন ঘরের ছাদ আর উঠিবে না। এমন কি, এই অসমাপ্ত গৃহের ইটগুলা কবে সস্তা দরে বিক্রীত হবে, কেহ কেহ তাহারও প্রতীক্ষা করিতেছিল। কিন্তু তাহাদের এই প্রতীক্ষাকে সম্পূর্ণ নিষ্ফল করিয়া দিয়া আবার রাশি রাশি ইট আসিয়া বাড়ীখানার চতুর্গুণ আয়তন বৃদ্ধির সম্ভাবনা জ্ঞাপন করিল, তখন বয়োধর্ম্মে গোবিন্দবাবুর যে ভীমরথী হইয়াছে সে সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ রহিল না। কেহ কেহ এমন আশঙ্কা করিতে লাগিল, দেওয়ান হয় তো গোবিন্দবাবুকে গুণ করিয়াছে। অনেক পরোপকারী ব্যক্তি এই গুণের কোন প্রতিকার আছে কি না তাহার সন্ধানেও বিরত হইল না।

এই সকল পরোপকারী ব্যক্তি আসিয়া যে মধ্যে মধ্যে গোবিন্দবাবুকে নিঃস্বার্থভাবে উপদেশ দিত না তাহা নহে। গোবিন্দবাবুও এই সকল নিঃস্বার্থ পরামর্শদাতার অযাচিত উপদেশ সাদরে গ্রহণপূর্ব্বক এমনভাবে তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতেন যে, তাহারা স্থির বুঝিত, গোবিন্দবাবু জমিদারী-কার্য্যে যখন মাথার চুল পাকাইয়াছেন, তখন তিনি যে মহেন্দ্রনাথের চতুরতা ধরিতে পারেন নাই এমন নহে, ধরিলেও তিনি শুধু সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছেন, এবং টোপ ফেলিয়া মাছ ধরার মত মহেন্দ্রনাথকে কেবল আশার আশ্বাসে প্রলুব্ধ করিয়া রাখিতেছেন। বাড়ীটা একবার উঠিলে হয়; তখন তিনি এই বড় বাড়ীতে মহেন্দ্রের বসবাসের সাধ মিটাইয়া দিবেন। গাছে তুলিয়া মই কাড়িয়া লইবেন।

উপদেশদাতারা এই আশ্বাসে আশ্বস্ত হইয়া ভাবিত, এমন না হইলে জমিদারী-বুদ্ধি!

মহেন্দ্রনাথ কিন্তু সহজে গাছে উঠিতে রাজি হইলেন না। তিনি প্রভুর কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "একে এ বৎসর চারিদিকে অজন্মা; তাহার উপর শাঁখাই নদীর বাঁধ বাঁধিতে বিস্তর টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে। ইহার উপর যদি এতগুলা টাকা বাজে খরচ হয়, তাহা হইলে লাটের কিস্তি সামলান দায় হইয়া উঠিবে।"

ইহার উত্তরে গোবিন্দবাবু বিরক্তির সহিত বলিলেন, "আমার হাত থেকে সকল ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে আমাকে একটি আস্ত কাঠের পুতুল সাজিয়েছ। এখন আবার আমাকে দায় জানাতে লজ্জা করে না?"

মহেন্দ্রনাথও দৃঢ়স্বরে জানাইলেন, "আপনি যাই বলুন বাবু, আমি কিন্তু এ বছর কিছুতেই এত টাকা খরচ কত্তে দেব না।"

গোবিন্দবাবু ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "তোমার বাবারও সাধ্য নাই যে, গোবিন্দ চৌধুরীর ইচ্ছা অপূর্ণ রাখে।"

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তা হ'লে আমাকে সেই বারো টাকার মুহুরীর পদ ফিরিয়ে দিন।"

রোষ-গম্ভীরস্বরে গোবিন্দবাবু বলিলেন, "তোমার মত মূর্খের সেইটাই উপযুক্ত পদ বটে। দেখ মহেন্দর, গোবিন্দ চৌধুরী চিরকাল ঋণ দিয়ে এসেছে, কিন্তু কারো কাছে কখন ঋণ নেয় না। তুমি এত বড় মূর্খ যে তাকে শেষ বয়সে ঋণী কত্তে চাও?"

ইহার পরে মহেন্দ্রনাথ আর কিছু বলিতে পারিলেন না; তাহাকে প্রভুর ইচ্ছার উপরে নির্ভর করিতে হইল।

এদিকে প্রবল উদ্যমে নূতন বাড়ীর নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইল। গোবিন্দবাবু মধ্যে মধ্যে নিজে গিয়া তাহার তত্ত্বাবধান করিতেন, এবং কোন্‌খানে কোন ঘর হইবে, কোন্ ঘরখানা কিরূপ হইলে ভাল দেখাইবে, কোন্ ঘরের কোন দিকে কয়টা জানালা থাকিবে নিপুণ স্থাপত্যবিদ্যাবিদের ন্যায় এ সকল বিষয়ে মিস্ত্রীদের উপদেশ দিতেন। এমন কি গৃহপ্রবেশের সময় বৈঠকখানাটা কিরূপ সাজান হইবে, তিনি কোন্ খানে চৌকী পাতিয়া বসিয়া সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিবেন ইহাও স্থির করিয়া ফেলিলেন।

লোকে গোবিন্দবাবুর এই আগ্রহ ও উদ্যম দেখিয়া বিস্মিত হইত। কিন্তু ভিতরের মই কাড়িয়া লওয়ার কথাটা যাহারা জানিত, তাহারা ইহাতে একটুও বিস্মিত হইত না, বরং গোবিন্দবাবুর আশ্বাসবাণীটা তাহাদের নিকট সম্পূর্ণ নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া উঠিত। মহেন্দ্রনাথের নামে গোবিন্দবাবু যে নিজের ব্যবহারের জন্যই বাড়ীখানা এমন মনোমত করিয়া প্রস্তুত করিতেছেন, ইহা তাহাদের নিকট বেশ স্পষ্ট হইয়াআসিত, এবং আশার আশ্বাসে প্রলুব্ধ মহেন্দ্রনাথ পরিণামে যে কতটা মনস্তাপ ভোগ করিবে, ইহাই চিন্তা করিয়া বেচারা মহেন্দ্রনাথের উপর করুণায় তাহাদের অন্তরটা ব্যথিত হইয়া পড়িত।

মানুষ আশা করিয়া কাজ করিতে পারে, কিন্তু তাহার সাফল্য-অসাফল্যের কর্তৃত্ব এমন একজনের থাকে, মানুষের চেষ্টা যাহার বিধানকে কিছুতেই অতিক্রম করিতে পারে না। সেই অদৃশ্য হস্তের নীরব ইঙ্গিতে যে পরিণাম আসিয়া উপস্থিত হয়, ঈপ্সিত হউক বা অনভীপ্সিত হউক, মানুষকে আপনার সকল আত্মাভিমান ত্যাগ করিয়া তাহাই মাথা পাতিয়া লইতে হয়। যতই কষ্টকর হউক তাহাকে অস্বীকার করিবার কোনই উপায় থাকে না। বৈরাগ্যের এই তীব্র বেদনাকে অপেক্ষাকৃত কোমল করিবার জন্যই বোধ হয় পণ্ডিতেরা কর্ম্মফলের বিধাতার হস্তেই কর্ম্মের ফলটুকুও অর্পণ করিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছেন।

গোবিন্দবাবুর আশাও সফল হইল না। তাঁহার চেষ্টায় মহেন্দ্রনাথের বাড়ীখানা যখন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিল, এবং আর মাসখানেকের মধ্যেই কাজ শেষ হইয়া আসিবে এমন আশা হইল, তখন হঠাৎ গোবিন্দবাবু উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইলেন। মহেন্দ্রনাথ ভাল ডাক্তার কবিরাজ আনিয়া প্রভুর চিকিৎসায় নিয়োজিত করিলেন। চিকিৎসার গুণে রোগ অনেকটা কমিয়া আসিল। গোবিন্দবাবু মহেন্দ্রনাথকে বলিলেন, "দু'টো মাস কোন রকমে আমাকে বাঁচিয়ে রাখ মহেন্দর, নিজে যেন মা লক্ষ্মীকে নূতন বাড়ীতে প্রতিষ্ঠা ক'রে যেতে পারি।"

মহেন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, "আপনি এখন কোথায় যাবেন বাবু, অপনার যে এখনো অনেক কাজই বাকী।"

কাল কিন্তু শুধু নিজের হিসাব রাখে, অপরের কাজের সম্পূর্ণতা অসম্পূর্ণতার দিকে লক্ষ্য করে না। সুতরাং গোবিন্দবাবুর রোগ যখন অনেকটা আরোগ্যের পথে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সহসা ভীষণ-বজ্রপাতের ন্যায় সংবাদ আসিল, লাটের কিস্তীর চালান লুট হইয়া গিয়াছে। এই দুঃসংবাদের ভীষণ আঘাতে গোবিন্দবাবু পুনরায় শয্যাশয়ী হইয়া পড়িলেন।

খাজনা আদায়ের সম্ভাবনাই ছিল না, কিন্তু মহেন্দ্রনাথের কতক আদায় হইয়াছিল। বাকী হাজার পাঁচ টাকা কোনরূপে যোগাড় করিয়া কিস্তীর বিশ হাজার টাকা চালান দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু সেই চালান যখন লুট হইয়া গেল, তখন জমিদারী রক্ষার আর কোনই উপায় রহিল না! গোবিন্দবাবু হতাশভাবে মহেন্দ্রনাথকে বলিলেন, "জমিদারী গিয়েছে মহেন্দর, তাকে আর

কিছুতেই রাখতে পারবে না। এখন বরদা ঘোষালকে দেখে নাও, এ চালান লুটের মূল সেই।"

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তাঁকে কেমন ক'রে শাসন করবো বাবু?"

রোগজীর্ণ বৃদ্ধ সবেগে বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন; সিংহগর্জ্জনে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "যেমন ক'রে পার শাসন কর। ঘর লুট করাও, মাথা কাটাও, কাছারীতে আগুন ধরাও, আমার সঙ্গে সঙ্গে তাকেও পথে বসাও।"

উত্তেজনায় ক্রোধে গোবিন্দবাবুর শরীর থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। মহেন্দ্রনাথ আস্তে আস্তে তাঁহাকে বিছানার উপর শোয়াইয়া দিয়া সান্ত্বনার স্বরে বলিলেন, "স্থির হোন বাবু, আগে জমিদারী রক্ষা তার পর শত্রু শাসন।"

গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত গোবিন্দবাবু বলিলেন, "জমিদারী আর কি দিয়ে রাখবে মহেন্দর?"

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমার সকল শক্তি, সকল উদ্যম দিয়ে।"

মহেন্দ্রনাথের স্বরের ভিতর দিযা যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সুর ধ্বনিত হইল, তাহাতে যারপর নাই বিস্ময় অনুভব করিয়া গোবিন্দবাবু তাহার স্থির প্রশান্ত মুখমণ্ডলের দিকে সচকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। মহেন্দ্রনাথ প্রভুর পদধুলি লইয়া প্রস্থান করিলেন।

তারপর কয়দিন আর মহেন্দ্রনাথের দেখা পাওয়া গেল না। গোবিন্দবাবু বুঝিলেন, আর আশা নাই, আশা থাকিলে মহেন্দ্র নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ করিতে আসিত; কিন্তু কোন উপায় না থাকায় লজ্জায় দেখা দিতে পাবে না। হা নির্ব্বোধ, যেখানে মানুষের কোন হাত নাই, সেখানে পরাজয়ের জন্য এত লজ্জা কেন?

যেদিন কিস্তীর নির্দ্ধারিত দিন সেদিনও মহেন্দ্রনাথের দেখা নাই। সেদিন গোবিন্দবাবু ঔষধ পথ্য কিছুই স্পর্শ করিলেন না। দিন যতই শেষ হইয়া আসিল, ততই কলেক্টরী গৃহের একটা ভীষণ চিত্র তাঁহার নিমীলিত দৃষ্টির সমক্ষে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল। এই সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সৌভাগ্য-রবিও অস্তমিত হইতেছে। এতক্ষণ কলেক্টরীতে ডাক পড়িয়াছে; এতক্ষণ নাজিরের ঘরে নীলামের উদ্যোগ হইতেছে। আর বরদা ঘোষালের উকিল নীলাম ডাকিবার জন্য আগ্রহান্বিত ভাবে অপেক্ষা করিতেছে। ঐ বুঝি নীলামের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল; এক, দুই—ওঃ ভগবান, কল্যকার সূর্য্যোদয় যেন আর দেখিতে না হয়। গোবিন্দবাবু একবার নিজে উপস্থিত থাকিয়া গোপীগঞ্জের জমিদারী নীলাম হইতে দেখিয়াছিলেন। সেই নীলামের কঠোর ঘণ্টাধ্বনি আজ সারারাত্রি গোবিন্দবাবুর কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

পরদিন অপরাহ্ণে একটা নিদারুণ দুঃসংবাদ শুনিবার জন্য গোবিন্দবাবু যখন আপনার হৃদয়কে সম্পূর্ণ প্রস্তুত করিতেছিলেন, তখন সহসা মহেন্দ্রনাথ আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। গোবিন্দবাবু শঙ্কা-কম্পিত-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে নীলাম ডাক্‌লে মহেন্দর?'

মহেন্দ্রনাথ চমৎকৃতভাবে প্রভুর মুখের দিকে চাহিলেন। গোবিন্দবাবু নৈরাশ্য-জড়িত স্বরে বলিলেন, "বরদা ঘোষালই বোধ হয় ডেকে নিয়েছে।"

স্থির গম্ভীর-স্বরে মহেন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, "এমন কথা কেন বল্‌ছেন বাবু? মহেন্দ্র মুখুজ্যে বেঁচে থাক্‌তে কার সাধ্য আপনার জমিদারী নীলামে ডাকে?"

গোবিন্দবাবু বিস্ময়ে দৃষ্টি বিস্ফারিত করিয়া মহেন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিলেন। উৎফুল্লস্বরে মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আপনার কোন চিন্তা নাই বাবু, সূর্য্যাস্তের এক ঘণ্টা আগে কিস্তীর টাকা দাখিল ক'রে দিয়েছি।"

এই অসম্ভাবিত সংবাদে গোবিন্দবাবু ক্ষণকালের জন্য যেন মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন, আনন্দের আতিশয্যে তাঁহার বাক্‌শক্তি পর্য্যন্ত যেন তিরোহিত হইল। ক্ষণকাল পরে তিনি আত্মসংবরণ করিয়া আবেগ-কম্পিত-কণ্ঠে শুধু ডাকিলেন, "মহেন্দর!"

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন,"অনেক কষ্টে টাকার যোগাড় কত্তে হয়েছে বাবু, তাই আপনাকে সংবাদ দেবার সময় পাই নাই।"

গোবিন্দবাবু বলিলেন, "আমি কিন্তু হাজার কষ্ট করলেও এই অল্প সময়ে এত টাকার যোগাড় কত্তে পারতাম না।"

সঙ্কুচিতভাবে মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "এমন কথা বল্‌বেন না বাবু, আপনারই নাম ক'রে আমি প্রজাদের দরজায় দরজায় ঘুরে যোল হাজার টাকার যোগাড় ক'রেছি।"

গোবিন্দবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাকী চার হাজার।"

মহেন্দ্রনাথ নতমুখে উত্তর করিলেন, "আমার চার বছরের মাইনের জমা তিন হাজার ছিল। বাকী এক হাজার আপনার বোয়ের—"

গোবিন্দবাবু বিদ্যুদ্বেগে বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন, এবং দুই হাতে মহেন্দ্রর হাত দুইটা চাপিয়া ধরিয়া উত্তেজিতকণ্ঠে বলিলেন, "হতভাগ্য, মা লক্ষ্মীর গহনা বেচে আমার জমিদারী বাঁচিয়েছ? কেন, আমার একটা মহাল বন্ধক দিতে পারলে না?"

মহেন্দ্রনাথ নিরুত্তরে নতমুখে দাঁড়াইয়াছিলেন। গোবিন্দবাবু তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া পুনরায় শুইয়া পড়িলেন, এবং ধীর-প্রশান্তস্বরে বলিলেন, এমন সময়ে আবার আমাকে এত ঋণে জড়ালে কেন মহেন্দর? আমার যে আর ঋণ শোধ করবার সময় নাই।"

লজ্জানতমুখে মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমি এমন কি ক'রেছি বাবু, উপকার যদি কেউ ক'রে থাকে, তবে সে আপনার প্রজারা। আপনার বিপদের কথা শুনে তারা ঘটী বাটী পর্য্যন্ত বেচে কড়ায় গণ্ডায় খাজনা শোধ ক'রেছে!"

গোবিন্দবাবুর দৃষ্টি আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া তিনি গদগদকণ্ঠে বলিলেন, "যদি এ যাত্রা বাঁচি, তবে গরীব প্রজাদের এ উপকারের প্রতিদান দেব। কিন্তু তোমার ঋণ শোধ করবার কোন উপায়ই নাই মহেন্দর।"

মহেন্দ্রনাথ লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া পলাইয়া গেলেন।

মহেন্দ্রনাথ জমিদারী রক্ষা করিল বটে, কিন্তু প্রভুকে রক্ষা করিতে পারিল না। তাহার প্রাণান্ত চেষ্টা এখানে ব্যর্থ হইল। কিস্তীর লুটের সংবাদ পাইয়া গোবিন্দবাবু সেই যে শয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে শয্যা হইতে আর উঠিতে পারিলেন না। জমিদারী নীলামের আশঙ্কায় ও দুশ্চিন্তায় রোগটা এমনভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে, চিকিৎসকের বহু চেষ্টাতেও তাহা আর কিছুতেই কমিল না, বরং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। দেখিয়া মহেন্দ্রনাথ ভীত হইলেন, এবং কলিকাতায় যোগেশকে সংবাদ দিতে চাহিলেন। কিন্তু তখন তাহার বি-এ পরীক্ষার এক মাস মাত্র বাকী বলিয়া গোবিন্দবাবু তাহাকে সংবাদ দিয়া ব্যস্ত করিতে নিষেধ করিলেন। তিনি মহেন্দ্রনাথকে বুঝাইয়া বলিলেন, "যদিও মৃত্যু নিশ্চিত, তথাপি তাঁহার মরিতে এখনও বিলম্ব আছে; তাঁহার ন্যায় পাপীর এত শীঘ্র ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইবার সম্ভাবনা নাই।"

কিন্তু হঠাৎ একদিন মুক্তির সময় এমনই অতর্কিতভাবে নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল যে, তখন আর যোগেশের সহিত সাক্ষাতের সম্ভাবনা রহিল না। মহেন্দ্রনাথ তাহাকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইয়া দিলেন বটে, কিন্তু সে আসিবার পূর্ব্বেই গোবিন্দবাবু হরিনাম করিতে করিতে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি মহেন্দ্রনাথের হাত ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "জমিদারীর জন্য আমার চিন্তা নাই মহেন্দর, জমিদারী রইল, আর তুমি রইলে। কিন্তু আমার দুঃখ এই যে, আমার মা লক্ষ্মীকে নূতন বাড়ীতে প্রতিষ্ঠা ক'রে যেতে পারলাম না। আমি তোমার কাছে ঋণী হ'য়ে চল্লাম। তোমার নির্ম্মলাকে আমার যোগেশের হাতে দিয়ে আমাকে ঋণদায় হ'তে মুক্ত ক'রো, নয় তো আমার ঊর্দ্ধগতি হবে না।"

মহেন্দ্রনাথ ধূলায় লুটাইয়া পিতৃহীন বালকের মত কাঁদিতে লাগিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গোবিন্দবাবুর শ্রাদ্ধটা কিরূপ সমারোহ-সহকারে সম্পন্ন হইবে এবং কোনরূপ গোলযোগে সেই সমারোহ পণ্ড হইবার সম্ভাবনা আছে কিনা, বরদাবাবু পারিষদগণের নিকট যখন এইরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করিতেছিলেন, তখন সহসা তাঁহার সকল সম্ভাবনাকে অতিক্রম করিয়া যোগেশ কাচা গলায় দিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন; তাহার পশ্চাতে মহেন্দ্রনাথ আসিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। তাঁহাদের আগমনে বরদাবাবু এতদূর চমৎকৃত হইলেন যে, মহেন্দ্রনাথের নমস্কারে প্রতিনমস্কার করিতেও তিনি ভুলিয়া গেলেন।

পারিষদ পরেশ সরকার বাবুর এই ভ্রমটুকু সংশোধন করিবার অভিপ্রায়ে তাড়াতাড়ি চাকরকে ডাকিয়া যোগেশের জন্য কম্বল আনাইয়া দিলেন, এবং অভ্যর্থনার সহিত মহেন্দ্রনাথকে উপবেশন করাইলেন। ততক্ষণে বরদাবাবু আপনাকে স্থির করিয়া লইয়া যোগেশকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কবে এলে হে যোগেশ?"

যোগেশ সবিনয়ে উত্তর করিল, "কাল সন্ধ্যার আগে এসেছি কাকাবাবু।"

মুখখানাকে অতিরিক্ত গম্ভীর করিয়া বরদাবাবু বলিলেন, "আহা, আর একটা দিন আগে যদি আসতে? তোমারই দোষ কি বল? এঁদের কিন্তু দু'দিন আগে সংবাদ দেওয়া উচিত ছিল।"

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কি ক'রে সংবাদ দেব ছোটবাবু, বাবু যে এমন হঠাৎ মারা যাবেন তার কোন লক্ষণই তো জানা যায় নি।"

গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালনপূর্ব্বক বরদাবাবু বলিলেন, "গ্রহণী রোগে ঐ রকমই হয় হে, এ রোগকে বিশ্বাস নাই। কখন্ যে কি হয় বলা যায় না।"

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমি খবর দিতে চেয়েছিলাম ছোটবাবু, কিন্তু পাছে যোগেশের এগ্‌জামিনের ব্যাঘাত হয় এই ভয়ে বাবু খবর দিতে বারণ করেন।"

গম্ভীরস্বরে বরদাবাবু বলিলেন, "এইটাই যে তোমাদের মস্ত ভুল! বাপ আগে, না এগ্‌জামিন্ আগে? যেমন তেমন বাপ নয়, এমন ইন্দ্রচন্দ্রের মত বাপ, মরণ সময় তাঁর সঙ্গে দেখা হলো না।"

বলিয়া বরদাবাবু জোরে একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। যোগেশের চোখ দুইটা সজল হইয়া আসিল। তাহা লক্ষ্য করিয়া বরদাবাবু ব্যস্তভাবে যেন সে প্রসঙ্গটা চাপা দিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন, "যাক্, যা-হবার হ'য়েছে। তা হ'লে যোগেশ, তোমার আর এগ্‌জামিন দেওয়া হ'লো না?"

যোগেশ বলিল, "কৈ আর হ'লো কাকাবাবু, কাল হ'তে এগ্‌জামিন্ বস্‌বে।"

নাসাগ্র কুঞ্চিত করিয়া উপেক্ষার ভাব প্রকাশপূর্ব্বক বরদাবাবু বলিলেন, "যাক্, এগ্‌জামিন্ দিয়েই আর হবে কি? চাকরী কত্তে তো হবে না। তবে সম্মান; তা এখন বি-এ, এম্-এ, গড়াগড়ি যাচ্ছে। আমাদের সময়ে এণ্ট্রেন্স পাশের যে সম্মান ছিল, এখন এম-এ, পাশ ক'রে তা পাওয়া যায় না। আমি যে বৎসর এণ্ট্রেন্স দিয়ে দেশে আসি, সে বৎসর আমাকে দেখ্‌বার জন্য গ্রামশুদ্ধ লোক ভেঙ্গে পড়েছিল।"

বরদাবাবু পারিষদবর্গের দিকে চাহিয়া একটু গর্ব্বের হাসি হাসিলেন! পরেশ সরকার মহেন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিল, "আজ বুঝি তিন দিন হ'লো? তা হ'লে মাঝে আর সাতটা দিন।"

মহেন্দ্রনাথ তাহার কথার কোন উত্তর না দিয়া বরদাবাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সেই জন্যই আপনার কাছে আসা ছোটবাবু। ছোট তরফ আর বড়র তরফ এই দুই তরফ গ্রামেরই বলুন আর সমাজেরই বলুন মাথা। বাইরে বিবাদ-বিসংবাদ যতই থাক্, ভিতরে কিন্তু দু'য়ে এক, একে দুই; একের মান-অপমানে অপরের মান-অপমান। যোগেশ ছেলেমানুষ, এখন তার মাথার উপর কর্ত্তাই বলুন, অভিভাবকই বলুন আপনিই সব। যোগেশ এখন আপনার উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে এসেছে।"

গাম্ভীর্য্যের সহিত কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিয়া বরদাবাবু গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন, "হাঁ, মাতৃপিতৃদায় হাতী দায়। এ সময়ে ছোট বড় সকলের কাছে গিয়ে দৈন্য জানাতে হয়। তা বেশ, যোগেশ নেহাৎ ছেলেমানুষ নয়, আর তার মাথার উপর যখন তুমি আছ, তখন কোন দিকেই কিছু ত্রুটী হবে না।"

মহেন্দ্রনাথ ঘাড় নাড়িয়া উত্তর করিলেন, "না ছোটবাবু, আপনি মনে করবেন না আত্মীয় ব'লে শুধু আপনাকে দায় জানাতে এসেছে। এক্ষেত্রে আপনাকেই মাথা দিয়ে দাঁড়াতে হবে।"

একটু গম্ভীর হাসি হাসিয়া বরদাবাবু বলিলেন, "দরকার হ'লে তাই দাঁড়ানই তো উচিত! তবে মাথার উপর তুমি যখন আছ—"

বাধা দিয়া মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমার কথা ছেড়ে দিন ছোট বাবু, আমি সামান্য প্রাণী, রাজা-রাজড়ার বাড়ীর মানসম্মানের কি জানি।"

সর্ব্বেশ্বর বাচস্পতি মস্তক সঞ্চালনপূর্ব্বক বলিয়া উঠিলেন, "যথার্থ কথা। 'ভবানী ভ্রূকুটিভঙ্গী ভবো বেত্তি ন ভূধরঃ।"

বলিয়া তিনি নাসাগহ্বরে এক টিপ নস্য প্রয়োগ করিলেন। যোগেশ নতমস্তকে মৃদুস্বরে বলিল, "না কাকাবাবু, আমার উপর মান-অভিমান ক'রে আপনার ব'সে থাক্‌লে চল্‌বে না।"

উচ্চ হাসি হাসিয়া বরদাবাবু বলিলেন, "পাগল! তোমার উপর মান অভিমান! তবে বল্‌ছিলাম কি, সময়টা তেমন ভাল নয়, কিস্তী লুট হওয়ায় কিছু দেনাও দাঁড়িয়েছে। এ সময় তেমন আড়ম্বর না ক'রে কোন রকমে কাজটা সেরে দিলে ভাল হয় না?"

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "না ছোটবাবু, কিস্তী লুট হ'য়েছে বটে, কিন্তু আপনার আশীর্ব্বাদে দেনা কিছু হয় নি। আর যদিই দেনা হয়, সে দেনা কিছু চিরদিন থাক্‌বে না, কিন্তু বাবু তো আর ফিরে আস্‌বেন না, তাঁর কাজও তো দু'বার হবে না।

বাচস্পতি বলিলেন, "ঠিক্ ঠিক্, তিনি যখন এমন উপযুক্ত পুত্র রেখে গিয়েছেন, তখন তাঁর ভাবনা কি? 'পুত্রে যশসি তোয়ে চ নরাণং পুণ্যলক্ষণম্।"

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "এখন তাঁর কাজ যাতে তাঁর মত হয় তাই আপনাকে কত্তে হবে। আর সে কাজ আপনি ছাড়া আর কারো দ্বারা নির্ব্বাহ হবে না।"

চিন্তিতভাবে বরদাবাবু বলিলেন, "আর কারো দ্বারা হবে না যে সে কথা সত্য। তবে আমাকে আবার—"

মস্তক-সঞ্চালনের সহিত মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আপনাকে না ধ'রে কি গোপাল কামারকে ধত্তে যাব? এ যে আপনারই কাজ ছোটবাবু।"

পরেশ সরকার বলিল, "তাতো বটেই, যার কাজ তাকে সাজে, অন্যকে লাঠী বাজে।"

মহেন্দ্রনাথ যোগেশকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তা হ'লে চল যোগেশ, ক'দিন উপবাস গিয়েছে, আজ আবার তোমার হবিষ্য কত্তে হবে।"

বলিয়া মহেন্দ্রনাথ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং বরদাবাবুকে নমস্কার করিয়া যোগেশকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

তাহারা চলিয়া গেলে বাচস্পতি সগর্ব্ব হাস্য-সহকারে বলিলেন, "বাবু না দাঁড়ালে কি কোন কাজ হয়?"

পরেশ বলিল, "তা হ'লে আর ছুটে আস্‌তো না।"

বরদাবাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ছুটে আস্‌বার তাৎপর্য্য আছে হে পরেশ, মহেন্দ্র মুখুজ্যেকে তোমরা চেন না, ও আমার উপর এক চাল্ দিয়ে গেল। এক ঢিলে দু'টো পাখী মারলে। যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞে দুর্য্যোধনকে ভাঁড়ারী করেছিল জান তো?"

সকলেই বিস্ময় বিস্ফারিত-দৃষ্টিতে বাবুর মুখের দিকে চাহিল। বরদাবাবু বলিলেন, "শত্রুর হাতে ভাঁড়ার সঁপে দিয়ে যশ কিন্‌বে, অথচ কাজে একটুও গোলযোগ হবে না। আচ্ছা, আমিও বরদা ঘোষাল, আজ দশ বৎসর জমিদারী চালাচ্চি। আমিও ওর উপর চাল্ না দিয়ে ছাড়বো না।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বরদাবাবুর তত্ত্বাবধানে উপযুক্ত সমারোহের সহিত গোবিন্দবাবুর শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন হইল। অনেকেই বলিতে লাগিল, "গোবিন্দবাবুর মাতৃশ্রাদ্ধের পর এমন সমারোহের শ্রাদ্ধ আর হয় নাই।" কেহ বা বরদাবাবুর প্রশংসা করিল, কেহ বা মহেন্দ্রনাথকে ধন্যবাদ দিল।

শ্রাদ্ধান্তে মহেন্দ্রনাথ যোগেশকে জমিদারীর ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। যোগেশ কিন্তু জমিদারীর কাজ-কর্ম্ম কিছুই জানিত না, সুতরাং সে একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। বরদাবাবু তাহাকে সাহস দিয়া বলিলেন, "ভয় কি, তিন দিনে কাজ-কর্ম্ম শিখিয়ে দেব।"

তাঁহার নিকট আশ্বাস পাইয়া যোগেশ কার্য্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিল। বরদাবাবু তাহাকে জমিদারী পরিচালনের কৌশল সকল শিখাইয়া দিতে লাগিলেন। তাঁহার এই সহৃদয়তায় যোগেশ মুগ্ধ হইয়া পড়িল এবং সর্ব্বতোভাবে তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল। বরদাবাবুর সহিত যোগেশের এতটা ঘনিষ্ঠতা কিন্তু মহেন্দ্রনাথের ভাল লাগিল না। ভাল না লাগিলেও তিনি কোন প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। বরদাবাবু যোগেশের আত্মীয়; তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতায় প্রতিবাদ করিতে গেলে যোগেশ কি মনে করিবে? বিশেষতঃ এই ঘনিষ্ঠতা দ্বারা উভয় পরিবারের মধ্যে বহুকালব্যাপী বিবাদটা যদি মিটিয়া যায়, তাহাতে মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল নাই। কিন্তু মহেন্দ্রনাথ বরদাবাবুকে চিনিতেন, সুতরাং এই ঈপ্সিত মঙ্গলের সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারিলেন না। না পারিলেও আপনার সন্দেহটা যোগেশের নিকট প্রকাশ করিলেন না। শুধু নিজেই সাবধান হইয়া চলিতে লাগিলেন।

শ্রাদ্ধের মাসখানেক পরে মহেন্দ্রনাথ একবার জ্বরে পড়িলেন। জ্বরের প্রথম অবস্থায় দুই একদিন কাজে আসিলেন, কিন্তু শেষে জ্বর যখন প্রবলভাবে আক্রমণ করিল, তখন আর আসিতে পারিলেন না। প্রায় এক পক্ষ কাল তাহাকে শয্যাগত হইয়া থাকিতে হইল। এই সময়ের মধ্যে এমন একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল, মহেন্দ্রনাথ যাহার প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না।

তাঁহার অনুপস্থিতির কয়েক দিন পরেই একদা বরদাবাবু যোগেশকে ডাকিয়া বলিলেন, "ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব যে সফরে আস্‌ছে হে যোগেশ!"

যোগেশ জানিত, রাজকর্ম্মচারীরা সফরে আসিলে তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য জমিদারকে কিছু খরচ করিতে হয়। সুতরাং সে উত্তর করিল, "তা হ'লে দু'এক শো যাবে দেখছি।"

বরদাবাবু বলিলেন, "তা তো যাবেই। তা ছাড়া তোমাকে আর একটা পরামর্শ দিচ্চি।"

পরামর্শের প্রত্যাশায় যোগেশ উৎসুকভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। বরদাবাবু বলিলেন, "তুমি ছেলেমানুষ, জান না, কিন্তু জমিদারী রাখ্‌তে হ'ল এঁদের একটু সন্তুষ্ট রাখ্‌তে হয়। কারণ এঁরাই হচ্চে জেলার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, এঁদের হাতে রাখ্‌তে না পারলে মান বল, ইজ্জৎ বল, সবই আকাশকুসুম।"

ঈষৎ হাসিয়া যোগেশ বলিল, "সোজা কথায় কিছু ঘুষ দেওয়া দরকার।"

বরদাবাবু মস্তক সঞ্চালনপূর্ব্বক গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "ঘুষ! আরে রামচন্দ্র! একে ইংরাজ, তায় ম্যাজিষ্ট্রেট্, ওঁকে কি ঘুষ দেওয়া চলে? তবে কিছু ভেট দেওয়া যায়। কিন্তু আজ কাল এমন আইন হ'য়েছে যে, ওঁরা ভেটও নিতে পারেন না।"

যোগেশ কিছু বলিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি নিতে পারেন?"

বরদাবাবু বলিলেন, "ওঁরা কিছুই নিতে পারেন না। অথচ কৌশলে কিছু দেওয়াও দরকার। শুনছি সাহেবের সঙ্গে মেমসাহেবও আস্‌ছেন। ভালই হ'য়েছে, এ ক্ষেত্রে শক্তির পূজা দিয়ে শিবের প্রসন্নতা লাভ কত্তে হবে।"

বলিয়া তিনি যোগেশের মুখের উপর সহাস্য কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। যোগেশ বলিল, "তা হ'লে শক্তিপূজার আয়োজনটা কি রকম কত্তে হবে?"

বরদাবাবু বলিলেন, "অনেক খরচপত্র হ'য়ে গিয়েছে, এখন তেমন আড়ম্বরে দরকার নাই, হাজার দুই টাকা দিয়ে হ্যামিল্টনের বাড়ী হতে এক যোড়া ব্রেস্‌লেট আনিয়ে দাও।"

যোগেশ চিন্তা-মলিন-মুখে নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। বরদাবাবু বলিলেন, "জমিদারী চাল বজায় রাখ্‌তে হ'লে এই বাজে খরচগুলোর হাত কিছুতেই এড়াবার যো নাই, মধ্যে মধ্যে এ রকম পূজা অর্চ্চনা গুলো আছেই। বিশেষ তুমি নূতন জমিদার, তোমাকে তো খরচ কত্তেই হবে। আমি যখন প্রথম জমিদারী হাতে নিই, তখন বেল সাহেব ছিলেন ম্যাজিষ্ট্রেট্; বিবি বেলকে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে এক ছড়া নেকলেস্ দিয়েছিলাম। নেকলেস্ পেয়ে মেমসাহেবের আনন্দ দেখে কে? নিজে হাতে ধ'রে আমাকে চেয়ারে বসালে। সাহেব আমার পিঠ চাপড়ে কত সুখ্যাতি করলে। দৈবের ঘটনা দেখ, তার মাস কয়েক পরেই একেবারে এক খুনী মামলায় পড়ে গেলাম। তুমুল মোকদ্দমা, ডেপুটী বেটা চার হাজার টাকা জামিন নিয়ে তবে ছাড়লে। উকীলরা পর্য্যন্ত ভয় খেয়ে গেল, সকলেই মনে করলে জেল নিশ্চয়। একদিন রাতারাতি খুব গোপনে গিয়ে বিবি বেলের সঙ্গে দেখা কর্‌লাম। তারপর মামলা সেসনে গেল। ম্যাজিষ্ট্রেট্ দু'চারজন সাক্ষীর জবানবন্দী নিয়েই মোকদ্দমা খারিজ ক'রে দিলেন।

উকীলরা বল্লে, বাবু, আপনার নেহাৎ ভাগ্যের জোর। আমি মনে মনে ভাব্‌লাম, "এ আমার সেই পাঁচ হাজার টাকার জোর।"

বলিয়া বরদাবাবু হাসিয়া উঠিলেন। যোগেশও একটু হাসিল, বরদাবাবু বলিলেন, "শুনতে পাচ্ছি, সাহেব আসচে শনিবার রবিবার নাগাদ আস্‌তে পারে। তা হ'লে তুমি আর দেরী ক'রো না, কালই কলকাতায় গিয়ে জিনিষটা নিয়ে এস। নিজে যেতে না পার, একজন বিশ্বাসী লোক পাঠিয়ে দাও।"

যোগেশ স্বীকৃত হইয়া প্রস্থান করিল, এবং কাছারীতে গিয়া খাজাঞ্চিকে দুই হাজার টাকা দিতে বলিল। খাজাঞ্চি জানাইল, তহবিলে এত টাকা নাই। যোগেশ রাগিয়া বলিল, "তহবিলে না থাকে, যে রকমে হোক টাকার যোগাড় ক'রে দাও।"

খাজাঞ্চি সঙ্কুচিতভাবে জানাইল, দুই হাজার টাকার যোগাড় অনায়াসেই হইতে পারে, কিন্তু তাহা দেওয়ানজীর অনুমতিসাপেক্ষ। তাঁহার অনুমতি ব্যতীত বাহির হইতে এক পয়সাও আনা যাইতে পারে না।

কিন্তু দেওয়ান তখন শয্যাগত, অনুপস্থিত। অপরাহ্ণে যোগেশ কাকাবাবুর নিকট গিয়া আপনার বিপন্ন অবস্থা জ্ঞাপন করিল। বরদাবাবু শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "সামান্য দু'হাজার টাকার জন্য তোমার চিন্তা নাই যোগেশ, আমিই দিচ্ছি। কিন্তু তোমার কর্ম্মচারীরা কি অবাধ্য! তুমি মনিব, তোমার হুকুম অমান্য করে। আমি হ'লে তো এমন অবাধ্য চাকরকে আগে জবাব দিয়ে তারপর জলগ্রহণ করতাম।"

বলিয়া বরদাবাবু তৎক্ষণাৎ দুই হাজার টাকা দিবার জন্য খাজাঞ্চির উপর আদেশ দিলেন। অতঃপর তিনি কর্ম্মচারীদের কিরূপে বশে রাখিতে হয়, সে সম্বন্ধে যোগেশকে উপদেশ দিতে দিতে সহসা যেন সচেতন হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ভাল কথা, টাকা নিয়েই বা তুমি করবে কি? তোমার কর্ম্মচারীদের ভাবগতিক যেরূপ, তাতে তাদের উপর তোমাকে বিশ্বাস কত্তেও বল্‌তে পারি না। তোমারও শরীর তেমন ভাল নয়। আমি বিশ্বাসী লোক পাঠিয়ে জিনিষটা আনিয়ে দিচ্ছি।"

কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে যোগেশের দৃষ্টি সজল হইয়া আসিল। সে কাগজ কলম লইয়া দুই হাজার টাকার একখানা হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিল। হ্যাণ্ডনোট লইতে বরদাবাবু অনেক আপত্তি করিলেন। যোগেশ কিন্তু কোন আপত্তিই শুনিল না; সে এক প্রকার জোর করিয়া তাঁহার হাতে হ্যাণ্ডনোটখানা গুঁজিয়া দিয়া চলিয়া আসিল।

পরদিন যোগেশ খাজাঞ্চী এবং তাহার সঙ্গে আরও দুই তিন জন কর্ম্মচারীকে জবাব দিল। তাহারা অনেক কাকুতি-মিনতি করিল, কিন্তু যোগেশ তাহাদের অনুনয়ে কর্ণপাত করিল না। তখন পদচ্যুত কর্ম্মচারিগণ হতাশ হইয়া দেওয়ানজীর নিকট উপস্থিত হইল।

দুই দিন হইতে জ্বর একটু কম ছিল। সুতরাং মহেন্দ্রনাথ সে দিন উঠিয়া বসিয়াছিলেন এবং আর দুই দিন জ্বরটা এইরূপ কম থাকিলে তিনি যে যাহা হয় কিছু খাইয়া কাজে যাইতে পারিবেন, ভবসুন্দরীর নিকট এইরূপ সম্ভাবনা প্রকাশ করিতেছিলেন। এমন সময় কর্ম্মচারীদের ডাক শুনিয়া তিনি লাঠি ধরিয়া বাহিরে আসিলেন। কর্ম্মচারীরা কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার নিকট আপনাদের অবস্থা জ্ঞাপন করিল। খাজাঞ্চীর নিকট সমস্ত শুনিয়া মহেন্দ্রনাথ যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। শেষে ইহাকে যোগেশের বালকবুদ্ধির খেয়াল মনে করিয়া কর্ম্মচারীদিগকে আশ্বাস দিয়া বিদায় দিলেন। তারপর ভবসুন্দরীর সহিত পরামর্শ করিয়া লাঠি ধরিয়া তিনি কাছারী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

যোগেশ বৈঠকখানায় বসিয়া বরদাবাবুর সহিত নূতন কর্ম্মচারী নিয়োগের পরামর্শ করিতেছিল। এমন সময় মহেন্দ্রনাথ লাঠি ধরিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে তথায় উপস্থিত হইলেন। যোগেশ আশ্চর্য্যান্বিতভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। বরদাবাবু বলিয়া উঠিলেন, "এই যে মহেন্দ্রবাবু, বেশ সেরে উঠেছ?"

মহেন্দ্রনাথ সম্মুখস্থ বেঞ্চিখানার উপর বসিয়া পড়িয়া একটু দম লইয়া উত্তর দিলেন, "জ্বরটা একটু কমেছে ছোটবাবু, এখনো বন্ধ হয় নি।"

বলিয়া তিনি জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিলেন। বরদাবাবু বলিলেন, "তা হ'লে এতটা পথ হেঁটে কষ্ট ক'রে এলে কেন? এতে যে জ্বর বাড়তে পারে।"

মহেন্দ্রনাথ সে কথার কোন উত্তর না দিয়া যোগেশের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বেণীবাবুকে নাকি জবাব দিয়েছ যোগেশ?"

যোগেশ মুখ নীচু করিয়া উত্তর দিল, "হুঁ।"

মহেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার অপরাধ?"

মুখ তুলিয়া যোগেশ বলিল, "জবাব হ'য়েছে এ সংবাদ যখন পেয়েছেন, তখন তার অপরাধের কথাটাও শুনে থাকবেন।"

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "শুনেছি সবই, কিন্তু তাতে বেণীবাবুর অপরাধ কিছুই নাই।"

বরদাবাবু বলিলেন, "মনিবের অবাধ্য হওয়া কি কর্ম্মচারীর অপরাধ নয়?

ভ্রূভঙ্গী করিয়া মহেন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, "দু'শো বার অপরাধ। কিন্তু এক্ষেত্রে সে নিয়ম পালন করেছে মাত্র। বাবুর আমল হ'তেই নিয়ম চলে আসছে, আমার সই ছাড়া কেউ এক পয়সা পাবে না, বাবু নিজে পর্য্যন্ত না।"

বরদাবাবু নিরুত্তর হইলেন। যোগেশ বলিল, "এমনতর নিয়ম আমি পছন্দ করি না।"

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "পছন্দ না হয়, ইচ্ছামত নূতন নিয়ম চালাতে পার। কিন্তু পুরাতন লোকদের জবাব দিও না যোগেশ।"

বরদাবাবু ঈষৎ হাসিয়া শ্লেষ-তীব্রকণ্ঠে বলিলেন, "মহেন্দ্রবাবু বুঝি যোগেশের নাম ধ'রেই ডেকে থাক?"

এই প্রশ্নে মহেন্দ্রনাথ একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন; ঈষৎ লজ্জিতভাবে বলিলেন, "ওটা অভ্যাস হ'য়ে গিয়েছে ছোটবাবু।"

গম্ভীরস্বরে বরদাবাবু বলিলেন, "কিন্তু এটা ভাল অভ্যাস নয় মহেন্দ্রবাবু। মনিবের নাম ধ'রে ডাকা, লোকে শুনলেই বা বলবে কি?"

মহেন্দ্রনাথ নতমুখে বসিয়া মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ নীরবে অতিবাহিত হইল। অতঃপর বরদাবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং যোগেশকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তা হ'লে তুমি সন্ধ্যার পর একবার যাবে যোগেশ। খুব সম্ভব তিনটার গাড়ীতেই পরেশ ফিরে আসবে।"

বলিয়া তিনি দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন, এবং দরজার নিকট উপস্থিত হইয়া সহসা ফিরিয়া বলিলেন, "ভাল কথা, নূতন লোক রাখা যদি মত হয়, তা হ'লে আজই আমাকে খবরটা দিও।"

বলিয়া তিনি ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে প্রস্থান করিলেন। মহেন্দ্রনাথ ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া যোগেশের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হঠাৎ এত টাকার দরকার হয়েছিল কেন?"

যোগেশ বলিল, ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব আসছেন, তাঁর মেমকে ভেট্ দিতে হবে।"

"দু'হাজার টাকা খরচ ক'রে ভেট?"

যোগেশ নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। মহেন্দ্রনাথ একটু ভাবিয়া বলিলেন, "কিন্তু আপাততঃ তহবিলে তো কিছু নাই, বাবুর শ্রাদ্ধে সব খরচ হয়ে গিয়েছে। চৈত্রের কিস্তীতে আদায় উশুল না হ'লে—"

বাধা দিয়া যোগেশ বলিল, "টাকার যোগাড় আমি করেছি।"

"কোথা হ'তে করলে ?"

"কাকাবাবু ধার দিয়েছেন।"

মহেন্দ্রনাথের মুখখানা গম্ভীর হইয়া আসিল। তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ধীর-গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ছোটবাবু তোমাদের আত্মীয়, সুতরাং তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় আমার কোন কথা বলা উচিত হয় না, বলিও না; কিন্তু ওঁদের সঙ্গে টাকার লেন-দেনটা না হলেই ভাল হয়।"

ঈষৎ ক্রুদ্ধভাবে যোগেশ বলিল, "টাকা দেবার জন্য উনিও বাক্স খুলে রাখেন নি।"

এই ক্রুদ্ধ উত্তরে মহেন্দ্রনাথ কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হইলেন না, বরং একটু হাসিয়া বলিলেন, "না রাখাই মঙ্গল। এখন যা দিয়েছেন, তা চৈত্রের কিস্তীতে মিটিয়ে দিতে পারলে তবে নিশ্চিন্ত।"

একটু থামিয়া পুনরায় বলিলেন, "তা হ'লে যা'দের জবাব দেওয়া হ'য়েছে, তা'দের সম্বন্ধে কি কত্তে চাও ?"

"তা'দের সম্বন্ধে যা করবার, তা' আগেই করেছি।"

"ওরা বাবুর আমলের পুরাতন লোক।"

"অপরাধ নূতন পুরাতন সকলের সমান।"

"আমি কিন্তু ওদের আশ্বাস দিয়েছি।"

"সে জন্য আমি দায়ী নই। আশা করি, যারা মনিবের অপমান কত্তে সাহসী হয়, তা'দের জন্য আপনি কোন অনুরোধ করবেন না।"

বলিয়াই যোগেশ উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং মহেন্দ্রনাথকে আর কিছু বলিবার অবসর না দিয়াই দ্রুতপদে বৈঠকখানা ত্যাগ করিল। মহেন্দ্রনাথ স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিলেন। তার পর উঠিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন।

বাহিরে পদচ্যুত কর্ম্মচারিগণ তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। তিনি তাহাদিগের সম্মুখীন হইয়া খাজাঞ্চীকে সম্বোধন করিয়া ম্লানমুখে বিষাদ-গম্ভীর-স্বরে বলিলেন, "আপনাদের আমি বৃথা আশ্বাস দিয়াছিলাম বেণীবাবু, আমি আপনাদের কিছুই কত্তে পারলাম না।"

বেণীবাবু দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নৈরাশ্য-জড়িত-কণ্ঠে বলিল, "আমাদের অদৃষ্ট !"

মহেন্দ্রনাথ নতমস্তকে লাঠির উপর ভর দিয়া কাছারীর বাহির হইলেন। এখানে প্রবেশের সময় যে-একটা গর্ব্ব, যে-একটা তেজ লইয়া আসিয়াছিলেন, যাইবার সময় সেটাকে সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া যেন অধিকতর ক্ষীণশরীরে নিতান্ত অবসন্ন-হৃদয়ে রিক্তহস্তে ফিরিয়া চলিলেন। প্রত্যাবর্ত্তন-কালে দেহটা যেন অধিকতর ক্ষীণ বোধ হইল, হাতের লাঠিটা যেন একটু বেশী কাঁপিতে লাগিল। কোনরূপে অবসন্ন দেহটাকে টানিয়া লইয়া মহেন্দ্রনাথ মাঠ পার হইলেন, এবং বাড়ীতে পৌঁছিয়া কাপড় ছাড়িবার অপেক্ষা না রাখিয়াই বিছানায় শুইয়া পড়িলেন।

ভবসুন্দরী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ গা, ওদের কি হ'লো ?"

নিতান্ত উদাসভাবে মহেন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন, "হবে আর কি, চাকর হ'য়ে মনিবের অপমান করলে মনিব কি তেমন চাকরকে ক্ষমা কত্তে পারে ?"

আশ্বস্তভাবে ভবসুন্দরী বলিলেন, "তাই তো বলি, যোগেশ এতটা অন্যায় করবে কেন ? সে তো তেমন ছেলে নয়।"

মহেন্দ্রনাথ মনে মনে হাসিলেন, কিন্তু মুখে তাহা প্রকাশ করিলেন না।

বাহিরে প্রকাশ না করিলেও মহেন্দ্রনাথ কিন্তু মনে মনে নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন, এবং এরূপ স্থলে চাকরীর মায়া ত্যাগ করা উচিত কিনা তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু গোবিন্দবাবুর অন্তিম অনুরোধ,—'তুমি রইলে আর জমিদারী রইলো মহেন্দর' এই শেষ নির্ভরের কথা যখনই মনে পড়িত, তখনই তাঁহাকে এই চিন্তা ত্যাগ করিতে হইত, এবং ছেলেমানুষের অন্যায় আবদার-স্বরূপ যোগেশের এই সকল অন্যায় আচরণ মাথা পাতিয়া লইবার জন্য হৃদয়কে প্রস্তুত করিতেন।

প্রায় একপক্ষ কাল পরে মহেন্দ্রনাথ সুস্থ হইয়া উঠিলেন, এবং পুনরায় গিয়া স্বীয় কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া মহেন্দ্রনাথ দেখিলেন, তাঁহার প্রভুত্ব পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, যোগেশ তাহাতে কিছুমাত্র হস্তক্ষেপ করিতেছে না, বরং সর্ব্বতোভাবে তাঁহার আজ্ঞাবহ হইয়াই চলিতেছে। মহেন্দ্রনাথের মনে যে ক্ষোভটুকু ছিল, তাহা সম্পূর্ণ বিদূরিত হইল; তিনি প্রাণপণে স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন করিয়া যাইতে লাগিলেন।

বাড়ীখানা কিন্তু অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই রহিয়া গেল। তাহা সম্পূর্ণ করিবার অবসর ছিল না। শুধু

যে অবসরের অভাব ছিল তাহা নহে, অর্থেরও অভাব ছিল। যিনি ইহার প্রতিষ্ঠাতা, যাঁহার অর্থে ও উদ্যোগে ইহা সম্পন্ন হইয়া আসিতেছিল, তিনি আর ইহলোকে নাই। নিজেরও যে কিছু সঞ্চিত অর্থ ছিল, তাহা প্রভুর জমিদারী রক্ষায় ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে। এমন কি, ভবসুন্দরীর অলঙ্কারগুলি পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। কাযেই বাড়ীখানা অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই পড়িয়া রহিল। ভবসুন্দরী এজন্য সময়ে-সময়ে তাড়া দিলে মহেন্দ্রনাথ আপনার অবসরের অভাব জানাইয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিতেন।

কেবল ভবসুন্দরী নয়, প্রতিবেশীদেরও এই বাড়ীখানা সম্পূর্ণ দেখিবার আগ্রহ বড় কম ছিল না। শুধু যে ইহাকে সম্পূর্ণ দেখিবার জন্য তাঁহাদের আগ্রহ ছিল তাহা নহে, ইহা অতঃপর সম্পূর্ণ হইবে কিংবা এইরূপ অসম্পূর্ণ অবস্থায় থাকিয়াই ক্রমে ভূমিসাৎ হইবে এ বিষয়েও তাঁহাদের যথেষ্ট সন্দেহ ছিল এবং ইহার শেষোক্ত পরিণতিটাই অনেকের নিকট প্রার্থনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং তাঁহারা কতকটা হিতৈষিতা প্রদর্শন মানসে, কতকটা আপনাদের সন্দেহ-ভঞ্জনের অভিপ্রায়ে মহেন্দ্রনাথকে তাড়া দিয়া বলিলেন, "মহেন্দ্রবাবু, এমন চমৎকার বাড়ীখানা, আধা-খেঁচড়া ক'রে ফেলে রাখলে কেন? কাজ তো আর বেশী বাকী নাই।"

মহেন্দ্রনাথ ঈষৎ হাসিয়া উত্তর দিলেন, "যাক্ দিন কতক।"

কিন্তু দুই তিন মাসেও যখন এই দিন কতক গেল না, তখন অনেকেরই মনে বাড়ীখানার শেষ পরিণতি সম্বন্ধে সন্দেহটাই বদ্ধমূল হইয়া উঠিল। তাহারা স্থির সিদ্ধান্ত করিল, এখন আর বুড়া নাই যে, তাহার চাল্‌সে-ধরা চোখের ক্ষীণ দৃষ্টিকে অতিক্রম করিয়া দুই হাতে সর্ব্বস্ব লুটিয়া লইবে। যোগেশ আজকালকার ইংরাজী-পড়া ছেলে, ওদের চোখে ধুলা দেওয়া সহজ কথা নয়। কাজেই বাড়ীখানা ঐ পর্য্যন্ত।

এই সকল সিদ্ধান্তকারীদিগের মধ্যে কেহ কেহ মহেন্দ্রনাথকে উপদেশ দিত, "মহেন্দ্রবাবু, যে রকমে হোক্, যখন এতটা খাড়া হ'য়েছে, তখন বাকীটুকু নিজের খরচেই শেষ ক'রে দাও না।"

মহেন্দ্রনাথ হাসিয়া উত্তর করিতেন, "দেখি দু'দিন।"

লোকে বুঝিল, এই দুইদিন সহজে যাইবে না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

"বড় বৌ!"

স্বামীর বিষাদ-গম্ভীর কণ্ঠস্বরে চমকিত হইয়া ভবসুন্দরী ব্যস্তসমস্তভাবে আলো লইয়া ঘর হইতে বাহির হইল। মহেন্দ্রনাথ দাবার উপর উঠিয়াই কাছারীর জামা-কাপড়সমেত বসিয়া পড়িলেন। ভবসুন্দরী ভয়চকিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হ'লো গা?"

মহেন্দ্রনাথ নিরুত্তরে জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিলেন। ভবসুন্দরী তাড়াতাড়ি পাখাখানা আনিয়া স্বামীর মাথায় বাতাস করিতে করিতে উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "অমন ক'রে বসে পড়লে কেন? কি হয়েছে?"

মহেন্দ্রনাথ মুখ তুলিয়া পত্নীর মুখের দিকে চাহিলেন; ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, "ভয় নাই, আমার কোন অসুখ হয় নি।"

ভবসুন্দরীর ধড়ে যেন প্রাণ আসিল। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তিনি বলিলেন, "তাই হোক, তুমি যে রকম-ভাবে এসে বস্‌লে, তাতে আমার প্রাণ উড়ে গিয়েছিল।"

মহেন্দ্রনাথ আর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া গম্ভীর-স্বরে বলিলেন, "কিন্তু এর পর যে খবরটা আছে, সেটাও ঠিক ধড়ে প্রাণ থাক্‌বার মত নয়।"

শঙ্কিতদৃষ্টিতে একবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়াই ভবসুন্দরী মুখটা ফিরাইয়া লইলেন, এবং নিরুদ্বেগকণ্ঠে বলিলেন, "তা যে খবরই থাক্, তোমার কিছু অসুখ-বিসুখ হয় নি তো?"

"না" বলিয়া মহেন্দ্রনাথ পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিমি কোথায়?"

"খোকাকে নিয়ে শুয়েছে।"

"বেজো আচাজ্যি ওর কোষ্ঠী দেখে কি ব'লেছিল?"

"ব'লেছিল, ওর কোথায় কি গ্রহের শুভদৃষ্টি আছে। তার ফলে ও রাজারাণী হবে।"

"বাবুও একদিন কি ব'লে গিয়েছিলেন না?"

"তিনিও তো নিমিকে দেখে ব'লেছিলেন, মেয়েটি লক্ষণযুক্তা, রাজরাণী হবে।"

একটু ভাবিয়া মহেন্দ্রনাথ ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন, "আচাজ্যির কথা না হয় মিথ্যা হ'তে পারে, কিন্তু বাবুর কথা যে কি ক'রে মিথ্যা হ'লো তাই ভাব্‌ছি।"

ব্যগ্রকণ্ঠে ভবসুন্দরী বলিলেন, "বাবুর কথা মিথ্যা হ'তে যাবে কেন?"

বেদনাপ্লুতস্বরে মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কেন হবে তাই তো ভাব্‌ছি বড়-বৌ।"

বিস্ময়বিমূঢ়ভাবে ক্ষণকাল স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ভবসুন্দরী ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হ'য়েছে বল দেখি ?"

মহেন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে বসিয়া থাকিয়া উত্তর করিলেন, "বিশেষ কিছু হয় নি। তবে নিমির বিয়ের চেষ্টা—তা যোগেশ যথাসাধ্য সাহায্য করবে ব'লেছে।"

গভীর বিস্ময়-সহকারে ভবসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে আবার কি ?"

ঈষৎ হাসিয়া মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "অর্থাৎ আমার মেয়ের বিয়েতে যোগেশ টাকা দিয়ে সাহায্য করবে, বুঝলে ?"

আশ্চর্য্যান্বিতভাবে ভবসুন্দরী বলিলেন, "সাহায্য আবার করবে কি, বিয়ে তো যোগেশের সঙ্গেই হবে ?"

"বাবুর তাই ইচ্ছা ছিল বটে।"

"তবে ?"

"কিন্তু যোগেশের এখন বিবাহ কত্তে ইচ্ছা নাই।"

"আজ ইচ্ছা না থাকে, ছ'মাস পরেও তো ইচ্ছা হবে।"

"দু'বছর পরেও হতে পারে।"

"বেশ, দু'বছর পরেই বিয়ে হবে।"

পত্নীর মুখের উপর তিরস্কার-সূচক কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তুমিই সেদিন বল্‌লে না, মেয়ে তেরো বছরে পড়েছে, আর রাখা যায় না ?"

গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালন করিয়া ভবসুন্দরী বলিলেন, "তা ছেলের যখন মত নাই এখন, তখন কাজেই রাখ্‌তে হবে।"

মহেন্দ্রনাথ স্থির গম্ভীর-কণ্ঠে বলিলেন, "দশ বছর রাখ্‌লেও হবে না বড়-বৌ।"

ভবসুন্দরী শঙ্কা-কাতর-দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আসল কথাটা কি জান, যোগেশ আমার মেয়েকে বিয়ে করবে না।"

"কেন ?"

"নিমিকে ওর পছন্দ হয় না। তা ছাড়া আমি ওর একজন কর্ম্মচারী—চাকর; চাকরের মেয়েকে বিয়ে করলে মাথা হেঁট হবে।"

"তবে বাবু স্বীকার করেছিলেন কেন ?"

"বাবু ছিলেন দেবতা। দেবতার চোখে ধনি-দরিদ্রের, মনিব-চাকরের প্রভেদ নাই। কিন্তু সকলেই তো দেবতা নয়।"

ভবসুন্দরী একটু ভাবিয়া বলিলেন, "কিন্তু যোগেশ বাপের আদেশ পালন করবে না ?"

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "প্রকারান্তরে আদেশ পালন কচ্চে; নিজে বিবাহ না করুক, বিবাহের খরচের ভার নিচ্চে।"

ভবসুন্দরী বলিলেন, "কিন্তু বাবু তো তেমন আদেশ দিয়ে যান নি, তিনি ওকে বিয়ে কত্তেই হুকুম দিয়ে গিয়েছেন।"

ধীর-গম্ভীর-স্বরে মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ঠিক্ কথা বল্‌তে গেলে বড়-বৌ, যোগেশের সাক্ষাতে তো সে হুকুম দেওয়া হয় নি। যোগেশ তখন কোথায় ?"

"কিন্তু তোমরা তো জান।"

"আমি যে স্বার্থের জন্য মিথ্যা বল্‌বো না তার নিশ্চয়তা কি ?"

কিন্তু আর পাঁচজন যারা ছিল, তারা তো মিথ্যা বল্‌বে না ?"

"তারা আমার জন্য সত্য বল্‌তে এসে বরদাবাবুর কোপে পড়তে সাহস করবে না।"

"তা হ'লে বরদাবাবুই এর মূল বল।"

"তিনিই এখন যোগেশের অভিভাবক, পরামর্শ দাতা, আত্মীয়-বন্ধু সব।"

ভবসুন্দরী নীরবে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। মহেন্দ্রনাথ অন্ধকার আকাশের দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন! অনুজ্জ্বল দীপশিখা বাতাসে কাঁপিয়া কাঁপিয়া অন্ধকারময় প্রাঙ্গণে ছায়ালোকের সৃষ্টি করিতে লাগিল।

খানিকপরে ভবসুন্দরী বলিলেন, "যাক্, অনেকটা রাত হ'য়েছে, এখন উঠে কাপড় ছাড়, আবার সন্ধ্যা আহ্নিক আছে তো ?"

বেদনা-জড়িত স্বরে মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আছে বই কি।"

ভবসুন্দরী বলিলেন, "নাও, উঠে পড়। দেখ, তুমি কিছু ভেবো না; চন্দ্র-সূর্য্য মিথ্যা হবে, দিন-রাত মিথ্যা হবে, তবু বাবুর কথা মিথ্যা হবে না এই আমি ব'লে রাখ্‌ছি।"

পত্নীর এই দৃঢ় বিশ্বাসের উপর অবিশ্বাসের মৃদু হাসির একটু আঘাত দিয়া মহেন্দ্রনাথ উঠিয়া কাপড় ছাড়িতে গেলেন।

সেদিন মহেন্দ্রনাথ সুযোগমত যখন যোগেশের নিকট বিবাহের কথাটা উত্থাপন করিলেন, এবং সেই সঙ্গে বাবুর অন্তিম অভিপ্রায় জানাইয়া দিলেন, তখন যোগেশ তাহার কোন উত্তর দিল না, একটু লজ্জার হাসি হাসিল মাত্র। কিন্তু বরদাবাবুর কাণে কথাটা

উঠিলে তিনি যোগেশকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "তুমি পাগল হ'য়েছ যোগেশ, চাকরের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেবেন, এমন কথা দাদা কক্ষণো বলেন নি। আমি কি তাঁকে চিনি না।"

যোগেশ বলিল, "কিন্তু মহেন্দ্রবাবু তো তাই বল্‌ছেন।"

হাসিতে হাসিতে বরদাবাবু বলিলেন, "জমিদারের শ্বশুর হ'বার সাধ কার না হয়?"

যোগেশ বলিল, "আরও দু'চার জন নাকি একথা জানে।"

বরদাবাবু বলিলেন, "আচ্ছা, কে কি জানে এখনি জেনে নিচ্ছি।"

তখন মহেন্দ্রনাথ যাহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে দুই-তিন জনকে ডাকা হইল। বরদাবাবু তাহাদিগকে ধমক দিয়া এমন সুকৌশলে কথাটা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সাক্ষীরা অনায়াসেই বুঝিতে পারিল যে, বাবু সত্য কথাটা শুনিবার জন্য আদৌ প্রস্তুত নহেন। সুতরাং তাঁহার অসন্তোষকে উপেক্ষা করিয়া কেহই সত্য কথা বলিতে সাহসী হইল না; তাহারা বলিল, বড়বাবুর আসন্নমৃত্যু বুঝিয়া শোকে-দুঃখে এমনই জ্ঞানহারা হইয়াছিল যে, তিনি সে সময়ে অস্পষ্টস্বরে কি কথা বলিয়াছিলেন, তাহা কাহারও কাণে যায় নাই; কাণে গেলেও সে কথা তাহাদের স্মরণপথে আদৌ উপস্থিত হইতেছে না।

যোগেশের মুখের উপর পরিহাসসূচক কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বরদাবাবু বলিলেন, "শুন্‌লে তো যোগেশ।"

যোগেশ বলিল, "মহেন্দ্রবাবু যে এমন মিথ্যাবাদী তা আমি জান্‌তাম না।"

বরদাবাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তোমার কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে আমার কোন কথা বলা উচিত নয় যোগেশ, কিন্তু মহেন্দ্রবাবু যে কি রকম লোক তা ক্রমে জানতে পারবে। একশো টাকায় সংসার চালিয়ে তুমি অত বড় একটা ইমারতের পত্তন দিতে পার? বাড়ীখানা তুমি বোধ হয় দেখ নি?"

যোগেশ বলিল, "শুনেছি সরকারী হ'তে বাড়ীর খরচ দেওয়া হচ্ছিল।"

বরদাবাবু হাসিয়া বলিলেন, "তুমিও যেমন পাগল! দাদা এমনি নির্ব্বোধ ছিলেন যে, চাকরকে অত বড় একটা ইমারত তৈরী ক'রে দেবেন, ছেলের সঙ্গে ওর মেয়ের বিয়ে দেবেন। গুরুপুত্র নাকি হে?"

বলিয়া তিনি হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। যোগেশ চুপ করিয়া রহিল।

সেদিন কথাবার্ত্তা এই পর্য্যন্তই হইল। পরদিন বরদাবাবু আসিয়া যোগেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহেন্দ্রবাবুকে কিছু ব'লেছিলে নাকি?"

যোগেশ উত্তর করিল, "না।"

বরদাবাবু বলিলেন, "এক কাজ কর যোগেশ, মহেন্দ্রবাবুকে মেয়ের বিয়ের জন্য কিছু টাকা দাও। কি জানি, হয় তো দাদার কাছে কাঁদা-কাটা ক'রেছিল, দাদা তো সেই উদার ছিলেন; হয় তো বা একটু আশাও দিয়ে থাক্‌বেন। সুতরাং হাজার খানেক টাকা দিযে দাও, তাঁরও সত্য রক্ষা হবে, তোমারও কর্ত্তব্য শেষ হবে।"

যোগেশ মাথা নীচু করিয়া ভাবিতে লাগিল। ঠিক এমনি সময়ে মহেন্দ্রনাথ কতকগুলা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র লইয়া যোগেশের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই বরদাবাবু বলিয়া উঠিলেন, "এই যে মহেন্দ্রবাবু, আপনার কথাই যোগেশের সঙ্গে হচ্চে।"

মহেন্দ্রনাথ দাঁড়াইয়া পড়িলেন। বরদাবাবু বলিলেন, "শুন্‌তে পাই আপনি নাকি ব'লেছেন, দাদা আপনার মেয়েকে পুত্রবধূ কত্তে স্বীকৃত হয়েছিলেন। তা তিনি বেঁচে থাক্‌লে কি কত্তেন বলা যায় না, সে কথা আপনি বা আমি কি রকমে বলবো বলুন। এদিকে যোগেশের এখন বিযে কত্তে ইচ্ছা নাই। জানেন তো, আজকালকার ছেলেরা বিয়েটাকে মস্ত একটা ভার ব'লে মনে করে, আর সেটা কতক ইংলিশ ফ্যাসানেই কত্তে চায়।"

মহেন্দ্রনাথ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া তাঁহার এই বক্তৃতা শুনিতে লাগিলেন। বরদাবাবু একটু থামিয়া পুনরায় বলিলেন, "কিন্তু এদিকে আপনার মেয়েটিও তো শুনতে পাই অরক্ষণীয়া হয়ে উঠেছে। কাজেই তার বিবাহের চেষ্টা দেখা দরকার। সেই জন্যই আমি যোগেশকে বল্‌ছি, বিয়ে না কর, অন্ততঃ বিয়ের খরচটা—হাজার খানেক টাকা দিয়ে দাও। বিশ্বাসী কর্ম্মচারীকে এ রকম সাহায্য কত্তেই হয়, এটাকে নেহাৎ বাজে খরচ বল্‌লে চলে না।"

মহেন্দ্রনাথের মুখখানা মুহূর্ত্তে মরার মুখের মত রক্তশূন্য পাণ্ডুর হইয়া আসিল। তিনি নীরবে বিবর্ণ মুখে যোগেশের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। যোগেশ তখন একেবারে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কোলের উপরকার খবরের কাগজখানার উপরে মনঃসংযোগ করিয়াছিল। বরদাবাবু নীরবে কড়িকাঠের নিম্নে লম্বমান ঝাড়টাকে

পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে যোগেশকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ওহে, অনিলবাবু এসেছে যে। তাঁকে চেন না বুঝি? আমার ভগ্নীপতি, এম-এ বি-এল, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্, বাঁকীপুরে বদলী হ'য়েছে। সেখানে যাবার আগে সপরিবারে আমাদের সঙ্গে দেখা কত্তে এসেছে। চল না, তাঁর সঙ্গে আলাপ করে আসবে। চমৎকার লোক।"

যোগেশ তখন মহেন্দ্রনাথের সম্মুখ হইতে পলাইতে পারিলে বাঁচিয়া যায়। সুতরাং সে কাগজখানা হাত হইতে ফেলিয়া দিয়া ত্রস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল "চলুন।"

বরদাবাবু ছড়িটার উপর ভর দিয়া উঠিতে উঠিতে বলিলেন,"ওগুলা কি বিশেষ জরুরি কাগজ মহেন্দ্রবাবু?"

মহেন্দ্রনাথ শুষ্ককণ্ঠে উত্তর দিলেন, "না।"

কিন্তু তাঁহার এই উত্তর শুনিবার পূর্ব্বেই যোগেশ পাশ কাটাইয়া বাহির হইয়া গেল। বরদাবাবু ধীর-পদে তাহার অনুসরণ করিলেন। মহেন্দ্রনাথ নিশ্চল প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় কক্ষমধ্যে একা দাঁড়াইয়া রহিলেন!

নবম পরিচ্ছেদ

"তোর বাবা কোথায় গেল লিলি?"

লিলি তখন কোচের উপর অর্দ্ধ শয়নাবস্থায় বসিয়া একখানা ইংরাজী ত্রৈমাসিক পত্রের ছবিগুলা বেশ মনোযোগের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। মাতুলের আহ্বানে ফিরিয়া চাহিতেই তাহার দৃষ্টির সম্মুখে এক অপরিচিত যুবককে দেখিয়া লজ্জানত মুখে একটু ত্রস্তভাবে সোজা হইয়া বসিল। যোগেশ দেখিল, একটি চৌদ্দ পনের বছরের মেয়ে, চাঁপার পাপড়ির মত রং, ফুটন্ত গোলাপের মত ঢলঢলে মুখ, ভাসা ভাসা স্বচ্ছ আয়ত চক্ষু দুইটি, ঠিক যেন বিলাতী চিত্রকরের সুনিপুণ হস্তে অঙ্কিত একখানি চিত্র কে কোচের উপর বসাইয়া রাখিয়াছে। যোগেশের মুগ্ধ দৃষ্টিটা নত হইয়া আসিল।

বরদাবাবু ঘরে ঢুকিয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন, এবং যোগেশকে বসিতে বলিয়া লিলির দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর বাবা বেড়াতে বেরিয়েছেন নাকি?"

লিলি উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং ঈষৎ আনত নেত্রে সহাস্যমুখে উত্তর দিল, "হাঁ।"

বরদাবাবু বলিলেন, "তুই এত লজ্জা কচ্চিস্ কা'কে দেখে? এ যে আমাদের যোগেশ।"

তারপর যোগেশের দিকে ফিরিয়া সহাস্যে বলিলেন, "এইটি অনিলবাবুর বড় মেয়ে। লীলা নাম, আমরা কিন্তু লিলি ব'লেই ডাকি। মেয়েটা একটু লাজুক। লাষ্ট ইয়ারে বেথুন কলেজ থেকে ম্যাট্রিকুলেশন্ দিয়েছে। গান-বাজনা, সেলায়ের কাজ এ সবও বেশ শিখেছে।"

লিলি মাতুলের দিকে একটা সলজ্জ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার উপক্রম করিল। বাধা দিয়া বরদাবাবু বলিলেন, "লজ্জা ক'রে তোকে পালাতে হবে না লিলি, যোগেশ আমাদের পর নয়।"

লিলি লজ্জাবনত মুখে থমকিয়া দাঁড়াইল। তখন বরদাবাবু যোগেশকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "অনিল নিজে পুরো-দস্তুর সাহেব হ'লেও মেয়েটাকে কিন্তু একটুও সাহেবি ধরণে আন্‌তে পারে নি; ও সম্পূর্ণ হিঁদুর ঘরের মেয়েই আছে।"

বলিয়া বরদাবাবু লিলির মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিলেন। লিলির মুখখানা আরও বেশী লাল হইয়া উঠিল। যোগেশ নতমুখে মৃদু হাসিল।

অতঃপর বরদাবাবু লিলির গুণরাজির উল্লেখ করিয়া যেরূপে তাহার প্রশংসাবাদ আরম্ভ করিলেন, তাহাতে লিলির সেখানে দাঁড়াইয়া থাকা নিতান্ত অসম্ভব হইয়া উঠিল। যোগেশ তাহা বুঝিয়া সে প্রসঙ্গটা চাপা দিবার অভি-প্রায়ে জিজ্ঞাসা করিল, "অনিলবাবুর ফিরতে বোধ হয় অনেকটা দেরী হবে?"

বরদাবাবু বলিলেন, "তোমার বিশেষ কিছু কাজ আছে নাকি?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া যোগেশ বলিল, "একটু কাজ ছিল। যদি বেশী দেরী না হয়।"

বরদাবাবু বলিলেন, "আচ্ছা, তা হ'লে আজ তুমি এস। এরা তো এখন সাত আট দিন এখানে আছে। কাল সকালে একবার আসতে পারবে না?"

যোগেশ বলিল, "স্বচ্ছন্দে পারবো।"

বরদাবাবু বলিলেন, "বেশ, তা হ'লে সকালে এখানে তোমার চায়ের নিমন্ত্রণ রইলো। ভুলে যাবে না তো।"

নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া যোগেশ উঠিল, এবং বাহিরে আসিয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। শুধু লিলিকে বিষম লজ্জার বন্ধন হইতে মুক্তি দিয়াই যে সে স্বস্তি অনুভব করিল তাহা নহে, লিলির এই লজ্জার কারণস্বরূপ হইয়া সে নিজেও যে-একটা অস্বস্তি অনুভব করিতেছিল তাহা হইতে মুক্তিলাভের জন্য

নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল, এবং সেই ব্যগ্রতার অনুরোধেই সে মিথ্যা ওজর করিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

পরদিন সকালে চা খাইতে আসিয়া যোগেশ অনিলবাবুর সহিত আলাপ করিল। অনিলবাবুর সাহেবী কেতা দুরস্ত, অধিকন্তু হাকিমি চালচলনের সগর্ব্ব আলাপে সে বেশ সন্তুষ্ট হইতে পারিল না বটে, কিন্তু লিলির স্বহস্ত-প্রস্তুত চা খাইয়া, এবং হারমোনিয়মের সুরসহযোগে তাহার কোকিলবিনিন্দিত কণ্ঠের মিষ্ট গান শুনিয়া যে অনাস্বাদিতপূর্ব্ব তৃপ্তি অনুভব করিল, তাহার নিকট অনিলবাবুর আলাপের ক্রটীটুকু নিতান্তই ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িল।

এই দুই দিন সে কিন্তু মহেন্দ্রনাথের সম্মুখীন হইতে পারিল না। মহেন্দ্রনাথ কাগজ-পত্রে তাহার সহি লইবার জন্য দুই তিন বার আসিয়াছিলন, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার ভাণ করিয়া যোগেশ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল না। একটা বিষম চক্ষুলজ্জা আসিয়া সাক্ষাতের পথে প্রবল অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল। মহেন্দ্রনাথকে এরূপে হঠাৎ নিরাশ করা যে অন্যায় হইয়াছে, এবং সে অন্যায়টা খুবই কঠোরতার সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে ইহা সে বেশ বুঝিতে পারিল। বুঝিয়া নিতান্ত লজ্জিত হইয়া পড়িল।

সে অনেকবারই কথাপ্রসঙ্গে পিতার নিকট শুনিয়াছিল, এক সময়ে মহেন্দ্রনাথই শুধু জমিদারী নয়, গোবিন্দবাবুর মান-সম্ভ্রম পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়াছিল। গোবিন্দবাবু যদিও কখন স্পষ্ট ভাষায় মহেন্দ্রনাথের প্রশংসা করেন নাই, তথাপি তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতেই তাঁহার কণ্ঠটা যেন কৃতজ্ঞতার ভারে গদগদ হইয়া আসিত, ইহা যোগেশ অনেকবার দেখিয়াছিল। এবারেও লাটের কিস্তীর চালান লুট হইলে, এবং গোবিন্দবাবু সে সময়ে শয্যাগত থাকিলেও কেবল মহেন্দ্রনাথের কার্য্যদক্ষতার গুণেই যে জমিদারীটা অষ্টমের নীলাম হইতে রক্ষা পাইয়াছিল, ইহাও সে কোন কোন লোকের নিকট শুনিয়াছিল। এরূপ কর্ম্মচারীকে এমন নিষ্ঠুরভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়া যোগেশ শুধু লজ্জা নহে, অন্তরে একটু বেদনাও অনুভব করিয়াছিল। এই কঠোর ব্যবহারের জন্য মহেন্দ্রনাথের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেও যে যোগেশ অপ্রস্তুত ছিল তাহা নহে, কেবল বরদাবাবুর ভয়েই তাহা কার্য্যতঃ করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। পাছে কাকাবাবু তাহাকে নিতান্ত দুর্ব্বলচিত্ত মনে করেন, এই আশঙ্কাটাই তাহার মনের ভিতর জাগিয়া উঠিতেছিল।

কিন্তু সেদিন উপরের বৈঠকখানার জানালার পাশে দাঁড়াইয়া যোগেশ যখন কাছারী-ঘরের বারান্দায় দণ্ডায়মান মহেন্দ্রনাথের নৈরাশ্যম্লান মুখখানার দিকে বার বার সকরুণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, তখন সকল লজ্জা, সকল আশঙ্কাকে পরাভূত করিয়া তাহার মনের ভিতর সহানুভূতির এমনই একটা বেদনা প্রবলভাবে জাগিয়া উঠিল যে, তাহার ইচ্ছা হইল যে, সে এখনই ছুটিয়া গিয়া মহেন্দ্রনাথের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, এবং তদীয় প্রস্তাবে সম্মতিদান করিয়া তাহার এই নৈরাশ্যজনিত মলিনতা মুছাইয়া দেয়। কিন্তু এমনভাবে সোজাসুজি ক্ষমা প্রার্থনা করিতে যাইতে গর্ব্বমিশ্রিত লজ্জা অসিয়া বাধা দিল; যোগেশ আত্মসংবরণ করিয়া ব্যস্তভাবে জানালাটা বন্ধ করিয়া দিয়া সরিয়া গেল।

বিবাহ যখন করিতেই হইবে তখন এরূপ মিথ্যা প্রতারণার আশ্রয়ে মহেন্দ্রনাথকে প্রতারিত করিয়া ফল কি? মহেন্দ্রনাথকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিলে তাহার সম্মানের হানির সম্ভাবনা কোথায়? মহেন্দ্রনাথও ব্রাহ্মণ, তাহারও কুলমর্য্যাদা আছে। প্রভেদের মধ্যে এই যে, সে প্রভু, মহেন্দ্রনাথ তাহার ভৃত্য। কিন্তু এ প্রভেদের মূল্য কতটুকু? ইহা তো একটা কুসংস্কার মাত্র। উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াও সে যদি এই কুসংস্কারের প্রভাব অতিক্রম করিতে না পারে, তাহা হইলে দেশের বা জাতির উন্নতির সম্ভাবনা কোথায়?

পরদিন সকালে মহেন্দ্রনাথের অনুসন্ধান করিয়া যোগেশ শুনিতে পাইল যে, সে দিন মহেন্দ্রনাথ আসেন নাই।

সেই দিন অপরাহ্নে বরদাবাবুর চায়ের নিমন্ত্রণ এবং লিলির গান শুনিবার প্রলোভনকে উপেক্ষা করিয়া যোগেশ বেড়াইতে বেড়াইতে মহেন্দ্রনাথের বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইল, এবং খানিক ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে দরজায় গিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "মহেন্দ্রবাবু!" দুই তিন ডাকের পর নির্ম্মলা "কে গা" বলিয়া দরজায় উপস্থিত হইল। সে যোগেশকে কখন দেখে নাই, সুতরাং কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে এই অপরিচিত যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবাকে খুঁজছেন?"

যোগেশ বলিল, হাঁ, তিনি কোথায়?"

নির্ম্মলা বলিল, "তিনি সকালে উঠে কোথায় গিয়েছেন।"

যোগেশ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমিই কি তাঁর বড় মেয়ে?"

নির্ম্মলা উত্তর দিল "হাঁ।"

"তোমার নাম কি?"

"শ্রীমতী নির্ম্মলা দাসী।"

যোগেশ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার মুখখানা নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। এই অন্তর্ভেদী তীক্ষ্ণদৃষ্টির সম্মুখে নির্ম্মলা অধিকক্ষণ মুখ তুলিয়া থাকিতে পারিল না, সে আস্তে আস্তে মুখটা নামাইয়া লইল। যোগেশও এই মেয়েটির মুখে আকর্ষণের কিছুই না পাইয়া মুখ ফিরাইয়া লইল, এবং ঈষৎ ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল, "তিনি ফিরে এলে বলবে, যোগেশবাবু খুঁজতে এসেছিলেন।"

নামটা শুনিয়াই নির্ম্মলা চমকিয়া উঠিল, এবং সে সঙ্কোচজড়িত দৃষ্টিতে আর একবার যোগেশের দিকে চহিয়াই উদ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল। তাহাকে ছুটিতে দেখিয়া ভবসুন্দরী ঘরের ভিতর হইতেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে রে নিমি?"

নির্ম্মলা উত্তর দিল না; সে ছুটিয়া খিড়কী দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে যোগেশ ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে দ্বার-প্রান্তে দাঁড়াইয়া রহিল। এই সৌন্দর্য্যহীনা শিষ্টাচার-শূন্যা বালিকাকে সে সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল? সৌভাগ্যক্রমে মহেন্দ্রনাথের পরিবর্ত্তে এই বালিকার সহিত সাক্ষাৎ হইল। নতুবা নিজের এই হঠকারিতার পরিণামে ভবিষ্যতে তাহাকে কি ভীষণ অনুতাপ ভোগ করিতে হইত, তাহা কল্পনা করিতেও যোগেশ শিহরিয়া উঠিল। সে দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিয়া একেবারে বরদাবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইল।

বৈঠকখানা ঘরে তখন চা-পান আরম্ভ হইয়াছিল। যোগেশকে দেখিয়া বরদাবাবু সহাস্যে বলিয়া উঠিলেন, "এই যে যোগেশ. তোমার বিলম্ব দেখে ভাবলাম, তুমি বুঝি আজ আসতে পারলে না।"

আপনার বিলম্ব জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া যোগেশ নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিলে বরদাবাবু চা পরিবেশন-কারণী লীলার দিকে চাহিয়া বলিলেন. "এই নূতন অতিথির জন্য তোকে আর একটা কাপ যোগাড় কত্তে হবে লিলি।"

• লীলা সহাস্যে আর এক কাপ চা প্রস্তুত করিয়া যোগেশের সম্মুখে স্থাপন করিল। যোগেশ অপাঙ্গে একবার তাহার দিকে চাহিয়াই অচিরপূর্ব্বে কৃত আপনার হঠকারিতা স্মরণে মনে মনে এমন বিষম লজ্জা অনুভব করিল যে, সেদিন সে আর ভাল করিয়া মুখ তুলিতে পারিল না।

সেদিন যোগেশ প্রগাঢ় সুপ্তির মধ্যেও যেন স্পষ্ট শুনিতে পাইল, লিলি তাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া আবেগ-বিহ্বল কণ্ঠে গাহিতেছে—"এসো এসো বঁধু এসো আধ আঁচরে ব'সো নয়ন ভরিয়ে তোমায় দেখি।"

ইহার কয়েকদিন পরে যোগেশ এক সময়ে মহেন্দ্রনাথকে ডাকাইয়া বলিল, "মহেন্দ্রবাবু, আজ কাল জমিদারী রাখতে হ'লে সর্ব্বদা সাহেব-সুবোদের সঙ্গে চিঠিপত্র লেখালেখি কত্তে হয়। আপনি তো ভাল ইংরাজী জানেন না, আমারও তেমন সময় নাই। কাজেই একজন গ্রাজুয়েট ম্যানেজার রাখবো মনে কচ্চি।"

ম্লান হাসি হাসিয়া মহেন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, "দরকার হ'লে কাজেই রাখতে হবে।"

যোগেশ বলিল, "ম্যানেজার থাকলেও আপনি যেমন আছেন তেমনি থাকবেন।"

দুই চারি দিন পরেই নূতন ম্যানেজার আসিলেন। নূতন ম্যানেজার বরদাবাবুর পরিচিত ও বিশ্বাসী, নাম রমণীমোহন ঘোষ বি-এল। রমণীবাবু বি-এল পাশ করিয়া দুই তিন বৎসর যাবৎ কোর্টের বার লাইব্রেরীর মেম্বর সংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার মধ্যে একদিনও তাঁহার বিচারকের সমক্ষে উপস্থিত হইবার সুযোগ না হওয়ায় অগত্যা তিনি বরদাবাবুর অনুরোধে একশত টাকা বেতনে যোগেশের জমীদারীর ম্যানেজারের পদ গ্রহণ করিলেন। মহেন্দ্রবাবু তাঁহাকে কাগজপত্র সব বুঝাইয়া দিলেন।

ভবসুন্দরী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁগা, নূতন ম্যানেজার হ'য়েছে, তোমার চাকরী থাকবে তো?"

ঈষৎ হাসিয়া মহেন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, "চাকরী কি কারো চিরকাল থাকে বড়-বৌ।"

শঙ্কিতস্বরে ভবসুন্দরী বলিলেন,"তা হ'লে কি হবে?"

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "বারো টাকার মুহুরিগিরি তো ছাড়াতে পারবে না।"

"কিন্তু গলায় যে তের বছরের মেয়ে।"

"যিনি জগতের ভার বইচেন, তিনি কি এই তের বছরের মেয়েটার ভার নেবেন না?"

কিন্তু দুই মাসের মধ্যেও মহেন্দ্রনাথের চাকরী যাইবার কোন সম্ভাবনাই দেখা গেল না। কন্যার বিবাহ চেষ্টা দেখিবার জন্য মহেন্দ্রনাথ দুই সপ্তাহের ছুটী লইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

শাপুরে পাত্র দেখিতে যাইবার কথা ছিল। মহেন্দ্রনাথ সকালে উঠিয়া কাপড় চোপড় পরিয়া দুর্গা স্মরণ করিতে করিতে সবেমাত্র বাড়ীর বাহিরে পা দিয়াছেন, এমন সময় চাপাটীর নবীন মণ্ডল আসিয়া তাঁহার পা দুইটা জড়াইয়া ধরিল। কেবল নবীন নহে, তাহার পশ্চাতে আরও বিশ পঁচিশ-জন প্রজা ছিল। তাহারা সমস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল, "দোহাই দেওয়ানবাবু, আমাদের রক্ষা করুন।"

মহেন্দ্রনাথ যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। প্রজারা তাঁহার দোহাই দিয়া তাঁহার পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িল। মহেন্দ্রনাথ বহুকষ্টে তাহাদের শান্ত করিয়া ব্যাপার কি জানিতে চাহিলে নবীন কাঁদিতে কাঁদিতে জানাইল যে কয়েকদিন পূর্ব্বে নূতন ম্যানেজার চাপাটীর কাছারীতে গিয়াছিলেন। তিনি প্রজাদিগকে ডাকাইয়া নূতন জমিদারের সেলামী স্বরূপ ছোট বড় জমা অনুসারে পঞ্চাশ হইতে দুইশত টাকা পর্য্যন্ত সেলামী দিতে আদেশ দেন। কিন্তু গরীব প্রজারা উহা দিতে অস্বীকৃত হইলে তিনি প্রজাদের ঘটী বাটী হাল গরু পর্য্যন্ত বেচিয়া উহা আদায় করিবার জন্য নায়েবকে আদেশ দিয়া আসিয়াছেন।

মহেন্দ্রনাথ দন্তে অধর দংশন করিলেন। তাঁহার আর শাপুরে যাওয়া হইল না; প্রজাদের সঙ্গে লইয়া কাছারী অভিমুখে রওনা হইলেন।

ম্যানেজার তখনও কাছারীতে আসেন নাই। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর তিনি উপস্থিত হইলে মহেন্দ্রনাথ দরিদ্র প্রজাগণকে সেলামীর দায় হইতে অব্যাহতি দিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। রমণীবাবু ঈষৎ শ্লেষের হাসি হাসিয়া মহেন্দ্রনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "গরীব প্রজাদের কাছ হ'তে কতগুলি টাকা পেয়ে ওদের পক্ষে ওকালত নামা নিয়েছেন মহেন্দ্রবাবু?"

মহেন্দ্রনাথের চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল। তিনি রোষতীব্রকণ্ঠে উত্তর করিলেন, "আমি নূতন উকীল নই মশায়, যে গরীবদের ঘটী বাটীর উপর পর্য্যন্ত নজর দেব।"

এই কঠোর বিদ্রূপটা নীরবেই পরিপাক করিয়া রমণীবাবু মৃদু-গম্ভীর হাস্যের সহিত বলিলেন, "তা হ'লে আপনি নিঃস্বার্থ ভাবেই মনিবের অনিষ্ট কত্তে এসেছেন বোধ হয়।"

ক্রোধে মহেন্দ্রনাথের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তিনি ম্যানেজারের মুখের উপর জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দ্রুতপদে উপরের বৈঠকখানায় চলিয়া গেলেন।

যোগেশ তখন বরদাবাবুর বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। অনিলবাবু কার্য্যস্থলে প্রস্থান করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্যালকের অনুরোধে লিলিকে রাখিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং প্রত্যহ সকালে সন্ধ্যায় সেখানে হাজিরা দেওয়া যোগেশের নিত্য কর্ম্মের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল। যে দিন কোন কারণে একবেলা যাওয়া না ঘটিত, সেদিনটা সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলিয়াই মনে হইত।

যোগেশ কাপড় ছাড়িয়া ধোয়া পাঞ্জাবীটা গায়ে দিবার উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময় দরজা হইতে মহেন্দ্রনাথ বজ্রগম্ভীরস্বরে ডাকিলেন, "যোগেশ!"

যোগেশ চমকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিল। মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "চাপাটী হতে বিশ পঁচিশ জন প্রজা এসে কেঁদে পড়েছে, তাদের উপর সেলামী আদায়ের জন্য অন্যায় জোর জুলুম হচ্চে।"

পাঞ্জাবীর হাতার ভিতর হাত দুইটা দিতে দিতে যোগেশ উত্তর করিল, "তাদের ম্যানেজারবাবুর কাছে যেতে বলুন।"

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ম্যানেজারবাবুই এই জোর জুলুম কচ্চেন।"

ঈষৎ হাসিয়া যোগেশ বলিল, "আপনি ভুল বুঝেছেন। ম্যানেজারবাবু শান্ত সুশিক্ষিত ব্যক্তি। তাঁর দ্বারা কোন অন্যায় অত্যাচার হতে পারে না।"

মহে। অত্যাচার না হলে প্রজারা এসে কেঁদে পড়বে কেন?

যোগে। সেটা ওদের স্বভাবসিদ্ধ দুষ্টামি। জমিদারের প্রাপ্য ন্যায্য গণ্ডা দিতে হ'লেই ওরা ঐ রকম বদমায়েসী ক'রে থাকে।

রোষক্ষুব্ধকণ্ঠে মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কিন্তু এই বদমায়েস প্রজারাই একদিন হাল গরু পর্য্যন্ত বেচে অষ্টমের নীলাম বাঁচিয়েছিল তা জান কি?"

যোগেশ বেশ সহজ স্বরেই উত্তর করিল, "সেটা তাদের যা অবশ্য দেয়, তাই দিয়েছিল; খয়রাত করেনি।"

মহে। ওদের মত গরীবদের পক্ষে তাই যথেষ্ট। খয়রাত করবার শক্তি ওদের নাই।

ঈষৎ রুষ্টস্বরে যোগেশ বলিল, "আপনার মত দয়া দাক্ষিণ্য দেখাতে গেলে জমিদারী চলে না মহেন্দ্রবাবু!"

এই কি সদাশয় গোবিন্দবাবুর পুত্র! মহেন্দ্রনাথ একবার উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। এমন সময় রমণীবা চটিজুতার ফট্ ফট্

শব্দ করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং মহেন্দ্রনাথের উপর একটা বক্রকটাক্ষ নিক্ষেপপূর্ব্বক যোগেশকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহেন্দ্রবাবু কতকগুলা চাষাকে এনে গোলযোগ উপস্থিত করেছেন বাবু।"

যোগেশ ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, "দরোয়ান দিয়ে তাদের দূর ক'রে দিন।"

ক্রোধকম্পিতকণ্ঠে মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কিন্তু একদিন এই চাষাগুলা দয়া না করলে তোমাকে আজ জমিদারী চালাতে হ'তো না যোগেশ।"

ম্যানেজারের সম্মুখে নাম ধরিয়া ডাকায় যোগেশ অপমানে যেন ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল; রোষতীব্রকণ্ঠে বলিল, "আপনার কাছে আমি উপদেশ নিতে চাই না।"

মহেন্দ্রনাথ সতেজকণ্ঠে বলিলেন, "তা হ'লে আমার আর এখানে থাকবার প্রয়োজন নাই।"

যোগেশ বলিল, "সে আপনার ইচ্ছা।"

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ইচ্ছা নয়, তা হ'লে আমি এই মুহূর্ত্তেই কার্য্য ত্যাগ ক'রে যাচ্ছি।"

যোগেশ নিতান্ত অবজ্ঞার সহিত মুখ ফিরাইয়া লইল। মহেন্দ্রনাথ প্রস্থানোদ্যত হইলেন। রমণীবাবু তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনার হিসাব-নিকাশটা মিটিয়ে গেলেই ভাল হয় মহেন্দ্রবাবু।"

মহেন্দ্রনাথ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন; ঘৃণাসূচক মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন, "খাতাপত্র সব আপনাদের হাতে। হিসাব নিকাশ দেখে নেবেন। আমি আমার হিসাব নিকাশ যাঁর কাছে দেবার তাঁর কাছে দেব।"

সগর্ব্ব পদক্ষেপে সিঁড়িগুলাকে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে মহেন্দ্রনাথ নীচে নামিয়া গেলেন, এবং প্রজাদের সহিত আর সাক্ষাৎ না করিয়াই কাছারী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। দেউড়ীর বাহিরে গিয়া হঠাৎ একবার থমকিয়া দাঁড়াইলেন, এবং ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মনে মনে বলিলেন, "আপনার কথা রাখতে পারলাম না বাবু, আমায় মাপ করুন।"

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত দুই ফোঁটা চোখের জল ফেলিয়া মহেন্দ্রনাথ উন্মাদের ন্যায় অস্থির পদে সেস্থান ত্যাগ করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

কন্যাদায় যে মস্ত একটা দায়, ইহা মহেন্দ্রনাথ অনেকবারই শুনিয়াছিলেন, কিন্তু সে দায়টা যে এমন ভয়ানক, তাহা এখন বুঝিতে পারিলেন। চাকরী গিয়াছে, খাওয়া পরার সংস্থান নাই, কিন্তু সেজন্য ততটা চিন্তা হইল না, যতটা চিন্তা এই বিষম কন্যাদায়ের জন্য। সঞ্চিত অর্থ কিছুই নাই, গৃহিণীর অলঙ্কারগুলি পর্য্যন্ত গিয়াছে, আছে শুধু পৈতৃক দুই পাঁচ বিঘা নিষ্কর জমি। এই জমি বিক্রয় করিয়া মহেন্দ্রনাথ কন্যাদায় হইতে উদ্ধারলাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সহজে সফল হইল না। পাঁচ বিঘা জমিতে ছয় সাত শত টাকার বেশী পাওয়া যাইবে না। কিন্তু একটু মনের মত পাত্র দেখিয়া দিতে গেলে হাজার টাকার কমে মিলিবে না। তাহার খরচপত্র আছে। মহেন্দ্রনাথ ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। যোগেশ সাহায্য করিবার আশা দিয়াছিল, কিন্তু তাহার মত অকৃতজ্ঞের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ অপেক্ষা কন্যাকে চিরকুমারী রাখাও শ্রেয়ঃ বলিয়া মহেন্দ্রনাথের মনে হইয়াছিল।

ভবসুন্দরী বলিলেন, "আর বাড়ীতে কাজ নাই, ওর ইট কাঠগুলো বেচলেও তো অনেক টাকা হবে।"

মহেন্দ্রনাথ দীর্ঘশ্বাসে হৃদয়ের গভীর বেদনা ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, "আমি নিজেকে বেচতে পারবো, তবু ও বাড়ী বেচতে পারবো না বড় বৌ। বাবুর বড় সাধের বাড়ী।"

মহেন্দ্রনাথের চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম করিল। মহেন্দ্রনাথ অনেক সময়ই এই অসমাপ্ত বাড়ীখানার দরজার উপর স্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিতেন। কখন বা দুই চারি বিন্দু তপ্ত অশ্রু ইষ্টক-খণ্ড বা চূণ সুরকীর স্তূপের উপর ঝরিয়া পড়িত।

কার্য্যত্যাগের মাসখানেক পরে হঠাৎ একদিন বরদাবাবু মহেন্দ্রনাথকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, এবং মহেন্দ্রনাথ উপস্থিত হইলে তাঁহার কার্য্যত্যাগের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া বরদাবাবু বলিলেন, "যোগেশ ছেলেমানুষ, রাগের বশে তোমাকে জবাব দেওয়া ভাল হয়নি মহেন্দ্রবাবু। তুমি ওদের যে উপকার করেছ তা আমি বেশ জানি। সেবারে লাটের কিস্তীর সময়—"

বাধা দিয়া মহেন্দ্রনাথ লজ্জিতভাবে বলিলেন, "বাবু আমার যা ক'রেছেন, তার তুলনায় ওটা কিছুই নয় ছোটবাবু।"

বরদাবাবু প্রসন্ন হাস্যের সহিত বলিলেন, "কিন্তু তোমার কার্য্যদক্ষতা জানতে আমার বাকী নাই মহেন্দ্রবাবু। যাক্, গতস্য শোচনা নাস্তি। এখন আমারও তোমার মত একজন লোকের দরকার হ'য়েছে।"

মহেন্দ্রনাথ বিস্ময়স্তব্ধনেত্রে বরদাবাবুর মুখের দিকে চাহিলেন। বরদাবাবু বলিলেন, একশো টাকা মাহিনাই আমি দেব মহেন্দ্রবাবু, তবে কাজকর্ম্ম আমি কিছুই দেখতে পারবো না, সব ভার তোমার উপর।"

ক্রোধে ঘৃণায় মহেন্দ্রনাথের আরক্তিম ললাট কুঞ্চিত হইয়া আসিল। মুহূর্ত্তে সে ভাবটাকে দমন করিয়া লইয়া মহেন্দ্রনাথ নতমুখে বলিলেন, আমাকে মাপ করুন ছোটবাবু, আমি এ ভার নেবার উপযুক্ত নই।"

ঈষৎ হাসিয়া বরদাবাবু বলিলেন, "হাতীর যে কত ক্ষমতা হাতী নিজে তা জানে না, কিন্তু অপরে জানে।"

মহেন্দ্রনাথ সবিনয়ে বলিলেন, "আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন ছোটবাবু, চাঁদের পিছনে সূর্য্যের তেজ থাকে ব'লেই চাঁদের আলো। নয় তো চাঁদ নিজে অন্ধকারের সমুদ্র। আমার যেটুকু বুদ্ধি বা ক্ষমতা দেখেছেন, সে সব বড়বাবুর। বড়বাবুর সঙ্গেই তা চলে গিয়েছে।"

বরদাবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "শেষ যেটুকু আছে, তার সাহায্য পেলেই আমি ছ'মাসের ভিতর জমিদারীটাকে ছয় গুন বাড়িয়ে নিতে পারব, সেজন্য তোমার কোন চিন্তা নাই। এখন এক বৎসরের মাহিনা আগাম নিয়ে যেতে পার, যত দিনে ইচ্ছা শোধ দেবে।"

এক বৎসরের মাহিনা বারশত টাকা! মহেন্দ্রনাথের বুকটা একটু কাঁপিয়া উঠিল। তিনি ব্যস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "আবার বলছি ছোটবাবু, আমাকে মাপ করুন। চাকরী কত্তে আর ইচ্ছা নাই; করলেও জমিদারী সেরেস্তায় কাজ আর করবো না।"

নমস্কার করিয়া মহেন্দ্রনাথ দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। বরদাবাবু ভ্রূকুটী-ভীষণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

"নিমি, ও পোড়ারমুখি!"

"কেন মা?"

ক্রোধ-সমুচ্চকণ্ঠে ভবসুন্দরী বলিলেন, "কোন্ চুলোয় গিয়েছিলি শুনি।" মুখ নীচু করিয়া ধীর শঙ্কিত স্বরে নিমি বলিল, "কোথাও তো যাই নি মা, বিন্দী ডাকলে তাই—"

তর্জ্জন করিয়া ভবসুন্দরী বলিলেন, "তাই সেখানে আমার শ্রাদ্ধ করতে গিয়েছিলি, না?"

হুঁকাটা বাঁ হাতে ধরিয়া মহেন্দ্রনাথ দাবার উপর বসিয়াছিলেন। তিনি স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ছি বড় বৌ।"

ক্রোধরুদ্ধকণ্ঠে ভবসুন্দরী বলিলেন, "ছি কিসের বল তো? তের চোদ্দ বছরের থুবড়ো মেয়ে, একটু আক্কেল নাই? বিয়ের তরে মানুষটার আহারনিদ্রা ত্যাগ হ'য়েছে, ভাবনায় অস্থিচর্ম্ম সার হ'য়ে এসেছে। সম্বন্ধ আসছে আর ভেঙ্গে যাচ্চে। আর ও কি না পাড়ায় পাড়ায় এখনো নেচে বেড়াবে?"

ম্লান হাসি হাসিয়া মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তোমার অভিযোগগুলা অস্বীকার করবার উপায় নাই বড় বৌ। কিন্তু সে জন্য ওকে তো দোষ দেওয়া যায় না।"

ললাট কুঞ্চিত করিয়া ভবসুন্দরী বলিলেন, "ওকে দোষ দেব না তো কা'কে দোষ দেব বল তো? ও যদি না জন্মাবে, তবে আজ এত ভাবতে হবে কেন?"

সহাস্যে মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "এটাও তুমি বললে বড়-বৌ, ছেলে মেয়ের জন্মের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী মা বাপ।"

ভবসুন্দরী কন্যার দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া নিরুত্তরে রহিলেন। মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ছেলে জুটছে না আমার পয়সার অভাবে, সম্বন্ধ ভাঙ্গছে বরদাবাবুর কৃপায়। তাতে ঐ কচি মেয়েটা কি করবে বল।"

গভীর বিরক্তির সহিত ভবসুন্দরী বলিলেন, "সর্ব্বস্ব খেয়ে ছাড়বে, আর করবে কি।"

"সর্ব্বস্বের মধ্যে তো তোমার এই ভাঙ্গা ঘর, আর রোক সাড়ে পাঁচ বিঘা জমি।"

বলিয়া মহেন্দ্রনাথ হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। অন্য সময় হইলে ভবসুন্দরীও হয় তো স্বামীর এই হাসিতে যোগ দিতেন। কিন্তু এত বড় দুঃখের আলোচনার মধ্যে স্বামীকে হাসিতে দেখিয়া ভবসুন্দরী বিরক্ত হইলেন; স্বামীর মুখের উপর তিরস্কারসূচক কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "ধন্য তুমি, এত

দুঃখকষ্টের মধ্যেও তোমার যে কি রকমে হাসি আসে তা তো আমি বুঝতে পারি না।"

স্থির প্রশান্তকণ্ঠে মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "অভাবটা তখনই সত্যিকার অভাব হয়, দুঃখটা তখনই বাস্তবিক বিধাতার অভিসম্পাত হ'য়ে দাঁড়ায় বড় বৌ, যখন তাদের তাড়নায় মানুষ আপনার ধৈর্য্যটুকু পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেলে।"

বলিয়া তিনি ভবসুন্দরীর গম্ভীর মুখের দিকে সহাস্য দৃষ্টিপাত করিলেন। ভবসুন্দরী মুখ ফিরাইয়া লইলেন। মহেন্দ্রনাথ তখন নির্ম্মলার দিকে ফিরিয়া স্নেহপ্রফুল্লকণ্ঠে ডাকিলেন, "নিমু!"

নির্ম্মলা সকাতর দৃষ্টিতে পিতার দিকে ফিরিয়া চাহিতেই তাহার দুই চোখ দিয়া ঝর ঝর জল গড়াইয়া পড়িল। চোখ মুছিতে মুছিতে সে ছুটিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

ভবসুন্দরীকে সম্বোধন করিয়া মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আচ্ছা বড়-বৌ, নিমি যখন হ'য়েছিল, তখনকার আনন্দ তোমার মনে পড়ে কি?"

সজল দৃষ্টি উন্নমিত করিয়া ভবসুন্দরী বলিলেন, "মনে আমার সবই পড়ে, কিন্তু এখন পাঁচজনে কি বলছে তা শুনচো কি?"

"পাঁচজনে ওকে পেটে ধরেনি।"

"মেয়ে পেটে ধরেচি ব'লে তাকে তো আইবুড়ো রাখ্‌তে পারবো না।"

"কিন্তু পাত্র না পাওয়া গেলে তো বিয়ে হ'তে পারে না।"

ঈষৎ রুষ্টস্বরে ভবসুন্দরী বলিলেন, "দেশের এত লোক পাত্র পাচ্চে, মেয়ের বিয়ে দিচ্চে, আর পাত্র পাও না শুধু তুমি। তোমার মেয়ের জন্য বিধাতাকে বোধ হয় নূতন ক'রে পাত্র গড়তে হবে।"

মহেন্দ্রনাথ কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "দেখ বড় বৌ, বাবু আমাকে মূর্খ ব'লে প্রায়ই তিরস্কার কত্তেন। দেখছি তাঁর কথা মিথ্যা নয়, বাস্তবিকই আমি মূর্খ।"

স্বামীর ব্যথিত স্বরে ক্ষুণ্ণ হইয়া ভবসুন্দরী ঈষৎ লজ্জিতভাবে বলিলেন, "আমার কথায় রাগ করলে?"

মহেন্দ্রনাথ বিষাদগম্ভীর হাস্য করিয়া বলিলেন, "না বড় বৌ, আমি যে মূর্খ তাতে কোনই সন্দেহ নাই। নয় তো তোমার গয়না পর্য্যন্ত বেচে নগদ চার হাজার টাকা পরকে দিয়ে রেখেছি, অথচ আজ আমি পয়সার অভাবে মেয়ের বিয়ে দিতে পাচ্চি না।"

মহেন্দ্রনাথের মুখখানা নিদাঘের মেঘের মত গম্ভীর হইয়া আসিল। স্বামীর এই ভাবান্তরে শঙ্কিত হইয়া ভবসুন্দরী সান্ত্বনার স্বরে বলিলেন, "ছিঃ, ও কথা এখন তুলছো কেন? সে টাকা তো তুমি পরকে দাও নাই, মনিবের মান বাঁচাবার জন্য দিয়েছ।"

রোষক্ষুব্ধকণ্ঠে মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কিন্তু এখন আমার মান কে বাঁচায় বল তো?"

শান্তস্বরে ভবসুন্দরী বলিলেন, "ঈশ্বর বাঁচাবেন, বাবুর আশীর্ব্বাদ তোমার মানরক্ষা করবে। সেজন্য তুমি কিছু ভেব না।"

অন্য সময় হইলে হয় তো মহেন্দ্রনাথ পত্নীর এই আশ্বাসেই আশ্বস্ত হইতে পারিত। কিন্তু এখন তাহা পারিল না। অনেক দেখিয়া শুনিয়া, সংসারের কুটিল গতি লক্ষ্য করিয়া সে বুঝিয়াছিল, ধর্ম্মের উপর নির্ভরতা, দেবতার কৃপার আশ্বাসে নিশ্চিন্ততা আপাততঃ দুশ্চিন্তার প্রতিকারক হইলেও তাহা ইহার স্থায়ী ভেষজ নহে। পরিণামে এই আশ্বাস কিছুমাত্র ফলদায়ক হয় না; অধিকন্তু সকল বিশ্বাস, সকল নির্ভরতাকে পরাভূত করিয়া সংসারের স্বাভাবিক কুটিল নীতি নিরাশার তমোময় গর্ভেই নিক্ষেপ করে। মানুষ যখন নিতান্ত নিরবলম্বন হইয়া পড়ে, তখনই সে এই অলীক আশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিতে চায়, অপরকেও সেইরূপ উপদেশ দিয়া থাকে। নতুবা যে ভবসুন্দরী ক্ষণকাল পূর্ব্বে অধৈর্য্য হইয়া স্নেহের কোমলতাটুকু পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছিল, ক্ষণপরে সে-ই আবার এই লুব্ধ আশ্বাসে প্রতারিত করিয়া ধৈর্য্যধারণের জন্য উপদেশ দিতেছে। হায়, মানুষ কি প্রতারক!

মহেন্দ্রনাথ এই প্রতারণায় প্রতারিত হইতে চাহিলেন না; তিনি একবার শেষ চেষ্টা দেখিবার অভিপ্রায়ে পরদিন সকালে যোগেশের কাছারীতে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সেখানে গিয়া শুনিলেন, যোগেশ গতকল্য বরদাবাবুর সহিত পশ্চিম ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছে, সঙ্গে বরদাবাবুর পরিবারবর্গ পর্য্যন্ত গিয়াছে। শুনিয়া মহেন্দ্রনাথ হতাশ হইয়া পড়িলেন।

রমণীবাবু তাঁহাকে অভ্যর্থনার সহিত বসাইয়া বলিলেন, "আপনি এয়েচেন, ভালই হ'য়েছে মহেন্দ্র-বাবু, আপনার কাছে লোক পাঠাব মনে করেছিলাম।"

মহেন্দ্রনাথ কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। রমণীবাবু চশমাটা মুছিয়া চোখে দিতে দিতে বলিলেন, "এতদিনে আপনার হিসাব শেষ হ'লো মহেন্দ্রবাবু। বাবুর হুকুম, তৎপর হিসাব দেখে দাও। কিন্তু পাঁচ সাত বৎসরের

হিসাব কি দু'দশ দিনে দেখা হয়। তার উপর কাজের কি রকম ভিড় তা আপনি জানেন তো।"

বলিয়া তিনি মহেন্দ্রনাথের মুখের উপর হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। মহেন্দ্রনাথও মৃদু হাসিয়া মস্তক সঞ্চালন করিলেন। রমণীবাবু বলিতে লাগিলেন, "এদিকে আবার চাপাটী, কুমীরচক, রাজাপুর, চার পাঁচ খানা মহলের প্রজারা ধর্ম্মঘট করেছিল, এক পয়সা খাজনা দেবে না। আরে, একি মগের মুল্লুক যে জমিদারের জমি ভোগ করবে, আর খাজানা দেবে না। চাপাটীর নবীন মণ্ডল, রাজাপুরের ফকির সেখ, গোপাল জানা, এই রকম জনকতক মাতব্বর প্রজার ঘর জ্বালিয়ে দিতেই বেটারা খাজনা দিতে পথ পাচ্চে না। এর মধ্যে আবার বেটারা কি করলে জানেন, একেবারে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে গিযে দরখাস্ত দিয়ে এলেন, আমি তাদের ঘর জ্বালিযে দিযেছি, মেয়ে ছেলেদের বে-ইজ্জৎ করেছি। ম্যাজিষ্ট্রেট্ পুলিসের উপর তদন্তের ভার দিলেন। পুলিস এলে বেটাদের উৎসাহ দেখে কে। আরে হতভাগা, পুলিস তোদের হাতে, না জমিদারের হাতে। আর আমি কি গোঁযার গোবিন্দ নাযেব গোমস্তা যে, আইন না বাঁচিয়ে কাজ করেছি? ক্রিমিন্যাল ল'তে আমি ফুল মার্ক পেয়েছিলাম। হ'লো কি, শেষে বেটারা ঘটি বাটি হাল গরু বেচে আক্কেল সেলামী দিযে তবে পুলিসের গোলযোগ থেকে নিষ্কৃতি পায়। এখন বেটাদের অভ ভক্ষ্য ধনুগুর্ণঃ। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।"

সগর্ব্ব হাস্যচ্ছটায় রমণীবাবুর মুখখানা প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। মহেন্দ্রনাথ তাঁহার মুখের উপর একবার জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিযাই নতমস্তক হইলেন। রমণীবাবু কাগজের বাণ্ডিল খুঁজিয়া একখানা হিসাবের কাগজ বাহির করিয়া বলিলেন, "যাক্, এখন আপনার হিসাবটা—আপনার হিসাবে হাজার ছয় টাকা গরমিল আছে। তা এত বড় এষ্টেটে ছ'হাজার টাকার গরমিল, এ আর তেমন বেশী কি।"

অতিমাত্র বিস্ময়সহকারে মহেন্দ্রনাথ বলিয়া উঠিলেন. "ছ'-হাজার টাকার গরমিল?"

সহাস্যে মস্তক সঞ্চালন পূর্ব্বক রমণীবাবু বলিলেন, "আমি নিজে দু'বার তিনবার তন্ন তন্ন মিলিয়ে দেখেছি, পাঁচ হাজারআটশো বিরানব্বই টাকা এগার আনা সাড়ে তিন পাই। আপনিও না হয় দেখুন না। আপনারই আমলের খাতা, কোথাও গোলমাল থাকে আপনি ধরে দিতে পারবেন।"

মহেন্দ্রনাথ বিস্ময়স্তব্ধভাবে নিরুত্তরে বসিয়া রহিলেন। রমণীবাবু যেন উপেক্ষাসূচক মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন, "যাক্ আপনাকে কথাটা শুনিয়ে রাখলাম। তারপর বাবু এসে যা হয় ব্যবস্থা করবেন। করবেন আর কি? তিনি কি আপনার কাছ হ'তে টাকাটা আদায় ক'রে নিতে যাবেন?"

মহেন্দ্রনাথ মুখ তুলিয়া তীব্রকণ্ঠে বলিলেন, "আমার দেনা দাঁড়ালে তিনি না নিলেও আমাকে দিতে হবে। কিন্তু কিসে এত টাকার গরমিল হ'লো তাই বুঝতে পাচ্চি না। আমি তো কখন মাইনের একটি পয়সা বেশী নিই নাই রমণীবাবু।"

রমণীবাবু যেন ইহার সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়া বলিলেন, "সে তো বরাবরই খাতায দেখে আসছি। তবে আপনার নূতন বাড়ী খানার বাবদ কিছু খরচ করেছেন কি?"

সপ্রতিভভাবে মহেন্দ্রনাথ বলিযা উঠিলেন, "বাড়ীর খরচ? সে খরচ তো সম্পূ্র্ণ এই তহবিল হ'তেই হয়েছে। কিন্তু সে তো আমার খরচ নয়, বাবু নিজ থেকেই করেছেন।"

একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া রমণীবাবু বলিলেন, "বটে, বটে। তবে খাতা পত্রে তো তেমন কথা কিছুই নাই, শুধু আপনার নামেই খরচ লেখা আছে। কাজেই ওটা আপনারই খরচ ধত্তে হবে। তা আপনি বাবুকে বুঝিয়ে বললেই—"

বাধা দিয়া মহেন্দ্রনাথ অভিমানক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিলেন, "বুঝিয়ে বলবার কোন দরকার নাই রমণীবাবু। যদি এটা আমারই খরচ ধরা হয, তা হ'লে আমি যে চার হাজার টাকা দিয়েছি সেটাও তো ধরা দরকার।"

জোরে মাথাটা নাড়িযা রমণীবাবু বলিয়া উঠিলেন, নিশ্চয, নিশ্চয়। আপনি চার হাজার টাকা দিযেছেন নাকি? তা হ'লে তো কথাই নাই। ছ'হাজারের চার হাজার বাদ গেলে থাকে দু'হাজার। তা এই সামান্য টাকা বাবু অনায়াসে ছেড়ে দেবেন।"

একটু ভাবিয়া রমণীবাবু পুনরায় বলিলেন, "কিন্তু আশ্চর্য্য এই মহেন্দ্রবাবু, আপনার এতগুলা টাকা জমা আছে, অথচ সে হিসাবটা কারো নজরেই পড়লো না। কর্ম্মচারীগুলা একেবারে অকর্ম্মণ্য।"

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তাদের দোষ নাই; এ টাকাটা খাতায় আদৌ তোলা হয়নি।"

রমণীবাবু বলিলেন, "খাতায় তোলা হয় নি ? তা হ'লে বোধ হয় স্বতন্ত্র লেখাপড়া আছে।"

মহেন্দ্রনাথ ভ্রূকুটী করিয়া বলিলেন, "বাবুর সঙ্গে আমার লেখাপড়ার সম্বন্ধ ছিল না।"

বিস্ময় প্রকাশ করিয়া রমণীবাবু বলিলেন, "তা হ'লে লেখাপড়া কিছু হয় নি ?"

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "লেখাপড়ার প্রয়োজনও কিছু ছিল না। সে বৎসর কিস্তীর চালান লুট হ'লে আমি অনেক কষ্টে হাজার টাকা আদায় করি। বাকী চার হাজার টাকা নিজ হ'তে দিয়েছি।"

গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালন করিতে করিতে রমণীবাবু বলিলেন, "তা লেখাপড়া না থাক্‌লেও বাবু আপনার কথায় অবিশ্বাস করবেন না, কি বলেন ?"

বলিয়া তিনি মহেন্দ্রনাথের মুখের উপর সহাস্য-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। মহেন্দ্রনাথ এ প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়াই কাছারী ত্যাগ করিলেন।

বাড়ী ফিরিয়া মহেন্দ্রনাথ ভবসুন্দরীকে বলিলেন, "বিয়ের যোগাড় কর বড়-বৌ, শাপুরেই মত করলাম।"

ভবসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাদের তো দেড় হাজার টাকা নগদ দিতে হবে।"

রুষ্টস্বরে মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "দশ হাজার টাকা দি-ত হলেও মেয়ের বিয়ে দিতেই হবে।"

ভবসুন্দরী আর কিছু বলিলেন না। মহেন্দ্রনাথ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ঈষৎ উত্তেজিতভাবে বলিলেন, "টাকা দিতে হবে ব'লে তো মেয়েটাকে জলে ফেল্‌তে পারবো না ? বীক সরকার তিন হাজার টাকা বাড়ীখানার দর দিয়েছে। ঐ টাকাতেই ছেড়ে দেব।"

ভবসুন্দরী বিস্ময়স্তব্ধ দৃষ্টিতে স্বামীর উত্তেজনাপূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

চা খাইতে খাইতে বরদাবাবু যোগেশকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এবার ফিরে যেতে হবে হে যোগেশ।"

যোগেশ চায়ের পাত্রটা মুখের কাছে ধরিয়া জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে বরদাবাবুর দিকে চাহিল। বরদাবাবু এক চুমুক চা উদরস্থ করিয়া বলিলেন, "মনে করেছিলাম, দেওঘরে দিনকতক থেকে আসানসোল ঘুরে পুরী যাব। কিন্তু এ যাত্রা সেটা আর ঘটে উঠলো না।"

যোগেশ জিজ্ঞাসা করিল, "বাড়ী হতে ফিরবার তাগিদ এসেছে বুঝি ?"

বরদাবাবু বলিলেন, "বাড়ী হতে তাগিদ আসে নি, অনিলের চিঠি এসেছে। অনিল যে ছুটী নিয়ে মেয়ের বিয়ে দিতে আস্‌চে।"

যোগেশের মুখের উপর দিয়া একটা উদ্বেগের ধারা যেন বিদ্যুতের ন্যায় চমকিত হইয়া গেল। বরদাবাবু নিঃশব্দে চা পান শেষ করিয়া একটা চুরুট্ ধরাইলেন, এবং তাহাতে জোরে টান দিয়া একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন, "বাইরে যতই সাহেবিয়ানা করুক, ভিতরের হিন্দুর সংস্কার যাবে কোথায় ? মেয়ে বড় হয়ে উঠেছে, চোখে আর ঘুম নাই। তবে ওদের ভিতরে ভিতরে একটা মতভেদ আছে তা জান না বোধ হয় ”

বলিয়া বরদাবাবু চুরুটে আর একটা টান দিলেন, এবং যোগেশের মুখের দিকে চাহিয়া সহাস্যে বলিলেন, "অনিলের ইচ্ছাটা কি জান, বিলাত-ফেরৎ ব্যারিষ্টার বা এই রকম দেখে মেয়েটি দেয়। তাতে সুবিধাও একটু আছে, নগদ তেমন মোটামুটি কিছু লাগ্‌বে না। কিন্তু লিলির মায়ের ইচ্ছা তা নয় ; সে বলে, হিঁদুর মেয়ে হিঁদুর ঘরে দিতে হবে। তার ইচ্ছা, জমিদারের ছেলেই হোক বা উকিল কি ডাক্তার হোক, একটি শিক্ষিত সচ্চরিত্র পাত্রের হাতে মেয়েটিকে দান করবে।"

বরদাবাবু যোগেশের মুখের উপর হাস্যোজ্জ্বল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। যোগেশ নিরুত্তরে উদ্বেগ বিবর্ণ মুখখানা নীচু করিয়া চায়ের বাটীতে চুমুক দিতে লাগিল। বরদাবাবু একটু থামিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "এখন কার ইচ্ছাটা জয়ী হ'বে বলা যায় না। কিন্তু অনিলের ইচ্ছায় কাজ হ'লে ফল যে বেশ ভাল হবে এমন তো বোধ হয় না। কেন না অনিলের চেষ্টাকে পরাভূত ক'রে লিলি যে সম্পূর্ণ হিন্দুভাবেই গঠিত হয়েছে, তাতে কোনই সন্দেহ নাই। তুমি কি বল ?"

চায়ের বাটিটা নামাইয়া রাখিতে রাখিতে যোগেশ নতমুখেই মৃদুস্বরে উত্তর করিল, "সেই রকমই বোধ হয়।"

মুখের চুরুটটা ডান হাতে ধরিয়া জোর গলায় বরদাবাবু বলিলেন, "বোধ হয় কেন, নিশ্চয়ই। আমি দিব্যি ক'রে বল্‌তে পারি যোগেশ, সাহেবী চালে লিলি কখনো চল্‌তে পারবে না। তার চেয়ে বেশ শিক্ষিত সচ্চরিত্র হিঁদুর ছেলে—তা সে জমিদারেরই ছেলে হোক বা উকীল-মোক্তারের

ছেলেই হোক, এই রকম একটি পাত্র দেখে দিলে ও সুখী হবে। কেমন ঠিক্ কি না।"

যোগেশ সংক্ষেপে উত্তর দিল, "হাঁ।"

বরদাবাবু বলিলেন, "তবে টাকা কিছু লাগ্‌বে। তা এমনই কি বেশী লাগ্‌বে? এমন শিক্ষিতা সুন্দরী সুরূপা মেয়ে, আমার তো মনে হয়, কত ছেলে ওকে বিনা পয়সায় গ্রহণ করবে।"

বলিয়া তিনি যোগেশের মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। যোগেশের মুখখানা তখন লাল হইয়া উঠিয়াছিল; সে বরদাবাবুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখ হইতে তাড়াতাড়ি মুখটা ফিরাইয়া লইল।

বরদাবাবু অন্যমনস্কভাবে চুরুট্ টানিতে টানিতে বলিলেন, "বেড়াতে যাবে নাকি?"

যোগেশ ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "এবেলা আর বেরোব না। শরীরটা—"

বরদাবাবু ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিলেন, "তবে থাক্। দেখছি তোমার সর্দ্দির মত হ'য়েছে। লিলিকে ব'লো, এক কৌটা বেলেডোনা দেবে।"

বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আমি একটু ঘুরে আসি। আমার আবার জান তো, একটু না হাঁট্‌লে ক্ষুধাই হয় না।"

ঘরের কোণ হইতে ছড়িটা লইয়া বরদাবাবু বাহির হইয়া গেলেন। যোগেশ চৌকীখানা জানালার কাছে টানিয়া আনিয়া পূর্ব্বদিনের বেঙ্গলীখানা লইয়া বসিল।

ঘরখানা রাস্তার উপরেই। রাস্তা দিয়া কত লোক মন্দির অভিমুখে যাইতেছিল, মন্দির হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল। তাহাদের মধ্যে বালক বালিকা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, কত বয়সের কত দেশের লোক ছিল। তাহাদের কত রকমের বেশ-ভূষা, কত রকমের চাল্‌চলন। বৃদ্ধেরা শিব-স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে চলিয়াছিল; বৃদ্ধারা যুবতী ও বালক বালিকাদিগকে সাম্‌লাইয়া লইয়া যাইতে ছিল; যুবতীরা মৃদু আলাপে, হাস্যে, কটাক্ষে পথটাকে যেন সজীব করিয়া ধীরমন্থর-পদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছিল। তাহাদের মধ্যে সুরূপা ছিল; কুরূপা ছিল; সুবেশা ছিল আবার বসনভূষণের আড়ম্বরশূন্যা পুষ্প-পল্লববিহীনা লতার মত সন্তর্পণে সঙ্কুচিতভাবে পাশ কাটাইয়া চলিয়াছিল। বালক বালিকারা পথের প্রায় সমস্ত স্থানটা অধিকার করিয়া কলহাস্যে অচেতন পথটাকে সচেতন করিয়া তুলিয়াছিল। যোগেশ কোলের উপর কাগজখানা ফেলিয়া মুগ্ধ-দৃষ্টিতে পথের দিকে চাহিয়া রহিল।

সহসা মৃদু-পদশব্দে চমকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিতেই যোগেশ দেখিতে পাইল, লীলা স্নানান্তে শুভ্রবস্ত্র পরিহিতা হইয়া বৃষ্টিধারা পরিমার্জ্জিতা লতার মত শুদ্ধ সৌন্দর্য্য লইয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; উন্মুক্ত কেশরাশি পৃষ্ঠবাস আবৃত করিয়া দুলিতেছে, আর তাহারই পাশে মুখখানা শিশিরধৌত প্রভাত-পদ্মের কমনীয় শোভা বিস্তার করিতেছে। যোগেশ মুগ্ধ-বিহ্বল-দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

লীলা ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি আজ বেড়াতে যান নি?"

যোগেশ সচকিতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া উত্তর দিল, "না, শরীরটা তেমন ভাল নয়।"

লীলা একটু উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন অসুখ বোধ কচ্চেন কি?

ঈষৎ হাসিয়া যোগেশ বলিল, "তেমন কিছু নয়।"

লীলা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। যোগেশ জিজ্ঞাসা করিল, "আজ এত সকালেই স্নান সেরেছ যে?"

লীলা বলিল, "আজ আমরা মন্দিরে যাব মনে করেছিলাম।"

"ওঃ, তাই বুঝি আজ চা খেলে না?"

"চা খেয়ে কি পূজা করা হয়?"

সহাস্যে যোগেশ বলিল, "সেটা ঠিক্। এখনি যাচ্চো নাকি?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া লীলা বলিল, "মামী বল্‌ছিলেন, আপনি সঙ্গে যাবেন। কিন্তু আপনার তো—"

ব্যস্ততার সহিত যোগেশ বলিয়া উঠিল, "না না, অসুখ তেমন কিছুই নয়। বেশ তো, আমি নিয়ে যাচ্চি, চল।"

চিন্তিতভাবে লীলা বলিল, "কিন্তু তা কেমন ক'রে হবে? আপনি তো স্নান করবেন না?"

ঈষৎ হাসিয়া যোগেশ বলিল, "স্নান না ক'রে সঙ্গে যেতে নাই?"

লীলা যেন-একটু আশ্চর্য্যান্বিতভাবে বলিল, "ওমা, স্নান না করলে মন্দিরে ঢুক্‌তে আছে?"

"ঢুক্‌লে মন্দির অপবিত্র হবে নাকি?"

মুখখানাকে একটু গম্ভীর করিয়া লীলা বলিল, "ও রকম ঢুক্‌তে নাই।"

"ঢুক্‌লে কি হয়?"

"পাপ হয়।"

যোগেশ হাসিয়া উঠিল। বলিল, "তুমি যে রকম আস্তিক হ'য়ে উঠেচ, তাতে এই আস্তিকতা কিরূপে বজায় রাখ্‌বে তাই ভাব্‌ছি।"

লীলা বিস্ময়-চকিত-দৃষ্টিতে যোগেশের মুখের দিকে চাহিল। যোগেশ সহাস্যমুখে বলিল, "এ দিকে তো শুন্‌ছি, বিলাত-ফেরৎ বাঙ্গালী সাহেবের সঙ্গে তোমার বিয়ের কথাবার্ত্তা হচ্চে।"

লীলার মুখখানা আষাঢ়ের মেঘের মত গম্ভীর হইয়া আসিল। যোগেশের মুখের উপর একটা ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়াই সে দ্রুতপদক্ষেপে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

খানিক পরে যোগেশ দেখিল, ঝি ও চাকরকে সঙ্গে লইয়া স্ত্রীলোকেরা দেবদর্শনোদ্দেশে বাহির হইয়া গেল। যোগেশ কোলের উপর হইতে খবরের কাগজখানা তুলিয়া লইয়া তাহাতে মনোযোগ দিবার চেষ্টা করিল।

এমন সময়ে চাকর পোষ্টাফিস্‌ হইতে কয়েকখানা চিঠি লইয়া ফিরিল। তাহার মধ্যে যোগেশের নিজের দুইখানা চিঠি ছিল। একখানা ম্যানেজারের লিখিত। রমণীবাবু লিখিয়াছেন, "আপনার বৈদ্যনাথ হইতে লিখিত পত্র পাইয়াছি এবং আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি সংবাদে সাতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। এখানকার জন্য আপনার কোন চিন্তা নাই। যদিও খাজনা এক পয়সা আদায় হয় নাই, যোগাড় করিয়া কিস্তীর টাকা আমানত করিয়া দিয়াছি। এগার হাজার টাকা মাত্র ঋণ হইয়াছে। তজ্জন্য আপনার কিছুমাত্র চিন্তা নাই। ইহার মধ্যে আইনের সাহায্যে দুর্ব্বৃত্ত প্রজাগণকে বশে আনিয়া মায়-সুদ সমস্ত টাকা পরিশোধ করিতে পারিব এরূপ ভরসা সম্পূর্ণ আছে।

এ সময়ে বিষয়-কার্য্যের চিন্তায় আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাইবার ইচ্ছা আমার নাই। সুতরাং সে সকল কথা আপনাকে জানাইলাম না। তবে একটা বিষয় নিতান্ত প্রয়োজনবোধে আপনাকে জানাইয়া রাখিতেছি। আপনাকে পূর্ব্বেই জানাইয়াছি যে, হিসাবে মহেন্দ্রবাবু ছয় হাজার টাকার দায়ী হইয়াছেন। এ বিষয় আপনার বিবেচনার উপরেই নির্ভর করিয়া আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। কিন্তু মহেন্দ্রবাবু প্রচার করিতেছেন যে, আমাদের এ হিসাব জাল। অধিকন্তু তিনি আপনার স্বর্গীয় পিতৃদেবকে চার হাজার টাকা ঋণ দিয়াছিলেন বলিয়া দাবী করিতেছেন। শুনিতে পাই, প্রায় সকল মহালের প্রজাই তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতেছে এবং তিনি উহাদিগকে সাহস দিয়া খাজনা দিতে নিষেধ করিতেছেন। ইহার উপর তিনি ভবিষ্যতের চিন্তায় নূতন অসম্পূর্ণ বাড়ীখানাকে বিক্রয় করিবার চেষ্টায় আছেন এবং সর্ব্বসমক্ষে আমার মূর্খতা প্রচার করিয়া সগর্ব্বে বলিয়া বেড়াইতেছেন, বাড়ীটা বিক্রয় করিয়া ফেলিলে আর আমাদের টাকা আদায়ের কোনই সম্ভাবনা থাকিবে না। অনুসন্ধানে জানিলাম, বাড়ীখানা বিক্রয়ের বায়না পর্য্যন্ত স্থির হইয়া গিয়াছে। অগত্যা আপনার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই আমাকে তাঁহার নামে ছয় হাজার টাকার দাবীতে মোকদ্দমা রুজু করিতে হইয়াছে, এবং বাড়ীটার উপর অগ্রিম ক্রোক দিয়া বিক্রয়ের পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছি। নিতান্ত দুঃখের সহিতই আমাকে এই কঠোর কর্ত্তব্য সাধন করিতে হইয়াছে। অতঃপর আপনি ফিরিয়া আসিয়া যেমত বিবেচনা করেন তাহাই করিবেন।"

পত্রপাঠান্তে যোগেশ ভ্রুকুটী করিয়া কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। তারপর দ্বিতীয় পত্রখানা খুলিয়া পড়িতে লাগিল। সেখানা মহেন্দ্রনাথের লিখিত। মহেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"যোগেশ, অনেক চেষ্টায় তোমার বর্ত্তমান ঠিকানা জানিয়া লইয়া তোমাকে পত্র লিখিলাম। তোমার ম্যানেজার রমণীবাবু ছয় হাজার টাকার দাবী দিয়া আমার নামে মোকদ্দমা আনিয়াছেন। কেবল তাহাতেই ক্ষান্ত হন নাই। আমার নূতন বাড়ীখানার উপর ক্রোক দিয়াছেন। ইহা তোমার জ্ঞাতসারে হইয়াছে কি না জানি না, কিন্তু জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক, আমাকে এরূপ পর্য্যুদস্ত করিয়া তোমার লাভ কি? ইহাতে শুধু আমাকে অপমানিত করা হইবে না, তোমার স্বর্গগত পিতার সম্মানেও যে আঘাত লাগিবে তাহা বোধ হয় জান না।

বাড়ীখানা বিক্রয় করিয়া মেয়েটার বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। মনে করিও না, সেই সঙ্কল্প ব্যর্থ হওয়াতেই এমন কথা বলিতেছি। ভিখারীর মেয়েরও বিবাহ হয়, আমার মেয়েরও বিবাহ হইবে। কিন্তু তোমার ধর্ম্মে যে আঘাত লাগিবে তাহাতে সুখ সৌভাগ্য চূর্ণ হইয়া যাইতে পারে।"

যোগেশ পত্রখানা পড়িয়া স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। এমন সময় বরদাবাবু ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার চিঠি এল হে?"

যোগেশ তাঁহার দিকে চাহিয়াই ত্রস্তভাবে চিঠিখানি মুঠার ভিতর গুটাইয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল।

———

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

রমেশ চক্রবর্ত্তী মহেন্দ্রনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সকালে তাড়াতাড়ি কোথায় যাচ্ছিলে হে ভায়া ?"

মহেন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন, "ন'পাড়ায়।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "ন'পাড়ায় কেন ? ছেলে দেখ্‌তে বুঝি ?"

মহেন্দ্রনাথ নীরবে মস্তক সঞ্চালন করিলেন। চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "ন'পাড়ায় তেমন ছেলে কার আছে ? এক তো গুপী চাটুজ্যের ছেলে। জমি-জায়গা কিছু আছে বটে, কিন্তু লেখাপড়ায় তেমন নয়।"

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সংস্কৃত পড়ছে।"

অবজ্ঞার মৃদু হাসি হাসিয়া চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "ও না-পড়ার মধ্যেই। আজকাল কি আর সংস্কৃত পড়ার আদর আছে ? দু'চার পাত ইংরিজী না পড়লে মানুষের মধ্যেই গণ্য করা যায় না। তা কথাবার্ত্তা ঠিক্ হ'য়ে গেল ?"

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ঠিক কিছু হয় নি। তাঁরা কাল মেয়ে দেখ্‌তে আস্‌বেন।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "দেনা-পাওনার কথা কিছু হ'য়েছে ?"

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "মেয়ে পছন্দ হ'লে কিছুই দিতে হবে না।"

চক্রবর্ত্তীর চক্ষু দুইটা বিস্ময়ে একটু বিস্ফারিত হইয়া আসিল। চকিতে তিনি সে ভাবটাকে সংবরণ করিয়া লইয়া গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালনপূর্ব্বক বলিলেন, "দিতে হবেই বা কেন, আর দেবেই বা কে ? ছেলে যদি ইংরিজী পড়তো তা হ'লে কি কিছু না নিয়ে ছাড়ে। যাক্, তোমার যেমন অবস্থা, তাতে এই রকম ছাড়া তো গতি নাই।"

মহেন্দ্রনাথের দুরবস্থা স্মরণে চক্রবর্ত্তী একটা বিষাদের গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। মহেন্দ্রনাথ তাঁহার মুখের উপর তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই নতমুখে বসিয়া রহিলেন। চক্রবর্ত্তী হাতের লাঠিটা একখানা ইটের উপরই ঠুকিতে ঠুকিতে বলিলেন, "যাক্, যখন কথাবার্ত্তা হচ্চে তখন শেষ পর্য্যন্ত দেখাই দরকার।"

বলিয়াই তিনি মহেন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, "আর শুনেছ, বনমালী খুড়ো নাকি আবার বিয়ে করবে।"

সচকিতে মহেন্দ্রনাথ বলিয়া উঠিলেন, "কে, বনমালী ঘোষাল ?"

গ্রীবা আন্দোলন-সহকারে চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "হাঁ হাঁ, আজ প্রায় দু'তিন বৎসর তাঁর স্ত্রীবিয়োগ হ'য়েছে জান তো। ছেলে-বৌ মেয়ে-জামাই সব আছে বটে, কিন্তু থাক্‌লে কি হয়, ছেলের সঙ্গে নাকি বনিবনাও হচ্চে না। তাই আবার বিয়ে করবেন। আর না করবেনই বা কেন ? অগাধ পয়সা, তোমার যোগেশবাবুকে সাতবার কিনতে বেচতে পারে। তবে বয়স পঞ্চাশ ছাড়িয়েচে এই যা। তা পয়সায় কি না হয় ? কথাতেই আছে—কড়িতে বুড়োর বিয়ে।"

বলিয়া চক্রবর্ত্তী হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। মহেন্দ্রনাথ হাঁ করিয়া তাঁহার অট্টহাস্য বিকৃত মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

চক্রবর্ত্তী আপন মনে খানিকটা হাসিয়া হাস্যবেগ সংবরণপূর্ব্বক বলিলেন, "কাল তাঁর সঙ্গে আমার হঠাৎ দেখা। এ কথা সে-কথার পর তোমার মেয়ের বিয়ে হ'য়েছে কি না জান্‌তে চাইলেন। আমি সকল কথাই খুলে বল্‌লাম। শুনে তিনি রাগে লাল হ'য়ে বল্‌লেন, কি, এই সামান্য টাকার তরে মহেন্দ্রবাবুর এমন বাড়ীখানা বিকিয়ে যাবে ? তাঁর মেয়েটি যদি বেশ ডাগর আর সুশ্রী হয়, তা হ'লে কালই আমি দাবীর টাকা আমানত ক'রে দিতে পারি।"

মহেন্দ্রনাথের চোখ দুইটা যেন জ্বলিয়া উঠিল। তদ্দর্শনে চক্রবর্ত্তী অপ্রতিভভাবে বলিলেন, "শুনে, আমি বল্‌লাম, মহেন্দ্রবাবুর তো তা হ'লে মেয়ে বিক্রী করা হবে। তিনি হেসে বল্‌লেন, পাগল আর কি, আমি কি নগদ টাকা তাঁকে দিতে যাচ্চি। ধর আদালত হ'তে আমি বাড়ীখানা কিনে নিলাম। তখন বাড়ীটা তাঁর মেয়ের বাড়ী হ'লো তো। মেয়ে আর ছেলে ভিন্ন নয়। ছেলের বাড়ীতে যদি বাস করা যায়, তবে মেয়ের বাড়ীতে বাস কর্ত্তেই দোষ কি।"

একটু কঠোর হাসি হাসিয়া মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তিনি বিয়ের নেশায় পাগল হ'য়েছেন, কিন্তু আমি এখনো পাগল হই নাই চক্রবর্ত্তী মশায়।"

চক্রবর্ত্তী ঈষৎ ক্ষুণ্ণভাবে বলিলেন, "ঠিক্, ঠিক্। যাক্, এখন ন'পাড়ার সম্বন্ধটা কতদূর কি হয় দেখ। তারার ইচ্ছায় যোগাযোগ হ'লেই মঙ্গল। আর না হ'লেই বা ভাবনা কিসের। ছেলে কি আর জুটবে না ? আমরা তো আছি। তুমি কি আমাদের পর হে ভায়া।"

বলিয়া তিনি মহেন্দ্রনাথের মুখের উপর হাস্যপ্রফুল্ল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। মহেন্দ্রনাথকেও প্রসন্ন হাস্যদ্বারা তাঁহারা যে পর নহেন, আত্মীয়, ইহা

স্বীকার করিতে হইল। অতঃপর চক্রবর্ত্তী মোকদ্দমার কথা পাড়িলেন, বাড়ীটার ক্রোকের উপর কোন 'ক্লেম' দেওয়া যায় কিনা, তাহার আলোচনা করিলেন; শেষে যোগেশের অকৃতজ্ঞতার উল্লেখ করিয়া আক্ষেপ-সহকারে বলিলেন, "ভায়া, গোড়ায় তুমি গলদ করেছ। জমিদারকে বিশ্বাস আছে? 'বড়র পীরিতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।' তখন যদি একটু বুঝে চল্‌তে?"

উত্তরে মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "অদৃষ্ট।"

চক্রবর্ত্তী আর দুই চারি কথায় কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে মহেন্দ্রনাথকে আশ্বাস দিয়া প্রস্থান করিলেন। মহেন্দ্রনাথ ইষ্টকস্তূপের পার্শ্বে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। সম্মুখে নূতন বাড়ীখানা; সায়াহ্ন-সূর্য্যের শেষ রশ্মিতে বিচ্ছুরিত হইয়া তাহার ইটগুলা যেন জ্বলিতেছিল; প্রত্যেক ইষ্টকখণ্ড হইতে যেন-একটা প্রীতিপ্রফুল্ল হাস্যচ্ছটা বিকীর্ণ হইতেছিল। একটা অপার্থিব করুণা, দেবোপম মহত্ত্বের জ্যোতিতে মণ্ডিত হইয়া বাড়ীখানা যেন গর্ব্বে হাসিয়া উঠিয়াছিল। মহেন্দ্রনাথ মুগ্ধ অপলক-দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

দিনের আলোককে ঠেলিয়া দিতে দিতে সন্ধ্যার ছায়া ধীরে ধীরে বাড়ীখানার উপর অন্ধকারের আবরণ টানিয়া দিতে লাগিল। মহেন্দ্রনাথের মনে হইল, পার্থিব অকৃতজ্ঞতা আসিয়া দৈবী করুণাকে ঢাকিয়া ফেলিতেছে। তাঁহার অন্তর ভেদ করিয়া একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইল।

সহসা পদশব্দে চমকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিতেই মহেন্দ্রনাথ দেখিলেন, সম্মুখে যোগেশ। তিনি বিস্ময়-স্তব্ধ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। যোগেশ ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার পাশে একখানা ইট টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল।

দুই তিন মাসের মধ্যে ঋণের অঙ্কটা কিরূপে যে ত্রিশ হাজারের সীমা ছাড়াইয়া উঠিল, তাহা রমণীবাবু খাতাপত্রের মধ্যে পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিলেও যোগেশ কিন্তু বেশ বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। তা ছাড়া ঋণের পরিমাণটা যে এইখানেই সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিবে, এরূপ সম্ভাবনাও ছিল না। প্রজাদের সঙ্গে দশ বারো নম্বর ফৌজদারী ও দেওয়ানী মোকদ্দমা চলিতেছিল। এ দিকে খাজনা এক পয়সা আদায় হইতেছিল না। সকল প্রজাই যে বিদ্রোহী হইয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু অজন্মাবশতঃ অধিকাংশ প্রজারই খাজনা দিবার সঙ্গতি ছিল না। যাহাদের সে সঙ্গতি ছিল, তাহারা অন্যায় অত্যাচারের প্রতিরোধ মানসে মোকদ্দমার ফলাফলের উপর নির্ভর করিয়াছিল। সুতরাং জমিদারী ও মোকদ্দমার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ঋণ ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। যোগেশ প্রমাদ গণিল।

জনৈক বৃদ্ধ কর্ম্মচারী উপদেশ দিল, "বাবু, আর একবার ঠিক্ এমনি অবস্থায় মহেন্দ্রবাবু জমিদারী রক্ষা করেছিলেন।"

যোগেশ ভ্রূকুটী করিয়া বলিল, "মহেন্দ্রবাবু মারা গেলে বোধ হয় আমাকে জমিদারী ছেড়ে দিতে হবে।"

বৃদ্ধ ভয়ে নিরুত্তর হইল। বর্ষার দুর্দ্দিনে পরিত্যক্ত জীর্ণ ছত্রটির মত এই দুঃসময়ে মহেন্দ্রনাথের কথা যে যোগেশের মনে আসে নাই এরূপ নহে, কিন্তু তাহার সঙ্গে এতখানি কুণ্ঠা মনের ভিতর জাগিয়া উঠিতেছিল যে, তাহাতে এ চিন্তাটাকে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত বোধে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। একদিন সে যাহার কৃতিত্বকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছে, আজ তাহারই নিকট আপনার এতটা অকৃতিত্ব স্বীকার করিতে যাইতে তাহার অন্তঃকরণটা যেন বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছিল। বৃদ্ধ কর্ম্মচারীর কথায় তাহার সেই অকৃতিত্বজনিত লজ্জাটা যেন আরও প্রবল হইয়া আসিল। সুতরাং সে ক্রোধের দ্বারা সেই লজ্জাটাকে ঢাকিবার চেষ্টা করিল।

কিন্তু বৃদ্ধ যখন তাহার কথার কোন উত্তর দিল না, তখন তাহার এই মৌনভাবের মধ্যেই যেন নিজের লজ্জাটা ধরা পড়িয়াছে বলিয়া যোগেশের মনে হইল। সে তখন বৃদ্ধের মুখের উপর ক্রুদ্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া করিয়া রোষ-গম্ভীরস্বরে বলিল, "তা হ'লে কি তুমি বলতে চাও, আমার এতগুলা কর্ম্মচারী সকলেই অক্ষম, আর মহেন্দ্রবাবু একাই ক্ষমতাবান্?"

বৃদ্ধ ধীরে ধীরে বলিল, "মানুষের কাজের ভিতর দিয়েই তার ক্ষমতা প্রকাশ পায় বাবু। সে ক্ষমতাকে যেমন কিছুতেই চেপে রাখা যায় না, তেমনি রাগ বলুন, অভিমান বলুন, কোন কিছু দিয়েই সেটাকে উড়িয়ে দেওয়াও চলে না।"

যোগেশ কিয়ৎক্ষণ গম্ভীরভাবে চিন্তা করিয়া উচ্চস্বরে বলিল, "তা হ'লে তোমার পরামর্শ এই যে, আমি মহেন্দ্রবাবুকে আবার পায়ে ধরে নিয়ে আসি।"

বৃদ্ধ বলিল, "পায়ে ধরতে হবে না বাবু, আপনি একবার ডেকে পাঠালেই তিনি ছুটে আস্‌বেন।"

যোগেশ বলিল, "কিন্তু সেই ডাকার ভিতর কতখানি অপমান আছে তা জান?"

বৃদ্ধ গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিল, "তা জানি বাবু, কিন্তু যেখানে একজনের কাছে একটু অপমান স্বীকার করলে দশজনের কাছে মান থাকে, সেখানে ঐ অপমানটুকু অপমানের মধ্যেই নয়। তা ছাড়া বাপ পিতামহের সম্মানের কাছে নিজের গর্ব্বটা বজায় রাখার চেষ্টা বুদ্ধিমানের কাজ নয় বাবু।"

বৃদ্ধের কথায় যোগেশ বিরক্তিসূচক মুখভঙ্গী করিল বটে, কিন্তু সে মনে মনে বৃদ্ধের যুক্তিটাকে স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিল না। সে সারা দিনরাত এই মান অপমানের তর্কটা লইয়া মনের ভিতর নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। সকালে রমণী বাবুর নিকট প্রস্তাবটা তুলিল। শুনিয়া রমণীবাবু ইহাতে সানন্দে সম্মতিদান করিয়া বলিলেন, "যা আমরা এত মামলা মোকদ্দমা ক'রে মিটাতে পারি না, তা যদি মহেন্দ্রবাবুর মুখের কথায় মিটে যায়, তবে তার চাইতে সুখের বিষয় আর কি আছে? আমি নিজেই গিয়ে তাঁকে ডেকে আনতে প্রস্তুত আছি।"

যোগেশ কিন্তু নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত অন্যকে দিয়া করাইতে প্রস্তুত হইল না। সে স্বয়ং মহেন্দ্র-নাথের নিকট উপস্থিত হইল।

সমস্ত শুনিয়া মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমি চেষ্টা ক'রবো যোগেশ, কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হ'ব তা ব'লতে পারি না। ছোট পিঁপড়াগুলার উপর ক্রমাগত পায়ের চাপ দিলে তারা উত্ত্যক্ত হ'য়ে যখন পায়ে কামড়ে ধরে, তখন তাদের কামড় হ'তে পা'টাকে সহজে মুক্ত করা যায় না।"

যোগেশ লজ্জায় নিরুত্তর হইল। মহেন্দ্রনাথ তাহাকে আশ্বাস দিয়া বিদায় দিলেন।

পরদিন ন'পাড়া হইতে মেয়ে দেখিতে আসিবার কথা ছিল। মহেন্দ্রনাথ তাঁহাদিগকে আপাততঃ আসিতে নিষেধ করিয়া লোক পাঠাইয়া দিলেন। ভবসুন্দরী বলিলেন, "হাঁগা, এ সম্বন্ধটাও ছেড়ে দিলে; তা হ'লে মেয়ের বিয়ে হবে কি রকমে?"

মহেন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, "সম্বন্ধ অনেক পাওয়া যাবে, কিন্তু যোগেশের জমিদারী একবার গেলে আর ফিরবে না।"

ভবসুন্দরী বলিলেন,. "এই যোগেশই না তোমায় অপমান ক'রেছিল?"

মহেন্দ্রনাথ সহাস্যে উত্তর দিলেন, "এই জন্যই তার মানরক্ষা করা আগে দরকার।"

ভবসুন্দরী ঈষৎ রুষ্টস্বরে বলিলেন, "কিন্তু তোমার মান কে রক্ষা করে?"

"ভগবান্" বলিয়া মহেন্দ্রনাথ কাছারী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

রমণীবাবু যোগেশের নিকট মুখে বেশ সরলতা প্রকাশ করিলেও ভিতরে ভিতরে কূট নীতির প্রয়োগে বিরত হইলেন না। তিনি থাকিতে মহেন্দ্রনাথের দ্বারা যদি এই প্রজাবিদ্রোহের নিষ্পত্তি হইয়া যায়, তাহা হইলে যোগেশের নিকট শুধু যে তাঁহার অক্ষমতাই প্রকাশ পাইবে তাহা নহে, এই সংসারের মধ্যে পুনরায় তাহার আধিপত্য প্রবলভাবে বিস্তৃতি লাভ করিবে। সুতরাং রমণীবাবু ভিতরে ভিতরে এমন চেষ্টা করিতে লাগিলেন, যাহাতে মহেন্দ্রনাথের চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া যায় এবং যোগেশের চেষ্টাটাও শুধু নিষ্ফল হীনতা স্বীকারেই পর্য্যবসিত হয়। কিন্তু মহেন্দ্রনাথের পূর্ব্ব প্রতিপত্তি ও প্রজাপ্রীতি তাঁহার এই গুপ্ত প্রযাসকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ করিয়া দিল।

যে আসন্ন বিপদের ঘনঘটা জমিদারীর মাথার উপর ঘনাইয়া আসিয়াছিল, মহেন্দ্রনাথের আগমনে বায়ুসন্তাড়নে মেঘমালার ন্যায় তাহা কোথায় উড়িয়া গেল। যে প্রজারা জমিদারের নামে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, মহেন্দ্রনাথের আহ্বানে তাহারাই ছুটিয়া আসিয়া দেওয়ানবাবুর পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া বশ্যতা স্বীকার করিল। মামলা মোকদ্দমা সব মিটিয়া গেল, আদালতের দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া প্রজারা স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

প্রজাদের সঙ্গে গোলযোগ মিটিয়া গেল। কিন্তু ঋণশোধের উপায় কি? ঋণের অধিকাংশই বরদাবাবুর নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছিল। এদিকে যোগেশ মহেন্দ্রনাথের সাহায্য গ্রহণ করায় এবং তাঁহার চেষ্টায় গোলযোগ মিটিয়া যাওয়ায় বরদাবাবু যে যোগেশের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না ইহা মহেন্দ্রনাথ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এবং খাজনা আদায় করিয়া ঋণ শোধ করিবার পূর্ব্বেই তিনি দেনার দায়ে জমিদারীটা নীলাম করিয়া লইবেন কি না এ সম্বন্ধেও মহেন্দ্রনাথের সন্দেহ ছিল। সুতরাং বরদাবাবুর কবল হইতে যাহাতে জমিদারী রক্ষা পায়, মহেন্দ্রনাথকে সর্ব্বাগ্রে সেই চেষ্টাই করিতে হইল। তিনি যোগেশকে অনেক বুঝাইয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া জমিদারী পরিদ-র্শনে বাহির হইলেন। তাঁহারা যে যে মহালে উপস্থিত হইলেন. সেই সেই মহালের প্রজারাই তাঁহাদিগকে

সাদর অভ্যর্থনার সহিত সাধ্যমত নজর দিতে লাগিল। এই উপায়ে অল্পকালমধ্যেই বরদাবাবুর ঋণ শোধের উপযোগী অর্থ সংগ্রহ করিয়া উভয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এই পরিদর্শনে যোগেশ যে কেবল আর্থিক বিষয়ে লাভবান্ হইল তাহা নহে, সে জমিদারী সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাও অর্জ্জন করিল। সে বুঝিতে পারিল, জমিদারীর কাজ কেবল কঠোরতা দ্বারাই পরিচালিত হইতে পারে না, তাহার মধ্যে অনেকটা কোমলতা প্রদর্শনও আবশ্যক। প্রজারা মূর্খ কৃষক হইলেও তাহারা হৃদয়হীন নহে; তাহাদের রৌদ্রদগ্ধ কুৎসিত আকৃতিটার ভিতরেও যে একটা হৃদয় আছে, সামান্য সহানুভূতি বা সদ্ব্যবহারের স্পর্শেই তাহা হিমশিলার ন্যায় বিগলিত হইয়া অনেক শিক্ষাভিমানী আভিজাত্য গর্ব্বে গর্ব্বিত ব্যক্তিকেও লজ্জা দিতে পারে। প্রজাদের সম্বন্ধে একটা নূতন ধারণা লইয়া যোগেশ ঘরে ফিরিল।

এই সঙ্গে যোগেশ মহেন্দ্রনাথকে চিনিবারও মস্ত সুযোগ পাইল। মহেন্দ্রনাথের কথা সে পূর্ব্বে অনেক শুনিয়াছিল, কিন্তু তাঁহাকে চিনিবার এমন সুযোগ হয় নাই। অপমানের এমন তীব্র বেদনা, আশাভঙ্গের এত মনস্তাপ বিস্মৃত হইয়া, অবমাননার প্রতিশোধ গ্রহণের এমন সুবর্ণ সুযোগকে উপেক্ষা করিয়া যে অকুণ্ঠিতচিত্তে বিপদে এতটা সাহায্য করিতে পারে, সেই লোকটার চরিত্রের মধ্যে যে কতখানি সরলতা থাকিতে পারে তাহা অনুমানেও স্থির করা যায় না। অবস্থার নিকষে পরীক্ষিত হইয়া মহেন্দ্রনাথের মনুষ্যত্বটা যোগেশের নিকট যেন অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে মনুষ্যত্বের ঔজ্জ্বল্যে যোগেশ মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিল না। মহেন্দ্রনাথের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

মহেন্দ্রনাথ কিন্তু তাহাকে এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অবসর দিলেন না। মহাল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মহেন্দ্রনাথ সেই যে বাড়ী গেলেন আর কাছারীতে আসিলেন না। যোগেশ দুই তিন দিন লোক পাঠাইল। কিন্তু মহেন্দ্রনাথ আসিলেন না; প্রেরিত লোক ফিরিয়া আসিয়া কোন দিন সংবাদ দিল, তাঁহার শরীর অসুস্থ, কোন দিন জানাইল, তিনি বাড়ীতে নাই, পাত্র অন্বেষণে গিয়াছেন। এ সংবাদে যোগেশ একটু ক্ষুব্ধ হইল।

অবশেষে যোগেশ একদিন স্বয়ং মহেন্দ্রনাথের বাটীতে উপস্থিত হইল। মহেন্দ্রনাথ সে দিন বাড়ীতেই ছিলেন। তিনি সমাদরের সহিত যোগেশকে বসাইলেন; বলিলেন, "শরীরটা বেশ ভাল ছিল না, বিশেষ মেয়েটার বিয়ের চেষ্টায় ব্যস্ত থাকায় দেখা কত্তে পারি না যোগেশ, সেজন্য কিছু মনে ক'রো না।"

যোগেশ জিজ্ঞাসা করিল, "বিবাহ সম্বন্ধ কোথাও স্থির হ'লো?"

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "স্থির কিছু হয় নি। ন'পাড়ার সম্বন্ধটা নিজেই ছেড়ে দিয়েছিলাম। এখন ক'দিন ঘুরে একটি ছেলে দেখে এসেছি। থার্ড ক্লাস পর্য্যন্ত প'ড়েছে, বাপ নাই, মা আছে, জমিজায়গা যৎসামান্য, তাই শ' তিনেক টাকা নগদ দিতে হবে।"

যোগেশ নীরবে নতমস্তকে বসিয়া শুনিতে লাগিল। মহেন্দ্রনাথ একটু থামিয়া বলিলেন, আজকালকার যেমন ফ্যাসান, ছেলে নিজে মেয়ে দেখে পছন্দ ক'রে বিয়ে ক'রবে। এখন জগদম্বার ইচ্ছায় পছন্দটা হ'য়ে গেলে হয়। তার পর ঘর ভিটে বেচে বা বন্ধক দিয়ে যেমন ক'রে হোক, দায় হ'তে উদ্ধার হ'তেই হবে। উঃ, দিন দিন আমাদের সমাজটা কি হ'য়ে উঠলো যোগেশ?"

বলিয়া তিনি যোগেশের মুখের দিকে চাহিলেন। যোগেশ একবার দৃষ্টি উন্নমিত করিয়াই পুনরায় মুখ নীচু করিল। মহেন্দ্রনাথ আপন মনে বলিতে লাগিলেন, "সমাজেরই বা দোষ দিই কেন বল, সমাজ তো আমাদেরি পাঁচজনকে নিয়ে। অথচ ছেলের বিয়ে দেবার সময় মেয়ের বিয়ের এই কষ্টটা আমাদের একটুও মনে থাকে না। বেশ বুঝে দেখলে মনে হয় যোগেশ, কন্যাদায়টা আমাদের স্বকৃত পাপের ফল। এই পাপের ফলে মেয়ের বিয়ের আনন্দটা আমাদের পক্ষে একটা নিদারুণ অভিসম্পাত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।"

বলিয়া মহেন্দ্রনাথ একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। যোগেশ অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া যোগেশ ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার শরীর বেশ সেরেছে?"

মহেন্দ্রনাথ একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিলেন, "শরীর? আমাদের শরীরের কথা ছেড়ে দাও। আমাদের সামান্য সুখ অসুখে কি কাজ বন্ধ হয়?"

যোগেশ বলিল, "তা হ'লে কবে হ'তে কাজে যাচ্চেন?"

একটু বিস্ময়ের সহিত মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কাজে! আর কি কাজে যাব? কাজ তো একরকম মিটিয়ে এসেছি। বাকী যা আছে—আদায় উশুল, তা রমণীবাবুর দ্বারাই তো হ'তে পারবে।"

যোগেশ। তা হ'তে পারবে। কিন্তু তার ভিতরেও কি আপনার যাবার প্রয়োজন নাই?

মহেন্দ্র। কিছুমাত্র না।

যোগেশ। তবে গিয়েছিলেন কেন?

মহেন্দ্র। সে শুধু গোবিন্দবাবুর ছেলের মানরক্ষার জন্য। চাকরী আর ক'রবো না যোগেশ। করলেও জমিদারী সেরেস্তায় চাকরী আর নয়।

যোগেশের মুখখানা যেন একটা তীব্র অপমানের কশাঘাতে লাল হইয়া উঠিল, ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল। সে গম্ভীরভাবে নীরবে বসিয়া হাতের ছড়িটা মাটীতে ঠুকিতে লাগিল।

মহেন্দ্রনাথ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "আমি প্রতিজ্ঞা ক'রেছি যোগেশ, জমিদারী সেরেস্তায় চাকরী আর করবো না।"

যোগেশ বসিয়াছিল, তীরবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল; তীব্র অভিমানক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল, "আমার জমিদারী বিকিয়ে গেলেও নয়।"

বলিয়াই সে দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিল। মহেন্দ্রনাথ তাহার এই আকস্মিক ক্রোধের কারণটা বুঝিতে না পারিয়া হতবুদ্ধির ন্যায় বসিয়া রহিলেন।

বাড়ীর ভিতর গেলে ভবসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কে এসেছিল গা?"

গৃহিণীর অনভিজ্ঞতায় যেন একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মহেন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন, "ওকে চেন না? ও যে যোগেশ।"

ভবসুন্দরী বলিলেন, "ঐ যোগেশ?"

ঈষৎ হাসিয়া মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "হাঁ হাঁ, ঐ যোগেশ, তোমার হবু—"

একটা জোর দীর্ঘশ্বাস আসিয়া কথাটা শেষ হইতে দিল না। হঠাৎ কথাটা বলিয়া ফেলিয়া মহেন্দ্রনাথ যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন। ভবসুন্দরীও তাহা বুঝিলেন। তিনি ম্লানমুখে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন এসেছিল?"

"চাকরীর জন্য অনুরোধ কত্তে।"

"আবার ওখানে চাকরী!"

"বড়লোকেরা মনে করে কি জান, গরীবদের মান অপমান ব'লে কিছুই নাই। এক অভাবের নির্য্যাতনই তাদের সকল নির্য্যাতনের চাইতে বড়।"

"কেন, গরীবরা কি মানুষ নয়?"

"অন্ততঃ বড়লোকদের ধারণা তাই।"

নাসাগ্র কুঞ্চিত করিয়া ভবসুন্দরী বলিলেন, "বড়লোকের ধারণা বড় লোকদেরই থাক্। এখন মেয়েকে দেখতে আসবে কবে?"

"কাল আসবার কথা আছে।"

"তা হ'লে তার উদ্যোগ আয়োজন তো কত্তে হবে।"

উপেক্ষাসূচক মুখভঙ্গী করিয়া মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ভারী তো বিয়ে, তার আবার মেয়ে দেখার উদ্যোগ আয়োজন!"

যেন নিতান্ত আশ্চর্য্যান্বিতভাবে ভবসুন্দরী বলিলেন, "অবাক্ করলে! বিয়ের আবার ভারী হাল্‌কা কি গা? মেয়ের বিয়ে তো বটে।"

গৃহিণীর মুখের দিকে ম্লানদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মহেন্দ্রনাথ নিরুত্তরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ভবসুন্দরী তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি এতটা কাতর হ'চ্চো কেন বল দেখি?"

বিষাদগম্ভীরস্বরে মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "যোগেশের পাশে এই ছেলেকে দাঁড় করিয়ে দেখলে তুমিও আমার চাইতে কাতর হ'য়ে পড়বে বড় বৌ।"

এ কথায় ভবসুন্দরীর মুখখানাও যে ম্লান হইয়া আসিল না এমন নয়, কিন্তু তিনি সেই ম্লানমুখে যতটা সম্ভব উৎসাহের প্রফুল্লতা আনিয়া সান্ত্বনার স্বরে ব'লিলেন, "তা হোক, সকলেই কি আর জমিদারের ঘরে মেয়ে দিতে পারে? বরাতে থাকে, ঐতেই মেয়ে সুখী হবে।"

মহেন্দ্রনাথ গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, "হুঁ।"

ভবসুন্দরী বলিলেন, "আমার বাবা যখন তোমার হাতে মেয়ে দিয়েছিলেন, তখন তোমার কি অবস্থা ছিল বল দেখি?"

বলিয়া তিনি একটু হাসিলেন। মহেন্দ্রনাথও ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তখন খুব গরীব দেখেই দিয়েছিলেন বটে, এখন তুমি রাজরাণী হ'য়েছ।"

গ্রীবা উন্নত করিয়া ভবসুন্দরী স্থিরগম্ভীরস্বরে বলিলেন, "আমি আশীর্ব্বাদ করি, আমার মেয়ে যেন আমার মতই শুধু স্বামিগর্ব্বে রাজরাণীকে পরাস্ত কত্তে পারে।"

গৃহিণীর গর্ব্বপ্রফুল্ল মুখের দিকে সহাস্য দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তোমার দেখছি এই অহঙ্কারটাই বড্ড হ'য়েছে। তোমার এ দেমাক ভাঙ্গচি থাম।"

বলিয়া মহেন্দ্রনাথ হাসিয়া উঠিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

যোগেশ যতটা কৃতজ্ঞতা লইয়া মহেন্দ্রনাথের নিকট আসিয়াছিল, ততোধিক ক্রোধ ও বিরক্তি লইয়া সে প্রত্যাবর্তন করিল। ছি ছি, একজন কর্ম্মচারী মাত্র, তাহার নিকট এতটা হীনতা প্রকাশ করিয়া যে এমন নিদারুণ অবজ্ঞা, এমন কঠোর প্রত্যাখ্যান লাভ করিল ? এই অহঙ্কারী লোকটার মধ্যেই সে না একটা অলৌকিক মহত্ত্ব, অসামান্য মনুষ্যত্ব সন্দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল ? কি নির্ব্বোধ সে! রমণীবাবু ইহা শুনিলে, কাকাবাবু ইহা জানিতে পারিলে কি মনে করিবেন! তাঁহাদের নিকট সে যে লজ্জায় মাথা তুলিতে পারিবে না। একটা গভীর অনুশোচনায় যোগেশের অন্তঃকরণটা যেন জ্বলিয়া উঠিল। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, এই অপমানের প্রতিশোধ লইয়া যদি উহার অহঙ্কার চূর্ণ করিতে না পারি, তবে আমি গোবিন্দ চৌধুরীর ছেলেই নয়।

রমণীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহেন্দ্রবাবুর নামে যে মামলা রুজু করা হ'য়েছে, সেটা তা হ'লে তুলে নেব ?"

যোগেশ বলিল, "কেন ?"

এ প্রশ্নের উত্তর রমণীবাবু সহসা দিতে পারিলেন না, তিনি একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। গম্ভীরস্বরে যোগেশ বলিল, "মামলার ভাল রকম তদ্বির ক'রে যাতে টাকাটা আদায় হয় তার চেষ্টা দেখুন। দাবীর পাই-পয়সাটি পর্য্যন্ত আদায় হওয়া চাই।"

রমণীবাবু ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেও টাকা আদায় সম্বন্ধে প্রভুকে আশ্বাস দিতে ভুলিলেন না। তাঁহাকে বিদায় দিয়া যোগেশ অধীরভাবে কক্ষমধ্যে পদচারণা করিতে লাগিলেন। একবার মনে হইল, কাজটা বুঝি ভাল হইল না। বিপদের সময় যে সকল কাজ ফেলিয়া সাহায্য করিতে ছুটিয়া আসিয়াছে, যাহার সাহায্য না পাইলে এই বিপদ্ চরম বিপদে পরিণত হইত, এই সামান্য কয়টা টাকার জন্য তাহাকে এরূপে বিপন্ন করা উচিত ? কিন্তু সে তো স্বেচ্ছায় এই অনুচিত কাজ করিতে যায় নাই, মহেন্দ্রনাথ নিজেই তাহাকে ইহা করিতে বাধ্য করিয়াছে। সে গিয়াছিল উপকারের প্রতিদান দিতে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে, কিন্তু মহেন্দ্রনাথের অতিরিক্ত অহঙ্কারই শেষে তাহাকে অকৃতজ্ঞ করিয়া তুলিল। তাহার দোষ কি ?

দোষ কিছু নাই স্থির' করিলেও যোগেশ কিন্তু মনের ভিতর বেশ স্বচ্ছন্দতা বোধ করিতে পারিল না। যেন কোথা হইতে একটা তীব্র গ্লানি আসিয়া মনটাকে অস্থির করিয়া তুলিল। ঘরে থাকিতে আর ভাল লাগিল না; বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া বরদাবাবুর বাটীর উদ্দেশে বাহির হইল।

বরদাবাবু বাড়ীর বাহিরে ছিলেন; তিনি যোগেশকে দেখিয়া সহাস্যে বলিয়া উঠিলেন, "এই যে যোগেশ। অনিলবাবু কাল হ'তে এসে তোমায় খুঁজছে। সকালে চাকর পাঠিয়েছিলাম, সে ফিরে এসে বললে, তুমি বাড়ীতে নাই। কোথায় গিয়েছিলে ? কোন মহলে নাকি ?"

যোগেশ নতমুখে ইতস্ততঃ সহকারে উত্তর দিল, "না। একবার ঐ দিকে—"

বরদাবাবু বলিলেন, "পরেশ বলছিল, তুমি গোঁসাইচকের দিক্ হ'তে ফিরে আসছো। মহেন্দ্রের কাছে গিয়েছিলে বুঝি ?"

আমতা আমতা করিয়া যোগেশ বলিল, "হাঁ—না, তবে ঐ দিকে গিয়েছিলাম, তাই—"

বরদাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহেন্দ্রবাবু আবার কাজ কচ্চেন নাকি ?"

যোগেশ উত্তর করিল, "না"।

গম্ভীরভাবে মস্তক-সঞ্চালনপূর্ব্বক বরদাবাবু বলিলেন, "লোকটা কাজের লোক বটে, তা কাজে বাহাল করলে না কেন ?"

যোগেশ। তিনি চাকরী আর করবেন না।

বরদা। তবে করবেন কি ? ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট ওঁর তরে গবর্ণর জেনারেলের পদটা স্থির ক'রে রেখেছেন নাকি ? না, সেটাও তো চাকরী।

বলিয়া বরদাবাবু একটু শ্লেষের হাসি হাসিলেন। যোগেশ নিরুত্তরে রহিল। বরদাবাবু বলিলেন, "আসল কথাটা কি জান, চাকরী ক'রবার ওর দরকার নাই। অত বড় বাড়ী একখানা ক'রে নিয়েছে, হাতে নগদও কোন্ না কিছু ক'রেছে। দাদা তো ছিলেন সেই সদাশিব। বুঝতেই তো পাচ্চো।"

বলিয়া তিনি যোগেশের মুখের উপর অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। যোগেশের যেন বড় বিরক্তি বোধ হইল; সে অন্যদিকে মুখ রাখিয়া ছড়ির আগা দিয়া মাটী খুঁড়িতে লাগিল। বরদাবাবু আর কিছু না বলিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন।

চাকরে চা দিয়া গেল। চা খাইতে খাইতে বরদাবাবু বলিলেন, "অনিলের যে আবার মত ফিরে গিয়েছে হে।"

যোগেশ চকিতে চায়ের বাটি হইতে মুখ তুলিয়া তাঁহার দিকে চাহিল। বরদাবাবু সহাস্যে বলিলেন, "কে এক বিলেত-ফেরৎ ব্যারিষ্টার একটা ফিরিঙ্গী মাগীর সঙ্গে জুটে স্ত্রীকে তাড়িয়ে দিয়েছে; তাই শুনে বিলেত-ফেরৎদের উপর ভারী চটে গিয়েছে।"

ঈষৎ হাসিয়া যোগেশ বলিল, "একজনের দোষে সমগ্র সম্প্রদায়কে দোষী করা ঠিক নয়।"

বরদাবাবু বলিলেন, "সে কথা ঠিক, কিন্তু অনিলের ধারণা ছিল কি জান, হিন্দু গৃহস্থের ঘরে মেয়েরা স্বামীর কাছে যে রকম অসৎ ব্যবহার পায়, ওদের সমাজে তা পায় না। কিন্তু এখন বুঝতে পেরেছে যে, সৎ অসৎ সকল সমাজেই আছে।"

যোগেশ নিরুত্তরে বাটির চা টুকু গলায় ঢালিয়া দিয়া বাটিটা সরাইয়া রাখিল। বরদাবাবু একটা চুরুট ধরাইয়া তাহাতে টান দিতে দিতে বলিলেন, "এখন পাত্র অনুসন্ধানের ভার আমাকেই নিতে হ'য়েছে। তা তেমন পাত্রের অভাব নাই। কিন্তু ওর একটা বড় মুস্কিলের সর্ত্ত আছে।"

কৌতূহলান্বিত ভাবে যোগেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম সর্ত্ত?"

বরদাবাবু বলিলেন, "বেশ শিক্ষিত সচ্চরিত্র রূপবান্ ধনবান্ পাত্র চাই, অথচ সে একটি পয়সা নেবে না।"

চিন্তাগম্ভীর মুখে যোগেশ বলিল, "এ রকম পাত্র পাওয়া সুকঠিন।"

বরদাবাবু বলিলেন, "সুকঠিন কেন, আকাশ-কুসুমের মতই দুর্লভ। কিন্তু ও বলে কি জান, যারা টাকা নেয়, তারা শুধু টাকার লোভেই বিবাহ করে, কাজেই মেয়ের উপর তাদের দরদ থাকে না। কিন্তু আমি চাই, যে শুধু স্ত্রীর জন্যই বিবাহ কত্তে চায়। অর্থাৎ যে শুধু মেয়ের রূপগুণ দেখে তাকে গ্রহণ করবে, তার কাছে মেয়ের অনাদর হবে না।"

যোগেশ বলিল, "সে কথা ঠিক।"

বরদাবাবু মুখ হইতে চুরুটটা সরাইয়া একটু উত্তেজিতভাবে বলিলেন, "ঠিক তো বটে, কিন্তু এ রকম আকাশ-কুসুম পাওয়া যায় কোথায়? শিক্ষিত সচ্চরিত্র ধনবান্, অথচ এক পয়সা নেবে না, এটা কি অসম্ভব কল্পনা নয় যোগেশ?"

যোগেশ নিরুত্তরে বসিয়া এক টুকরা কাগজ লইয়া পাকাইতে লাগিল। বরদাবাবু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এ রকম ছেলে যোগাড় ক'রে দিতে পার?"

যোগেশ সহাস্যমুখে ধীরে ধীরে উত্তর করিল, "চেষ্টা দেখতে পারি।"

জোরে মাথাটা নাড়িয়া বরদাবাবু দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "যতই চেষ্টা দেখ যোগেশ, আমি প্রতিজ্ঞা ক'রে বলতে পারি, এ রকম ছেলে কক্ষণো পাবে না।"

মৃদু হাসিয়া যোগেশ বলিল, "যদি পাওয়া যায়?"

বরদাবাবু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সহাস্যে বলিলেন, "পাওয়া যেতে পারে, যদি তুমি নিজে—"

যোগেশ লজ্জারক্ত মুখখানা তাড়াতাড়ি দরজার দিকে ফিরাইয়া লইল। কিন্তু সেখানে যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার আরক্ত মুখখানা অতিমাত্র লজ্জায় সিন্দুরের মত লাল হইয়া উঠিল। দেখিল, দরজার উপর লীলা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

যোগেশকে দেখিয়া লীলার মুখখানা লাল হইয়া আসিল। সে ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত পদে প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্যোগ করিল। তাহাকে ফিরিতে দেখিয়া বরদাবাবু ডাকিলেন, "লিলি!"

লীলাকে ফিরিয়া দাঁড়াইতে হইল। বরদাবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, "চলে যাস্ যে? শোন্।"

নতমস্তকে লজ্জাজড়িত পদে লীলা ধীরে ধীরে আসিয়া মাতুলের পাশে দাঁড়াইল। বরদাবাবু তাহার একখানা হাত নিজের হাতের উপর রাখিয়া সহাস্যে বলিলেন, "ও বেলা কি বলেছিস্ মনে আছে?"

মৃদু হাসিয়া লীলা বলিল, "কি?"

বরদাবাবু বলিলেন, "এ বেলা চা খাবার সময় নূতন গানটা শুনিয়ে দেবার কথা আছে না?"

লীলা আরক্ত মুখখানা তুলিয়া মাতুলের দিকে কৃত্রিম কোপপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। বরদাবাবু হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "তা বাছা, রাগই কর আর যাই কর, মোদ্দা গানটি না শুনে ছাড়চি না।"

বলিয়া তিনি যোগেশের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "বড় চমৎকার গানটি হে। কি বেশ 'মর্ম্ম মুছায়ে'। না লিলি, গানটা তোকে শোনাতেই হবে।"

লীলা মেঝের উপর দৃষ্টি রাখিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। যোগেশ এবার তাহার দিকে অপাঙ্গে চাহিয়া বলিল, "তা আমি না হয় উঠি।"

বরদাবাবু বলিলেন, "ঐ শোন, যোগেশ রাগ ক'রে উঠে যেতে চাইচে। সেটা ভাল হবে কি? এখন আস্তে আস্তে লক্ষ্মী মেয়েটির মত গানটা শুনিয়ে দাও।"

অগত্যা লীলাকে ধীরে ধীরে গিয়া হার্ম্মোনিয়মের কাছে বসিতে হইল। সে হার্ম্মোনিয়মের চাবি টানিয়া, বেলোয় চাপ দিয়া পর্দ্দায় অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে হঠাৎ থামিয়া বলিল, "এখনও বেশ কায়দা হয় নি"

বরদাবাবু বলিলেন, "দেখ বাছা, এমন যদি ফাঁকি দেবার চেষ্টা করবে, তা হ'লে ভাল হবে না বলছি। তা হ'লে আমিও এমন দজ্জাল শাশুড়ীর যোগাড় দেখব—"

লীলা জোরে জোরে পর্দ্দা টিপিতে লাগিল, এবং কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া মৃদুমন্দস্বরে গান ধ'রিল—

"তুমি নির্ম্মল কর মঙ্গল করে মলিন মর্ম্ম মুছায়ে।
তব পুণ্য কিরণে দিয়ে যাক্ মোর মোহ কালিমা
ঘুচায়ে।"

পশ্চিমের খোলা জানালা দিয়া গোধূলির রক্তরাগ আসিয়া ঘরখানাকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল; ফাল্গুনের পাগল বাতাস ফুটন্ত জুঁই ফুলের গন্ধ লইয়া ঘরের ভিতর ছুটাছুটি করিতেছিল; বিহঙ্গের কলতানে সান্ধ্যপ্রকৃতি মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। স্নিগ্ধ-মধুর কণ্ঠে সে সকলকে ছাপাইয়া লালা গাহিতে লাগিল—

"লক্ষ্যশূন্য লক্ষ বাসনা ছুটিছে গভীর আঁধারে,
কে জানে কখন্
ডুবে যাবে কোন্
অকূল-গরল পাথারে।"

——

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

মনের ভিতর মোহের একটা উচ্ছ্বাস লইয়া যোগেশ যখন ঘরে ফিরিল, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। বৈঠকখানার উপরের ঘরেই সে ইদানীং থাকিত। বাড়ীর ভিতর বড় একটা যাইত না, যাইবার প্রয়োজনও হইত না।

চাকরে আলো জ্বালিয়া দিয়া গেল। যোগেশ বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া একখানা চৌকী টানিয়া লইয়া বসিল। একটু পরে রমণীবাবু কতকগুলা কাগজ লইয়া উপস্থিত হইলেন। যোগেশ কাগজগুলার দিকে সভয় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "আজ আমাকে রেহাই দেন রমণীবাবু, কাল সকালে কাগজ-পত্র সব দেখবো।"

ঈষৎ হাসিয়া রমণীবাবু বলিলেন, "একখানা কিন্তু জরুরি কাগজ আছে।

যোগেশ বলিল, "শুধু সই দিলে চলবে?"

"তাই দিন" বলিয়া রমণীবাবু টেবিলের উপর হইতে দোয়াত, কলম আনিয়া একখানা বৃহৎ হিসাবের কাগজ তাহার সম্মুখে ধরিলেন। যোগেশের মনটা তখন এই পৃথিবী ছাড়িয়া আর এক নবীন জগতে বিচরণ করিতেছিল। হিসাব নিকাশের বা টাকার অঙ্কের প্রতি মনোযোগ দিবার অবসর বা প্রবৃত্তি আদৌ ছিল না। সুতরাং সে তাড়াতাড়ি সই করিয়া কাগজখানা রমণীবাবুর হাতে ফিরাইয়া দিল। রমণীবাবু সেখানা ভাঁজ করিয়া পকেটে রাখিতে রাখিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার শরীর অসুস্থ কি?"

"না" বলিয়াই যোগেশ মুখ ফিরাইয়া লইল। রমণীবাবু ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। যোগেশ ভাবিল, লোকগুলা কি নির্ম্মম! ইহারা শুধু কাজের কঠোরতার মধ্যেই মানুষকে আকণ্ঠ ডুবাইয়া রাখিতে চায়। কিন্তু তাহাতে প্রাণটা হাঁপাইয়া উঠিয়া যে একটু ফাঁকা বাতাসে আরামের নিশ্বাস ফেলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে, ইহা কেহ বুঝে না, বুঝিলেও সেটুকু অবসর দিবার মত সহানুভূতি বা প্রবৃত্তি ইহাদের নাই। ছি ছি, জগৎটা কি স্বার্থপর!

যোগেশ উঠিয়া বারান্দায় আসিয়া বসিল। তখন আকাশের মাঝখানে শুক্লাষ্টমীর চাঁদ হাসিতেছিল। তরল জ্যোৎস্নার প্লাবনে পৃথিবী প্লাবিত হইয়াছিল। বৈঠকখানার সম্মুখে বাগানে কতকগুলা বেল, গন্ধরাজ ফুটিয়াছিল; তাহদের মিষ্ট গন্ধে বারান্দা ভরিয়া উঠিয়াছিল। জ্যোৎস্না-সাগর কম্পিত করিয়া আকুল সুরে সঙ্গিনীকে আহ্বান করিতেছিল। বহুদূর হইতে আর একটা কোকিল তাহার আকুল আহ্বানের প্রতিধ্বনি তুলিতেছিল। কাছারীর সম্মুখের পথ দিয়া কে গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল—

"এমন যামিনী মধুর চাঁদিনী,
সে যদি গো শুধু আসিতো।"

জ্যোৎস্না-বিহ্বলা প্রকৃতির দিকে চাহিয়া যোগেশ নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। তাহার প্রাণের মধ্যে যে একটা অভিনব পুলকোচ্ছ্বাস উত্থিত হইয়া সমগ্র অন্তরটাকে অভিভূত করিয়া দিতেছিল, প্রকৃতির মধ্যেও যেন সেই পুলকের উচ্ছ্বাস সে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে লাগিল।

এমন সময়ে ভৃত্য আসিয়া জানাইল, গোপাল ঠাকুর দেখা করিতে আসিয়াছেন। যোগেশ ভৃত্যের দিকে চাহিয়া ভ্রূ-কুঞ্চিত করিল। ভৃত্য বলিল, "ঠাকুরমশাই সাঁঝ হ'তে এসে ব'সে আছেন।"

বিরক্তভাবে যোগেশ জিজ্ঞাসা করিল, "তাঁর কি দরকার ?"

ভৃত্য দরকারের কথা জানিত না, সুতরাং সে ভয়ে ভয়ে প্রস্থানোদ্যত হইল। যোগেশ বলিল, "বসতে বল্, যাচ্ছি।"

ভৃত্য চলিয়া গেল। যোগেশ নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত উঠিয়া নীচে চলিল।

এখানে গোপাল ঠাকুরের একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। গোপাল ঠাকুর ওরফে গোপাল চক্রবর্ত্তী আগে বরদাবাবুর মাতুলের অধীনে গোমস্তাগিরি করিতেন। তাঁহার গোমস্তাগিরির একটু বিশেষত্ব ছিল। তিনি জমিদারের সাধারণ কর্ম্মচারীদের ন্যায় প্রজাপীড়ক ছিলেন না, কেন না তিনি নিজ মুখেই বেশ দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করিতেন, প্রজাপীড়ন মহাপাপ ; গরীব প্রজাদের দুই পয়সা প্রতারণা বা জোর করিয়া আত্মসাৎ করিলে তাহা কখন ভোগে আসে না। তাঁহার সুদীর্ঘ শিখা, শুভ্র যজ্ঞোপবীতগুচ্ছ এবং মুখে সর্ব্বদা ধর্ম্মের মহিমা-কীর্ত্তন দর্শনে ও শ্রবণে কোন প্রজাই তাঁহার এই উক্তিতে অবিশ্বাস করিতে পারিত না। তাহারা অনেক সময় খাজনা জমা দিয়া দাখিলা না লইয়াই নিশ্চিন্তচিত্তে প্রস্থান করিত। শেষে দুই মাস পরে গোমস্তা মহাশয় নিজে তাহাদিগকে ডাকিয়া দাখিলা কাটিয়া দিতেন। সে দাখিলার হিসাবের সহিত তাহাদের প্রদত্ত জমার টাকার কতক গরমিল হইলেও প্রজাদিগকে সেটা আপনাদেরই হিসাবের ভুল বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হইত। কেন না পরম ধার্ম্মিক নির্লোভ গোমস্তা মহাশয় কখন তাহাদের এক পয়সা প্রবঞ্চনা করিয়া লইতে পারেন না।

গোপাল ঠাকুর শুধু প্রজাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করিয়াই আপনার কর্ত্তব্য শেষ করিতেন না ; তাহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধেও সচেষ্ট হইতেন। তিনি প্রায়ই সন্ধ্যার পর তাহাদের মধ্যে বসিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের বঙ্গানুবাদ, চৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি পাঠ করিতেন, এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহাদিগকে নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিতেন।

তাঁহার এই উপদেশের মর্ম্ম সকলেই যে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত তাহা নহে, তথাপি তাঁহার প্রতি মৌখিক ভক্তি প্রদর্শনে কেহই ত্রুটী করিত না। এইরূপে প্রজাদের ভক্তি ও অর্থ কুড়াইয়া গোপাল ঠাকুর প্রায় পাঁচ বৎসর কাল গোমস্তার পদ উজ্জ্বল করিয়া রাখিলেন।

কিন্তু তাহার পর যাহা ঘটিল, তাহা অতি শোচনীয়। গোপাল ঠাকুর পুরুষ মহল হইতে ক্রমে স্ত্রী-মহলে ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করিলেন। বিশেষতঃ হতভাগিনী বিধবাদের উদ্ধারের জন্যই তিনি বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এই ব্যস্ততার ফলে চরণ বৈরাগীর ঘরে কর্ত্তা-ভজার দল প্রতিষ্ঠিত হইল। গোপাল ঠাকুর তাহার গুরুপদে বৃত হইলেন। প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় সেখানে গ্রামের ইতর-ভদ্র রমণী-মণ্ডলী সমবেত হইয়া কর্ত্তাগুরুর মুখ-নিঃসৃত উপদেশামৃত পানে কৃতার্থতা লাভ করিত। কিন্তু ধর্ম্মপথে বিঘ্ন অনেক। গ্রামের সন্দিগ্ধমনা দুষ্টপ্রকৃতির লোকেরা জল্পনা করিতে লাগিল যে, এই সাধনাস্থানে উপদেশ দান ও শ্রবণ ব্যতীত রাসলীলা, বস্ত্রহরণ লীলা প্রভৃতি কৃষ্ণলীলার প্রত্যক্ষ অভিনয় হইয়া থাকে।

পরিশেষে এইরূপ দুষ্টবুদ্ধি কতকগুলি লোক একদা শুক্রবারের রাত্রিতে চরণ বৈরাগীর মৃন্ময় প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক সাধনস্থলে উপস্থিত হইয়া যখন বস্ত্র-হরণ লীলার প্রত্যক্ষ অভিনয় সন্দর্শন করিল, তখন সেই অসভ্য ও সদসদ্-বিবেকরহিত কৃষকের দল গোপীরূপিণী অবলাদিগের বস্ত্রহরণকারী শ্রীকৃষ্ণরূপী গোপাল ঠাকুরকে টানিয়া এমনভাবে সম্বর্দ্ধনা করিল যে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে অতি বড় শত্রু কংস বা তাহার অনুচরের হস্তেও কখন এরূপ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় নাই।

এই সম্বর্দ্ধনার ফলে গোপাল ঠাকুরকে সাতদিন শয্যাগত হইয়া থাকিতে হইল। তারপর অনেক চিকিৎসা সত্ত্বেও তদীয় দক্ষিণ চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত এবং বামপদটি ঈষৎ খঞ্জ হইয়া গেল। ইহাতে গোপাল ঠাকুরের মনে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল ; তিনি মূর্খ প্রজাগণের সহিত সংস্রব ত্যাগ করিবার অভিপ্রায়ে চাকরীতে ইস্তফা দিলেন।

চাকরী পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে গোপাল ঠাকুর বিলাস-বাসনা বর্জ্জন করিয়া নামাবলী স্কন্ধে লইলেন, এবং ত্রিসন্ধ্যা ও পূজা জপে দিনের সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন। গ্রামান্তরে কয়েক ঘর পৈতৃক শিষ্য ছিল। তাহাদিগকে দীক্ষা দিয়া তাহাদের কুলগুরুর পদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

কিন্তু সংসারকে ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইলেই যদি তাহাকে ত্যাগ করা যাইত, তাহা হইলে সংসারের অর্দ্ধাধিক লোক এতদিন ডোর কৌপীন গ্রহণপূর্ব্বক বিধাতার সৃষ্টির উত্তমকে নিষ্ফল করিয়া দিত। কিন্তু তাহা হইবার নহে। এই জন্যই বোধ হয় ভগবান্

স্বয়ং বলিয়াছেন—নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্য-কর্ম্মকৃৎ। অর্থাৎ কর্ম্ম না করিয়া কেহ ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। সুতরাং নির্ব্বেদপরায়ণ গোপাল ঠাকুরকেও সংসারের নিয়ম মানিয়া চলিতে হইল।

তিনি মনিবের চাকরী ছাড়িলেও মনিব কিন্তু তাঁহাকে ছাড়িলেন না। কারণ মোকদ্দমার তদ্বির করিতে ও সাক্ষ্য দিতে তাঁহার ন্যায় নিপুণ ব্যক্তি সে প্রদেশে দ্বিতীয় ছিল না বলিলেই হয়। সুতরাং মামলা মোকদ্দমা উপস্থিত হইলেই মনিবের নিকট হইতে সর্ব্বাগ্রে গোপাল ঠাকুরের ডাক পড়িত। গোপাল ঠাকুরও তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া ভূতপূর্ব্ব প্রভুর অবমাননা করিতে পারিতেন না। ইহাতে দুইটা কাজই সিদ্ধ হইত; মনিবও সন্তুষ্ট হইতেন, আর সাংসারিক অসচ্ছলতার জন্য অর্থচিন্তায় নিজের জপতপের বিঘ্নও হইত না।

সন্ধ্যা আহ্নিক ও জপতপেই দিনরাত্রির সমস্ত সময়টা ব্যয়িত হইত না। যে সময়টুকু অবশিষ্ট থাকিত, সেটাকে বৃথা ব্যয় না করিয়া পরোপকারেই বিনিয়োগ করিতেন। আবার তাহাতেও ঐহিক উপকার অপেক্ষা পারত্রিক উপকারের দিকেই সবিশেষ লক্ষ্য ছিল। ঐহিক উপকার কতক্ষণ স্থায়ী? কিন্তু পারত্রিক যাহা, তাহা অক্ষয় অবিনশ্বর। সুতরাং লোকের যাহাতে ধর্ম্ম বজায় থাকে, সেইদিকেই তিনি সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। কাহার কোথায় ধর্ম্মহানি হইতেছে, কোথায় কোন্ ছিদ্র দিয়া অধর্ম্মটা প্রবেশ করিবার সুযোগ পাইয়াছে, গম্ভীর মনোযোগসহকারে গোপাল ঠাকুর সর্ব্বদা ইহাই দেখিয়া বেড়াইতেন এবং যাহাকে এ বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও অমনোযোগী দেখিতেন, তাহাকেই অমনোযোগী ছাত্রের উপর গুরুমহাশয়ের ন্যায় বার বার সাবধান করিয়া দিতেন।

এতাদৃশ ধার্ম্মিক গোপাল ঠাকুর মহেন্দ্রনাথের ধর্ম্মহানি দর্শনে নিতান্ত ব্যথিত হইলেন এবং অরক্ষণীয়া কন্যাকে পাত্রস্থ করিয়া যাহাতে সে ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারে তজ্জন্য চেষ্টিত হইলেন। এজন্য তিনি মহেন্দ্রনাথকে এ সম্বন্ধে অবহিত হইবার জন্য কয়েকবার পরামর্শ দিয়া আসিলেন। শুধু পরামর্শ দিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, মহেন্দ্রনাথকে এই দায় হইতে উদ্ধার করিবার জন্য পাত্র পর্য্যন্ত স্থির করিয়া ফেলিলেন। সে পাত্র বিপত্নীক বনমালী ঘোষাল। কিন্তু জগতে অল্প লোকেই যেমন উপকার করিতে পারে, তেমনই অল্প লোকই উপকারকের নিকট হইতে উপকার গ্রহণ করিতে পারে। সুতরাং নির্ব্বোধ মহেন্দ্রনাথ এই অযাচিত উপকার গ্রহণ করিতে পারিলেন না। গোপাল ঠাকুর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিলেন, এই বুদ্ধিহীন লোকটা কিরূপে দেওয়ানী করিয়াছিল।

সেদিন শাপুর হইতে দুইজন ভদ্রলোক নির্ম্মলাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। মহেন্দ্রনাথ তাঁহাদের যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া মেয়ে দেখাইলেন। পল্লীগ্রামের নিয়ম এই যে, কাহারও বাড়ীতে দুই একজন ভদ্রলোক আসিলে তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনার জন্য পাড়ার পাঁচজন উপস্থিত হয় এবং যাহাতে ভদ্রলোকদিগের অভ্যর্থনার ক্রটী না হয়, তজ্জন্য সকলেই যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া থাকে। তবে সকল স্থলেই যে তাহারা সাহায্য করিতেই আসে তাহা নহে, অনেকে শুধু কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়াই উপস্থিত হয়, এবং কোন কোন স্থলে সাহায্যের পরিবর্ত্তে তাহাদের দ্বারা এক আধটু অপকারও সাধিত হইয়া থাকে। অপকারই হউক বা উপকারই হউক, তাহাদের উপস্থিতি প্রায় বাদ যায় না।

মহেন্দ্রনাথের গৃহে ভদ্রলোকদিগের উপস্থিতির সঙ্গে পাড়ার দুই চারিজন উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে গোপাল ঠাকুরও একজন। গোপাল ঠাকুরের একটা বিশেষ গুণ এই যে, গল্পে তিনি সিদ্ধ ছিলেন। তিনি উপস্থিত থাকিতে অন্য কাহারও মুখ খুলিবার প্রয়োজন হইত না; দেশের যত কিছু সমাচার, সকলই তাঁহার নখদর্পণে ছিল। এজন্য কেহ কেহ তাঁহাকে 'সমাচার দর্পণ' আখ্যা দিয়াছিল।

গোপাল ঠাকুর আসিয়া দীর্ঘচ্ছন্দে 'ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ' বলিয়া আসন গ্রহণপূর্ব্বক সেই যে মুখ খুলিলেন, ধূমপানকালে কাসির উপদ্রব ব্যতীত তাহা আর বন্ধ হইল না। বাজারের আলু পটল বেগুন, চাউলের দর হইতে আরম্ভ করিয়া বরের বাজারের মহার্ঘতা পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া তিনি শ্রোতৃবর্গকে চমৎকৃত করিয়া দিলেন। সেই সঙ্গে তিনি মহেন্দ্রনাথের সৌভাগ্যের প্রশংসা এবং তদীয় কন্যার গুণবত্তার সুখ্যাতি প্রকাশেও বিরত হইলেন না।

এই সকল আলোচনার সঙ্গে একালের সহিত সেকালের তুলনামূলক সমালোচনাও উপস্থিত হইল। সে আলোচনা প্রসঙ্গে গোপাল ঠাকুর আক্ষেপ প্রকাশপূর্ব্বক মত প্রকাশ করিলেন, অধুনা নানা প্রকারে বাহ্য উন্নতি হইতেছে বটে, কিন্তু ধর্ম্মের সম্পূর্ণ অবনতি সংঘটিত হইয়াছে। আগে লোকে যেমন ধর্ম্মরক্ষা করিয়া চলিত, এখন আর কেহই তেমন করে না। এই উক্তির প্রমাণস্বরূপে তিনি দেখাইলেন, পূর্ব্বে

লোকে দশম বর্ষ অতিক্রান্ত হইবার পূর্ব্বেই কন্যাকে পাত্রস্থ করিয়া গৌরীদানের ফললাভ কল্পিত, কিন্তু এখন দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রম করিবার পূর্ব্বে কেহ কন্যার বিবাহ বিষয়ে আদৌ মনোযোগ দেয় না। শাস্ত্রে আছে, অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা। বিবাহের পূর্ব্বে কন্যা রজস্বলা হইলে যে চতুর্দ্দশ পুরুষ নরকস্থ হয়, ইহা এখন আর কেহই গ্রাহ্য করে না। শুধু কন্যার পিতা কেন, বরের পিতাও এই ভয়ানক দোষটা আমলে আনেন না। তিনি শুধু প্রার্থিত অর্থ প্রাপ্ত হইলেই সন্তুষ্ট হন, কিন্তু তাঁহার কুল যে পতিত হইতেছে তাহা আদৌ লক্ষ্য করেন না। ইহার ফলে বংশে যে ক্রমেই বৈধব্য, অকাল-মৃত্যু, দারিদ্র্য প্রভৃতি আধিপত্য বিস্তার করিতেছে, তাহা অনেকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও বুঝিতে পারেন না।

পরেশ সরকার সেখানে উপস্থিত ছিল। সে গোপাল ঠাকুরকে যেন সতর্ক করিবার অভিপ্রায়েই বলিয়া উঠিল, "আহা, ঠাকুর মশায় কি যে বলেন তার ঠিক নাই। মহেন্দ্রবাবু শুন্‌লে কি মনে করবেন। আর এই ভদ্রলোকেরাই বা—"

গোপাল ঠাকুর সপ্রতিভভাবে বলিলেন, "আমি কি মহেন্দ্রনাথের মেয়ের সম্বন্ধে কিছু বল্‌ছি? আমি বল্‌ছি, আজকালকার রীতিই এই দাঁড়িয়েছে। আর এঁরা—"

বলিয়া তিনি সমাগত ভদ্রলোকদ্বয়ের প্রতি সহাস্য দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "পনেরো বছরের মেয়ের যে দ্বিতীয় সংস্কার হ'তে বাকী থাকে না, সে কথা কি এঁরা বুঝেন না? কেবল এঁরা কেন, আজকাল অনেকেই তো জেনে শুনে এমন কাজ করেন। কি বলেন মশায়?"

ভদ্রলোকেরা শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহারা সম্মতি-সূচক মস্তক আন্দোলন করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের মুখখানা অস্বাভাবিক ম্লান হইয়া আসিল। গোপাল ঠাকুর তখন তারা শিবসুন্দরীকে স্মরণপূর্ব্বক লাঠি-গাছটা তুলিয়া পরেশকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "ভায়া এখন বস্‌বে নাকি? আমাকে আবার বরদাবাবুর কাছে একবার যেতে হবে।"

"আমিও যাব চলুন" বলিয়া পরেশও তাঁহার সহিত উঠিয়া দাঁড়াইল। গোপাল ঠাকুর তখন ভদ্র-লোকদ্বয়কে যথাযোগ্য নমস্কার করিয়া প্রস্থান করিলেন।

ভদ্রলোকদের জলযোগের আয়োজনের জন্য মহেন্দ্রনাথ বাড়ীর ভিতর গিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি বাহিরে আসিয়া আগন্তুকগণকে জলযোগের জন্য আহ্বান করিলেন। তাঁহারা কিন্তু উঠিলেন না, নানা প্রকার ওজর করিতে লাগিলেন। পরিশেষে মহেন্দ্রনাথের সানুনয় অনুরোধে বাধ্য হইয়া তাঁহা-দিগকে বলিতে হইল যে, বিবাহ স্থির না হইলে তাঁহারা এখানে জলগ্রহণ করিতে পারেন না, এবং বিবাহের স্থিরতা বিষয়ে তাঁহারা পরে সংবাদ দিবেন।

বলিয়া তাঁহারা উঠিয়া পড়িলেন। তাঁহাদের ভাব দেখিয়া মহেন্দ্রনাথ চমৎকৃত হইলেন। কিন্তু উপস্থিত যদু ঘোষ যখন গোপাল ঠাকুরের ইঙ্গিতপূর্ণ আলোচনার কথা বলিল, তখন মহেন্দ্রনাথ ব্যাপারটা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

যোগেশকে সম্বোধন করিয়া গোপাল ঠাকুর বলিলেন, "ধর্ম্ম বজায় রাখ্‌তে হ'লে বাবাজি, আগে সমাজটাকে বজায় রাখা দরকার। আবার সমাজের একজন মাথা না থাক্‌লে সমাজ ঠিক থাকে না। আমাদের সমাজটা কেমন জান, ঠিক দুষ্ট ঘোড়ার মত; রাশ একটু আল্‌গা পেলেই বিপথে ছুটে যেতে চায়। তাই এর রাশটা সর্ব্বদা টেনে রাখা দরকার। কিন্তু যেমন ভাল সওয়ার না হ'লে দুষ্ট ঘোড়াকে বশে রাখ্‌তে পারে না, তেমনি উপ-যুক্ত লোক সমাজের মাথা না হ'লে সমাজকে বশে রাখা যায় না। বড় বাবু যতদিন ছিলেন, ততদিন আমাদের এ সকল ভাবনা একটুও ভাবতে হয় নি, সমাজ-ঘোড়ার উপযুক্ত সওয়ার তিনি ছিলেন। কিন্তু তিনি গত হওয়া অবধি সমাজ একেবারে বিশৃঙ্খল হ'য়ে উঠেছে। এখন তুমি যদি এর রাশটা চেপে না ধর, তা হ'লে তো হিঁদুর হিঁদুয়ানি আর বজায় থাকে না।"

যোগেশ চুপ করিয়া বসিয়া বিস্ময় সহকারে গোপাল ঠাকুরের এই বক্তৃতা শুনিতে লাগিল। গোপাল ঠাকুর একটু থামিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "তুমি বল্‌তে পার, আপ-নারাই কেন সমাজটাকে চালনা করুন না। কিন্তু তা হয় না। আমরা যে চালাবার উপায় জানি না তা নয়, কিন্তু আমাদের কথা শোনে কে? এই ধর না মহেন্দ মুখুজ্যে ঘরে পনের বছরের মেয়ে পুষে রেখেছে, তার বিবাহ দেবার নামটি নাই। কতবার গিয়ে তাকে সাবধান ক'রে দিয়েছি, কিন্তু সে কথায় কাণই দেয় না। দেবে কেন? আমাদের তো তেমন অর্থবল লোকবল নাই যে ভয় ক'রে চল্‌বে।"

যোগেশ বলিল, "কিন্তু মহেন্দ্রবাবুর মেয়ের বিয়ের উপর আমার তো হাত নাই।"

গোপাল ঠাকুর হা হা করিয়া হসিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "হাত নাই, অথচ সম্পূর্ণ হাত আছে বাবাজি। তুমি যদি তাকে ডেকে ব'লে, দাও এত বড় মেয়ে ঘরে রাখতে পাবে না, এক মাসের মধ্যে বিয়ে দিতে হবে, নয় তো তোমাকে সমাজচ্যুত করবো, তা হ'লে বাধ্য হ'য়ে তাকে মেয়ের বিয়ের চেষ্টা দেখ্‌তে হবে।"

যোগে। যদি না দেখেন ?

গোপা। সমাজচ্যুত হবেন। তুমি বোঝ না বাবাজি, সমাজের শাসন বড় শাসন, সে শাসনকে রাজা মহারাজাও অতিক্রম কত্তে পাবে না। মহেন্দ্র মুখুজ্যে কোন্ ছার !

যোগে। কিন্তু পাত্র না পাওযা গেলে তো বিয়ে হ'তে পারে না।

গোপাল ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, "এইখানেই তোমাদের সঙ্গে আমাদের মতের মিল হয় না বাবাজি। মেয়ে জন্মাবার আগেই বিধাতা তার বর স্থির ক'রে রাখেন। তা নৈলে দেশের এত লোকের মেয়ের বিয়ে হচ্চে কি রকমে ? তবে রাজা জমিদার খুঁজে বেড়ালেই কষ্ট পেতে হয।"

যোগেশ জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কি তাই খুঁজে বেড়াচ্চেন ?"

গোপাল ঠাকুর বলিলেন, "তা নৈলে দেশে কি ছেলের এত দুর্ভিক্ষ হ'য়েছে যে, মেয়ের দ্বিতীয় সংস্কার হ'য়ে গেল, অথচ তার বিয়ে হ'লো না। আসল কথা কি জান, সে এখনো তোমার অপেক্ষায় আছে।"

যোগেশ নিরুত্তরে গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিল। গোপাল ঠাকুর বলিলেন, "সে কথা যাক্, এখন বাবাজি, আমাদের সকলেরই ইচ্ছা, তুমি বিবাহ ক'রে সংসার-ধর্ম্ম কর।"

যোগেশ মৃদু হাসিল। অতঃপর গোপাল ঠাকুর যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা প্রমাণ করিতে লাগিলেন যে, সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা সংসার ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ, এবং সে ধর্ম্ম প্রতিপালনে স্ত্রীই প্রধান সহায়। তাঁহার অঞ্চল ছায়ায় বসিয়া শুধু যে সংসারের সুখ নামক সুমধুর ফলের আস্বাদটাই উপভোগ করা যায় তাহা নহে, পরলোকে পিণ্ড নামক যে পদার্থটা প্রাণিমাত্রেরই অত্যাবশ্যক, স্ত্রীর দ্বারাই তাহা লব্ধ হওয়া যায়। শাস্ত্রে আছে—'পুত্রঃ পিণ্ড প্রয়োজনং'; এই পিণ্ড জিনিষটা ইহলোকে যতই উপেক্ষণীয় হউক, পরলোকে এই জিনিষটুকু ছাড়া ক্ষুন্নিবৃত্তির কিছুমাত্র উপায় নাই। সুতরাং সর্ব্ব কর্ম্ম পরিহারপূর্ব্বক অগ্রে দার-পরিগ্রহ করাই কর্ত্তব্য।

এইরূপে বিবাহের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিয়া গোপাল ঠাকুর পরিশেষে প্রস্তাব করিলেন যে, বরদাবাবুর ভাগিনেয়ী এবং অনিলবাবুর কন্যা লীলাবতীই যোগেশের সহধর্ম্মিণী হইবার উপযুক্ত। এ জন্য যোগেশের অনুমতি না লইয়াই তিনি এ সম্বন্ধে অনিলবাবুর সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া আসিয়াছেন। এক্ষণে যোগেশ মত দিলেই তিনি যথাসম্ভব সত্বর এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিতে পারিবেন। ইহাতে শুধু যোগেশেরই সংসারধর্ম্ম প্রতিপালনরূপ কর্ত্তব্য সম্পাদিত হইবে না, মহেন্দ্রনাথও যোগেশের সম্বন্ধে হতাশ হইয়া কন্যার বিবাহে মনোযোগী হইবেন। যদি না হন, তবে তাঁহাকে সমাজচ্যুত করিবেন, তাঁহার ন্যায় পাতকীর সংস্রবে সমাজকে পাতকগ্রস্ত করিতে পারিবেন না।

যোগেশ এ সম্বন্ধে ভাবিয়া উত্তর দিবে বলিয়া গোপাল ঠাকুরকে বিদায় দিল।

অতঃপর গোপাল ঠাকুর মহেন্দ্রনাথের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে জানাইলেন যে, অরক্ষণীয়া কন্যা ঘরে রাখায় যোগেশ তাঁহাকে সমাজচ্যুত করিতে উদ্যত হইয়াছে। কেবল তিনিই অনুরোধ করিয়া এক মাসের সময় লইয়াছেন। ইহার মধ্যে যাহা হয় একটা প্রতিবিধান না করিলে তিনি কিন্তু দ্বিতীযবার যোগেশকে অনুরোধ করিতে পারিবেন না, যোগেশও আর কাহারও কথা রাখিবে না। মহেন্দ্রনাথ শুনিয়া একটু ম্লান হাসি হাসিলেন।

ইহার কয়েকদিন পরে মহেন্দ্রনাথ শুনিলেন, দেনার দায়ে তাঁহার নূতন বাড়ীটা নীলামে বিক্রীত হইয়া গিয়াছে; রমণীবাবু চারি হাজার টাকায় যোগেশের নামে বাড়ীটা কিনিয়া লইয়াছেন।

পরদিন হইতে যোগেশের নিয়োজিত মিস্ত্রীরা আসিয়া বাড়ীখানার সম্পূর্ণতাসাধনে প্রবৃত্ত হইল। একদিন যোগেশ নিজে আসিয়া দেখাশুনা করিয়া তাহাদিগকে নানাবিধ উপদেশ দিয়া গেল। মহেন্দ্রনাথ আপনার ভাঙ্গা চণ্ডীমণ্ডপের রোয়াকে বসিয়া সব শুনিলেন, সব দেখিলেন। একবার যোগেশের সঙ্গে তাঁহার চোখাচোখি হইল। কিন্তু যোগেশ ত্রস্তভাবে মুখ ফিরাইয়া লইয়া চলিয়া গেল। মহেন্দ্রনাথের বক্ষঃপঞ্জর ভেদ করিয়া যে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল, বহু চেষ্টাতেও মহেন্দ্রনাথ তাহাকে চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

নির্ম্মলা আসিয়া ডাকিল, "বাবা।"

মহেন্দ্রনাথ মুখ তুলিয়া চাহিলেন। নির্ম্মলা বলিল, "বাড়ীতে এস না বাবা!"

উদাসস্বরে "যাই" বলিয়া মহেন্দ্রনাথ বসিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরেও তাঁহার উঠিবার উদ্যোগ না দেখিয়া নির্ম্মলা বলিল, "মা ভাত বেড়ে বসে আছে বাবা।"

মহেন্দ্রনাথ গম্ভীরস্বরে উত্তর দিলেন, "হুঁ।"

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া নির্ম্মলা পুনরায় ডাকিল, "বাবা!"

মহেন্দ্রনাথ যেন চমকিতভাবে উত্তর দিলেন, "কেন নিমি?"

নির্ম্মলা বলিল, "এস না বাবা।"

সম্মুখের বাড়ীখানার দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ঐ যে ঘরটা দেখছিস্ নিমি, ওখানে আমি—"

বাধা দিয়া নির্ম্মলা বলিল, "ভাত শুকিয়ে গেল বাবা।"

মহেন্দ্রনাথ বিরক্তভাবে ভ্রূসঞ্চালন করিয়া বলিলেন, "চুলোয় যাক্ ভাত, আমি মনে করেছিলুম কি জানিস্, ঐ ঘরটায় লক্ষ্মীর হাঁড়ী থাকবে।"

নির্ম্মলা ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই দেখিল, একজন সাগ্রহদৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। সে যোগেশ। নির্ম্মলাকে চাহিতে দেখিয়াই যোগেশ একটু সরিয়া গেল। নির্ম্মলাও সন্ত্রস্তভাবে পিতার আরও নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে অপেক্ষাকৃত মৃদু অথচ ব্যগ্র স্বরে বলিল, "এখান হ'তে উঠে এস বাবা।"

যোগেশ পশ্চাৎপদ হইবার সময়ে মহেন্দ্রনাথের দৃষ্টিকেও অতিক্রম করিতে পারে নাই, সুতরাং নিমির এই ব্যগ্রতার কারণ অনুমান করিতে বিলম্ব হইল না। তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "গরীবের আবার লজ্জা কি নিমি?"

পিতার হস্ত আকর্ষণ করিতে করিতে নির্ম্মলা ঘাড় বাঁকাইয়া ক্ষোভ-গভীর-কণ্ঠে বলিল, "তা হোক, তুমি উঠে এস।"

সে স্নেহকোমল আকর্ষণকে মহেন্দ্রনাথ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না; তিনি উঠিয়া সহাস্যে কন্যার অনুসরণ করিলেন। যাইতে যাইতে বলিলেন, "যার বাবা পরের দোরের ভিখিরী, তার মেয়ের এত লজ্জা কেন বল্ তো?"

নির্ম্মলা দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া সকোপ কটাক্ষে পিতার দিকে ফিরিয়া চাহিল; হাস্যস্ফুরিতকণ্ঠে বলিল, "তুমি বড় দুষ্টু হ'য়েছ বাবা।"

সেই ক্রোধে গম্ভীর, হাস্যে সমুজ্জ্বল বালিকার মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে স্নেহে আনন্দে পিতার হৃদয় এমনই পূর্ণ হইয়া আসিল যে তাহার নিকট সকল দৈন্য, সকল ব্যথা, স্রোতের সম্মুখে তৃণখণ্ডের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া গেল। অভাবক্ষুণ্ণ হৃদয়ে একটা পরিপূর্ণতা লইয়া মহেন্দ্রনাথ বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন।

আহারে বসিয়া মহেন্দ্রনাথ স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া সহাস্যে বলিলেন, "আমি একবার দেখবো বড় বৌ, কত দিন তুমি আমাকে এমনি করে ভাত বেড়ে দিতে পার।"

ঈষৎ গাঢ়স্বরে ভবসুন্দরী বলিলেন, "আশীর্ব্বাদ কর, শেষ দিন পর্য্যন্ত যেন তোমার কোলে ভাত দিয়ে যেতে পারি। কিন্তু তুমি দেখবে কি সেটা শুনি?"

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "দেখবো এই, কতদিন তুমি আমাকে বসিয়ে খাওয়াতে পার।"

ঈষৎ রাগভাবে ভবসুন্দরী বলিলেন, "আমি রোজগার ক'রে এনে তোমাকে খাওয়াচ্চি নাকি?"

"তুমিও রোজগার ক'রে আনচো না, আমিও রোজগার কচ্চি না, তা হ'লে খাওয়াটা কি আস্‌মান থেকে আস্‌চে বড় বৌ?"

বলিয়া মহেন্দ্রনাথ পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিলেন। ভবসুন্দরী মুখ ফিরাইয়া কৃত্রিম তর্জ্জন সহকারে বলিলেন, "হাঁ, আস্‌মান থেকে আস্‌চে। খেতে বসেছ খেয়ে নাও, কোথা হ'তে আসচে, কি বৃত্তান্ত, এত খোঁজে দরকার কি?"

ঈষৎ ক্ষুণ্ণভাবে মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "যে নিজে আনতে পারে না, তার এত খোঁজ লওয়া অন্যায় হইলেও কোথা হ'তে আসচে এটা জানবার জন্য সকলেরই কৌতূহল হয়। গয়না গাঁটি তো কিছু রাখি নাই যে, তাই বেচে খাওয়াবে, দু'টো পয়সাও কখন হাতে দিই নাই—"

উত্তেজিতকণ্ঠে ভবসুন্দরী বলিলেন, "ওগো, ব্যাগত্তা করি, খেয়ে নাও। মেয়েটা যে ক্ষিদেয় ছট্‌ফট্ কচ্চে।"

সচকিতভাবে মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "এটা তোমার নেহাৎ অন্যায় বড় বৌ। কেন, আমার খাওয়া না হ'লে কি—"

বাধা দিয়া ভবসুন্দরী বলিলেন, "খেলে তো? কোন দিন কি খেয়েচে? না তোমার পাতে না খেলে ওর পেট ভরে? এমনি তোমার মেয়ে কি না?"

গর্ব্বপ্রফুল্লকণ্ঠে মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমার মেয়ে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী বড় বৌ, এমন মেয়ে কার ক'টা আছে?"

ভবসুন্দরীর ঠোঁট দুইটা উচ্ছ্বসিত হাস্যবেগে ফুলিয়া উঠিল। কিন্তু তাহা চাপিয়া ভ্রূভঙ্গীসহকারে বলিলেন, "সে কথা ঠিক। মেয়ের বিয়ের তরে আর কাউকে এতটা লাঞ্ছনা ভোগ কত্তে হয় না।"

সবেগে মস্তক সঞ্চালন করিয়া মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "লাঞ্ছনা! কিসের লাঞ্ছনা বড় বৌ? ছেলে মেয়ের বিয়ে দিতে হ'লে পাঁচ জায়গায় চেষ্টা দেখতে হয়, তাই দেখছি। কিন্তু তাতে লাঞ্ছনা তো কিছুই দেখতে পাই না।"

ভবসুন্দরী একটু হাসিয়া বলিলেন, "লাঞ্ছনাকেই তুমি লাঞ্ছনা দিয়েছ, কাজেই তাকে দেখতে পাও না।"

মহেন্দ্রনাথ এমনই জোরে হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন যে, তাঁহার মুখের ভাতগুলো চারিদিকে ছিটকাইয়া পড়িল। ভবসুন্দরী বলিলেন, "খেয়ে নাও, আমি আর বসতে পাচ্চি না।"

মহেন্দ্রনাথ সহাস্যে বলিলেন, "এত ক্ষিদে?"

গম্ভীরভাবে ভবসুন্দরী, বলিলেন, "খিদে নয়, শরীর যেন কেমন কচ্চে।"

উৎকণ্ঠার সহিত মহেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "শরীরের আবার কি হ'লো?"

ভবসুন্দরী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "হয়নি তেমন কিছু। তবে আজ দু'দিন ধ'রে কেমন যেন একটু জ্বরভাব হ'য়ে আছে।"

ব্যস্ততার সহিত মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "জ্বরভাব? খাচ্চো কি?"

"কি আর খাব?"

মহেন্দ্রনাথ ভাতের গ্রাসটা হাতে রাখিযাই পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ভবসুন্দরী যেন একটু পরিহাসের স্বরে বলিলেন, "এখন কি তোমার সে দিন আর আছে। আগে একটু মাথা ধরলে দিনে সাতবার খোঁজ নিতে।"

স্বামীর মুখের উপর হাস্যোজ্জ্বল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া ভবসুন্দরী মুখ ফিরাইয়া লইলেন। মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আগে তুমিও একটু মাথা ধরলে আমার কাছে তা লুকিয়ে রাখতে না, কিন্তু আজ দু'দিন জ্বর হয়েছে—"

মাথা নাড়িয়া ভবসুন্দরী বলিলেন, "হাঁ, ভারী তো জ্বর।"

ম্লানমুখে বিষাদগম্ভীরস্বরে মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কিন্তু জ্বর তো বটে। সময়ে অসম্ভবও সম্ভব হয় বড় বৌ।"

মহেন্দ্রনাথ নীরবে আহার কার্য্য শেষ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। তিনি হাতমুখ ধুইয়া আসিলে নির্ম্মলা তামাক সাজিয়া তাঁহার হাতে হুঁকা দিতে গেল। মহেন্দ্রনাথ কিন্তু তামাক খাইলেন না; তিনি হুঁকাটা রাখিয়া দিয়া চাদরখানা কাঁধে ফেলিয়া বাহির হইযা গেলেন।

সন্ধ্যার সময় মহেন্দ্রনাথ যখন বাড়ী ফিরিলেন, তখন তাঁহার মুখে একটা অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য দেখিয়া ভবসুন্দরী বিস্মিত হইলেন। নির্ম্মলা তামাক সাজিয়া দিল। মহেন্দ্রনাথ দাবার উপর বাসিয়া তামাক টানিতে টানিতে ডাকিলেন, "বড় বৌ!"

ভবসুন্দরী সম্মুখে আসিযা উত্তর দিলেন, "কি বলছো?"

মহেন্দ্রনাথ নীরবে হুঁকায় দুইটা টান দিয়া পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ক্ষমতা থাকতে যারা ব'সে ব'সে কষ্ট ভোগ করে, স্বয়ং বিধাতাও তার কষ্ট দূর কত্তে পারে না।"

ভবসুন্দরী নিরুত্তরে স্বামীর কুটিল হাস্য প্রদীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মহেন্দ্রনাথ একটু চুপ করিয়া থাকিযা জিজ্ঞাসা করিলেন, "যারা ক্ষমতা সত্বেও শুধু ধর্ম্মের মুখের দিকে চেয়ে, অত্যাচার লাঞ্ছনা সহ্য করে, তাদের লোকে কি বলে?"

ভবসুন্দরী একটুও না ভাবিয়া উত্তর দিলেন, "ধার্ম্মিক বলে।"

তীব্র হাসি হাসিয়া মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "না, নির্ব্বোধ বলে।"

সে হাসিতে, সে স্বরে ভবসুন্দরী চমকিয়া উঠিলেন। মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "এতদিন আমি সেই নির্ব্বোধ ছিলাম, এবার বুদ্ধিমানের মত কাজ করবো।"

শঙ্কিতস্বরে ভবসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করবে?"

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "চাকরী।"

যেন কথঞ্চিৎ আশ্বস্তভাবে ভবসুন্দরী বলিলেন, "বেশ তো।"

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "হাঁ, ভাল ব'লেই আজ বরদাবাবুর কাছে চাকরী ঠিক ক'রে এলাম।"

বিস্ময়জড়িতস্বরে ভবসুন্দরী বলিয়া উঠিলেন, "বরদাবাবুর কাছে !"

বিরক্তিসূচক ভ্রূকুটি করিয়া মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তা নয় তো, ছিরু মাইতির কাছে যাব নাকি ?"

ভবসুন্দরী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। মহেন্দ্রনাথও নিরুত্তরে হুঁকায় ঘন ঘন টান দিতে লাগিলেন।

তখন সন্ধ্যার তরল-অন্ধকারে ধরণী আচ্ছন্ন হইয়াছিল; আকাশের গায়ে ছোট বড় অনেকগুলি নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিয়াছিল। মহেন্দ্রনাথ একটা সমুজ্জ্বল বড় তারকার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ক্রমে তাহার উজ্জ্বলতাটা এমনই তীব্রভাবে আসিয়া চোখে লাগিল যে, মহেন্দ্রনাথ অসহিষ্ণুভাবে মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

মানুষ যে আঘাতগুলাকে অনায়াসে সহ্য করিয়া যাইবে মনে করে, সময়ে সময়ে সেগুলা এমন কঠোরভাবে আসিয়া মর্ম্মকে স্পর্শ করে যে, তাহাতে মানুষ অনেক সময় সহিষ্ণুতার সীমা হইতে সম্পূর্ণ বিচলিত হইয়া পড়ে। দুঃখের এই প্রচণ্ড আঘাত যিনি সমভাবে সহ্য করিয়া যাইতে পারেন, তিনি জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ এবং সংসারে সেরূপ মহাপুরুষের সংখ্যা অত্যল্পমাত্র। মহেন্দ্রনাথ এই স্বল্পশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। সুতরাং তিনি ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়িলেন, এবং পূর্ব্বে তিনি অনুচিত বোধে যে উপায়কে প্রত্যাখান করিয়াছিলেন, সেইটাকেই গ্রহণ করিতে ইতঃস্তত: করিলেন না।

কিন্তু মানুষ যদি ইচ্ছা করিলেই অন্যায় পথ অবলম্বন করিতে পারিত, তাহা হইলে সংসারটা এত দিনে পিশাচের লীলাক্ষেত্র হইয়া পড়িত। মানুষ উত্তেজনার বশে অন্যায় কাজে অগ্রসর হইলেও মধ্যে যে বিবেকের বৃত্তিটা ব্যবধান রূপে দণ্ডায়মান থাকে, তাহাকে অতিক্রম করিবার শক্তি সকলের থাকে না, এই ব্যবধানের নিকট গিয়াই অনেককে পশ্চাৎপদ হইতে হয়। মহেন্দ্রনাথকেও পশ্চাৎপদ হইতে হইল।

মহেন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বসিয়া ভাবিলেন। কলিকার আগুন নিবিয়া গেল, ধূম বাহির হইল না, তথাপি মহেন্দ্রনাথ মধ্যে মধ্যে তাহাতে টান দিতে লাগিলেন। পরিশেষে নির্ম্মলা আসিয়া যখন হুঁকার ধূমহীনতার উল্লেখ-পূর্ব্বক সন্ধ্যা-আহ্নিকের কথা স্মরণ করাইয়া দিল, তখন তিনি হুঁকা রাখিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া গেলেন।

মহেন্দ্রনাথ গিয়া আহ্নিকে বসিলেন। কিন্তু অকৃতজ্ঞতার ভারে অন্তঃকরণটা এমনি ভারী হইয়া রহিল যে, আহ্নিকে আদৌ মন বসিল না। ইষ্ট দেবতাকে ধ্যান করিতে গেলেন, কিন্তু তাঁহার ধ্যানের মূর্ত্তি যখন অন্তরিন্দ্রিয়ের সম্মুখে প্রকট হইয়া উঠিল, তখন মহেন্দ্রনাথ যেন সসঙ্কোচে সভয়ে সেদিক্ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলেন।

সে রাত্রে আর কিছুই খাইলেন না, শুধু একটু জল খাইয়া শুইয়া পড়িলেন। ভবসুন্দরীর জ্বর আসিয়াছিল, তিনি অনেক আগেই শুইয়া পড়িয়াছিলেন। শয়নের পূর্ব্বে একবার তাঁহার সংবাদ লইবার ইচ্ছা হইল। মহেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে গিয়া পত্নীর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইলেন। ঘন অন্ধকার; সেই অন্ধকারের মধ্যে মহেন্দ্রনাথ দাঁড়াইয়া রহিলেন। ডাকিবার ইচ্ছা হইলেও ডাকিতে পারিলেন না। এইরূপে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া নিঃশব্দেই প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু নিঃশব্দে যাইতে পারিলেন না; মেজের উপর একটা বাটি ছিল সেটা পায়ে লাগিতেই শব্দ হইল। ভবসুন্দরী চমকিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ?"

মহেন্দ্রনাথ ধরা গলায় উত্তর দিলেন, "আমি।"

ভব। শুতে যাচ্চো ?

মহেন্দ্র। হাঁ।

ভব। খাওয়া হ'য়েছে ?

মহেন্দ্র। হাঁ।

ভব। তা হ'লে কালকেই কি —

কথাটা শেষ করিবার অবসর না দিয়াই মহেন্দ্রনাথ ব্যস্ততার সহিত উত্তর দিলেন, "হাঁ' কাল হ'তে কাজে বেরুবো।"

ভবসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিমির খাওয়া হ'য়েছে ?"

মহেন্দ্রনাথ বলিল, "এতক্ষণ হয়েছে বোধ হয়।"

উত্তর দিয়াই মহেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। ভবসুন্দরী বলিলেন, "চলে গেলে ?"

দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া মহেন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন, "কেন ?"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ভবসুন্দরী বলিলেন, "আমি বলছিলাম কি, চাকরীই যদি কত্তে হয়, তবে একবার যোগেশের কাছেই গেলে না কেন ?"

রোষতীব্রকণ্ঠে মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আর অপমানিত হ'বার ইচ্ছা নাই ব'লে।"

বলিয়াই মহেন্দ্রনাথ দ্রুতপদে আপনার ঘরে চলিয়া গেলেন, এবং সশব্দে দরজাটা বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িলেন।

শুইলেন বটে, ঘুম কিন্তু সহজে আসিল না; কতকগুলা চিন্তা আসিয়া ঘুমটাকে দূরে সরাইয়া দিতে লাগিল। ফাল্গুনমাসের ঠাণ্ডা বাতাসেও মহেন্দ্রনাথ যেন অসহ্য গ্রীষ্ম বোধ করিতে লাগিলেন।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ভাবিয়া মহেন্দ্রনাথ শেষে ক্লান্তভাবে ঘুমাইয়া পড়িলেন। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিলেন, যেন গোবিন্দবাবু আসিয়া ডাকিতেছেন, "মহেন্দর!" মহেন্দ্রনাথ ঠিক সেই ঘরেই সেই বিছানায় শুইয়া ঘুমাইতেছিলেন, প্রভুর আহ্বানে চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিতেই দেখিলেন, অনেকটা বেলা হইয়াছে, চারিদিক্ রৌদ্রে ভরিয়া গিয়াছে। আর সেই রৌদ্রে অনাবৃতমস্তকে দাঁড়াইয়া গোবিন্দবাবু ডাকিতেছেন, "মহেন্দর!"

মহেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরে আসিয়া প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইলেন। গোবিন্দবাবু হাতের লাঠিটার উপর ভর দিয়া হাস্যগম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন, "ওহে, এত বেলা পর্য্যন্ত ঘুমুলে দেওয়ানী করা চলে না।"

মহেন্দ্রনাথ লজ্জানত মস্তকে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আমি ত এখন দেওয়ানী করি না বাবু?"

বাবু হাসিয়া বলিলেন, "তবে কি কাছারীর উঠান ঝাঁট দাও?"

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, আমি আর কাছারীতে যাই না।"

গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালন করিতে করিতে গোবিন্দবাবু বলিলেন, "তা যাবে কেন, গোবিন্দ চৌধুরীর জমিদারী যাক্ বা থাক্, তোমার তাতে কি বল। উঃ, কলিকালের লোকগুলা কি নিমকহারাম?"

লজ্জায় মহেন্দ্রনাথ মাথা তুলিতে পারিলেন না। তখন গোবিন্দবাবু তাঁহার লজ্জা-সঙ্কুচিত মুখের উপর হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "চুলোয় যাক্ জমিদারী, এখন তোমার বাড়ীখানা কি রকম হ'লো দেখি চল।"

সঙ্কুচিতভাবে মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ও বাড়ী তো আর আমার নয় বাবু।"

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া গোবিন্দবাবু মেঘমন্দ্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কি?"

শঙ্কিতস্বরে মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "যোগেশ ও বাড়ীটা নিলাম ক'রে নিয়েছে।"

গোবিন্দবাবুর চোখ দুইটা দিয়া যেন প্রলয়ের আগুন ছুটিল; মুখমণ্ডলে রুদ্রের সংহার মূর্ত্তি প্রকট হইয়া উঠিল; তিনি গর্জ্জনে আকাশ পৃথিবী প্রকম্পিত করিয়া বলিলেন, "তুমি মুর্খ হ'তে পার মহেন্দর, কিন্তু গোবিন্দ চৌধুরীর ছেলে এতটা অকৃতজ্ঞ হ'তে পারে না।"

বলিয়া গোবিন্দবাবু হাতের লাঠির আগা দিয়া সজোরে আঘাত করিলেন। সে আঘাতে ভূমি বজ্রনাদে বিদীর্ণ হইয়া গেল, পৃথিবী থরথর শব্দে কাঁপিয়া উঠিল, বিদারিত ভূগহ্বর হইতে ধক্ ধক্ অগ্নিশিখা বিস্তৃত হইয়া মহেন্দ্রনাথকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। মহেন্দ্রনাথ আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "বাবু, বাবু!"

কোথায় বাবু? বিকট অট্টহাস্যে দিগন্ত প্রকম্পিত হইল।

ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। মহেন্দ্রনাথ কাঁপিতে কাঁপিতে শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

বরদাবাবু যোগেশকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমার মহেন্দ্রবাবু চাকরীর উমেদারীতে আমার কাছে এসেছিল যে হে?"

ঈষৎ চমকিতভাবে যোগেশ বলিল, "বটে।"

বরদাবাবু বলিলেন, "তা আমার তো এখন লোকের তেমন দরকার নাই। এই তো হাজা শুকা অজন্মা অনাদায়, এর উপরে কতকগুলো লোক রেখে করবো কি?"

যোগেশ অন্যদিকে মুখ রাখিয়া নীরবে রহিল। বরদাবাবু বলিলেন, "আমি তোমার কাছে যেতে ব'লেছিলাম, তাতে উত্তর করলে, না খেয়ে শুকিয়ে মরি তাও ভাল, তবু ওখানে যাব না। দেখলাম তোমার উপর বড্ড রাগ।"

ভ্রূকুটি করিয়া যোগেশ বলিল, "তা হ'তে পারে।"

বরদা। বোধ হয়, নূতন বাড়ীখানা বেচে নিয়েছ ব'লে? কিন্তু সেটা এমন কি অন্যায় করেছ? ন্যায্য টাকা তো?

যোগেশ কোন উত্তর দিল না। বরদাবাবু বলিলেন, "আমি ব'লে দিয়েছি, আচ্ছা এসো, দেখি, যা হয় একটা কাজ দেখে শুনে দেব। ধর না,

তোমার বাপের আমলের লোক, খুব কষ্টে পড়েছে ব'লেই এসেছে, কাজেই—"

গম্ভীরস্বরে যোগেশ বলিল, "ভালই করেছেন।"

বরদাবাবু যেন একটু তাচ্ছীল্যের সহিত বলিলেন, "ভালই হোক, মন্দই হোক, লোকটা যখন এসেছে, আমার কেমন স্বভাব জান, মুখের উপর 'না' বলতে পারি না।"

যোগেশ মৃদু হাসিল; বরদাবাবু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, সে হাসি অর্থশূন্য শুষ্ক হাসি মাত্র। তিনি বেশ একটু গর্ব্বিতভাবে সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, "ভাল কথা ওর মেয়েটার বিয়ের কি হ'লো? তুমি নাকি আবার ভয় দেখিয়েছ, এক মাসের মধ্যে মেয়ের বিয়ে না দিলে সমাজচ্যুত করবে?"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া যোগেশ বলিয়া উঠিল, "কে বললে?"

বরদাবাবু বলিলেন, "মহেন্দ্রবাবুর নিজের মুখেই শুনলাম। তা ঠিকই বলেচ যোগেশ। হিঁদুর ঘরে এত বড় মেয়ে, এতে হিঁদুয়ানি বজায় থাকবে কেন? আর এগুলো তো আমাদেরই দেখা দরকার। তুমি গীতা পড়েছ তো? আমার সংস্কৃতটা মোটেই আসে না, বাঙ্গলা অনুবাদ মাঝে মাঝে দেখি। গীতায় বলেছে কি জান, বড় লোকেরা যেমন যেমন কাজ করবে, গরীবরাও সেইমত ক'রে থাকে। আমরা যদি এ বিষয়ে উদাসীন হই, তা হ'লে ধর্ম্মটাই যে লোপ পেয়ে যাবে। আমার 'মটো' কি জান, মামলা মোকদ্দমাই করি, আর জাল জুয়াচুরিই করি ধর্ম্মটা মোদ্দা বজায় রাখা চাই।"

বলিয়া বরদাবাবু যোগেশের মুখের উপর সদর্প দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলেন। যোগেশ নিরুত্তরে নতমুখে বসিয়া রহিল। বরদাবাবু তাহার এই নিরুৎসাহ ভাবটা বেশ লক্ষ্য করিয়া একটু ভাবিয়া বলিতে লাগিলেন, "যাক্, সে তুমি যেমন বুঝবে করবে, এখন এ দিক্‌কার কি বল দেখি? আমি তা হ'লে ২৫শে তারিখেই দিন ঠিক ক'রে অনিলকে পত্র লিখি।"

নতমুখেই যোগেশ বলিল, "এত তাড়াতাড়ি কেন?"

বরদাবাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "না হে, তুমি বোঝ না, শুভস্য শীঘ্রং; ধর, এর মধ্যে যদি আবার একটা সাহেব-সুবো জুটে যায়। অনিলকে তো চেন, তার মতের কোন স্থিরতা নাই।"

যোগেশের ললাট কুঞ্চিত হইল। বরদাবাবু তাহা লক্ষ্য করিয়া সপ্রতিভভাবে বলিলেন, "আমি অবশ্য তোমার দিক্ দিয়ে বলছি না, নিজের কথাই বলছি। ধর, আমার ভাগ্নী, তার বিয়ে যদি অহিন্দুর সঙ্গে হয়, তবে সমাজে আমার একটা দুর্নাম তো। এর পর হয় তো ঐ ভাগ্নীর সঙ্গে, ভগ্নী বা ভগ্নীপতির সঙ্গে আহার ব্যবহার কত্তে পারবো না। কেমন ঠিক কি না?"

বলিয়া তিনি যোগেশের দিকে কটাক্ষপাত করিলেন। যোগেশ সহাস্যে সম্মতিসূচক মস্তক সঞ্চালন করিল। বরদাবাবু একটা জৃম্ভণ ত্যাগ করিয়া তুড়ি দিতে দিতে বলিলেন, "যাক্, তা হ'লে ঐ দিনটাই আপাততঃ ঠিক রইলো। আমি কালই গিয়ে রমণীবাবুকে উদ্যোগ আয়োজন যা যা কত্তে হবে, সমস্ত ব'লে আসবো। বেশী জাঁক-জমক না হোক, তবু জমিদারের বিয়েতে যতটুকু দরকার, সেটুকু কত্তেই হবে। বাইরে মান-সম্মানটা বজায় রাখা চাই তো।"

কাকাবাবুর প্রস্তাবে যোগেশ কোন প্রতিবাদ করিল না। অতঃপর বরদাবাবু নানা কথার মধ্যে লিলির প্রসঙ্গ তুলিলেন এবং সেই প্রসঙ্গের মধ্যে প্রায় প্রত্যেক কথাতেই লিলি যে যোগেশকে ভালবাসে, ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সে কথাগুলা যোগেশের কাণে সুধাবর্ষণ করিলেও তাহার অন্তরটা লজ্জায় এমনই পীড়িত হইতে লাগিল যে, কিরূপে বরদাবাবুর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিবে তাহাই ভাবিতে লাগিল।

বেশী ভাবিতে হইল না। বরদাবাবুর জনৈক কর্ম্মচারী উপস্থিত হইয়া এ প্রসঙ্গ চাপা দিল। যোগেশ যেন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। বরদাবাবু কিন্তু কর্ম্মচারীর উপর একটু বিরক্তি প্রদর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চাই?"

কর্ম্মচারী সঙ্কুচিতভাবে একতাড়া কাগজ বাহির করিয়া বলিল, "সেই হরিশচন্দ্রের মামলা—"

তীব্র ভ্রূকুটী করিয়া বরদাবাবু বলিলেন, "ভারী তো মামলা! সাত কাঠা জমি নিয়ে মামলা, তাও আবার যোগেশের সঙ্গে।"

বলিয়া তিনি যোগেশের দিকে সহাস্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "শুনেছ হে যোগেশ, তোমার হরিশ-চন্দ্রের নায়েব আবার একটা মামলা বাধিয়ে ব'সে আছে।"

যোগেশ বিস্ময়ে যেন চমকিয়া উঠিল। বরদাবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "এই যে সব জমিদারীর কর্ম্মচারী, এরা একটা বিভিন্ন জীব। মামলা মোকদ্দমা নিয়েই আছে, কোন রকমে খড়ে-বড়ে

জড়িয়ে একটা মোকদ্দমা লাগাতে পারলেই বেটাদের দু'পয়সা লাভ।"

বলিয়া তিনি উপস্থিত কর্ম্মচারীর দিকে একটা তীব্র কটাক্ষপাত করিলেন। কর্ম্মচারী লজ্জানত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। বরদাবাবু তখন যোগেশের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ভিতরের কথাটা কি জান, ঐ যে হরিশচক আর রাণীর বাজার এ দু'টা পাশাপাশি মহাল। হরিশচকটা তোমার অংশে, আর রাণীর বাজারটা আমার। এই মহাল দু'টার সীমানির্দ্দেশ ছিল যমুনা খাল। রূপ্‌সী নদীর বেশীর ভাগ জল এই খাল দিয়ে ভাঙ্গতো। কিন্তু ১৩০০ সালে রূপ্‌সীর ওপারের যে বাঁধ ভাঙ্গে, সে বাঁধ আর বাঁধা হয় নি, যত জল এখন সেই খাল দিয়ে ভাঙ্গচে, কাজেই যমুনা খাল মজে গিয়েছে। তুমি কখন ওদিকে যাওনি, গেলে দেখতে পাবে, অনেক জায়গায় খাল এখন জমিতে পরিণত হ'য়েছে। এই যে এখন বছর বছর হাজা, শুকা, অজন্মা, তার কারণ ঐ সব খাল বিল মজে যাওয়া। এখন কি আর দেশে লোক আছে যে, চেষ্টা ক'রে এ সকলের সংস্কার করাবে। লোকে দোষ চাপায় জমিদারের ঘাড়ে। কিন্তু জমিদারের অবস্থা যে কি, তা তো কেউ জানে না। চাঁদার খাতায় সই দিয়ে, কর্ত্তাদের মন জুগিয়ে, বড়-মানুষি চাল বজায় রেখে জমিদারের যেটুকু লাভ থাকে, সেটুকু দেনা। কেমন ঠিক কিনা?"

বলিয়া বরদাবাবু একটু হাসিলেন। যোগেশও মৃদু হাস্য দ্বারাই এই উক্তির সমর্থন করিল। বরদাবাবু বলিতে লাগিলেন, "এখন যা বলছিলাম, খাল মজে যাওয়ায় সীমা নিয়ে অনেক সময় গোল বাধে। বছর কয়েক আগেও এই রকম জমি নিয়ে একটা মামলা হ'য়েছিল। তখন মামা বেঁচে ছিলেন। সে মামলায় শেষে মামাই জয়ী হলেন। আজ দুকুর বেলা তার নথীপত্রগুলা দেখছিলাম; সাক্ষীরা প্রায় সকলেই বলছে, জমিটা খালের উত্তর পাশে ছিল। সেখানে খালের একটা বেঁক থাকাতেই সেটা যেন হরিশচকের সীমানায় পড়েছে ব'লে বোধ হয়। এটাও ঠিক সেই ধরণের মামলা; এখানেও খালের একটা মস্ত বেঁক ছিল।"

অতঃপর তিনি কর্ম্মচারীকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিবাদী জমিটার পরিমাণ কত?"

কর্ম্মচারী বলিল, "তিন বিঘে সাত কাঠা।"

একটু ভাবিয়া বরদাবাবু বলিলেন, "আচ্ছা, এই তিন বিঘে সাতকাঠা নিয়ে তেরটা মাথা ফাটাতে হবে না, হাজার তিনেক টাকাও ন দেবায় ন ধর্ম্মায় দেবার দরকার নাই। এটা না হয়, লিলির বিয়েতে আমি যোগেশকে ছেড়ে দিলাম।"

সবিনয়ে কর্ম্মচারী জানাইল, "তা দিতে পারেন, কিন্তু—"

বিরক্তির সহিত বরদাবাবু বলিলেন, "কিন্তুটা আবার কি?"

কর্ম্মচারী বলিল, "কিন্তু এই সামিলে আর যে সব জমি আছে, সেগুলা নিয়ে গোল বাধতে পারে।"

বরদা। কত জমি?

কর্ম্মচারী। দু'তিন শো বিঘের কম হবে না।

বরদাবাবুর ললাট কুঞ্চিত হইল। তিনি গম্ভীরভাবে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। খানিক ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, যোগেশ যদি ছেড়ে দেয়?"

কর্ম্মচারী উৎফুল্লভাবে বলিল, "তা হ'লে তো কোন গোলই থাকে না।"

বরদাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোল তো থাকে না, কিন্তু ওর ক্ষতি কতটা হ'তে পারে?"

কর্ম্মচারী উত্তর করিল, "ক্ষতির মধ্যে ঐ বিবাদী জমিটুকু।"

মুখে নিশ্চিন্ততার ভাব আনিয়া বরদাবাবু বলিলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, এ সম্বন্ধে এক সময়ে যোগেশের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ঠিক করা যাবে। কি বল যোগেশ?"

যোগেশ বলিল, "এক সময় কেন, এখনি আমি দাবী ছেড়ে দিচ্চি।"

বরদাবাবু গম্ভীর হাস্য সহকারে বলিলেন, "বিষয় কর্ম্মের কাজ এত তাড়াতাড়ি কত্তে নাই হে, সকল দিক্ দেখে শুনে করাই কর্ত্তব্য।"

কর্ম্মচারী বলিল, "পরশু কিন্তু মোকদ্দমার দিন।"

"উকীলকে পোস্‌পন্ নিতে লিখে দাও।"

কর্ম্মচারী নমস্কার করিয়া প্রস্থান করিলে বরদাবাবু আলস্য ত্যাগপূর্ব্বক বলিলেন, "জমিদারীর মুখে ছাই! শুধু মামলা আর মামলা। যাক্, একটু বেড়িয়ে আসি চল। লিলি তো আর তোমার সামনে আসবে না যে, দু'টো গান শুনবো।"

বলিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে গাত্রোত্থান করিলেন। যোগেশও উঠিয়া তাঁহার পশ্চাৎ বাহির হইল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

বাহিরে আসিয়া মহেন্দ্রনাথ দেখিলেন, ভবসুন্দরী গৃহকর্ম্ম সমাপন করিয়া রান্না চাপাইয়া দিয়াছেন। মহেন্দ্রনাথ মুখে জল দিয়া রান্নাঘরের সম্মুখে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাত্রে তোমার না জ্বর হ'য়েছিল?"

ম্লান হাসি হাসিয়া ভবসুন্দরী বলিলেন, "হ'য়েছিল একটু।"

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "একটু কেন, বেশ জ্বর হ'য়েছিল। জ্বরে বেহুঁস হ'য়ে পড়েছিলে।"

ভবসুন্দরী নিরুত্তরে উনানে একখানা কাঠ গুঁজিয়া দিলেন। রোষরুদ্ধকণ্ঠে মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তোমরা কি ভেবেছ বল দেখি?"

সহাস্যে ভবসুন্দরী উত্তর করিলেন, "ভেবেছি, যা হয় এক মুঠো ভাতে ভাত ক'রে দিতে পারলেও তুমি খেয়ে কাজে যাবে।"

"চুলোয় যাব" বলিয়া মহেন্দ্রনাথ মুখ ফিরাইয়া লইয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। দুই পা গিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আমি কাজে যাব কে বললে?"

ব্যথিতস্বরে ভবসুন্দরী বলিলেন, "কাল তুমি নিজেই বলেছিলে—"

বাধা দিয়া উগ্রস্বরে মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "হাঁ, বলেছিলাম, বরদাবাবুর কাছে চাকরী নিয়ে আমি গোবিন্দ চৌধুরীর নিমকের ধার শোধ করবো। কেমন, না?"

স্বামীর এই অস্বাভাবিক ক্রোধটা ভবসুন্দরীর প্রাণে এমনই তীব্রভাবে গিয়া আঘাত করিল যে, সে আঘাতের বেদনাটা তিনি কিছুতেই গোপন করিতে পারিলেন না; চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসিল। সুতরাং মহেন্দ্রনাথের কথার কোন উত্তর না দিয়াই তিনি নীরবে মুখটা ফিরাইয়া লইলেন। মহেন্দ্রনাথ কিয়ৎক্ষণ তীব্রদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া নিজের ঘরে চলিয়া আসিলেন, এবং চাদরখানা কাঁধে ফেলিয়া খালি পায়েই বাহির হইয়া গেলেন।

নির্ম্মলা স্নান করিতে গিয়াছিল। সে আসিয়া জলের কলসীটা রান্নাঘরের দাবায় নামাইয়া রাখিতে রাখিতে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা কোথায় গেল মা?"

তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছিয়া ভবসুন্দরী উত্তর দিলেন, "কি জানি।"

মাতার মুখের দিকে সন্দিগ্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নির্ম্মলা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কাঁদছো নাকি মা?"

ভাল করিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে ভবসুন্দরী বলিলেন, "দূর, কাঁদবো কেন? কাঠগুলো বড্ড ভিজে, শুধু ধোঁয়া হচ্চে।"

নির্ম্মলা বলিল, "তুমি এবার উঠে যাও, আমি দেখছি।"

ঈষৎ হাসিয়া ভবসুন্দরী বলিলেন, "হাঁ তুই দেখবি। আমিই যার পেরে উঠচি না।"

"কে তোমাকে পারতে বলছে" বলিয়া নির্ম্মলা মায়ের হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিল। "আচ্ছা মেয়ে বাবা" বলিয়া ভবসুন্দরী হাসিতে হাসিতে আসিয়া তরকারী কুটিতে বসিলেন।

উনানে জ্বাল দিতে দিতে নির্ম্মলা জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা মা, আমাদের বাড়ী ঘর সব বেচে নেবে?"

ঈষৎ বিস্ময় সহকারে ভবসুন্দরী বলিলেন, "কে বেচে নেবে?"

মুখটা ফিরাইযা লইয়া নির্ম্মলা বলিল, "ঐ যে ঐ বাবুরা।"

"কে বললে?"

"ও বাড়ীর ছোটখুড়ী বলছিল।"

"তা বলুক।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া নির্ম্মলা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ওরা বেচে নেবে মা? আমরা ওদের কি করেছি?"

বিষাদগম্ভীরস্বরে ভবসুন্দরী বলিলেন, "ক'রবার মধ্যে উপকারই করেছি নিমি, অপকার কখন করা হয় নি।"

ঈষৎ তীব্রকণ্ঠে নির্ম্মলা বলিল, "সে উপকারের শোধ ওরা বুঝি এই রকমে দিচ্চে?"

ভবসুন্দরী ইহার উত্তরে শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

মহেন্দ্রনাথ বাড়ী ঢুকিয়া ডাকিলেন, "বড়-বৌ!"

ভবসুন্দরী উত্তর দিবার পূর্ব্বেই মহেন্দ্রনাথ বলিযা উঠিলেন, "মেয়ের বিয়ের যোগাড় কর। পরশু নিমির বিয়ে।"

আশ্চর্য্যান্বিতভাবে ভবসুন্দরী বলিয়া উঠিলেন, "পরশু!"

বিকৃতমুখে মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "হাঁ পরশু। কেন আরও তিন বছর অপেক্ষা কর্ত্তে চাও নাকি?"

বলিয়া তিনি কাঁধের চাদরখানা দাবার উপর ছুড়িয়া দিয়া বলিলেন, ওবেলা মেয়ে দেখতে আসবে।"

ভবসুন্দরী বলিলেন, "আচ্ছা।"

মহেন্দ্রনাথ দাবার উপর বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, "পাত্র কে জান?"

উৎকণ্ঠিতভাবে ভবসুন্দরী স্বামীর মুখের দিকে চাহিলেন। মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "পাত্র বনমালী খুড়ো।"

ভবসুন্দরী চমকিয়া উঠিলেন ; বলিলেন, "তিনি তো বুড়ো।"

ক্রোধবিকৃতকণ্ঠে মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কে বলছে যে যুবো।"

ভবসুন্দরী অর্দ্ধকর্ত্তিত বার্ত্তাকুটা বঁটির উপর ধরিয়া বিস্ময়স্তিমিতদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মহেন্দ্রনাথ মুখটা ফিরাইয়া লইয়া বলিলেন, "এখনো কি জমিদারের শাশুড়ী হ'বার সাধ আছে বড়-বৌ ?"

ভবসুন্দরী একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন, "জমিদারের শাশুড়ী হওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটে না, কিন্তু এ রকম ঘাটের মড়ার হাতেও কেউ প্রাণ ধরে মেয়ে দিতে পারে না।"

মহে। তুমি না পারলেও আমি পারি। কেন না আমার মানের ভয় আছে।

ভব। কিন্তু আমার তা নাই ; কাজেই তুমি পারলেও আমি পারবো না।

রাগে চীৎকার করিয়া মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তবে কি মেয়েটাকে গলায় বেঁধে আমাকে ডুবে মত্তে পরামর্শ দাও ?"

ক্রোধতীব্রকণ্ঠে ভবসুন্দরী বলিলেন, "তাতে তোমার দুর্ণাম হবে। সে কাজটা না হয় আমিই করবো।"

মহেন্দ্রনাথ নীরবে বসিয়া ঘন ঘন নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। সহসা যন্ত্রণাসূচক একটা অস্ফুট শব্দে চমকিত হইয়া তিনি ফিরিয়া চাহিলেন। দেখিলেন, রাগে রাগে তরকারি কুটিতে গিয়া ভবসুন্দরীর একটা আঙ্গুল কাটিয়া গিয়াছে, ক্ষত স্থান দিয়া দর-দর ধারায় রক্ত গড়াইতেছে।

নির্ম্মলা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিল, এবং ভিজা ন্যাকড়া দিয়া ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিতে লাগিল। মহেন্দ্রনাথ সে দিকে চাহিয়া একটু ম্লান হাসি হাসিলেন মাত্র।

খানিক পরে নির্ম্মলা বাটি হাতে পিতার সম্মুখে আসিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "বেলা হ'য়েছে বাবা, নেয়ে এস।"

মহেন্দ্রনাথ কন্যার মুখের দিকে একটা অর্থশূন্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন মাত্র। নির্ম্মলা পুনরায় বলিল, "অনেক বেলা হ'য়েছে বাবা।"

মহেন্দ্রনাথ নীরবে তাহার হাত হইতে তেলের বাটি লইয়া তৈলমর্দ্দনে প্রবৃত্ত হইলেন।

এমন সময় বাহির হইতে কে ডাকিল, "মহেন্দ্রবাবু!"

মহেন্দ্রনাথ উঠিয়া বাহিরে গিয়া দেখিলেন, যোগেশের জনৈক কর্ম্মচারী। কর্ম্মচারী নমস্কার করিয়া বলিল, "ওবেলা বাবু একবার দেখা কত্তে বলেছেন।"

"আচ্ছা" বলিয়া মহেন্দ্রনাথ পুনরায় বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

বরদাবাবুর সহিত কথোপকথনের পরদিন সকালে যোগেশ রমণীবাবুকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরিশচকে খানিকটা জমি নিয়ে বড় তরফের সঙ্গে নাকি মোকদ্দমা বেধেছে ?"

রমণীবাবু বলিলেন, "হাঁ, নায়েব বলে আমাদের চিঠা-পত্রে সে জমি—"

ক্রুদ্ধভাবে যোগেশ বলিল, "চুলোয় যাক্ চিঠা-পত্র। কিন্তু আমাকে তো এ কথা জানান নি ?"

রমণীবাবু বেশ সপ্রতিভভাবে উত্তর করিলেন, "সামান্য একটা মোকদ্দমা—"

বাধা দিয়া যোগেশ বলিল, "মোকদ্দমার আবার সামান্য বৃহৎ আছে নাকি ? বিশেষ সরিকী মোকদ্দমার। আপনি না একজন উকীল ?"

রমণীবাবু ইহাতে লজ্জা অনুভব না করিয়া সগর্ব্বে বলিলেন, "অমি উকীল ব'লে, আইনে আমার অভিজ্ঞতা আছে ব'লেই এ মোকদ্দমায় মত দিয়েছি। কারণ যেটা ন্যায্য সম্পত্তি—"

ক্রোধে ভ্রূকুটী করিয়া যোগেশ বলিল, "ন্যায্য হোক্ অন্যায্য হোক, আমার সম্পত্তি রাখবার বা ছেড়ে দেবার অধিকার আমার আছে তা জানেন বোধ হয়।"

রমণী। সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

যোগে। তা হ'লে জমিটা ছেড়ে দিয়ে মোকদ্দমা মিটিয়ে ফেলুন।

রমণী। কিন্তু জমিটা ছেড়ে দিলে—

যোগে। আমার জমীদারীটা উড়ে যাবে না, বরং কতকগুলো টাকা অন্যায় খরচের হাতে হ'তে বাঁচবে।

ইহার উপর রমণীবাবু আর প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। যোগেশ কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মহেন্দ্রবাবুর কাছে সব টাকা আদায় হ'য়েছে ?"

রমণীবাবু বলিলেন, "এখনো দু'হাজার টাকা বাকী।"

ঈষৎ শ্লেষপূর্ণস্বরে যোগেশ বলিল, "সেটা কি আমার ন্যায্য পাওনা নয়? তার আদায়ের কোন চেষ্টা করেছেন!"

রমণীবাবু বলিলেন, "ডিক্রীজারি হ'য়ে আছে। কিন্তু আদায়ের তো কোন সম্ভাবনা দেখি না।"

বিরক্তভাবে যোগেশ বলিল, "অন্য উপায় না থাকে, স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করুন।"

যোগেশের ভাব দেখিয়া রমণীবাবু বিস্মিত হইলেন। যোগেশ একটু থামিয়া বলিল, "এ দিকে আমার কাছে বললেন, চাকরী আর করবেন না, অথচ কাকাবাবুর কাছে চাকরীর উমেদারীতে গিয়েছিলেন।"

সহাস্যে রমণীবাবু বলিলেন, "আপনার কাছে চাকরী করলে অপমান হ'তো নাকি?"

"বোধ হয়" বলিয়া যোগেশ মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিল, "মান তো ভারী। একটা ষাট বছরের বুড়োর হাতে মেয়েটাকে ধরে দিচ্চেন।"

"তাই নাকি" বলিয়া রমণীবাবু একটু উপহাসের হাসি হাসিলেন। যোগেশ বলিল, "চুলোয় যাক্, দু'এক দিনের মধ্যেই ক্রোকী পরোয়ানা বা'র ক'রে ফেলুন।"

রমণীবাবু স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলেন। দরজার নিকট গিয়া সহসা ফিরিয়া বলিলেন, "ভাল কথা, বরদাবাবুকে যে পনরো হাজার টাকা দেওয়া হ'য়েছে তা'র রসিদাটা—"

বাধা দিয়া যোগেশ বলিল, "তার জন্য আপনার চিন্তা নাই।"

রমণীবাবু আর কিছু না বলিয়া প্রস্থান করিলেন। যোগেশ একজন কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া মহেন্দ্রনাথের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

মহেন্দ্রনাথের সহিত, সাক্ষাতের যে বিশেষ প্রয়োজন ছিল তাহা নহে। কিন্তু সকালে গোপাল ঠাকুরের মুখে যখন শুনিল যে, মহেন্দ্রনাথ বৃদ্ধ বনমালী ঘোষালের হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখন হইতেই তাহার মনটা যেন কেমন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, একটা বালিকার পরিণাম চিন্তা হইতে সে কিছুতেই মনকে নিবৃত্ত করিতে পারিল না। সেই সঙ্গে এই বীভৎস বিবাহ ব্যাপারের সহিত যেন আপনাকেও অনেকটা জড়িত বলিয়া তাহার মনে হইল। ছি-ছি, সেই চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকাকে এমন অগ্নিপরীক্ষার মুখে সমর্পণ! যোগেশের মনে হইল, জগতে যতপ্রকার নিষ্ঠুরতা আছে, এইটাই তাহাদের মধ্যে সব চেয়ে বেশী নিষ্ঠুরতা।

সেদিন নূতন বাড়ীর উপরের একটা ঘরে দাঁড়াইয়া যোগেশ দেখিয়াছিল, নির্ম্মলা স্নানান্তে একখানা লোহিত পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া শিব-পূজা করিতে বসিয়াছে। আর্দ্র কেশরাশি পৃষ্ঠবাস আবৃত করিয়া মৃত্তিকা স্পর্শ করিতেছে। যেন পার্ব্বত্য গৈরিক ভূমির উপর যমুনার কৃষ্ণ সলিল-রাশি তরঙ্গায়িত হইতেছে। আর তাহারই পাশে বালিকার স্নানশুদ্ধ মুখখানা যেন প্রাতঃসূর্য্যের প্রতিবিম্বের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে; ভক্তি ও প্রীতির কিরণে সে মুখমণ্ডল মহিমান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। সেই পবিত্রতা-মণ্ডিত মাধুর্য্যময় মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে যোগেশ এমনই আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছিল যে, বহুক্ষণেও সে দিক হইতে দৃষ্টিকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারে নাই। তারপর পূজান্তে নির্ম্মলা দেবতাকে প্রণাম করিয়া মুখ তুলি-তেই যখন যোগেশের আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টির সহিত তাহার দৃষ্টি সম্মিলিত হইয়াছিল, তখন সে একটুও ব্যস্ততা বা সঙ্কোচের ভাব প্রকাশ করে নাই; সে স্থির-শান্ত দৃষ্টিতেই মুহূর্ত্তকাল যোগেশের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিয়াছিল। তাহার দৃষ্টির সেই প্রশান্তভাব, মুখমণ্ডলের সেই প্রসন্নতাপূর্ণ গাম্ভীর্য্য যোগেশ আজিও বিস্মৃত হইতে পারে নাই।

সেই বালিকার এরূপ কঠোর পরিণাম চিন্তায় যোগেশ যেন অনেকটা ব্যাকুল হইয়া পড়িল। ছি-ছি, দেশে কি মানুষ নাই? সমাজের কি প্রাণ নাই? মানুষের জীবন লইয়া, একটা কোমলপ্রাণা বালিকার সুখ-দুঃখ লইয়া, সমাজ কি এমনই কন্দুক-ক্রীড়া করিতে পারে? যোগেশ যদি লিলিকে না দেখিত, তাহাকে যদি হৃদয়ের অনেকটা স্থান ছাড়িয়া না দিত, কাকাবাবুর নিকট হইতে যদি উপহাসের ভয় না থাকিত, তাহা হইলে হয় তো সে নিজেই এই বালিকার অদৃষ্ট-চক্রটাকে এমন নিতান্ত কঠোর পথ হইতে ঘুরাইয়া বেশ একটা কোমলপথে চালাইয়া দিতে পারিত। কিন্তু সে উপায় যে আর নাই।

উপায় নাই বলিয়াই যোগেশ নিশ্চিন্ত হইল না। উপায় হীনতার মধ্যেও সে উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিল, এবং অনেক ভাবিয়া যে উপায় স্থির করিল, তাহার সমাধানের জন্য মহেন্দ্রনাথকে ডাকিয়া পাঠাইল।

কিন্তু সমগ্র অপরাহ্নটা নিদারুণ উৎকণ্ঠার সহিত প্রতীক্ষা করিয়াও যোগেশ যখন মহেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পাইল না, তখন গভীর অবসাদে তাহার মনটা যেন তিক্ত হইয়া উঠিল। সন্ধ্যার সময় বেশভূষা করিয়া সে বাটীর বাহির হইল। উদ্দেশ্য বরদাবাবুর নিকট যাইবে। কিন্তু হঠাৎ গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া মহেন্দ্রনাথের বাড়ীর দিকে চলিল।

মহেন্দ্রনাথের বাটীতে উপস্থিত হইয়া যোগেশ যাহা দেখিল, তাহাতে সে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। দেখিল, বৃদ্ধ বনমালী ঘোষাল স্বয়ং পাত্রী দেখিতে আগমন করিয়াছেন। শুধু ইহাতেই তিনি নিরস্ত হন নাই, যুবজনোচিত বেশভূষায় আপনাকে ভূষিত করিয়া তিনি স্বীয় জরা-বিশ্লথ দেহের গ্লানিকে আবৃত করিবার জন্য এমন অস্বাভাবিক চেষ্টা করিয়াছেন, যাহাতে নিতান্ত নির্ব্বোধ ব্যক্তিরও হাস্যসংবরণ করা দুষ্কর। কিন্তু তাহাতে তিনি নিজে একটুও সঙ্কুচিত নহেন, বরং বেশ প্রসন্ন গম্ভীর ভাবেই বরের আসন গ্রহণ করিয়া বসিয়া আছেন। আর তাঁহার লোলুপ-দৃষ্টির সম্মুখে নব-বসন্তস্পৃষ্টা লতাটির মত বালিকা নির্ম্মলা লজ্জা ও সঙ্কোচে যেন আপনাকে সম্পূর্ণ ঢাকিয়া ফেলিয়া নতমস্তকে বসিয়া রহিয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী প্রদীপের আলোকে তাহার আরক্ত কপোল-দেশে যে একটা ঘৃণাবিমিশ্র বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা ঘোষাল মহাশয় লক্ষ্য করিতে পারিতেছেন না। উপস্থিত প্রতিবেশীরা, সমবেত আত্মীয় স্বজনেরাও যে তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন এমন বোধ হইতেছে না। তাহারা বরের সম্পত্তি ও কন্যার রূপগুণের ব্যাখ্যাতেই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

এমন সময় সহসা যোগেশকে উপস্থিত দেখিয়া সকলেই সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল, ঘোষাল মহাশয় ব্যস্ততার সহিত একেবারে দাঁড়াইয়া পড়িলেন। মহেন্দ্রনাথ কিন্তু একটুও ব্যস্ততা প্রকাশ করিলেন না; তিনি সাধারণ ভাবে অভ্যর্থনা করিয়া যোগেশকে বসিতে বলিলেন। যোগেশও নীরবে ধীরে-ধীরে গিয়া সমবেত প্রতিবেশীদিগের পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিল। প্রতিবেশীরা সসঙ্কোচে একটু সরিয়া বসিল।

গোপাল ঠাকুর ঘটকরূপে উপস্থিত ছিলেন। তিনি হর্ষ-প্রফুল্ল কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "শিবের বিবাহে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্র সকলেই উপস্থিত ছিলেন। আমাদেরও আজ শিবের বিবাহের উদ্যোগ; দেবরাজ ইন্দ্র এখানে উপস্থিত না হইয়া কি থাকিতে পারেন। কি বলেন ঘোষাল মহাশয়?"

ঘোষাল মহাশয় দন্তহীন মুখে মৃদুহাসির লহর তুলিয়া বলিলেন, "আমার সৌভাগ্য, আমার সৌভাগ্য।"

বক্তার সম্মান রক্ষার জন্য যোগেশ একটু হাসিল বটে, কিন্তু অন্তরে গভীর বিরক্তি অনুভব করিয়া অন্য-দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল। এই সময়ে নির্ম্মলাও তাহার দিকে বক্র কটাক্ষপাত করিল। মুখ ফিরাইতে যাইতেই তাহা যোগেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। যোগেশ সবিস্ময়ে দেখিল, এখনও তাহার দৃষ্টিতে সেই প্রসন্নতা, সেই মাধুর্য্য। বলির পশুটা অজ্ঞ জীব হইলেও উৎসর্গের মন্ত্র শুনিতে-শুনিতে বুঝি ইহা অপেক্ষা একটু চাঞ্চল্য প্রকাশ করে। কিন্তু ইহার চোখে মুখে কাতরতার চিহ্নমাত্র নাই। অদ্ভুত এই বালিকা!

গোপাল ঠাকুর ঘোষাল মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "নামধাম জিজ্ঞাসা করার যে প্রথা আছে সেগুলা সেরে ফেলুন না।"

বরের সঙ্গিরূপে যিনি আসিয়াছিলেন, তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "চেনা বামুনের পৈতার দরকার হয় না।"

গোপাল ঠাকুর বলিলেন, "তবু যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ। যে কাজের যা অঙ্গ সেগুলা চাই তো।"

ঘোষাল মহাশয় তখন একটু সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া, নির্ম্মলার মুখের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নামটি কি গা?"

তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির উপর আপনার প্রশান্ত দৃষ্টি স্থাপন করিয়া নির্ম্মলা বেশ গম্ভীর স্বরেই উত্তর দিল, "শ্রীমতী নির্ম্মলাবালা দেবী।"

তাহার এই অসঙ্কুচিত উত্তরে ঘোষাল মহাশয় যেন একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন। তিনি দৃষ্টিটা ঈষৎ নত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি রাঁধতে জান?"

নির্ম্মলা ঘাড় দোলাইয়া উত্তর দিল, "হাঁ।"

পাশ হইতে একটা ডেঁপো ছোকরা বলিয়া উঠিল, "চমৎকার পান ছেঁচতে পারে।"

ঘোষাল মহাশয় ভ্রূকুটী করিলেন। গোপাল ঠাকুর অপ্রতিভ ভাবে বলিলেন, "ওহে, গৃহধর্ম্মে সকল কাজই জানা দরকার।"

বরের সঙ্গী জিজ্ঞাসা করিলেন, "লিখতে পড়তে জান?"

এবার নির্ম্মলা লজ্জায় মাথা হেঁট করিল; মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "জানি।"

"কি বই পড়েছ?"

"চারুপাঠ প্রথম ভাগ, পদ্যপাঠ দ্বিতীয় ভাগ।"

ঘোষাল মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আঁক কষতে জান?"

নির্ম্মলা বলিল, "ভেরিজ জমাখরচ জানি।"

সেই ডেঁপো ছোকরাটি বলিয়া উঠিল, "সুদকষাটা আপনি শিখিয়ে দেবেন।"

উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মৃদু হাস্যধ্বনি উত্থিত হইল। গোপাল ঠাকুর সেই ছোকরাকে একটা ধমক দিলেন।

ঘোষাল মহাশয় নির্ম্মলার হাতে একটি মোহর দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলে নির্ম্মলা মাটীতে মাথা ঠেকাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। তার পর গোপাল ঠাকুরের আদেশক্রমে উঠিয়া ধীরে ধীরে বাটীর মধ্যে চলিয়া গেল। যাইবার সময় তাহার সহাস্য দৃষ্টিটা তির্য্যক্‌ ভাবে আসিয়া একবার যোগেশের মুখের উপর পতিত হইল।

যোগেশ যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল, তেমনই নিঃশব্দে উঠিয়া প্রস্থান করিল। সে বৈঠকখানার বাহিরে আসিতেই মহেন্দ্রনাথ তাহার সম্মুখীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমায় ডেকেছিলে যোগেশ?"

যোগেশ তাঁহার দিকে না চাহিয়াই উত্তর দিল, "হাঁ।"

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "এঁরা আসবেন ব'লে আমি যেতে পারি নাই।"

যোগেশ নিরুত্তরে পাশ কাটাইয়া প্রস্থানের উপক্রম করিল। মহেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে?"

"না" বলিয়াই যোগেশ দ্রুতপদে চলিয়া গেল। মহেন্দ্রনাথ বিস্মিত ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

গোপাল ঠাকুর ডাকিয়া বলিলেন, "এবার একটু মিষ্টিমুখ করিয়ে দিন না মহেন্দ্রবাবু। জানেন তো মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ।"

বলিয়া তিনি হাসিয়া উঠিলেন। মহেন্দ্রনাথ ব্যস্তভাবে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

যোগেশ যখন বাড়ী ফিরিল, তখন তাহার মনের ভিতর তুমুল বিপ্লব চলিতেছে। সে আজ যে দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিল, সেটা তাহার নিকট এমনই বীভৎস ব্যাপার বলিয়া প্রতীতি হইল যে, তাহার অন্তরটা ঘৃণা ও বিরক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। এই দৃশ্যটাকে বিস্মৃত হইবার জন্য সে যতটা পারিল, পতিটা ক্ষিপ্র করিয়া আনিল; কিন্তু বৃদ্ধ বনমালী ঘোষালের লুব্ধ দৃষ্টির সম্মুখে নির্ম্মলার সেই হাস্যপ্রফুল্ল সতেজ দৃষ্টিটাকে কিছুতেই মন হইতে দূরীভূত করিতে পারিল না। পথের গাঢ় অন্ধকারের মধ্যেও সে দৃষ্টিটা যেন উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হইয়া তাহার অন্তরকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। নৈশবায়ু-প্রবাহে সঞ্চালিত বৃক্ষশাখাগুলা পর্য্যন্ত যেন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া উপহাস করিতে লাগিল। যোগেশ কোন দিকে না চাহিয়া একপ্রকার ছুটিয়া চলিল, এবং নিজের ঘরে ঢুকিয়া যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

ঘরে আসিয়া যোগেশ কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। তার পর উঠিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক ধীরে ধীরে বারান্দায় গিয়া বসিল। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি; স্তূপে স্তূপে অন্ধকার আসিয়া যেন পৃথিবীটাকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। তরল মেঘের অবকাশ দিয়া দুই একটা নক্ষত্র করুণ দৃষ্টিতে অন্ধকার কবলিত ধরণীর দিকে চহিয়া রহিয়াছে। গভীর নিস্তব্ধতার সমুদ্রে বিশ্বটা যেন ডুবিয়া গিয়াছে। সেই অন্ধকারস্তূপের দিকে চাহিয়া যেগেশ স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল।

উঃ, কি ভীষণ নিষ্ঠুরতা! এই যষ্টিবর্ষীয় বৃদ্ধের হস্তে একটা বালিকাকে সমর্পণ করিয়া বালিকার নারীজীবনের সকল আশা-ভরসার মূলে কুঠারাঘাত করা হইতেছে, অথচ কেহই ইহাতে বাঙ্‌নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত করিতেছে না, এই ক্ষুদ্র বালিকার মুখের দিকে ফিরিয়াও চাহিতেছে না। বরং অনেকেই এই বিসদৃশ মিলন-ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। তাহাদের নিকট এই ব্যাপারটা যেন নিতান্ত স্বাভাবিক। ছি ছি, সমাজের একি নীচতা, একি নিদারুণ নিষ্ঠুরতা! সমাজে এমন কোন হৃদয়বান্‌ লোক নাই কি, যে এই নির্ম্মমতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারে? কে দাঁড়াইবে? কন্যাদায়ের ভীষণতা যে কুক্কুর-বিষের ন্যায় সমাজের সর্ব্ব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পরিব্যাপ্ত হইয়া তাহাকে অবসন্ন করিয়া তুলিয়াছে। এ বিষের কি চিকিৎসা নাই, ঔষধ নাই? ইহার জন্য মাতাপিতা অপত্যস্নেহ বিস্মৃত হইবে, সমাজ ন্যায়ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিবে, আর বালিকার ব্যর্থ জীবনের অভিশাপে, বিধবার কঠোর তপ্তশ্বাসে হিন্দুসমাজ দিন দিন ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইবে?

নির্ম্মলার হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টিটা ঠিক এই ভাবই যেন ব্যক্ত করিয়াছিল না? তাহার সেই সহাস্য দৃষ্টির মধ্যে হইতে যেন এমনই একটা উপহাসের তীব্রতা ফুটিয়া

উঠিয়া স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছিল, "এই দেখ, তোমরা সবল পুরুষ; তোমাদের সুখের দ্বারে, স্বার্থের মন্দিরতলে অবলা আমরা কিরূপে আত্মবলি দিতে পারি।" উঃ কি কঠোর পরিহাস! ভাবিতে ভাবিতে যোগেশের নিশ্বাস যেন রোধ হইয়া আসিতে লাগিল।

কতক্ষণ যে এইভাবে কাটিল, তাহা যোগেশ বুঝিতে পারিল না। ভৃত্য আসিয়া আহারের কথা স্মরণ করাইয়া দিলে তাঁহার চমক হইল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘরে আসিয়া দেখিল, ঘড়ীতে এগারটা বাজিয়া গিয়াছে। যোগেশের সেদিন আহারে আদৌ প্রবৃত্তি ছিল না। শুধু খানিকটা জল খাইয়াই সে শুইয়া পড়িল। ভৃত্য আলো নিবাইয়া দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল।

ঘুমও সেদিন ভাল হইল না। চক্ষু মুদ্রিত করিলেই ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের জ্বলন্ত দৃষ্টির সম্মুখে অসহায়া হরিণীর সহাস্যমুখে আত্মসমর্পণের দৃশ্য দেখিয়া চমকিয়া উঠিতে লাগিল।

সকালে উঠিয়া বাহিরে আসিতেই ভৃত্য জানাইল, মহেন্দ্রবাবু বৈঠকখানায় বসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। যোগেশ তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুইয়া বৈঠকখানায় উপস্থিত হইল।

মহেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল কি জন্য গিয়েছিলে যোগেশ?"

যোগেশ উত্তর করিল, "আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার ছিল।"

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কি কথা?"

যোগেশ একটু তীব্রকণ্ঠে উত্তর করিল, "আপনি ব'লছিলেন, জমিদারী সেরেস্তায় চাকরী আর করবেন না।"

কথাটা মহেন্দ্রনাথ বুঝিতে পারিলেন। বুঝিয়া সহাস্যে বলিলেন, "অভাবে পড়লে কয়টা লোক প্রতিজ্ঞা বজায় রাখতে পারে যোগেশ?"

যোগেশ। সকলে না পারলেও দু'একজন বোধ হয় রাখতে পারে।

মহেন্দ্র। আমি অবশ্য সে দু'এক জনের মধ্যে গণ্য হ'তে পারি না।

যোগেশ। আমার কিন্তু সেই রকম ধারণাই ছিল।

মহেন্দ্রনাথ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন, "কন্যাদায় কিরূপ ভয়ানক তা কি জান যোগেশ?"

যোগেশ বলিল, "কিন্তু আপনি সে দায়টাকে তো খুব সহজ ক'রেই এনেছেন।"

"মেয়েটার অদৃষ্ট" বলিয়া মহেন্দ্রনাথ সশব্দে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। যোগেশ নিঃশব্দে গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিল।

একটু পরে মহেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বরদাবাবুর সঙ্গে নাকি মোকদ্দমা বেধেছে?

যোগেশ বলিল, "বেধেছিল, কিন্তু সে সব মিটিয়ে দিয়েছি।"

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "বরদাবাবু বোধ হয় জমিটার দাবী ছেড়ে দিলেন?"

যোগেশ বলিল, "না, আমিই ছেড়ে দিয়েছি।"

"তুমি ছেড়ে দিযেছ?"

মহেন্দ্রনাথের চোখে মুখে ক্ষোভ ও বিস্ময়ের রেখা ফুটিয়া উঠিল। যোগেশ শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। মহেন্দ্রনাথ ক্ষোভ-রুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "জমিটার দাবী ছেডে দিয়েছ? ক'রেছ কি যোগেশ?"

যোগেশ দৃষ্টি নত করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "কাজটা খুব অন্যায় হ'য়েছে কি?"

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "খুবই অন্যায় হয়েছে। তুমি জান কি, এই জমিটা হাতে রাখবার জন্য বাবু কত টাকা খরচ ক'রেছেন?"

যোগেশ মুখ তুলিয়া ঈষৎ কঠোরস্বরে বলিলেন, "জেদ বজায় ক'রবার জন্য হাজার হাজার টাকার মায়া ছাড়া অপেক্ষা জেদটাকে ছাড়াই আমি ভাল মনে করি।"

উত্তেজিতকণ্ঠে মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তুমি নিতান্ত ছেলেমানুষ ব'লেই এ রকম মনে কত্তে পার। এই একটা জমির সঙ্গে তোমাকে কতটা সম্পত্তি ছাড়তে হবে তা জান কি?

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া যোগেশ বলিল, "যতটা সম্পত্তিই হোক, তার জন্য আমি আত্মীয়ের সঙ্গে বিবাদ কত্তে ইচ্ছা করি না।"

ক্রোধকম্পিতকণ্ঠে মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আত্মীয় কা'কে বলছো? বরদাবাবু তোমার আত্মীয়?"

"নিতান্ত অনাত্মীয়ও নই মহেন্দ্রবাবু" বলিয়া বরদাবাবু হাসিতে হাসিতে বৈঠকখানায় প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া যোগেশ একটু সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। বরদাবাবু কিন্তু নির্ব্বিকারভাবে সহাস্য মুখে অগ্রসর হইয়া ইজি চেয়ারটার উপর বসিয়া পড়িলেন, এবং মহেন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করিয়া শান্ত-প্রফুল্লকণ্ঠে বলিলেন, "যে যতই বলুক মহেন্দ্রবাবু, আত্মীয় যে, সে চিরকালই আত্মীয় থাকে, আর অনাত্মীয়ও কখন আত্মীয় হয় না।

তা সে মুখে যতই আত্মীয়তা প্রকাশ করুক। যাক, তা হ'লে তোমার মতে কি মোকদ্দমা করাই ভাল বোধ হয়?"

মহেন্দ্রনাথ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিষাদগম্ভীর-স্বরে বলিলেন, "আমার মতামতে এখন আর কিছুই আসে যায় না ছোটবাবু, আর মৌখিক আত্মীয়তা দেখাতেও আমি আসি নাই। তবে এইটুকু জেনে রাখ্‌বেন, মহেন্দ্রনাথ বেঁচে থাকতে কেউ যে গোবিন্দ চৌধুরীর সম্পত্তির একটি টুকরো নিযে হজম করবে তা হবে না।

বলিয়া মহেন্দ্রনাথ উঠিযা দাঁড়াইলেন এবং বরদাবাবুর উচ্চ হাস্যধ্বনি কক্ষমধ্যে প্রতিধ্বনিত হইবার পুর্ব্বেই বিদ্যুদ্বেগে বাহির হইয়া গেলেন।

বরদাবাবু খুব খানিকটা হাসিলেন, তার পব খানিক কাশিয়া কতকটা প্রকৃতিস্থ হইযা যোগেশকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "লোকটার মাথা খারাপ হ'য়ে গিয়েছে। আমার কাছে গিযে চাকরী করবে ঠিক ক'রে এলো, তার পর আর দেখা নাই।"

যোগেশ নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। বরদাবাবু বলিলেন, "মাথা খারাপ না হ'লে বুড়ো বনমালী ঘোষালের হাতে মেয়ে দেয? বুড়ো আমাদেরই পিতামহের বয়সী। ঠিক কি না?"

উত্তরে যোগেশ একটু ম্লান হাসি হাসিল মাত্র। বরদাবাবু পকেট হইতে একটা চুরুট বাহির করিয়া তাহা ধরাইবার উদ্যোগ করিতে করিতে বলিলেন, "ভাল কথা, অনিলের চিঠি এসেছে।"

বলিয়া তিনি বাঁ হাতে চুরুটটা ধরিয়া ডান হাতে পকেট হাতড়াইতে লাগিলেন, এবং পকেট হইতে কতকগুলো কাগজ বাহির করিয়া দেখিতে দেখিতে বলিলেন, "না, চিঠিখানা টেবিলের উপরেই পড়ে আছে।"

কাগজগুলাকে পুনরায় পকেটে ফেলিয়া বরদাবাবু চুরুটে অগ্নিসংযোগ করিলেন। যোগেশ আগ্রহপূর্ণদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বরদাবাবু বলিলেন, "লিখেছে কি জান, বিবাহে তার আপত্তি নাই, তবে এখন ছুটী পাচ্চে না, কাজেই আসতে পারবে না। আর খরচ পত্র—"

বলিয়া বরদাবাবু চুরুটে আর একটা টান দিলেন, এবং একবার কাশিয়া বলিলেন, "তা খরচ—কতই বা খরচ, আমিই না হয় দেব। আমারও তো পর নয়।"

যোগেশের ললাট কুঞ্চিত হইল। সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইযা 'খবরের কাগজখানা টানিয়া লইল। বরদাবাবু আপন মনে চুরুট টানিতে লাগিলেন।

এমন সময় রমণীবাবু উপস্থিত হইয়া যোগেশকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "মহেন্দ্রবাবুর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের পরোয়ানা নিয়ে পেয়াদা এসেছে। তা হলে বেণীবাবুকে সঙ্গে দিযে—"

যোগেশ তড়িদ্‌গতিতে মুখ ফিরাইযা রমণীবাবুর মুখের উপর তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। বরদাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহেন্দ্রবাবুর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক! তার এখনো দেনা আছে নাকি?"

রমণীবাবু উত্তর করিলেন, "এখনো হাজার দুই টাকা বাকী আছে।"

"বটে" বলিয়া বরদাবাবু চুরুটের ছাই ঝাড়িতে লাগিলেন। যোগেশ ধীরে ধীরে দৃষ্টিটাকে আবর্ত্তিত করিযা পুনরায সংবাদপত্রে স্থাপন করিল। রমণীবাবু উত্তরের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। বরদাবাবু যোগেশের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল না মহেন্দ্রবাবুর মেয়ের বিয়ে?"

যোগেশ দৃষ্টি না ফিরাইয়াই গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, "হাঁ"।

বরদাবাবু ধীরে ধীরে মস্তক সঞ্চালন পূর্ব্বক বলিলেন, "কাজটা কিন্তু ভাল হ'লো না যোগেশ। ভদ্রলোকের মেয়ের বিযে কাল, আর আজ এই কাণ্ড। রমণীবাবু কি বলেন?"

রমণীবাবু একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "আমি হুকুমের চাকব মাত্র।"

বরদাবাবু বলিলেন, "তা হ'লেও মানুষ মাত্রেরই একটা কর্ত্তব্যবুদ্ধি আছে তো?"

ভ্রূকুটী করিয়া যোগেশ কঠোর স্বরে বলিল, "আমার কিন্তু সে বুদ্ধি বিন্দুমাত্র নাই কাকাবাবু। আমি পাওনাদার, আমার কর্ত্তব্য প্রাপ্য আদায় করা।"

অতঃপর রমণীবাবুর দিকে ফিরিয়া দৃঢ় গম্ভীর-কণ্ঠে বলিল, "বেণীবাবুকে সঙ্গে দিলে হবে না, আপনাকে নিজে যেতে হবে। জিনিষপত্র সমস্ত এখন নূতন বাড়ীতে তুল্‌বেন। দেখবেন, একটা কুটা পর্য্যন্ত যেন বাদ না যায়।"

রমণীবাবু নমস্কার করিয়া প্রস্থান করিলেন। বরদাবাবু মৃদু গম্ভীর হাস্য সহকারে বলিলেন, "এতদিনে তুমি জমিদারী রক্ষার উপযুক্ত হ'য়েছ যোগেশ। এমনি কঠোর না হ'লে জমিদারী চালান যায় না।"

যোগেশ আরক্ত মুখটা ফিরাইয়া লইল। বরদাবাবু ছড়ি গাছটা তুলিয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেলেন। যোগেশ কিয়ৎক্ষণ নিস্পন্দভাবে বসিয়া রহিল। তার পর ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া স্নান করিতে চলিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

স্নানের ঘাটে সেদিন জনতাটা যেন একটু বেশী হইয়াছিল। বৃদ্ধ নরহরি বাপুলী স্নানান্তে ঘাটের শেষ সোপানে বসিয়া আহ্নিক করিতেছিলেন, আর তাঁহার আশে-পাশে জলে ও স্থলে পাঁচ সাত জন দাঁড়াইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল। বাপুলী মহাশয় মধ্যে-মধ্যে আহ্নিক হইতে বিরত হইয়া তাহাদিগকে কি উপদেশ দিতেছিলেন। এমন সময়ে যোগেশকে ঘাটে উপস্থিত হইতে দেখিয়া সকলেই যেন একটু সম্ভ্রস্ত হইয়া পড়িল। বাপুলী মহাশয় অতিমাত্র ব্যস্ততার সহিত যজ্ঞোপবীত সমেত দক্ষিণ হস্ত ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "জয় হোক বাবা, তোমার জয় হোক! তুমি আজ ব্রাহ্মণের মান রক্ষা ক'রে, বাক্য রক্ষা ক'রে, গোবিন্দবাবুর পুত্রের উপযুক্ত কাজ ক'রেছ। জয় হোক বাবা, তোমার জয় হোক।"

এই আকস্মিক প্রশংসাবাদ এবং জয় ঘোষণার মর্ম্মাবধারণে অসমর্থ হইয়া যোগেশ হতবুদ্ধির ন্যায় দাঁড়াইয়া পড়িল। বাপুলী মহাশয় কিন্তু তাহার বিস্ময়ের ভাবটাকে আমলে না আনিয়াই হর্ষোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "হাঁ, একেই বলে ব্রহ্মশাপ। ছ'মাস ছ'মাস নয়, দু'দিন দশদিন নয়, সঙ্গে সঙ্গে দু'টি ঘণ্টার মধ্যে ফলে গেল। তবু লোকে বলে কলিতে দেবতা ব্রাহ্মণ নাই। আরে দেবতা ব্রাহ্মণ নাই তো সৃষ্টি রক্ষা হচ্চে কার জোরে?"

বলিয়া তিনি সমবেত শ্রোতৃবর্গের দিকে সগর্ব্ব দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। যোগেশ কিন্তু দেবতা ব্রাহ্মণের অখণ্ড প্রতাপ সম্বন্ধে স্পষ্টতর কোন প্রমাণ না পাইয়া কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে বাপুলী মহাশয়ের ব্রাহ্মণত্বের মহিমা স্মরণে দৃপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সিদ্ধেশ্বর বিশ্বাস যোগেশের এই বিস্ময়ভাব অপনোদন উদ্দেশ্যে যাহা জানাইল, তাহার মর্ম্ম এই যে, গোপাল ঠাকুর কর্ত্তাভজার দল ছাড়িয়া আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অন্যতমা গোপী বিরাজ মোহিনীর মায়া ত্যাগ করিতে পারেন নাই, তিনি ত্যাগ করিতে চাহিলেও বিরাজ কিন্তু এই প্রেমিক সাধুপুরুষের সঙ্গ ছাড়িতে রাজী হয় নাই। সুতরাং সে এ পর্য্যন্ত গোপাল ঠাকুরের আশ্রয়েই বাস করিতেছিল। কিন্তু ইদানীং তাহার স্বভাব-চরিত্র এমনই দূষিত হইয়া পড়িয়াছে যে, যে কোন ধার্ম্মিক লোকের পক্ষেই তাহাকে আশ্রয় দেওয়া মহাপাপ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। এজন্য স্বধর্ম্মনিষ্ঠ গোপাল ঠাকুর তাহাকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিলে সে নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে। কিন্তু কেহই এই পাপিষ্ঠাকে আশ্রয় দানে সাহসী হয় নাই। পরিশেষে মহেন্দ্র মুখুজ্যে তাহাকে স্বগৃহে স্থান দান করিয়া অধার্ম্মিকতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। গোপাল ঠাকুর তাঁহাকে এই কার্য্য হইতে বিরত হইবার জন্য বার বার উপদেশ দিয়াছিলেন। মহেন্দ্রনাথ তাঁহার উপদেশে কর্ণপাত করেন নাই। কিন্তু পাপের ফল হাতে-হাতে ফলিয়াছে। পাপিষ্ঠাকে আশ্রয় দিবার ঘণ্টা দুই পরেই আদালতের পেয়াদা আসিয়া মহেন্দ্রনাথের ঘর দরজা ক্রোক করিয়াছে। ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণের অভিসম্পাত কি ব্যর্থ হয়!

তাহাদের এই অসাধারণ ধর্ম্মনিষ্ঠা দর্শনে যোগেশ একটু না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। মদন ঘোষ কিন্তু প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "রেখে দাও তোমার ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ! মাগী এতদিন পবিত্র ছিল, আর আজ অপবিত্র হ'য়ে গেল। আসল কথা, মাগীর হাতে যা দু'পয়সা ছিল তা বামুনের বাক্সে উঠেছে। কাজেই এখন সে অপবিত্র হ'য়ে পড়েছে। ও এক-চোখো বামুনকে কে না জানে।"

ব্রাহ্মণের নিন্দা শ্রবণে বাপুলী মহাশয় গর্জ্জিয়া উঠিলেন, এবং শূদ্র হইয়া ব্রাহ্মণের নিন্দা করিলে পরলোকে নরক নামক অজ্ঞাত স্থলবিশেষে যমদূতের হস্তে কিরূপ ভয়ানক শাস্তি ভোগ করিতে হয়, তাহা সকলকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন।

এই অদ্ভুত পারলৌকিক কাহিনী শ্রবণ করিতে করিতে যোগেশ স্নান শেষ করিয়া উঠিয়া আসিল।

আহারান্তে যোগেশ গীতাখানা লইয়া নাড়া-চাড়া করিতে লাগিল। অন্যমনস্কভাবে পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে হঠাৎ একটা শ্লোকের উপর দৃষ্টি পড়িল,—

"সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
উদাসীনবদাসীনঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥"

একটা পরিচ্ছেদের শেষে খানিকটা ফাঁক ছিল। সেখানে লেখা ছিল—

হিঃ শ্রীমান্ মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
সাং গোঁসাইগঞ্জ।

জমা———— খরচ————

১দফা রোক চারিহাজার টাকা
২দফা গোবিন্দ চৌধুরীর সম্মান

যোগেশ দুইবার তিনবার লেখাটা পড়িল। হস্তাক্ষরটা যে পিতার সে সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ ছিল না; তথাপি বার বার অক্ষরগুলা নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তারপর বইখানা মুড়িয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সম্মুখের দেওয়ালে পিতার তৈলচিত্র প্রলম্বিত ছিল। যোগেশ স্থির অপলক দৃষ্টিতে চিত্রের দিকে চাহিয়া রহিল।

এমন সময় রমণীবাবু আসিয়া জানাইলেন, মহেন্দ্রবাবুর যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করা হইয়াছে। যোগেশ নিরুত্তরে বসিয়া রহিল।

রমণীবাবু একখানা রেজেষ্টারী চিঠি বাহির করিয়া বলিলেন, "সামন্ত বাড়ীর মুকুন্দ ঘোষ উকীলের চিঠি দিয়েছে।"

চমকিত ভাবে যোগেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

রমণীবাবু বলিলেন, "হ্যাণ্ডনোটখানা শোধ ক'রবার তাগাদা ক'রেছে।"

"কত টাকার হ্যাণ্ডনোট?"

"সতের হাজার টাকার।"

"কিছুই ওয়াশীল যায় নি?"

"না।"

"এই তো সেদিন ত্রিশ হাজার টাকা এলো।"

"তার মধ্যে ষোল হাজার বরদাবাবুকে দেওয়া হ'য়েছে।"

"বাকী?"

"বাকী খুচরা দেনায়, মামলা মোকদ্দমায় খরচ হ'য়ে গিয়েছে।"

যোগেশ নীরবে ভ্রূকুটী করিল। রমণীবাবু বলিলেন, "হিসাবের কাগজ এনে দেখাব?"

"না" বলিয়া যোগেশ মুখ ফিরাইয়া লইল। রমণীবাবু বলিলেন, "এক মাসের মধ্যে টাকাটা না দিলে নালিশ করবে ব'লে ভয় দেখিয়েছে।"

"যাতে নালিশ না হয় তার চেষ্টা দেখুন।"

"কিন্তু উপায় তো কিছু দেখছি না। অন্ততঃ অর্দ্ধেক টাকা দিতে না পারিলেও যে নালিশ বন্ধ হবে এমন তো বোধ হয় না।"

"এক মাসের মধ্যে আপনি এই টাকার যোগাড় কর্ত্তে পারেন না?"

"সম্ভব নয়।"

যোগেশ বিরক্তিসূচক মুখভঙ্গী করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। রমণীবাবু একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমার মতে একটা মহাল ছেড়ে দিলে ভাল হয়।"

পরুষ-কণ্ঠে যোগেশ বলিল, "তার চেয়ে আপনি এ সকল ভাবনার দায় হ'তে অব্যাহতি নিলে আরও ভাল হয়।"

ম্লান হাসি হাসিয়া রমণীবাবু বলিলেন, "আমি তাতে প্রস্তুত আছি।"

"আপনাকে ধন্যবাদ। আপাততঃ আমাকে অব্যাহতি দিন।"

রমণীবাবু নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলেন। যোগেশ পিতার প্রতিমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া স্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিল।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

সকালে উঠিয়াই মহেন্দ্রনাথ পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আজ তোমার মেয়ের বিয়ে বড়-বৌ?"

ভবসুন্দরী হাঁ করিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "গোড়ায় আশা করেছিলে জমিদারের শাশুড়ী হবে, কিন্তু শেষে বুড়ো ঘোষালের শাশুড়ীও হ'তে পারলে না।"

বলিয়া মহেন্দ্রনাথ উচ্চ হাসি হাসিয়া উঠিলেন। ভবসুন্দরী শঙ্কিতভাবে স্বামীর মুখের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া ধীর শান্ত স্বরে বলিলেন, "আমি কোন আশাই করি না। তাঁর মনে যা আছে তাই হবে।"

হাসিতে হাসিতে মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তুমি দেখছি একজন মস্ত সাধু, এর পরেও ভগবানের উপর নির্ভর ক'রে থাকতে পার।"

ভবসুন্দরী। তুমিই কি পার না?

মস্তকসঞ্চালনপূর্ব্বক মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "একটুও না বড়-বৌ। ভগবানের যদি কিছুমাত্র ক্ষমতা থাকতো—"

ভবসুন্দরী বলিলেন, "তা হ'লে ঐ বুড়োর সঙ্গে আজ তোমার মেয়ের বিয়ে হ'য়ে যেতো। কিন্তু তাঁর ক্ষমতা নাই বলেই কাল যোগেশ তোমার ঘটী-বাটি বেচে নিয়েছে, বিরাজকে ঘরে এনে সমাজচ্যুত হয়েছে। তা নৈলে আজ ঐ বুড়োর সঙ্গে বিয়ে কে আটকাত বল দেখি?"

"আমি আটকাতাম।"

সহসা সম্মুখে যোগেশকে দেখিয়া মহেন্দ্রনাথ হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। ভবসুন্দরী তাড়াতাড়ি

মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইলেন। যোগেশ উঠানের উপর মহেন্দ্রনাথের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রোষগম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "আপনি কি মনে করেন মহেন্দ্রবাবু, আমার অধীনে বাস ক'রে আপনি যা ইচ্ছা তাই ক'রে যাবেন ? আপনি আশী বছরের বুড়োর হাতে মেয়েটাকে তুলে দেবেন, একটা পতিতাকে ঘরে ঠাঁই দিয়ে ধর্ম্মের অবমাননা করবেন, অথচ কেউ তাতে বাধা দেবে না ?"

ঈষৎ হাসিয়া মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তাই বুঝি আমার ঘটীবাটিতে পর্য্যন্ত টান দিয়ে তুমি বাধা দিতে এসেছ যোগেশ ?"

যোগেশের মাথাটা লজ্জায় যেন নত হইয়া আসিল ; কিন্তু তৎক্ষণাৎ জোরে মুখটা উঁচু করিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "তা নৈলে আপনার মত স্বার্থপর স্বেচ্ছাচারী লোককে বশ করা যায় না।"

মহেন্দ্রনাথের মুখখানা কালবৈশাখীর মেঘের মত ভীষণ হইয়া উঠিল। তিনি ক্ষুব্ধ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আমি স্বার্থপর যোগেশ ?"

যোগেশ বলিল, "নিশ্চয়। তা নৈলে আজ দেনার দায়ে আমার সর্ব্বস্ব বিকিয়ে যাচ্চে, চারিদিক্ হ'তে বিপদের ঝঞ্ঝা এসে আমার উপর ঝুঁকে পড়েছে, অথচ আপনি তুচ্ছ অভিমানটুকু সম্বল ক'রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছেন।"

মহেন্দ্রনাথের মুখের রৌদ্রভাব মুহূর্ত্তে অপসৃত হইল, তিনি মাথাটা একটু নীচু করিয়া নৈরাশ্যব্যঞ্জক কণ্ঠে বলিলেন, "কিন্তু আমি আর কি করতে পারি যোগেশ ?"

যোগেশ বলিল, "সে কথা আপনি নিজে জানেন। কিন্তু আমি আজ সেজন্য আসি নাই।"

মহে। কিজন্য এসেছ ?

যোগেশ। আমি এসেছি পিতৃঋণ পরিশোধ করতে।

বলিয়া যোগেশ পকেট হইতে গীতাখানা বাহির করিল, এবং তাহার যেস্থানে গোবিন্দবাবু স্বহস্তে মহেন্দ্রনাথের নামে হিসাব লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই স্থানটা খুলিয়া মহেন্দ্রনাথের হাতে দিলেন। মহেন্দ্রনাথ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে লেখাটার দিকে চাহিয়া রহিলেন, চাহিতে চাহিতে তাঁহার চক্ষু দুইটা জলে ভরিয়া আসিল। যোগেশ পকেট হইতে পেন্‌সিল বাহির করিয়া মহেন্দ্রনাথের হাতে দিয়া বলিল, "খরচের ঘরে লিখুন।"

মহেন্দ্রনাথ পেন্‌সিল হাতে লইয়া বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে যোগেশের দিকে চাহিলেন। যোগেশ বলিল, "লিখুন, খরচ—গোবিন্দ চৌধুরীর পুত্র যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কর্ত্তৃক স্বীয় সম্মানরক্ষা ও কন্যাদায় উদ্ধার।"

মহেন্দ্রনাথ নীরবে মৃদু হাস্য করিলেন। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ধীর প্রশান্তস্বরে বলিলেন, "আমার আর এমন কোন সম্মান নাই যোগেশ, যাকে রক্ষা করবার জন্য তুমি এতটা হীনতা স্বীকার করবে।"

যোগেশ বলিল, আপনার সম্মান না থাকে, আমার আছে। আর সেটাকে রক্ষা কত্তে পারলে প্রকৃতপক্ষে আপনারই মান রক্ষা হবে।"

মহেন্দ্রনাথের দৃষ্টিটা স্থির প্রোজ্জ্বল হইয়া আসিল। তিনি মেঘগম্ভীর কণ্ঠে ডাকিলেন, "যোগেশ !"

যোগেশ হাতের ছড়িটা উঠানের মাটীতে ঠুকিয়া বলিল, "মুকুন্দঘোষ নালিশ করবে, কাকাবাবুও বোধ হয় ছেড়ে কথা কইবেন না, রমণীবাবু যতটা পেরেছেন জমিদারীর উন্নতি ক'রে সরে দাঁড়াচ্ছেন।"

যোগেশের চোখে মুখে একটা তীব্র কুটিল হাসি ফুটিয়া উঠিল। মহেন্দ্রনাথ ক্রোধস্ফুরিত কণ্ঠে বলিলেন, "এতদিন তুমি চুপ করে ছিলে যোগেশ ?"

যোগেশ বলিল, "আমি আপনার মত চুপ ক'রে নাই। আপনার নূতন বাড়ীটা শেষ ক'রে ফেলেছি, এ বাড়ীর জিনিষপত্রগুলা পর্য্যন্ত নীলাম ক'রে ও বাড়ীতে তুলে দিয়েছি।"

মহেন্দ্রনাথ গীতা ও পেন্‌সিল যোগেশের হাতে ফিরাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, "তা হ'লে খরচ আমি আজ লিখবো না যোগেশ, আগে আমি আমার জমার ঘরটা ঠিক ক'রে আনি।"

যোগেশ বলিল, "আপনার কাজ আপনি করুন, আমার কাজ আমি করি। আজ নূতন বাড়ীতে আমার পিতৃ-প্রতিশ্রুত লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠা, আর আপনার কন্যার বিবাহ। আমি তার উদ্যোগ কত্তে চললাম।"

বলিয়া যোগেশ দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। মহেন্দ্রনাথ পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া সহাস্যে বলিলেন, "তোমারই সাধ পূর্ণ হ'লো বড়-বৌ, শেষে জমিদারের শাশুড়ীই হ'লে।"

হাসিয়া ভবসুন্দরী বলিলেন, "আর তুমি ?"

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সেই পুনর্মূষিকো ভব। আবার দেওয়ানি।"

"এই না আর চাকরী করবে না ?"

"এ চাকরী নয় বড় বৌ, যোগেশের মানরক্ষা, নিজের মানরক্ষা।"

সমাপ্ত



অপরাধী

[উপন্যাস]

নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

মূল্য ১৷৷০ টাকা

অপরাধী

১

বাদলের মা গোবর কুড়াইয়া, কুলা ধুচুনী বেচিয়া অনেক কষ্টে বাদলকে মানুষ করিল বটে, কিন্তু যতক্ষণ না ছেলের মাথায় এক গণ্ডুষ জল দিতে পারিল, ততক্ষণ সে আপনার এত পরিশ্রম এত কষ্টকে সার্থক বলিয়া মনে করিতে পারিল না, এবং পাছে সেই ঈপ্সিত জলগণ্ডুষ প্রদানের পূর্ব্বেই তাহাকে পরলোকে গিয়া ছেলের কাছেই এক গণ্ডুষ জলের প্রার্থী হইতে হয়, এই আশঙ্কায় দিন দিন কাতর হইয়া পড়িতেছিল।

মায়ের মত ছেলের যদি আগ্রহ থাকিত, তাহা হইলে মা এতদিন নিশ্চিন্ত হইয়া পরপারে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিত। কিন্তু মায়ের সব চেয়ে দুঃখের বিষয় হইল, ছেলেটা মানুষ হইয়াও মানুষ হইল না, সংসারের উপর তাহার একটুও আগ্রহ দেখা গেল না। গান গাহিয়া, যাত্রা শুনিয়া, কীর্ত্তনে 'গৌর গৌর' বলিয়া নাচিয়া বেড়াইতে পাইলে সে আর কোনও দিকেই ফিরিয়া চাহিত না। অথচ সে বেতের কাজ এমন শিখিয়াছিল যে, কাজে গেলেই বারো গণ্ডা পয়সা লইয়া ঘরে ঢুকিত। সুতরাং বাদল যদি পাঁচটা মাস মন দিয়া কাজ করিত, তবে বাদলের মার আজ চিন্তা কি? কবে সে ছেলের বিবাহ দিয়া আজ যোগ্য বউ লইয়া ঘরকন্না করিত। যাহারা বাদলের সমবয়স্ক, অথচ বাদল অপেক্ষা কম মজুরী পায়, তাহারা আজ ছেলের বাপ, বাদল কিন্তু এখনও আইবুড়ো। সকলই অদৃষ্ট!

বাদল যদি মাসের মধ্যে পনরটা দিনও কাজ করিত, তাহা হইলেও ভাবনা ছিল না। কিন্তু সে দশটা দিনও কাজে যাইত কি না সন্দেহ। কাজে যাইবার পক্ষে কতকগুলা বাধা ছিল। দুই চারি ক্রোশের মধ্যে কোথাও যাত্রা হইলে এবং আসরে যন্ত্র পুড়া হইতে আরম্ভ করিয়া সংএর শেষ পর্য্যন্ত না শুনিলে বাদলের আদৌ তৃপ্তি হইত না। কোথাও কীর্ত্তন হইলে বা অষ্টম প্রহর, চব্বিশ প্রহর হইতেছে শুনিলে বাদল হাতের কাজ ফেলিয়া সেখানে ছুটিয়া যাইত। ব্রাহ্মণ শূদ্র যে কোনও জাতির মড়া মরিয়াছে শুনিলে বিনা আহ্বানেই তথায় উপস্থিত হইত, এবং যতক্ষণ না চিতা নিবিত, ততক্ষণ সে স্থান ত্যাগ করিত না। এই সকল বাধার জন্য বাদল মাসের অধিকাংশ দিনই কাজে যাইতে পারিত না।

বাদলের সব চেয়ে আকর্ষণের বস্তু ছিল কীর্ত্তন। খোলের শব্দ কানে গেলে মেঘগর্জ্জনশ্রবণে মত্ত শিখীর ন্যায় বাদল হাতের কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া যাইত। খোলের বাজনার তালে তালে তাহার অন্তরটা যেন তালে তালে নাচিতে থাকিত; হৃদয়ের আবেগে স্থির থাকিতে না পারিয়া কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে গাহিতে থাকিত—

'নিতাই এনেছে নাম হরিবোল হরিবোল!'

গাহিতে গাহিতে তাহার কণ্ঠস্বর গাঢ়, নেত্রপল্লব আর্দ্র হইয়া আসিত; হাত দুইটা উপরে তুলিয়া, ভাবস্তিমিত দৃষ্টি ঊর্দ্ধে স্থাপন করিয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য-ভাবে প্রেমপুলকিত কণ্ঠে নাচিয়া নাচিয়া গাহিত—

'নিতাই এনেছে নাম হরিবোল হরিবোল!'

তাহার এই অস্বাভাবিক ভাবাবেশদর্শনে অনেক মুণ্ডিতমস্তক স্ফীতোদর বাবাজী এই ডোমের ছেলেটার দিকে ঈর্ষ্যাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিত। অনেকে বলিত, 'বেটার সব ভণ্ডামী।' নিতান্ত বুদ্ধিমানেরা স্থির করিত, রেখো ডোমের বেটা বাদলা ডোম পাকা চোর না হইয়া যায় না।

বুদ্ধিমান্ বা নির্ব্বোধ যে যাহাই মনে করুক, বাদল কিন্তু আপনার কাজের ক্ষতি করিয়া সংকীর্ত্তনে নাচিয়া বেড়াইত, এবং তজ্জন্য মাতার ও অন্তরঙ্গ কুটুম্বগণের তিরস্কার অকাতরে সহ্য করিত।

২

'বাদলা, ওরে হতভাগা!'

সকাল হইতে দুপুর পর্য্যন্ত কীর্ত্তনে নাচিয়া আসিয়া বাদলা তেল মাখিতে বসিয়াছিল। তেলের ভাঁড়ে তেলও বেশী ছিল না, যেটুকু ছিল, তাহাই মুছিয়া উষ্ণ মস্তিষ্কটাকে কোনওরূপে তৈলসিক্ত করিতেছিল; এমন সময় মাতার কঠোর আহ্বানে বিরক্ত হইয়া সে একটু রাগতভাবে উত্তর দিল, 'কেনে?'

মা বলিল, 'আজ না কাজে যাবি বলেছিলি?'

গম্ভীরভাবে বাদল উত্তর করিল, 'যাচ্ছিলুম তো। রাস্তায় যেতে যেতে নিতে বল্লে, বীরু পোদ্দারের

বাড়ীতে একজন বাবাজী এয়েছে, খুব ভাল নাম গায়।'

মা। তাই বুঝি সেখানে ছুটে গিয়েছিলি ?

বাদল। তোমার ঐ এক কথা। ছুটে যাব কেন ? মনে কর্লুম, বাবাজীকে একবার দেখে যাই। গিয়ে দেখি, কেত্তন আরম্ভ হয়েছে। বাবাজী গান ধরেছে—'নিতাই শমনদমন নাম এনেছে, ভয় দূরে গিয়েছে।'

মা। আর তুইও অমনি তার সঙ্গে গলা জুড়ে দিলি ?

বাদল। দূর, আমি গাইতে যাব কেনে ? গানটা বড্ড মিষ্টি লাগ্‌লো, তা বলি একটু শুনে যাই। শুনতে শুনতে দেখি, পহরখানেক বেলা হ'যে গিয়েছে। বাবাজী কি চমৎকার গায়! মা, তুই যদি শুন্‌তিস্—

মা রাগে তর্জ্জন করিয়া বলিল, 'আমি শুনলে তার মাথায় সাত ঘা খ্যাঙ্গরার বাড়ি বসিয়ে দিতাম।'

দন্তে জিহ্বা দংশন করিয়া বাদল বলিল, 'ছিঃ মা, বোষ্টম বাবাজীকে এমন সব কথা বল্‌তে আছে ? ওতে যে তোর পাপ হয়।'

মুখভঙ্গী করিয়া মা বলিল, 'ওঃ, পাপ হয়! আমি ডোমের মেয়ে, আমার আবার পাপ পুণ্যি কি রে!'

ডোমের মেয়ের পাপ পুণ্য নাই শুনিয়া বাদল যেন অবাক্ হইয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিল। মা রোষতীব্রকণ্ঠে বলিল, 'তোর বাপ ঠাকুরদাদা চুরী ডাকাতী ক'রে, মানুষের মাথা ফাটিয়ে ম'রে গেল, আর তুই এয়েছিস্ আমাকে পাপ পুণ্যির ভয় দেখাতে। ভারি আমার দত্যিকুলের পেল্লাদ কি না।'

ঈষৎ হাসিয়া বাদল বলিল, 'আমাকেও কি চুরী ডাকাতী করতে বলিস্ মা ?'

ক্ষোভগম্ভীরস্বরে মা বলিল, 'কপাল আমার, তুই সে সব বড় বড় কাজ করবি! তা হ'লে আজ আমার ভাবনা কি ? তুই কি জানবি, এক এক রাতে তোর বাপ কত সোনা রূপোর গয়না, কত ভাল ভাল কাপড় এনে হাজির কত্তো। বল্‌তো, আহ্লাদী, রাতারাতি প'রে সাধ মিটিয়ে নে। সে এক একখানা কাপড় গয়নার দাম কত!'

বাদল আশ্চর্য্যান্বিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, 'সে সব কাপড় গয়না কি হ'লো মা ?'

মা বলিল, 'হবে আর কি! রাতটা থাক্‌তো, সকাল হলেই ভাঁড়ারীর ঘরে চ'লে যেতো।'

বাদল। তোদের কি লাভ থাক্‌তো ?

মা। লাভ থাক্‌বে না কেনে ? একসের সোনার গয়না দিলে নগদ পাঁচ গণ্ডা টাকা পাওয়া যেতো। রূপোর সের ছিল বুঝি তিন টাকা। এক রাত ঘুরে এসে তোর বাপ এক মাস পায়ের ওপর পা দিয়ে খেতো।

ভ্রূকুটী করিয়া বাদল বলিল, 'আমাকেও কি তাই কত্তে বলিস্ ?'

একটু অপ্রতিভভাবে মা বলিল, 'তা বল্‌বে কেনে। তবে গতর খাটিয়ে এনে খা। তা নয়, তোর কেবল হরিবোল হরিবোল!'

সহাস্যে বাদল বলিল, 'শুন্‌তে তোর বড্ড্ মন্দ লাগে, না ?'

মা বলিল, 'মন্দ না লাগুক্, লোকে যে নিন্দে করে। বলে, ডোমের ছেলে, তার আবার এত হারিনাম কেনে ?'

গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বাদল বলিল, 'বটে!'

মা বলিল, 'আর হরিনাম ক'রে বেড়ালেই না তোর চল্‌বে কেনে ? পেট আছে, বাইশ বছরে থুবড়ো হলি, তোকে বিয়ে কত্তে হবে। তুই ' বোষ্টমের ছেলে যে, জয় রাধে বল্‌লেই ভিক্ষে পাবি বুড়ো বয়সে আমি তোর রোজগার ব'সে খাব, তা নয়। এখনও আমাকে খেটে তোকে খাওয়াতে হচ্ছে। কুলো ধুচুনী ঘাড়ে ক'রে রোদে পুড়ে জলে ভিজে আমাকে বাজারে যেতে হয়, পাঁচ জনে আমার মুখ পুড়িয়ে দেয়। বলে, হ্যাদে বাদলের মা, তোর এখনও এ ভোগান্তি কেনে ?'

মায়ের কথায় বাদল লজ্জা অনুভব করিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তার পর আস্তে আস্তে উঠিয়া গামছা কাঁধে ফেলিয়া স্নান করিতে চলিল।

মায়ের কথায় বাদলের মনে আঘাত লাগিয়াছিল, এ জন্য খুব বিষণ্ণ ভাবে ভাবিতে ভাবিতে চলিল। কতক দূর গিয়া মনের এই বিষণ্ণতা দূর করিবা' অভিপ্রায়ে গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরিল—

'হরিনাম বিনে আর কি ধন আছে সংসারে,
বল্ মাধাই মধুর স্বরে।'

৩

বাদল মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করিল, অতঃপর ে আর বাজে কাজে ঘুরিয়া বেড়াইবে না, মনোযো' সহকারে অর্থোপার্জ্জন করিয়া মাতার অভিল' পূর্ণ করিবে। মায়ের আহ্লাদের সীমা রহিল ন সে ছেলেকে শুধু আশীর্ব্বাদ করিয়াই ক্ষান্ত হইল না

ইহাতে ভবিষ্যতে সে কত সুখী হইবে, এবং পাঁচ জনের এক জন হইয়া থাকিতে পারিবে, তাহা ব্যক্ত করিয়া বাদলকে উৎসাহিত করিতে লাগিল। মায়ের কথায় বাদলও ভবিষ্যতের আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

পর দিন সকালে উঠিয়া বাদল কাজে যাইতেছিল। তাঁতিপাড়া ছাড়াইয়া সবেমাত্র বামুনপাড়ায় ঢুকিয়াছে, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল, 'বাদল!'

পিছনে ডাক শুনিয়া বাদল বিরক্তভাবে ফিরিয়া চাহিতেই দেখিল, হরিশ হালদার। বিরক্তি সত্ত্বেও বাদল কপালে হাত ঠেকাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। হালদার মহাশয় তাহার নিকটস্থ হইয়া খুব জোরে আশীর্ব্বাদবাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সকালেই কোথায় চলেছ হে?'

বাদল উত্তর দিল, 'কাজে যাচ্ছি।'

'ওঃ, কাজে যাচ্ছো' বলিয়া হালদার মহাশয় মুখখানা একটু বিকৃত করিলেন। বাদল জিজ্ঞাসা করিল, 'কেনে গা বাবাঠাকুর?'

হালদার মহাশয় বলিলেন, 'একটু কাজ ছিল বাপু, যদি কত্তে পাত্তে, বড়ই উপকার হ'তো।'

বাদল। কাজটা কি?

হালদার। আর কিছু নয়, মেজো ছেলেটার অসুখ, গুপীগঞ্জ থেকে ওষুধ আনতে হবে। আমার আবার ঘোষেদের বাড়ীতে তুলসীর বরাত আছে। বড় ছেলেটা গেলে তার ইস্কুল কামাই হয়। তাই বল্‌ছিলাম—তা যখন কাজে যাচ্ছো—

বাদল একটু ভাবিয়া বলিল, 'তাই তো বাবাঠাকুর, না গেলে রোজটা মারা যায়।'

প্রফুল্লহাস্যসহকারে হালদার মহাশয় বলিলেন, 'ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ থাকলে অমন কত রোজ পেয়ে যাবে। তা হ'লে দাঁড়াও, শিশি আর ওষুধের দাম এনে দিই।'

বাদলের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই হালদার মহাশয় দ্রুতপদে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং অনতিবিলম্বে শিশি ও পয়সা আনিয়া বাদলের হাতে দিয়া বলিলেন, 'আট আনা ওষুধের দাম। পয়সা আট গণ্ডা বেশ ক'রে বেঁধে নাও। ঘরে মুড়ী বাড়ন্ত, নয় তো এক মুঠো দিতাম, রাস্তায় জল খেতে। তা দু' কোশ রাস্তা বৈ তো না, ফিরতে কত বেলাই বা হবে।'

পয়সাগুলা গুণিয়া কাপড়ের খুঁটে বাঁধিতে বাঁধিতে বাদল বলিল, 'নদীপারের দু'টো পয়সা চাই না?'

হালদার মহাশয় বলিলেন, 'ব্রাহ্মণের কাছে তো পয়সা নেয় না। আমার কাজে যাচ্ছো বললে তোমাকেও হয় ত ছেড়ে দেবে। যদি নেহাৎ না ছাড়ে, তুমিই পয়সা দিও। খুচরো পয়সা আর নাই, সকাল বেলা আবার কোথায় সিকি ভাঙ্গাতে যাব। তা হ'লে বাড়ীতে ওষুধটা দিয়ে যাবে। আমার আবার বেলা হ'যে যায়, চল্‌লাম।'

হালদার মহাশয় বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন। বাদল গুপীগঞ্জের পথ ধরিয়া গায়িতে গায়িতে চলিল—

'নিতাই চলিতে চলিতে ঢলিতে ঢলিতে
বলিতে বলিতে যায়,
এ নাম বিনা মূল্যে দিব, জগত মাতাব,
কে নিবি তোরা আয়।'

৪

'বাদল!'

ঔষধ লইয়া বাদল ফিরিয়া আসিতেছিল। নদী পার হইয়া সবেমাত্র মাঠের রাস্তা ধরিয়াছে, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে প্রতিবেশী বেজো সর্দ্দারের মেয়ে হারাণী ডাকিল, 'বাদল!'

বাদল থমকিয়া দাঁড়াইল, এবং পশ্চাতে ফিরিয়া একটু হর্ষস্ফীতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'কে? হারাণী!'

হারাণী মৃদুহাস্যসহকারে বলিল, 'তবু ভাল, চিনতে পেরেছিস্। আমি তো সেই নদীর পাড় থেকে চেল্লাচ্চি; আমার গলা ফেটে গেল, তোর আর খেয়াল নাই। আজ কাল তুই কালা হয়েছিস্ না কি?'

'একটু' বলিয়া বাদল হাসিল; জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথায় গিয়েছিলি?'

হারাণী উত্তর করিল, 'চুলোয়। রঙ্গপুরের হাটে গিয়েছিলাম।'

'কেন, গড়ন বেচ্‌তে?'

'তা নয় তো কি রূপ দেখাতে?'

'কি জানি।'

'কি জানি কি? সত্যি কথা বল্ দেখি, দেখাবার মত রূপ আমার আছে কি না?'

'না।'

ভ্রূভঙ্গী করিয়া হারাণী বলিল, 'তুই দেখ্‌ছি কাণাও হয়েছিস্।'

সহাস্যে বাদল বলিল, 'তোর রূপের জেল্লায়।'

কৃত্রিম কোপে ওষ্ঠাধর স্ফুরিত করিয়া হারাণী বলিল, 'তোর তো খুব রূপ আছে! আমাকে একটু ধার দিবি?'

'ধার নিলে ধার শুধ্‌তে হয় জানিস্ তো?'

'সব খাতক কি মহাজনের ধার শুধ্‌তে পারে?'

'না পারুলে নাতক ক'রে ধ'রে নিয়ে যায়।'

রাস্তায় চলিতে চলিতেই কথা হইতেছিল। কথাটা বলিয়া বাদল পিছনে ফিরিয়া চাহিল। হারাণীও তাহার মুখের উপর হাস্যোজ্জ্বল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিল, 'আমাকেও না হয় তাই ধ'রে নিয়ে যাবি।'

বাদল মৃদু হাসিল, এবং মুখ ফিরাইয়া পুনরায় পথ অতিবাহন করিতে লাগিল। যাইতে যাইতে হারাণী বলিল, 'বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল খেতে হবে।

সামনেই একটা পুকুর ছিল। উভয়ে পুকুর পাড়ে উঠিয়া একটা বটগাছের ছায়ায় বসিল। হারাণীর আঁচলে এক মুঠা মুড়ী মুড়কী বাঁধা ছিল। তাহা খুলিতে খুলিতে বাদলকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোর জল খাওয়া হয়েছে?'

বাদল বলিল, 'না, ঘরে গিয়েই জল খাব।'

'এখানে খেতে দোষ আছে?'

'দোষ আর কি? কিন্তু তোর তো ঐ পুঁজি।'

'তা হোক্, বেঁটে খেলে এঁটে যায়।'

বলিয়া হারাণী মুড়ী মুড়কীর অর্দ্ধাংশ বাদলের কোঁচার খুঁটে দিয়া অর্দ্ধেক নিজে লইল, এবং একটু ঘুরিয়া বসিয়া তাহার সদ্ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইল। মুড়ী চিবাইতে চিবাইতে বাদল জিজ্ঞাসা করিল, 'তোর সাঙ্গার কি হ'লো?'

হারাণী যেন একটু উপেক্ষার সহিত উত্তর দিল, 'হবে।'

বাদল বলিল, 'হ'য়ে গেলে তবু তোর হাটে যাওয়া আসার কষ্ট থাকে না।'

ম্লান হাসি হাসিয়া হারাণী বলিল, 'ঢেকীকে সগ্‌গে গেলেও ধান ভানতে হয়, জানিস্ তো?'

বাদল। কেন, তিনে তো বেশ দু' পয়সা রোজগার করে?

হারাণী। কিন্তু সে দু' পয়সা ঘরে আসে না, শুঁড়ীর দোকানেই দিয়ে আসে।

বাদল। তা বটে। বেহদ্দ মাতাল। তা এই মাতালকেই তো পছন্দ করেছিস্?

হারাণী। কাজেই। তোর মত সাধু পুরুষ কোথায় খুঁজে পাব বল্।

বাদল। খুঁজে দেখেছিলি কি?

হারাণী। তা দেখি নি সত্যি।

মুড়ী শেষ করিয়া বাদল পুকুরে নামিয়া আঁজলা ভরিয়া জল খাইল। তার পর হারাণীর দিকে চাহিয়া আরামসূচক একটা শব্দ করিয়া বলিল, 'বড্ডই তেষ্টা লেগেছেল হারাণী, ভাগ্যিস্ তুই মুড়ী ক'টা দিলি। তোর পুণ্যি হবে কিন্তু।'

ঈষৎ হাসিয়া হারাণী বলিল, 'তা আর হবে না? দুকুর বেলা এমন আস্ত বোষ্টমের সেবা নিয়েছি।'

বলিয়া হারাণী হাসিতে হাসিতে গিয়া পুকুরে নামিল। বাদল গাছের ছায়ায় বসিয়া কোঁচার খুঁট দোলাইয়া বাতাস খাইতে লাগিল। আশে পাশে সম্মুখে পশ্চাতে রৌদ্রদগ্ধ নির্জ্জন প্রান্তর। শুধু মাথার উপর বটগাছের সবুজ পাতাগুলা বাতাসে সর্‌সর্ শব্দ করিতেছিল; পাতার আড়ে লুকাইয়া একটা কোকিল মাঝে মাঝে ডাকিতেছিল—কু-উ, কু-উ।

হারাণী জল খাইয়া, মাথায় জল দিয়া, ভিজা আঁচলে মুখ মুছিতে মুছিতে আসিয়া পাশে বসিল। বাদল বলিল, 'আজ রোদটা বড্ড চড়া।'

হারাণী বলিল, 'আমি তো একটু না জিরিয়ে উঠ্‌ছি না। তুই ততক্ষণ একটা গান ধর্।'

'এই ঠিক দুকুর বেলা গান!'

'ওঃ, ভারী তো গায়েন, তার আবার দুকু-সাঁজের বিচার। গাইবি তো গা।'

বাদল একটু হাসিয়া ধীরে ধীরে গান ধরিল—

'তোরা চাঁদ নিবি তো আয়।
চাঁদ দাও ব'লে কত না কেঁদেছিস্,
আজ চাঁদের ছড়াছড়ি কাটোয়ায়।'

মধুর স্বরতরঙ্গে প্রান্তর প্লাবিত করিয়া বাদল গায়িতে গায়িতে চলিল। হারাণী মুগ্ধ-বিহ্বল-চিত্তে তাহার অনুসরণ করিল।

এইরূপে এক জন তন্ময়ভাবে গান গায়িতে গায়িতে, আর এক জন তাহা মুগ্ধচিত্তে শুনিতে শুনিতে কখন্ যে মাঠ পার হইল, এবং গ্রামের ভিতর ঢুকিয়া গ্রামবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, তাহা উভয়ের মধ্যে কেহই জানিতে পারিল না! হালদার মহাশয়ের সক্রোধ তিরস্কারে বাদলের প্রথম চৈতন্য হইল। হালদার মহাশয় তাহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া ক্রোধপরুষকণ্ঠে বলিলেন, 'তোর তো আচ্ছা আক্কেল! দুকুর গড়িয়ে যায়, রুগী এখনও ওষুধ

পেলে না; আর তুই সচ্ছন্দে ইয়ারকি দিয়ে গলা হেঁকে আস্‌ছিস্‌!'

হালদার মহাশয় হারাণীর দিকে রোষপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। বাদল তাড়াতাড়ি ঔষধের শিশি বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিতে গেল। হালদার মহাশয় ব্যস্ততার সহিত পশ্চাৎপদ হইয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, 'মর্‌ বেটা, ঐখানে শিশিটা রাখ্‌। এক্ষুণি ছুঁয়ে দিয়ে নাইয়েছিলি যে!'

বাদল লজ্জিতভাবে শিশিটা মাটীতে রাখিয়া একটা প্রণাম ঠুকিয়া গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল। হারাণী তাহার পশ্চাৎ চলিল। হালদার মহাশয় তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

৫

হালদার মহাশয়ের বেগার খাটিতে গিয়া বাদল সে দিন শুধু যে রোজটাই হারাইল, তাহা নহে; মনটাকেও সেই নির্জ্জন মাঠের মাঝে কোথায় যেন হারাইয়া আসিল। সে দিন সে কোনও কাজেই মন দিতে পারিল না; শুধু সেই রৌদ্রদগ্ধ নির্জ্জন প্রান্তর, আর তাহার মধ্যে সবুজ পাতায় ভরা বটগাছ-টার ছবি মনের ভিতর জাগিতে লাগিল। বাদল বিরক্ত হইয়া সন্ধ্যার পর গৌরদাস বাবাজীর আখড়ায় উপস্থিত হইল। আখড়ায় সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। খোল বাজিল, করতাল বাজিল, তাহার সঙ্গে হরিনামের মধুর সুর উত্থিত হইয়া সন্ধ্যা গগন প্লাবিত করিতে লাগিল। কিন্তু আজ আর সে সুরে বাদলের প্রাণ তালে তালে নাচিয়া উঠিল না। কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া আসিল।

হারাণীর ঘরের পাশ দিয়া আসিবার সময় সে একবার থমকিয়া দাঁড়াইল। ঘরে তখনও আলো জ্বলিতেছিল। আলোর সামনে বসিয়া হারাণী 'চুপড়ী বুনিতেছিল; বাদলের ইচ্ছা হইল একবার ডাকে— হারাণী! কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ আপনাকে সামলাইয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। প্রস্থানকালে বুঝি একটু জোরে পা পড়িল। সে শব্দে চমকিত হইয়া হারাণী হাঁকিল, 'কে গা?'

বাদল কোনও উত্তর না দিয়াই ছুটিয়া পলাইল। পিছনে কে হা-হা শব্দে হাসিয়া উঠিল। বাদল চিনিতে পারিল, সে তিনু; চিনিলেও সে কোনও উত্তর দিল না।

ঘরে আসিয়া বাদল মাকে বলিল, 'শিগ্‌গির বিয়ের চেষ্টা দেখ্‌ মা। আমি যেখান থেকে হোক্‌, টাকার যোগাড় কচ্ছি।'

মা আহ্লাদের হাসি হাসিয়া বলিল, 'টাকার যোগাড় তোকে কত্তে হবে না বাপ, আমিই কচ্ছি। তুই শুধবার চেষ্টা দেখ্‌।'

পাড়ায় রাষ্ট হইল, হারাণীর সহিত বাদলের অবৈধ প্রণয় জন্মিয়াছে। শুনিয়া সকলে হারাণীকে তিরস্কার করিতে লাগিল। তিনু আসিয়া তাহাকে কড়া কড়া কথা শুনাইয়া দিল; উত্তরে হারাণী তাহাকে গালি দিল। নেশার ঝোঁকে তিনু তাহাকে দুই চারি ঘা প্রহার দিয়া গেল।

হারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া গ্রামের পাঁচ জন ভদ্রলোকের কাছে নালিশ করিল। ভদ্রলোকেরা বিচার করিয়া দেখিলেন, দোষটা হারাণীর। তাহার যখন এক জনের সহিত বিবাহের কথাবার্ত্তা হইতেছে, তখন অপরের সহিত গুপ্ত প্রণয়ে আবদ্ধ হওয়া সামাজিক রীতিবিরুদ্ধ। হারাণী কিন্তু এই গুপ্ত প্রণয়ের কথা অস্বীকার করিল। কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না; হালদার মহাশয় সপ্রমাণ করিয়া দিলেন, এ বিষয়ে তিনি প্রধান সাক্ষী; সে দিন তাঁহারই ছেলের ঔষধ আনিতে গিয়া বাদল হারাণীর সহিত যে কাণ্ডটা করিয়া আসিয়াছে, তাহা অবক্তব্য। তাঁহার হাতে শাসনদণ্ড নাই, তাই রক্ষা, নতুবা সেই দণ্ডেই তিনি এই পাপিষ্ঠ ও পাপিষ্ঠাকে গ্রামবহির্ভূত করিয়া দিতেন।

ইহাতে কাহারও অবিশ্বাসের কারণ ছিল না। কেন না, অতিভক্তি যে চোরের লক্ষণ, ইহা সর্ব্বজনবিদিত মহাজন বাক্য। সুতরাং ডোমের ছেলে বাদল যখন গৌরপ্রেমে এতটা মত্ত হইয়াছে, তখন তাহার দ্বারা যে কোনও দুষ্কার্য্য সাধিত হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নহে।

বিচারে আসামী তিনুরই জয়লাভ হইল। হারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে ফিরিল।

বাদলের অপরাধ প্রমাণিত হইলেও তাহাকে কেহ দণ্ডিত করিতে পারিল না। কিন্তু সেই দিন হইতে বাদল যেন কেমন হইয়া গেল। সে আর কীর্ত্তনের আখড়ায় যাইত না, খোলের শব্দে তাহার প্রাণ আর তেমন নাচিয়া উঠিত না, যাত্রার ঢোল বাজিয়া থামিয়া গেলেও সে আর আসরের ধারেও যাইত না। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নীরবে কাজ লইয়াই ব্যস্ত থাকিত। এই একটা মাসে সে বেতের কাজ এমন সুন্দর করিল যে, তেমন পূর্ব্বে বা পরে আর কখনও করিতে পারে নাই।

৬

শ্রাবণের সন্ধ্যায় ঝির ঝির করিয়া বৃষ্টিধারা ঝরিতে-ছিল; জমাট মেঘে সমগ্র আকাশটা ছাইয়া ছিল। সে

মেঘে বিদ্যুৎ ছিল না, গর্জ্জন ছিল না; শুধু স্তব্ধ ধূসর মেঘটা ঝিরঝির বৃষ্টিধারায় বর্ষার সন্ধ্যাটাকে গম্ভীর করিয়া তুলিয়াছিল।

বাদল চুপ করিয়া বসিয়া প্রকৃতির এই গম্ভীর মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতেছিল। তাহার বিবাহের সব ঠিক হইয়াছে। কাল বিবাহ; আজ সকালে সে গোকুল দত্তের হাতচিঠায় সহি দিয়া সাড়ে সাত গণ্ডা টাকা লইয়া আসিয়াছে। পাঁচ কুটুম্বের নিমন্ত্রণ হইয়াছে। সব ঠিক, কিন্তু বাদলের মনে যেন সুখ নাই; তাহার উদাস প্রাণের মধ্যে যেন একটা কিসের অভাব জাগিয়া উঠিতেছে। বাদল চুপ করিয়া বসিয়া সেই অভাবটা কোথায় তাহাই খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল।

গৌরদাস বাবাজীর আখড়ায় খোল বাজিয়া উঠিল। খোলের শব্দ কানে যাইতেই বাদলের প্রাণটা যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল। আজ প্রায় এক মাস সে আখড়ায় যায় নাই। এক দিন গিয়াছিল, কিন্তু বাবাজী তাহাকে অপরাধী জ্ঞানে তিরস্কার করিয়াছিলেন। হায়, যে স্থান সংসারের সার সত্য হরিনামের আশ্রয়, সেখানেও সত্যের আদর নাই? অন্তরে গভীর ক্ষোভ ও দুঃখ লইয়া বাদল সেই যে আখড়া ত্যাগ করিয়াছিল, তদবধি আর সেখানে যায় নাই। হরিনামও বোধ হয় সেই অবধি করে নাই। উঃ, এক দিন সে এই হরিনাম লইয়া কি উন্মত্তই হইয়াছিল! নিজের কাজ পর্য্যন্ত হারাইতে বসিয়াছিল। হরিনাম কি তাহাদের মত নীচ জাতির জন্য নয়? ক্ষণিকের পাপে পাপী যে, তাহার জন্য নয়? তবে যে নিতাই প্রভু মহাপাপী জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহা মিথ্যা; যখন হরিদাস নামের গুণে উদ্ধার লাভ করিয়াছিল, সে কথা গল্পমাত্র? দূর হউক, ডোমের ছেলে আমি, বেত বুনিয়া খাইব, এত সত্য মিথ্যার বিচারে আমার দরকার কি?

'বাদল!'

চমকিতভাবে বাদল বলিয়া উঠিল, 'কে? হারাণী?'

দাবার উপর উঠিয়া হারাণী বলিল, 'আমি চল্‌লাম।'

বিস্ময়জড়িতকণ্ঠে বাদল জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথায় যাবি?'

'চুলোয়। আমার আর কোথায় যাবার জায়গা আছে?'

'কেন যাবি?'

'ন্যাকা সাজিস্‌নে। গাঁশুদ্ধ লোক যাকে দেখে ঘেন্না করে, সে কি সুখে গাঁয়ে থাকবে?'

একটু ভাবিয়া বাদল জিজ্ঞাসা করিল, 'একা যাবি?'

'সঙ্গী কোথায় পাব?'

বাদল নিরুত্তরে নতমস্তকে বসিয়া রহিল। 'তবে চল্‌লুম' বলিয়া হারাণী উঠানে নামিল। বাদল মুখ তুলিয়া বলিল, 'দাঁড়া।'

হারাণী দাঁড়াইল। বাদল উঠিয়া উঠানে নামিয়া বলিল, 'চল্।'

হারাণী বিস্ময়বিস্ফারিতদৃষ্টিতে বাদলের মুখের দিকে চাহিল বাদল তাহা লক্ষ্য না করিয়া বলিল, 'একবার হরি বল্‌তে পারবি?'

'পারবো।'

'আচ্ছা, বল্ হরিবোল।'

হারাণী বলিল, 'হরিবোল'।

বাদল বলিল, 'ভাল ক'রে গলা ছেড়ে বল্, হরিবোল, হরিবোল!'

হরিধ্বনিতে শুদ্ধ কুটীর প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে উভয়ে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। মা ছুটিয়া আসিয়া বলিল, 'বাদল, ওরে বাদল, কোথায় যাস্ রে?'

বাদল উত্তর দিল না; গলা ছাড়িয়া গান ধরিল—

'নিতাই শমনদমন নাম এনেছে, ভয় দূরে গিয়েছে।'

মা চীৎকার করিয়া ডাকিল, 'বাদল, ওরে বাদল!'

বাদল দুই হাত উর্দ্ধে তুলিয়া গায়িতে গায়িতে বলিল—

'নিতাই চলিতে চলিতে ঢলিতে ঢলিতে
বলিতে বলিতে যায়;
এ নাম বিনামূল্যে দিব, জগত মাতাব,
কে নিবি তোরা আয়।'

গায়িতে গায়িতে উভয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। অন্ধকারময় স্তব্ধ পল্লীপথে শুধু প্রতিধ্বনি উঠিতে লাগিল,—'তোরা আয় আয় আয়।'

বিন্দীর সাঙ্গা

১

দুলের মেয়ে বিন্দী আঠার বৎসর বয়সে বিধবা হইয়া বছরখানেক পরে যখন ঘোষপুরের রামু ঘোড়ুইকে সাঙ্গা করিল, তখন সে একবারও ভাবে নাই যে, তাহাকে শেষে মাছ ধরিয়া, মাচ বেচিয়া দিন চালাইতে হইবে। বাপ বেচু মাহার জাতিতে দুলে হইলেও মাছ ধরা তাহার ব্যবসায় ছিল না। তাহার চাষবাস ছিল, ঘরে সংবৎসরের খোরাকী ধান মরাই বাঁধা থাকিত। তা ছাড়া পাল্কীর সর্দ্দারীও ছিল, সুতরাং পৌষের হাড়ভাঙ্গা শীতকে উপেক্ষা করিয়া, পুকুরের জলে নামিয়া বিন্দীকে কখনও মাছ ধরিতে হয় নাই। জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড রৌদ্রে, শ্রাবণের অবিরল বারিধারার মধ্যে হাটে বাজারে বা পাড়ায় পাড়ায় মাছ বেচিবার প্রয়োজনও তাহার ছিল না। বিবাহও হইয়াছিল সমান ঘরে; সেখানেও বিন্দীকে ভাত-কাপড়ের জন্য কখনও ভাবিতে হয় নাই। কিন্তু বাপ-খুড়ার অমতে সাঙ্গা করিয়া, নূতন স্বামীর ঘরে আসিয়া যখন তাহাকে এ সকলই করিতে হইল, তখন সে বুঝিতে পারিল, গুরুজনের কথা না শুনিয়া কাজটা ভাল করে নাই।

জাতীয় সমাজে সাঙ্গা প্রচলিত থাকিলেও বাপের ইচ্ছা ছিল না যে, মেয়ের সাঙ্গা দেয়। মায়েরও তেমন মত ছিল না। বিন্দী কিন্তু বারুণীর মেলা দেখিতে গিয়া রামুর মুখের মিষ্ট কথায় যে একটা ভালবাসার স্বপ্ন লইয়া ঘরে ফিরিয়াছিল, সে স্বপ্নের ঘোরটা সে কিছুতেই কাটাইতে পারিল না। সুতরাং মা-বাপের অমতেও সে রামুকে সাঙ্গা করিতে উদ্যত হইল। কন্যার একান্ত আগ্রহ দেখিয়া বেচু বলিল, 'যদি সাঙ্গা কত্তেই হয়, তবে গাংপুরের নিমু ঘোড়ুইকেই সাঙ্গা কর্। রেমো ছোঁড়ার চাল নাই, চুলো নাই, ওকে সাঙ্গা ক'রে শেষে কি এক মুঠো ভাতের তরে কেঁদে বেড়াবি?'

বিন্দীর মনে কিন্তু তখন ভাত-কাপড়ের ভাবনাটা একবারও আসিল না। সে সকলের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া রামু ঘোড়ুইকেই সাঙ্গা করিল। বাপ প্রতিজ্ঞা করিল, সে আর মেয়ের মুখ দেখিবে না। বিন্দীও আর বাপকে মুখ দেখাইল না, রামুর হাত ধরিয়া তাহার ঘর করিতে আসিল। রামুর কুঁড়ে-ঘর, তালপাতার ছাউনী; দরজায় কবাট নাই, ছেঁচা বাঁশের আগড়। বিন্দী সেই আগড় দেওয়া, তালপাতায় ছাওয়া কুঁড়েটিকেই স্বর্গ বলিয়া মানিয়া লইল।

কিন্তু দিন কতক পরে বিন্দীকে যখন ছেঁড়া কাপড়ে লজ্জা নিবারণ করিয়া, জাল ঘাড়ে করিয়া পুকুরে পুকুরে ঘুরিতে হইল এবং মাছ বেচার পয়সায় চাল কিনিয়া আনিয়া দিন চালাইতে হইল, সেই দিন তাহার সাধের স্বর্গটা সহসা যেন কঠোর মর্ত্ত্যে পরিণত হইয়া আসিল। প্রাণপণ চেষ্টাতেও বিন্দী সেই ভাঙ্গা কুঁড়েটুকুর মধ্যে স্বর্গের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিল না। কিন্তু তখন আর উপায় নাই। স্বর্গই হউক বা মর্ত্ত্যই হউক, সেই ক্ষুদ্র কুঁড়েটুকুকেই আপনার সুখের কেন্দ্র করিয়া লইয়া বিন্দী দিন কাটাইতে লাগিল।

তা রামুও যে অক্ষম ছিল, পয়সা উপায় করিতে পারিত না, এমন নয়। সে পাল্কী বহিত, পাল্কীর ভাড়া না জুটিলে মজুর খাটিত। কিন্তু তাহার উপার্জ্জনের একটি পয়সাও ঘরে আসিত না। যে দিন যাহা পাইত, তাহা বাজারের সিদ্ধেশ্বর শাহার মদের দোকানে, অথবা করিমদ্দি চাচার তাড়ির আড্ডায় দিয়া টলিতে টলিতে ঘরে ফিরিত। ঘরে আসিয়া বিন্দীকে গালাগালি দিত, তাহার মা-বাপের উদ্দেশে অশ্রাব্য ভাষা প্রয়োগ করিত। বিন্দী কোন দিন মুখ বুজিয়া থাকিত, কোন দিন গালাগালির উত্তরে দুই একটা গালাগালি দিত। যে দিন উত্তর করিত, সে দিন বিন্দী স্বামীর নিকট দুই চারি ঘা মার খাইত। মার খাইয়া বিন্দী কাঁদিতে বসিত, আর রামু টলিতে টলিতে গিয়া দাবার উপর চাটাই পাতিয়া শুইয়া পড়িত।

তার পর বমিতে যখন চাটাই ভাসিতে থাকিত, সংজ্ঞাহীন রামুর মুখের ভিতর মাছি ঢুকিত, বিন্দী আসিয়া সে সকল পরিষ্কার করিয়া দিত, ঘটী করিয়া জল আনিয়া রামুর চোখে মুখে মাথায় দিয়া তাহাকে বাতাস করিতে বসিত। নেশা ছুটিয়া গেলে রামু উঠিয়া বসিত। বিন্দী তাহার হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া ভাতের কাছে বসাইয়া দিত। রামু আহার শেষ করিয়া উঠিলে বিন্দী তাহাকে আঁচাইবার জল দিয়া তামাক সাজিয়া আনিত। রামু দাবায় বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে গুন্ গুন্ করিয়া গাহিত-

'সে কি আমার অন্তোনের ধোন।
মনো প্রাণো যারি করে কর্ছি সমোপ্পোণ।
সে কি আমার—'

বিন্দী ভাতের গ্রাস মুখের কাছে রাখিয়া উৎকর্ণ হইয়া শুনিত, রামু গাহিতেছে—

'তবে যে অপ্রিয়ো বোলি, যখনো জ্বালাতে জ্বলি,
নতুবা তারি সকোলিই, প্রেমেরি কারোণ।
সে কি আমার—'

একটা অব্যক্ত আনন্দের উচ্ছ্বাসে বিন্দীর সকল নির্য্যাতন—সকল কষ্ট মুহূর্ত্তে মুছিয়া যাইত।

আধ ক্রোশ দূরে বাপের বাড়ী। সুতরাং বিন্দীর কষ্টের কথা মা-বাপের অগোচর ছিল না। বাপ রাগিয়া বলিত, 'চুলোয় যাক্ বিন্দী।' মা কি... রাগ করিয়া থাকিতে পারিত না। সে সময়ে অসময়ে আসিয়া মেয়েকে দেখিয়া যাইত, এবং মেয়ের কষ্ট দেখিয়া কাঁদিতে থাকিত। বলিত, 'আমার ভাত কে খায় বিন্দি, আর তুই এক মুঠো ভাতের তরে হা হা ক'রে বেড়াস্?'

বিন্দী উত্তর করিত, কি করবো মা, কপাল।'

মা আক্ষেপ করিয়া বলিত, 'তোর কপাল নয় বিন্দি, আমারই পোড়া কপাল। থাক্ তুই আমার ঘরে; পেটে ঠাঁই দিয়েছি, হাঁড়িতে কি ঠাঁই দিতে পারবো না?'

মুখ নীচু করিয়া বিন্দী বলিত, 'তোমার জামাই যে রাগ করবে মা?'

মা রাগিয়া বলিত, 'আরে মোর জামাই! বলে— ভাত কাপড়ের কেউ নয়, নাক কাট্‌বার গোঁসাই।' মুখে আগুন অমন জামাইয়ের।'

ঈষৎ বিরক্তির সহিত বিন্দী বলিত, 'ছি মা!'

মা হাত-মুখ নাড়িয়া উত্তর করিত, 'আ লো, এত দরদ! তবু যদি দু'বেলা উত্তম মধ্যম না দিত।'

বিন্দী ধীরে ধীরে বলিত, 'তা মারলেই বা মা, আপনার মানুষ বটে তো।'

মা গর্জ্জন করিয়া বলিত, 'খ্যাঙরা মারি অমন আপনার মানুষের মুখে; মার ধর কত্তে তো আছে, কিন্তু এই হাড়ভাঙ্গা শীতে তোকে জলে নেমে যে মাছ ধরতে হয়, তার কি?'

মৃদু হাসিয়া বিন্দী উত্তর করিত, 'তা ধরলেই বা মাছ, দুলের মেয়ে তো বটি।'

মা রাগে মেয়েকে কতকগুলো তিরস্কার করিয়া দিয়া যাইত। কিন্তু মায়ের প্রাণ, থাকিতে পারিত না। মাঝে মাঝে দু'সের চাল, এক সের মুড়ি, দু'পোয়া মুসুর কলায়, ক্ষেতের পাঁচটা বেগুন, বাড়ীর সকলকে লুকাইয়া মেয়েকে দিয়া আসিত।

২

'বিন্দি!'

'কেনে?'

'হাঁড়ী তুলছিস্ যে?'

স্বামীকে ভাত দিয়া বিন্দী হাঁড়ী তুলিতেছিল। উনানের পাশে বেদীর উপর হাঁড়ীটা রাখিয়া তাহার মুখে সরা চাপা দিতে দিতে বিন্দী বলিল, 'হাঁড়ী তুলবো না তো প'ড়ে থাকবে?'

রামু ভাতে নুন মাখিতে মাখিতে বলিল, 'তুই খাবি না?'

বিন্দী মৃদুস্বরে উত্তর দিল, 'না।'

রা। কেনে?

বি। খিদে নেই।

রা। খিদে নেই, না ভাত নেই?

বি। রাঁধলে তো ভাত থাকবে?

রা। চাল থাকলে তো রাঁধবি?

বিন্দী ঝঙ্কার দিয়া বলিল, 'তোকে বলেছে চাল নেই, চাল থাক্ না থাক্, রাঁধি না রাঁধি, সে আমার খুসী। তোর মরদ মানুষের এত খোঁজে দরকার কি রে?'

ঈষৎ হাসিয়া রামু বলিল, 'দূর মাগী, আমি তোর খোঁজখবর নেব না তো নেবে কে?'

বিন্দী মুখ ফিরাইয়া ক্ষুব্ধ কণ্ঠে উত্তর করিল, 'যম।'

রামু নীরবে কয়েক গ্রাস ভাত উদরস্থ করিয়া বলিল, 'তোর গোসা হয়েছে বিন্দি?'

বিন্দী একটু রাগতভাবে বলিল, 'হঁা, তোকে বলেচে গোসা হয়েচে।'

স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া রামু দৃঢ়স্বরে বলিল, 'আলবোৎ গোসা হয়েছে। কৈ, তুই আমার মাথার কিরে ক'রে বল্ দেখি?'

বিন্দী ভ্রূকুটী করিয়া ক্রোধকম্পিতকণ্ঠে বলিল, 'দেখ্ মিনষে, খেতে বসেছিস, খেয়ে উঠে যা।'

রামু মুখ নীচু করিয়া ভাত মাখিতে মাখিতে বলিল, 'আমি তো খেতে বসেছি খেয়ে উঠবো, কিন্তু তুই না খেয়ে থাকবি বিন্দি?'

একটু স্নেহের হাসি হাসিয়া বিন্দী বলিল, 'ভাল রে মিনষে, এই যে আমার ওপর দরদ দেখাতে শিখেছিস্?'

রামু গম্ভীরস্বরে বলিল, 'কেনে বিন্দি, আমি কি তোকে দরদ করি না?'

শ্লেষের তীব্রস্বরে বিন্দী বলিল, 'খুব করিস্। এই তুকুর বেলা কত দরদ দেখালি? চোখের কোলটা এখনো ফুলে আছে।'

লজ্জিতকণ্ঠে রামু বলিল, 'বড্ড লেগেচে, না বিন্দি?'

ঈষৎ হাসিয়া বিন্দী বলিল, 'না, মার্‌লে কি লাগে?'

রামু নতমস্তকে কোলের ভাতগুলাকে চটকাইতে লাগিল। বিন্দী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, 'লাগেনি তেমন, তবে আর একটু হলেই চোখটা যেতো। তা যেতো যেতই, তুই ব'সে রইলি যে? খেয়ে নে।'

রামু ক্ষিপ্রহস্তে কয়েক গ্রাস ভাত মুখে তুলিয়া, বাঁ হাতে ধরিয়া ঘটীর জলটা গলায় ঢালিয়া দিল। বিন্দী বলিল, 'ও কি, ভাত ফেলে উঠ্‌ছিস্ যে?'

রামু বলিল, 'ফেলে উঠ্‌ছি না, খেয়েই উঠ্‌ছি।'

বি। তবে ওগুলা প'ড়ে রইলো কেনে?

রামু। থাক্, তুই খাবি।

রামু উঠিতে গেল। বিন্দী তাড়াতাড়ি আসিয়া তাহার হাতটা চাপিয়া ধরিল; ব্যগ্রস্বরে বলিল, 'আমার মাথা খাস্, খেয়ে ফেল্, কা'ল আবার তাকে ভাড়া বইতে যেতে হবে।

রামু বলিল, 'আর তুই উপোস থাক্‌বি?

বিন্দী বলিল, 'আমার খিদে নেই, মাইরি বল্‌ছি, আমার খিদে নেই।'

রামু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, 'আমাকে ছুঁয়ে বল্‌চিস্?'

বিন্দী তাহার হাতটা ছুঁড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; গর্জ্জন করিয়া বলিল, 'খেতে হয় খা, নয় তো চুলোয় যা। আমি কেনে কথায় কথায় তোর কিরে কত্তে যাব রে মিন্‌ষে?'

রামু হাসিতে হাসিতে উঠিয়া গেল। বিন্দী তাহাকে তামাক সাজিয়া দিয়া খাইতে বসিল। রামু তামাক টানিতে টানিতে ডাকিল, 'বিন্দি!'

বিন্দী মুখের ভাত চিবাইতে চিবাইতে উত্তর দিল,

রামু জিজ্ঞাসা করিল, 'সত্যি কি ঘরে চাল ছিল না?'

বিন্দী মুখের ভাতগুলা গিলিতে গিলিতে উত্তর করিল, 'আধসেরটাক প'ড়ে আছে।'

রামু বলিল, 'তবে রাঁধ্‌লি না কেন?'

বিন্দী ঈষৎ রুক্ষস্বরে বলিল, 'আজ রাঁধ্‌লে কা'ল কি খাবি।'

রামু রাগিয়া বলিল, 'ছাই খাব। কা'ল খাব ব'লে আজই উপাস দিবি?'

দুঃখিত স্বরে বিন্দী বলিল, 'কাজেই, কা'ল আর মাছ ধর্‌তে যেতে পার্‌বো না। কোমরে একটা দরদ লেগেছে।'

রামু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া হুঁকা হাতে বসিয়া রহিল।

বিন্দী আহার শেষ করিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ব'সে ব'সে কি ভাব্‌ছিস্ ঘোড়ুই?'

রামু মাথা না তুলিয়াই বলিল, 'ভাব্‌চি, মদ ছাড়্‌বো, না তোকে ছাড়্‌বো?'

বিন্দী বলিল, "মদ কি ছাড়্‌তে পারবি? ছাড়িস তো আমাকেই ছাড়্‌বি।"

রামু মুখ তুলিল; অভিমানক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল, 'তোকে ছাড়্‌বো বিন্দি?'

বিন্দী ঘরে গিয়া বিছানা পাতিয়া রামুকে শুইবার জন্য ডাকিল। রামু কোন উত্তর দিল না, চুপ করিয়া ব'সিয়া রহিল।

দুই তিনবার ডাকিয়া স্বামীর সাড়া না পাইয়া বিন্দী বাহিরে আসিল, এবং বাঁহাতে কেরোসিনের ডিবা, ডান হাতে স্বামীর হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল, 'তা আমাকে ছাড়িস্ ছাড়্‌বি, এখন শুবি আয়। কা'ল সকালে উঠেই আবার তোকে ভাড়ায় যেতে হবে।'

রামু উঠিয়া ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিল।

৩

'তোর পায়ে পড়ি ভূতো, আজ আর খাব না।'

ভূতো ওরফে ভূতনাথ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; হাসিতে হাসিতে বলিল, 'কেনে বল্ দেখি, আজ তুই তপিস্বি হয়েছিস্ না কি?'

রামু বলিল, 'না, আমি দিলেসা করেছি।'

ভূতো বলিল, 'বিন্দীর কাছে বুঝি?'

ভূতো শ্লেষের হাসি হাসিল। রামু বলিল, 'আমি নিজের মনে মনে দিলেসা করেছি, ও সব আর ছোঁব না।'

ভূ। বিন্দী বুঝি বারণ করেছে!

রা। বারণ কর্‌বার মেয়ে বিন্দী নয়।

ভূ। তবে?

রা। তবে আবার কি? সে পেটে না খেয়ে আমাকে খাওয়াবে আর আমি নেশা ক'রে সব উড়িয়ে দেব!

তিরস্কারের পরে ভূতো বলিল, 'এই রে শালা মরেচে, ওরে মুখ্যু, এই যে তিন তিন কোশ পাল্কী

ঘাড়ে ঘুরে এলি, 'এক পাত্তর পেটে না দিলে গা গতরের বেদনা যাবে কেন? বৌ আগে, না নিজের জানটা আগে? বলে—আপনি বাঁচলে বাপের নাম?'

রামু ইতস্তত: করিতে লাগিল। ভুতো তাহার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল, 'বেশী না হয়, দুপাত্তর টেনে যাবি আয়, পয়সা তোকে দিতে হবে না।'

রামু সঙ্গীর কথা ঠেলিতে পারিল না, তাহার সহিত গিয়া সিদ্ধেশ্বর শাহার দোকানে ঢুকিল। সেখানে দুই পাত্রের স্থলে চারি পাত্র উজাড় হইয়া গেল; তথাপি রামু উঠিল না। শুধু একবার বলিল, 'ঘরে আজ চাল নাই ভুতো, মাগীটার খাওয়া হবে না।'

ভুতো আর একপাত্র পূর্ণ করিয়া তাহার হাতে দিতে দিতে বলিল, 'তোকে বলেছে খাওয়া হবে না। তুই দেখছি, বিন্দীর ভাবনা ভেবে ভেবেই মারা যাবি। তুই যদি কা'ল ম'রে যাস্?'

ভীত কম্পিত কণ্ঠে রামু বলিল, 'না ভুতো, তা হ'লে মাগী আছাড়ি-বিছাড়ি ক'রে ম'রে যাবে।'

ভুতো হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, 'ম'রে যাবে না চেয়ে থাকবে। তুই দেখিস্, তিন দিন না যেতে যেতে আবার একটা সাঙ্গা ক'রে বসবে।'

রামু পাত্রটা গলায় ঢালিয়া দিয়া সক্রোধে বলিল, 'মুখ সাম্‌লে কথা কইবি ভুতো; বিন্দী তেমন নয়।'

ভুতো ভ্রূকুটী করিয়া বলিল, 'রেখে দে তোর বিন্দী, অমন কত ইন্দির চন্দর দেখা গেছে। নফরা মাজির বৌটা কি করলে দেখলি না! তোর ছাঁচার ধারে পেলা কাহারের বৌটা বার বার চার বার—'

ভুতো নিজের জন্য একপাত্র ঢালিতে যাইতেছিল। রামু তাহার হাত হইতে বোতলটা কাড়িয়া লইয়া এক নিশ্বাসে সবটা গলায় ঢালিয়া দিল; তার পর বোতলটা মেঝেয় আছড়াইয়া দিয়া জড়িত কণ্ঠে বলিল, 'লেয়াও দোসরা বোতল।'

ভুতো বলিল, 'আমার ট্যাঁক খালি।'

রামু আপনার কোঁচার খুঁট হইতে টাকাটা খুলিয়া ছুড়িয়া দিল।

৪

সন্ধ্যা হয় হয়, বিন্দী উনানে ঘুঁটে দিয়া রান্নার উদ্যোগ করিতেছিল আর রামুর প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষায় রাস্তার দিকে চাহিতেছিল। এমন সময় রামু টলিতে টলিতে আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল; উচ্চ স্খলিত-কণ্ঠে ডাকিল, 'বিন্দি!'

বিন্দী ডালের হাঁড়ীটা উনানে বসাইয়া বাঁশের চোঙ্গা দিয়া উনানে ফুঁ দিতেছিল, চোঙ্গাটা ফেলিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে উত্তর দিল, 'এসেছিস্?'

রামু বলিল, 'আলবৎ আস্‌বো। তোর বাবার ঘর যে আস্‌বো না?'

বিন্দী থমকাইয়া দাঁড়াইয়া ঘৃণায় নাসা কুঞ্চিত করিয়া বলিল, 'কথা শোন একবার, আজ আবার খেয়ে মরেছিস্!'

রামু চীৎকার করিয়া বলিল, 'চুপ রাও, তোর বাবার খাই।'

রামু কথা কহিতেছিল বটে, কিন্তু তাহার পা দুইটা এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকিতে পারিতেছিল না। বিন্দী আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, 'তা খেয়েছিস্ খেয়েছিস্, এখন শুয়ে পড়্‌বি আয়!'

রামু হাতটা টানিতে টানিতে বলিল, 'তোর বাবার হুকুমে শোব?'

বিন্দীর পিতার উদ্দেশ্যে রামু একটা কটূক্তি প্রয়োগ করিল। বিন্দী তাহার হাতটা ছুড়িয়া দিয়া সরোষে বলিল, 'তবে এইখানে প'ড়ে মর্।'

বিন্দী চলিয়া যাইতেছিল, রামু তাহার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া কর্কশ-কণ্ঠে বলিল, 'আমি মর্‌বো! আমি ম'লে তুই কাকে সাঙ্গা কর্‌বি?'

বিন্দী রাগিয়া উত্তর করিল, 'যমকে।'

রামু উচ্চকণ্ঠে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, 'কর্‌বি?'

বিন্দীও উচ্চকণ্ঠে উত্তর দিল, 'কর্‌বো না ত কি তোকে ভয় ক'রে থাক্‌বো?'

রামু বিন্দীর হাতটা ছাড়িয়া দিয়া তাহাকে লাথি মারিতে গেল; কিন্তু পাটা বিন্দীর অঙ্গ স্পর্শ করিল না, তৎপূর্ব্বে রামু নিজেই উঠানের উপর দুম করিয়া পড়িয়া গেল। বিন্দী তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া তুলিল। রামু উঠিয়া টলিতে টলিতে বিন্দীকে তাহার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আদেশ করিল। বিন্দী বলিল, 'আচ্ছা, কা'ল সকালে যাব।'

রামু বলিল, 'না, এখুনি যেতে হবে।'

বিন্দী বলিল, 'আমি যাব না।'

রামু চীৎকার করিয়া বলিল, 'তোর বাবাকে যেতে হবে। তুই যদি না যাস্—'

রামু একটা ভয়নাক কটু কথা বলিল। উত্তরে বিন্দী তাহাকে গালাগালি করিল। রামু তখন বিন্দীর উপর বাঘের মত ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং

তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতে লাগিল। বিন্দীর চীৎকারে পাড়ার মেয়ে পুরুষ অনেকে ছুটিয়া আসিল। ভূতো বহু কষ্টে রামুকে টানিয়া আনিয়া তাহাকে গালাগালি দিতে দিতে শোয়াইয়া দিল। বিন্দী প্রহারে হতচেতন হইয়া পড়িয়াছিল; সকলে ধরাধরি করিয়া তাহাকে ঘরে আনিয়া শোয়াইল এবং মুখে হাতে জল দিয়া তাহার চৈতন্যসম্পাদন করিল।

বিন্দীর ছয় মাসের গর্ভ ছিল। সেই রাত্রিতে তাহার গর্ভস্রাব হইয়া গেল। সে ঘরে পড়িয়া যাতনায় ছটফট করিতে লাগিল। ভূতো চার পয়সার কুইনাইন কিনিয়া আনিয়া তাহাকে খাওয়াইয়া দিল।

রামুর নেশার ঘোরটা যখন একটু কাটিয়া আসিল, তখন সে বিন্দীর যন্ত্রণা-সূচক কাতর স্বর শুনিয়া জড়িতকণ্ঠে বলিল, 'কেমন, আর সাঙ্গা করবি ?'

বিন্দী কাতরস্বরে বলিল, 'ওরে—একটু জল—একটু জল।'

গর্জ্জন করিয়া রামু বলিল, 'কভি নেহি, যাকে সাঙ্গা কর্‌বি, সেই জল দেবে।'

বিন্দী বলিল, 'না ঘোড়্‌ই, আর সাঙ্গা কর্‌বো না, তোর পায়ে পড়ি, একটু জল দে।'

রামু উঠিতে গেল, কিন্তু পারিল না; মাথাটা তুলিতেই তাহা ঘুরিয়া চাটায়ের উপর পড়িয়া গেল।

ভূতো ঘরে যায় নাই, কাপড় মুড়ি দিয়া রোয়াকের এক পাশে পড়িয়াছিল, সে উঠিয়া জল লইয়া বিন্দীর মুখের কাছে ধরিল; বলিল, 'জল খা বিন্দি।'

চমকিত হইয়া বিন্দী বলিল, 'তুই ?'

ভূতো বলিল, 'হাঁ আমি, জল খা।'

ভূতো মুখে জল ঢালিয়া দিল। বিন্দী জল খাইয়া একটা স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

বিন্দী ভূতোকে শত্রু বলিয়াই মনে করিত। ভূতো যে বাস্তবিক তাহার সহিত শত্রুতা আচরণ করিত, তাহা নহে, বরং সে বিন্দীর অনুরাগ-দৃষ্টি আকর্ষণ জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিত। তাহার এই চেষ্টাটুকুই কিন্তু বিন্দীর নিকট শত্রুতা বলিয়া বোধ হইত।

বিন্দী মাছ ধরিতে যাইত, কিন্তু অভ্যাস না থাকায় বেশী মাছ ধরিতে পারিত না। ভূতোও মাছ ধরিত, সে বিন্দীর অজ্ঞতা দেখিয়া হাসিত, এবং কিরূপে জাল টানিতে বা তুলিতে হয়, তাহা শিখাইয়া দিত। বিন্দী কিন্তু উহার এ উপদেশ গ্রহণ করিত না, সে যাহা করিতে বলিত, বিন্দী তাহার বিপরীত আচরণ করিত। ইহার ফলে তিন চারি ঘণ্টা পরিশ্রমের পর বিন্দী যখন দুই [illegible] পয়সার মাছও ধরিতে পারিত না, [illegible] নিজের হাঁড়ী হইতে এক খাবলা মাছ [illegible] হাঁড়ীতে ঢালিয়া দিতে যাইত। বিন্দী [illegible] দান লইতে চাহিত না। এক এক দিন সে [illegible] হইতে ভূতোর মাছভরা খাবলাটা ঠেলিয়া দিয়া [illegible] গরগর করিয়া চলিয়া যাইত। ভূতো হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিত; তাহার হাতের মাছগুলা [illegible] করিয়া মাটীতে পড়িয়া যাইত।

আজি সেই ভূতোকে নিজের রোগশয্যার পাশে দেখিয়া বিন্দী শুধু চমকিত হইল না, বিরক্তও হইল। ভূতো বিন্দীকে জল খাওয়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'এখন কেমন আছিস বিন্দি ?'

বিন্দী রুক্ষস্বরে উত্তর করিল, 'তুই এখানে কেন ? ঘরে যাস্‌নি যে ?'

ভূতো বলিল, 'তোকে এমনতর দেখে কি ঘরে যেতে পারি ? তোকে দেখ্‌বে কে ?'

বিন্দী রাগিয়া বলিল, 'যম। কেন, তুই ছাড়া কি আর দেখ্‌বার লোক নাই ?'

সহাস্যে ভূতো বলিল, 'যে দেখবার, সে তো মেরে ধ'রে বেহুঁস হ'য়ে প'ড়ে আছে। তুই একটু জল চাইলে কি জবাব দিলে, তা শুন্‌লি তো ?'

বিরক্তির সহিত বিন্দী বলিল, 'খুব শুনেছি। তুই এখন যাবি কি না বল্‌ ?'

'যাচ্চি' বলিয়া ভূতো বাহিরে আসিয়া দরজার আগড়টা ভেজাইয়া দিল।

সকালে ভূতোর মুখে সংবাদ পাইয়া বিন্দীর মা কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া আসিল। সঙ্গে বাপও আসিল। তাহারা আসিয়া রামুকে কতকগুলা গালাগালি দিল। তার পর ভূতোর পরামর্শমতে বিন্দীকে ডুলিতে তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল। রামু রোয়াকের একপাশে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। শ্বশুর-শাশুড়ীর কথার একটিও উত্তর দিল না।

অনেকটা বেলা হইলে রামু উঠিয়া পুকুরে একটা ডুব দিয়া আসিল। তার পর রান্না করিতে গিয়া দেখিল, উনানের উপর ডালের হাঁড়ীটা বসান রহিয়াছে পাশে সরায় কাঁচা মসুর ডাল। রামু মসুর ডাল ভালবাসিত, এ জন্য বিন্দী মাছ বেচিয়া যে দিন দুই পয়সা বেশী পাইত, সে দিন সে মসুর ডাল কিনিয়া আনিত। মাছের চুপড়ীর ঢাকা খুলিয়া রামু দেখিল, তাহাতে বড় বড় চারিটা চিংড়ী-মাছ নুন-হলুদ মাখা অবস্থায়

পড়িয়া আছে। চিংড়ী-মাছ রামুর বড় প্রিয়, এ জন্য বিন্দী চিংড়ী-মাছ পাইলে প্রাণান্তেও তাহা ত্যজিত না, ঘরে আনিয়া স্বামীকে ঝোল রাঁধিয়া দিত। মাছের চুপড়ীর পাশেই কর্ত্তিত আলু বেগুন রহিয়াছে। রামু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। সাম্‌নের কুলুঙ্গীতে একমুঠা চিঁড়া-মুড়কী আর একখানা তিলে পাটালী ছিল। ইহা যে রামুর জলযোগের জন্যই সংগৃহীত হইয়াছে তাহা বুঝিতে রামুর বিলম্ব হইল না। রামু আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না, ছুটিয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিল। সাম্‌নের দেওয়ালের কুলুঙ্গীর উপর একটা শূন্য মদের বোতল ছিল। রামু সেটাকে উটানে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। বোতলটা ঝন্‌-ঝন্‌ শব্দে ভাঙ্গিয়া গেল। তখন রামু ঘরের আগড় বন্ধ করিয়া বিন্দীর পরিত্যক্ত বিছানার উপর শুইয়া পড়িল; শুইয়াই হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

৩

বিন্দী চলিয়া যাইবার পর তিন চার দিন কাটিয়া গেল। রামুর এই দিন কয়টা বড় কষ্টেই কাটিল। এখনও সে মদ খাইত, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী খাইত। মদ খাইয়া টলিতে টলিতে আসিয়া, দাবার উপর শুইয়া পড়িত। রাত্রিটা যে কোথা দিয়া চলিয়া যাইত, তাহা সে জানিতে পারিত না। যখন নেশার ঘোর কাটিত, জ্ঞান হইত, তখন চোখ মেলিয়া দেখিত, সকালের রোদ আসিয়া তাহার গায়ে লাগিয়াছে, আর সে ধূলা ও শুষ্ক বমির উপর গড়াগড়ি দিতেছে! তখন রামুর বিন্দীকে মনে পড়িত, তাহার সেবা মনে পড়িত, অনুতাপ—আত্মগ্লানিতে তাহার বুকটা যেন ফাটিয়া যাইত। এদিকে উপবাসে শরীর ঝিম্‌ঝিম্‌ করিত, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিতে থাকিত। রামু ঘরে ঢুকিয়া জল গড়াইয়া, খানিকটা জল ঢক্‌ঢক্‌ করিয়া গলায় ঢালিয়া দিত।

একদিন রামু জল খাইতে গিয়া দেখিল, কলসী শুষ্ক, কা'ল জল তুলিতে ভুল হইয়াছে। সে রাগে কলসীটা লইয়া আছাড় দিল। মাটীর কলসী শতখণ্ডে চূর্ণ হইয়া গেল। ভাঙ্গিবার সময় কলসীটা ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে যেন একটা বিকটা হাসি হাসিয়া তৃষ্ণার্ত্ত রামুকে কঠোর উপহাস করিতে লাগিল। রামু দাঁতে দাঁতে চাপিয়া চূর্ণ খণ্ডগুলাকে কুড়াইয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল।

দুই দিন অনাহারের পর রামু রাঁধিতে গেল। কিন্তু রাঁধিবার উপকরণ কোথায় কি আছে, তাহা সে জানিত না। বহু কষ্টে ভাতে ভাত রাঁধিবার মত যোগাড় করিয়া লইয়া সে উনানে হাঁড়ী চাপাইল। কিন্তু উনান জ্বালিবার কিছু পাইল না। বিন্দী এখান সেখান হইতে ঘুঁটে কাঠ সংগ্রহ করিয়া রাঁধিত। রামু বহু কষ্টে কয়েকখানা ঘুঁটে আর আধশুকনা গাছের ডাল সংগ্রহ করিয়া উনান জ্বালিতে গেল, উনান কিন্তু জ্বলিল না। কেরোসিনের ডিবার তেল ফুরাইয়া গেল, ধোঁয়ায় রামুর চোখ দুইটা জবাফুলের মত লাল হইয়া উঠিল, তথাপি উনান জ্বলিল না। রামু রাগে একটা লাঠি আনিয়া হাঁড়ীর উপর বসাইয়া দিল। হাঁড়ী ভাঙ্গিয়া জল চালে উনান ভরিয়া উঠিল। রামু আপন মনে গর্জ্জন করিতে করিতে ঘরে গিয়া চাটায়ের উপর শুইয়া পড়িল; শুইয়া 'বিন্দী বিন্দী' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সন্ধ্যার সময় বাজার হইতে দুই পয়সার মুড়ি কিনিয়া আনিয়া, রামু পিত্তরক্ষা করিল।

সেই দিন রাত্রে রামু স্বপ্নে দেখিল, যেন বিন্দী আসিয়া তাহার মাথার শিয়রে বসিয়াছে, এবং আস্তে আস্তে তাহার মাথাটা নাড়িতে নাড়িতে স্নেহমাখা কণ্ঠে ডাকিতেছে, 'ওঠ্ না ঘোড়ুই দু'দিন তোর খাওয়া হয়নি, খাবি আয়।'

রামু ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল, চীৎকার করিয়া ডাকিল, 'বিন্দি, বিন্দি!'

শূন্য গৃহে পুঞ্জীভূত অন্ধকারের ভিতর হইতে প্রতিধ্বনি হাসিয়া উত্তর দিল,—'হি হি হি হি!' রামু অবসন্নভাবে আবার শুইয়া পড়িল।

স্বপ্নে বিন্দীকে দেখিয়া রামুর মনটা বড় খারাপ হইয়া গেল। সে আর ঘুমাইতে পারিল না, পড়িয়া পড়িয়া নানা কথা ভাবিতে লাগিল। দরজার আগড়ের ফাঁক দিয়া ভোরের আলো ঘরে ঢুকিলে রামু উঠিয়া মুখ হাত ধুইল, এবং গামছাখানা কাঁধে ফেলিয়া, খেটে লাঠিটা লইয়া বিন্দীকে দেখিতে চলিল।

পিছন হইতে ভূতো ডাকিয়া বলিল, 'এত সকালে কোথায় চলেছিস্ রে?'

পাছু ডাকায় বিরক্ত হইয়া রামু উত্তর দিল, 'যাচ্চি।'

ভূতো বলিল, 'কোথায় যাচ্চিস্? শ্বশুরবাড়ী নাকি?'

অপ্রসন্নভাবে রামু উত্তর করিল, 'বিন্দীকে দেখতে।'

ভূতো বলিল, 'আর দেখতে গিয়ে কি হবে, ফিরে আয়।'

অমঙ্গলাশঙ্কায় রামুর বুকটা দুড় দুড় করিয়া উঠিল। সে উদ্বেগপূর্ণ দৃষ্টিতে ভূতোর মুখের দিকে

চাহিল। ভুতো বলিল, 'বিন্দী যে তোর নামে নালিশ করেছে।'

বিস্ময়াপ্লুতস্বরে রামু বলিয়া উঠিল, 'এঁ্যা!'

ভুতো তখন মাথা নাড়িয়া গম্ভীরভাবে বলিল, 'আমি তো তোকে তখনই বলেছিলাম, ও সব সাঙ্গালী মাগীকে বিশ্বাস নাই, ওরা সব কত্তে পারে।'

ভুতো চলিয়া গেল। রামু ফিরিয়া লাঠি গামছা ফেলিয়া দাবার উপর বসিয়া পড়িল।

সেই দিন মধ্যাহ্নে রামু যখন রন্ধনের উদ্যোগে ব্যাপৃত ছিল, তখন বিন্দীর ভাই পেয়াদা সঙ্গে আনিয়া রামুকে শমন ধরাইয়া গেল।

৬

রামু গিয়া শ্বশুরের হাতে পায়ে ধরিল, পাড়ার পাঁচজনের কাছে গিয়া পড়িল। কিন্তু বেচারাম কাহারও কথা রাখিল না; সে বলিল, 'আমার মরায়ে তিন আড়া ধান আছে, এই ধান বেচে বেটাকে জেলে দেব, তবে আমার নাম বেচারাম।'

গ্রামের করালী চক্রবর্ত্তী মোকদ্দমার পরামর্শদাতা ও তদ্বিরকারক হইয়াছিলেন। রামু গিয়া তাঁহাকে ধরিল। কিন্তু চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, 'তাও কি হয় বাপু! আমার কথায় নির্ভর ক'রেই বেচারী মোকদ্দমায় হাত দিয়েছে, আমি কি কথার নড়চড় কত্তে পারি? এতে যে আমার অধর্ম্ম হবে।'

রামু কিন্তু কিছুতেই ছাড়িল না; কাঁদাকাটা করিতে লাগিল। তাহার কাতরতা দর্শনে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রাণটা একটু নরম হইল। তিনি বলিলেন, 'তা কি জান বাপু, পেটে খেলেই পিটে সয়! গোটা দশেক টাকা দিতে পার তো চেষ্টা দেখি। পরন্তু মেয়েটাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাতে হবে। এ তো আর তোমাদের ঘরের মেয়ে পাঠানো নয়, বিস্তর খরচ, বুঝলে?'

রামু ইহা বুঝিল বটে, কিন্তু দশটা টাকা যে কোথায় পাইবে, তাহাই ভাবিয়া পাইল না। কিন্তু যেরূপে হউক, টাকাটা সংগ্রহ করিতে হইবে, নতুবা জেলে যাইতে হয়। রামুর মনে পড়িল, বিন্দীর হাতে আটগাছা রূপার চুড়ী আছে, তাহা বেচিলে দশ টাকা হইতে পারে। বিন্দী কি চুড়ী দিয়া তাহাকে জেল হইতে রক্ষা করিবে না।

রামু তক্কে তক্কে থাকিয়া বিন্দীর সহিত সাক্ষাৎ করিল। ব্যস্তভাবে বলিল, 'বিন্দি, তোর চুড়ী ক গাছা দে।'

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বিন্দী বলিল, 'কেনে রে?'

রামু বলিল, 'করালী ঠাকুরকে দিতে হবে।'

ঈষৎ হাসিয়া বিন্দী বলিল, 'ঘুষ নাকি?'

রামু বলিল, 'নয় তো আমাকে জেলে যেতে হবে'।

বিন্দী বলিল, 'তুই জেলে যাবি, তা আমি চুড়ী দিতে গেলাম কেন?'

রা। তুই যে আমার ইস্তিরী।

বি। মারবার সময় সে কথাটা মনে থাকে না?

লজ্জিতভাবে রামু বলিল, 'আর তোকে মারবো না বিন্দি।'

বিন্দী বলিল, 'আমি তোর ঘরে গেলে তো মারবি?'

রামু জিজ্ঞাসা করিল, 'যাবি না?'

মাথা নাড়িয়া বিন্দী বলিল, 'উহুঁ।'

রা। তবে কি আবার সাঙ্গা করবি?

বি। করবো।

রা। সত্যি?

বি। সত্যি।

রামু প্রস্থানোদ্যত হইল। বিন্দী জিজ্ঞাসা করিল, 'চললি যে? চুড়ী নিবি না?'

মুখ ফিরাইয়া রামু বলিল, 'আর দরকার নাই।

রামু দ্রুতপদে চলিয়া গেল। বিন্দী দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

ভুতো জিজ্ঞাসা করিল, 'কি রে রামু, মামলার কিছু চেষ্টাবেষ্টা দেখলি না?'

উদাসভাবে রামু উত্তর দিল, 'কি আর দেখবো?'

ভু। তবে জেলে যাবি?

রা। গেলুম বা।

ভু। বলিস্ কি রে, জেল যে?

রামু হাসিয়া বলিল, 'যার পাছু চাইতে নাই, তার জেলই কি, আর ঘরই বা কি?'

ভুতো একটু চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'সত্যি নাকি বিন্দী আবার সাঙ্গা করবে?'

রামু বলিল, 'আমিও তাই শুনচি। তুই চেষ্টা দেখ্ না।'

ভুতো সে কথার কোন উত্তর দিল না।

মোকদ্দমার দিন রামু জনৈক প্রতিবেশীকে তাহার কুঁড়ে দেখিবার ভার দিয়া আদালতে হাজির হইল।

৭

আদালতে গিয়া রামু দেখিল, ভুতো ও পাড়ার আরও দুই এক জন বিন্দীর পক্ষ হইয়া সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছে। বিন্দীর বাপ উকিল দিয়াছে। চক্রবর্ত্তী মহাশয়

গাছতলায় বসিয়া সাক্ষীদের তালিম দিতেছেন। বিন্দী মাথায় কাপড় দিয়া একপাশে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। রামুর উকীল দিবার ইচ্ছা ছিল না। সে একাই জেলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে।

অসহায়ের সহায় ভগবান্। একজন নূতন উকীল স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া রামুর মোকদ্দমা গ্রহণ করিলেন।

মোকদ্দমার ডাক পড়িলে রামু গিয়া আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইল। ফরিয়াদী বিন্দী দাসীর ডাক পড়িল। বিন্দী মাথায় ঘোমটা দিয়া আদালতের মধ্যে আসিল। রামুর উকীল তাহাকে জেরা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। রামু দুই হাতে কাঠগড়া চাপিয়া ধরিয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

কিন্তু আদালতের প্রশ্নের উত্তরে বিন্দী যাহা বলিল, তাহাতে শুধু উকাল কেন, রামু পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া গেল। বিন্দী বলিল, 'হুজুর, আসামী আমার সোয়ামী। ও আমাকে বড্ড ভালবাসে। ও সে দিন বেশী মদ খেয়ে এসেছিল। আমি ধরে শোয়াতে যেতে ও টাল খেয়ে আমার উপর প'ড়ে যায়। তাতেই আমার গর্ভ নষ্ট হ'য়ে গিয়েছে। ও কোন দিনই আমাকে একটি চড়া কথা বলেনি। আমার বাপের সঙ্গে ওর বনিবনাও নাই, তাতেই আমার বাপ পাঁচজনের মাতলবে নালিস রুজু করেছে।'

রামু কাঠগড়ার ভিতর স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিল না। বিন্দীর প্রত্যেক কথায় তাহার বুকের ভিতর যেন মুগুরের ঘা পড়িতেছিল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, সে চীৎকার করিয়া বলে, 'ওগো, সব মিছে কথা। আমিই বিন্দীকে মেরে তার সর্ব্বনাশ করেছি।'

হাকিম মোকদ্দমা খারিজ করিয়া দিলেন। রামু উন্মাদের ন্যায় চীৎকার করিয়া বলিল, 'হুজুর!'

পাহারাওয়ালা তাহাকে ধমক দিয়া কাঠগড়া হইতে বাহির করিয়া দিল। বিন্দী হাত ধরিয়া তাহাকে আদালতের বাহিরে আনিল।

বাহিরে আসিয়া রামু জিজ্ঞাসা করিল, 'এখন তুই কোথায় যাবি বিন্দি?'

বিন্দী উত্তর করিল, 'চুলোয়।'

রা। সাঙ্গা করবি না?

বি। করবো বই কি।

রা। কাকে?

রামুর মুখের উপর একটা মৃদু কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বিন্দী সহাস্যে বলিল, 'আপাততঃ তোকে।'

বেচারাম হতবুদ্ধির ন্যায় হইয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিল, 'ও ঠাকুর মশাই, এ কি হইলো?'

চক্রবর্ত্তী সক্ষোভে বলিলেন, 'আমার মাথা আর তোর মুণ্ডু হইল। বিন্দী বেটী সব নাট ক'রে দিলে। বেটী ছোটলোকের মেয়ে কি না, ওর কি একটুও ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান আছে?'

ভূতো ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'যা ব'লেছ ঠাকুর মশাই, ভদ্দর নোক না হলে কি ধম্মকম্ম বুঝতে পারে?'

চক্রবর্ত্তী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'যাক্, বেটীকে এর ফল ভুগ্‌তেই হবে। এখন উকীলের সাড়ে সাত টাকা পাওনা আছে, সেটা মিটিয়ে দাও হে বেচারাম।'

বেচারাম মুখখানাকে একটু বিকৃত করিয়া কাপড়ের খুঁট হইতে টাকা বাহির করিবার জন্য গেরো খুলিতে লাগিল। ভূতো শুনিতে পাইল, রামু তখন গলা ছাড়িয়া গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে—

'সে কি আমার অযতনের ধো-ও-ন্,
সে কি আমার—'

ঘাতকের মায়া

১

মহেশ চক্রবর্ত্তীর ছেলে শিবু চক্রবর্ত্তী বিদ্যাবুদ্ধিশূন্য হইলেও পাঁঠা কাটিয়া আপনার নামটাকে প্রসিদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল।

সে গ্রাম্য দেবতা সিদ্ধেশ্বরীর সেবায়েত ছিল। এক পুরুষের সেবায়েত নয়, পাঁচ পুরুষের সেবা। সুতরাং পূজকের উপযুক্ত বিদ্যা না থাকিলেও সে পৈতৃক অধিকার হইতে বঞ্চিত হয় নাই। পুরোহিতের ছেলে পুরোহিত, গুরুর ছেলে গুরু, ইহাই নিয়ম। শিবুর বেলাতেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইল না। দেবতার যে আয় ছিল, তাহাতেই সুখে স্বচ্ছন্দে তাহার সংসার চলিয়া যাইত।

সংসারে খরচও তেমন বেশী ছিল না; শুধু সে নিজে আর বুড়া পিসী। মা বাপ মারা গেলে পিসীই শিবুকে মানুষ করিয়াছিলেন। লেখাপড়া শিখাইবারও চেষ্টা যে না করিয়াছিলেন, এমন নহে; কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা সফল হয় নাই। নিষ্ফলতার কারণ কতকটা তাঁহার আদর, কতকটা শিবুর অমনোযোগ। সাধারণ জ্ঞান হইবার পর শিবু দেখিল, সিদ্ধেশ্বরীর কৃপায় যে চাল কলা সন্দেশ বাতাসা ঘরে আসে, তাহাই খাইয়া যখন শেষ করিতে পারা যায় না, তখন ইহার উপর সরস্বতীর কৃপালাভের চেষ্টা সম্পূর্ণ নিরর্থক। সুতরাং পাঠশালায় বর্ণপরিচয় শেষ করিবার পর যখন কৃত্তিবাসী রামায়ণ বানান করিয়া পড়িতে পারিল, তখন সে কেবল গুরুমহাশয়ের নিকট নয়, সরস্বতীর নিকট হইতেও বিদায় গ্রহণ করিল। পিসীমা এ জন্য অনুযোগ করিলে উত্তর দিল, 'ভাবনা কি পিসীমা, মা সিদ্ধেশ্বরী থাক্‌তে আমাদের বংশে কারও গুরুমহাশয়ের বেত খাবার দরকার হবে না।'

উপনয়নের পর শিবু রামসদয় বাচস্পতির টোলে গিয়া জনৈক ছাত্রের নিকট হইতে কালীর ধ্যানটা লিখিয়া আনিয়া তাহা মুখস্থ করিল, এবং তাহার পর হইতে নিজে দেবতার পূজার ভার গ্রহণ করিল। পূজারীর ছেলে পূজারী হইবে, সুতরাং ইহাতে গ্রামের লোকের কোনও আপত্তি রহিল না। মূর্খ বলিয়া যে দুই এক জনের আপত্তি ছিল, পূজার কল্পকে দ্বিগুণ করিয়া লইয়া শিবু তাহাদের সে আপত্তির খণ্ডন করিয়া দিল। যদিও সে ধ্যানপাঠকালে 'দ্বিভুজা দক্ষিণে দেব্যাং মুণ্ডমালাং প্রসেবিতাং, সদ্যবিন্নাং শিরং খড়্গো বামাদুর্দ্ধে করাম্বুজাং' পাঠ করিত, এবং 'সিদ্ধেশ্বরী কালিকায় নমঃ' বলিয়া দেবীর চরণে পুষ্প প্রদান করিত, তথাপি সে মন্ত্রগুলি সুরের সহিত এমনই উচ্চকণ্ঠে পাঠ করিতে থাকিত যে, বাজারের দোকানদারেরা তাহা শুনিয়া প্রশংসা করিয়া বলিত, 'লেখাপড়া না জানুলে কি হয়, পূজারী ঠাকুরের ভক্তিটুকু বেশ আছে।'

শিবুর এই ভক্তিটুকু আরও বর্দ্ধিত হইত, যে দিন কোনও যজমান পাঁঠা লইয়া মানসিক শোধ করিতে আসিত। সে দিন সে নিত্যকর্ম্মপদ্ধতির 'ব্রহ্মমুরারি ত্রিপুরান্তকারী' হইতে আরম্ভ করিয়া 'নমঃ শিবায় শান্তায়' পর্য্যন্ত এক নিশ্বাসে পড়িয়া যাইত। এই ভক্তিবৃদ্ধির কারণও ছিল। আগে কামারে পাঁঠা কাটিত, এবং সে পারিশ্রমিকস্বরূপ ছাগমুণ্ড প্রাপ্ত হইত। শিবু ইহাতে বড়ই ক্ষুণ্ন হইল, এবং সে দেশের যেখানে যত বেল গাছ ছিল, তাহা উজাড় করিয়া বেল আনিয়া তাহা কাটিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে সে ছেদন কার্য্যে হাত পাকাইয়া প্রচার করিল যে, বলিচ্ছেদ পূজকেরই কার্য্য, সুতরাং এখন হইতে সে নিজেই বলিদান করিবে। ইহাতে কামার বৃত্তিলোপের আশঙ্কায় আপত্তি তুলিল। কিন্তু শিবু তাহার প্রাপ্য ছাগমুণ্ড তাহাকে দিতে স্বীকৃত হওয়ায় কামার নিরস্ত হইল।

শিবু দিন কতক আপনার কথা রাখিল, নিজে পাঁঠার মুড়ি লইয়া কামারের ঘরে পঁহুছাইয়া দিত। তার পর আর কে বা যায়! কামারও ভাবিল, দূর হউক, বামুনের ছেলে পাঁঠা কাটিবে, আর আমি তার মুড়ি খাব। তার চেয়ে বামুনে খায় মন্দ কি। তদবধি ছাগমুণ্ড শিবুর নিজের ঘরেই আসিত, এবং তদ্দ্বারা তাহার পরিপাটীরূপে নৈশ-ভোজনের আয়োজন হইত। যে দিন দুই তিনটা পাঁঠা কাটা হইত, সে দিন শিবু দুই একজন বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইত, এবং তাহার গাঁজার পরিমাণটা ডবল মাত্রা ছাড়াইয়া যাইত।

ক্রমে শিবু পাঁঠা কাটায় এমনই সিদ্ধহস্ত হইয়া উঠিল যে, গ্রামের যেখানে যত বড় বড় পাঁঠা কাটা হইত, সেইখানেই পূজারী ঠাকুরের ডাক পড়িত। অনেক স্থলে সে আবার উপযাচক হইয়া, বিনা

পারিশ্রমিকে পাঁঠা কাটিতে ছুটিত, এবং বড় বড় পাঁঠা-গুলাকে এক এক কোপে কাটিয়া দর্শকগণের বিস্ময় ও প্রশংসাপূর্ণ দৃষ্টিকেই স্বীয় বীরত্বের যথেষ্ট পারিশ্রমিক বলিয়া মনে করিত। তার পর মুদীর দোকানে, কামারশালায় বসিয়া পাঁঠা কাটার মধ্যে যে কত প্রকার কৌশল আছে, তাহাই ব্যক্ত করিতে থাকিত। তাহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া লোকে বুঝিতে পারিত, পাঁঠা কাটার মত মহৎ কার্য্য পৃথিবীতে আর নাই!

এই মহৎ কার্য্য সাধন করিয়া, মধ্যে মধ্যে গাঁজায় দম দিয়া, এবং সিদ্ধেশ্বরীর পূজা করিয়া শিবু যখন স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতেছিল, তখন পিসীমা ধরিয়া বসিল, 'বিয়ে কর্ শিবে, বাপের বংশরক্ষা হউক।'

বংশরক্ষায় শিবুরও আপত্তি ছিল না। সুতরাং সে বংশরক্ষার উদ্দেশ্যে সাত বিঘা জমী বন্ধক দিয়া চারি শত টাকা সংগ্রহ করিল, এবং সেনহাটীর পরমেশ্বর বাউলী মহাশয়কে সেই টাকা ধরিয়া দিয়া, তাঁহার সাড়ে সাত বৎসরের কন্যার পাণিগ্রহণ করিল। কিন্তু বিবাহের পর একটা গোল উঠিল, পরমেশ্বর বাউলীর বিবাহগত দোষ আছে; তিনি অধিকারী ব্রাহ্মণের কন্যার পাণিগ্রহণ করিযাছিলেন; শিবুর চারি শত টাকা মূল্যের পত্নী সেই অধিকারী-কন্যার গর্ভজাত। গ্রামে হৈ হৈ পড়িয়া গেল। গ্রামের প্রধানেরা ধরিয়া বসিল, হয় মেয়েটাকে ত্যাগ কর, নয় সিদ্ধেশ্বরীর সেবা ছাড়।

শিবু জীবিকার একমাত্র অবলম্বন দেবসেবা ছাড়িতে পারিল না, নববিবাহিতা পত্নীকেই ত্যাগ করিল।

সে আজ প্রায় সাত আট বৎসরের কথা। তার পর অনেকেই শিবুকে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিতে অনুরোধ করিয়াছিল। শিবু কিন্তু তাহাদের কথায় কান দেয় নাই, বা বিবাহের কোনও চেষ্টাও করে নাই। কেবল সকালে এক ছিলিম গাঁজা বাড়াইয়া দিয়াছিল।

২

সকালে গাঁজায় দম দিয়া বেশ এক ছিলিম কড়া তামাক সাজিয়া লইয়া, শিবু রাস্তার ধারের চালাটীতে বসিয়া আছে, এমন সময় একটি কৃষ্ণবর্ণ ছাগশিশু কুর্দ্দন করিতে করিতে তাহার সম্মুখে আসিল, এবং দুই একবার অস্ফুট শব্দ করিয়া তাহার জানুতে শৃঙ্গহীন মস্তক ঘর্ষণ করিতে লাগিল। শিবু বাঁ হাতে হুঁকা ধরিয়া ডান হাত দিয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইতে আরম্ভ করিল।

রসিক রায় রাস্তা দিয়া যাইতেছিল; পূজারী ঠাকুরকে তামাক খাইতে দেখিয়া সে আসিয়া পাশে বসিল। শিবু কলিকা-সমেত হুঁকাটা তাহার দিকে হেলাইয়া দিল। রসিক হাত বাড়াইয়া হুঁকার মাথা হইতে কলিকাটা খুলিয়া লইল, এবং উভয়-হস্ত-সংযোগে তাহাতে টান দিতে দিতে শিবুর পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছাগশিশুটির দিকে চাহিয়া বলিল, 'দিব্যি নধর পাঁঠাটি! কার হে?'

শিবু সম্মুখস্থ কুটীরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, 'দীনুর মায়ের।'

রসিক বলিল, 'বুড়ী বুঝি ছাগল চাষ করে?'

শিবু বলিল, 'কাজেই। ছেলে গেছে, কিন্তু পেট তো আছে।'

শিবুর স্বরটা যেন করুণায় আর্দ্র হইয়া আসিল। রসিক সে দিকে মনোযোগ না দিয়া, ছাগশিশুর উপর লুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, 'পাঁঠাটি কিন্তু চমৎকার। তবে এখনও বলির লায়েক হয়নি।'

শিবু বলিল, 'এই মোটে মাস দু'য়ের।'

ছাগশিশুটি তখন সরিয়া আসিয়া শিবুর পৃষ্ঠ-লেহনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। রসিক ধূমপান শেষ করিয়া, কলিকাটা শিবুর হস্তধৃত হুঁকার মাথায় বসাইয়া দিয়া বলিল, 'তোমার সঙ্গে যে খুব ভাব দেখছি।'

সহাস্যে শিবু বলিল, 'আমি এখানে বসলেই ছুটে আমার কাছে আসে।'

রসিক বলিল, 'দিন থাকতে ভাব ক'রে রাখ্ছে। তোমার হাতেই তো এক দিন ওর নিয়ৎ আছে।'

রসিক হাসিয়া উঠিল। তাহার সে উচ্চ হাস্য-ধ্বনিতে ভীত হইয়া ছাগশিশু অস্ফুট শব্দ করিতে করিতে শিবুর কোলের কাছে সরিয়া আসিল। শিবু ডান হাত দিয়া তাহার গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া তামাক টানিতে লাগিল। রসিক উঠিয়া গেল।

শিবু ডাকিল, 'কালু!'

ছাগশিশুটি কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া শিবু তাহাকে কালু, কালুয়া, কালো প্রভৃতি নামে অভিহিত করিত। তাহার সাদর আহ্বানে কালু আর একটু সরিয়া আসিল, এবং নিজের মুখটা উঁচু করিয়া শিবুর মুখের উপর স্থাপন করিতে উদ্যত হইল। শিবু 'আঃ' বলিয়া বিরক্তভাবে তাহার মুখটা ঠেলিয়া দিল। কালু যেন এ বিরক্তিটুকু বুঝিতে পারিয়া একটু পিছাইয়া আসিল, এবং একবার তাহার পৃষ্ঠে ও

জানুদেশে মাথা ঘষিয়া পাশে শুইয়া পড়িল। শিবু তামাক খাইতে খাইতে তাহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। হাত বুলাইতে বুলাইতে তাহার গলাটা টিপিয়া টিপিয়া স্থূলতা ও কোমলতার পরীক্ষা করিতে লাগিল। নাঃ, নিতান্তই কোমল, হাড় নাই বলিলেই হয়; এখনও খড়্গাঘাতের আদৌ উপযুক্ত হয় নাই; হাড়ীকাটে ফেলিয়া একটা টান দিলেই ছিঁড়িয়া যাইবে। অন্ততঃ এক বৎসরের না হইলে ইহাকে কাটিয়া সুখ নাই।

ঘাড়ের লোমগুলিকে সুবিন্যস্ত করিতে করিতে শিবু ডাকিল, 'কালু!'

কালু মুখ তুলিয়া চাহিল। শিবু বলিল, 'তুই যখন বড় হবি, আর আমি তোকে কাট্‌তে যাব, তখন কি হবে বল্ দেখি?'

কালু উত্তর করিল, 'প্যা—এঁ্যা।'

সহাস্যে শিবু বলিল, 'হবে আর কি, তোর পশু-জন্ম উদ্ধার হ'যে যাবে। কিন্তু তুই মনে করবি, বামুনটা কি নিষ্ঠুর!'

কালু উত্তর দিল, 'প্যা—এঁ্যা—এঁ্যা।'

শিবু হাসিয়া উঠিল; বলিল 'দুর বেটা, ভয় পেলি নাকি? না না, আমি তোকে কাটবো না। কেমন?'

কালু স্বীয় সম্মুখস্থ পদদ্বয়ের মধ্যে মাথাটা গুঁজিয়া দিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল। পিসীমা আসিয়া বলিলেন, 'হাঁবে শিবে, এখনো ব'সে ব'সে গল্প কববি, এর পর নাইবি, পূজো করবি কখন্?'

বলিয়াই তিনি ইতস্ততঃ চাহিয়া অতিমাত্র বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিলেন, 'ওমা, কার সঙ্গে গল্প কচ্ছিস্? এই ছাগলছানার সঙ্গে?'

শিবু বলিল, 'কেন পিসীমা, ছাগলছানাটা কি মানুষ নয়?'

ঈষৎ হাসিয়া পিসীমা বলিলেন, 'হাঁ, মস্ত মানুষ। তা এখন উঠবি না কি? তোর আবার আজ কাল পূজোর ঘটা এত বেড়েছে যে, দুপুর গড়িয়ে গেলেও পূজো সাঙ্গ হয় না।'

শিবু বলিল, 'কি করি বল পিসীমা, মন্ত্র তন্ত্র তো কিছুই জানি না, তাই মায়ের কাছে দু'দণ্ড ব'সে মাকে বুঝিয়ে বলি, মাগো, বামুনের ছেলে, গলায় শুধু পৈতেগাছটা আছে মাত্র, মন্ত্রহীন, তন্ত্রহীন, ভক্তিহীন, নিজের পূজা নিজে নাও মা।'

পিসীমা যেন একটু ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, 'তা বাছা, একটু সকাল সকাল গিয়ে তো মাকে বুঝিয়ে বল্‌লে পারিস্।'

পিসীমা গজ্ গজ্ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। শিবুও স্নানে যাইবার জন্য উঠিতে উদ্যত হইল। এমন সময় নিতাই মণ্ডল আসিয়া বলিল, 'হ্যাদে বাবাঠাকুর, একটু সকাল সকাল মায়ের থানে চলো, আমাকে আজ মানসিক শোধ কত্তে হবে।'

একটু উল্লাসের সহিত শিবু বলিয়া উঠিল, 'তোর সেই খয়রা বড় পাঁঠাটা দিবি নাকি?'

নিতাই ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। শিবু জিজ্ঞাসা করিল, 'আজ হঠাৎ যে?'

নিতাই বলিল, 'কি করি বল, দায়ে প'ড়ে। ছোট ছেলেটার ভাত, পাঁচ কুটুমকে নেমন্তন্ন করা হ'য়েছে; কিন্তু তিনটে বাজার ঢুঁড়ে দু' সের মাছ মিললো না। এখন পাঁচ জনের পাতে কি দিই? তাই ভাবলাম, মানসিকটা শোধ ক'রে দিই, পাঁঠাটা বড় আছে, পঞ্চাশ জনের খুব হবে।'

শিবু বলিল, 'তা হবে।'

নিতাই বলিল, 'একটু তৎপর এসো তাহ'লে বাবা-ঠাকুর। এর পর আবার তৈরী কর্‌তে, সিদ্ধ হ'তে বেলা থাকবে না।'

নিতাই চলিয়া গেল। শিবু আপন-মনে হাসিয়া বলিল, 'চমৎকার মানসিক-শোধ!'

মানসিক-শোধ যেমনই হউক, নিতাই মণ্ডলের পাঁঠাটা খুব বড় ছিল। সুতরাং শিবু উৎসাহের সহিত স্নান করিতে ছুটিল।

৩

সেই দিন সন্ধ্যার সময় শিবুর বাহিরের ঘরে বেশ একটা মজলিস বসিয়াছিল। নিতাই মণ্ডলের মানসিক পাঁঠাটার মাথা অন্ততঃ তিন সেরের কম হইবে না। সুতরাং তাহার সদ্‌ব্যবহারার্থ শিবু তিন চারি জন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। ঘরের ভিতর পাঁঠার মাংস পাক হইতেছিল। শিবু এক একবার আসিয়া তাহা নাড়িয়া চাড়িয়া দিতেছিল, তার পর বাহিরে গিয়া, এত বড় পাঁঠাটা সে কেমন কৌশলের সহিত কাটিয়াছে, অনেকেই তাহাকে দাঁড়াইয়া কোপ করিতে বলিয়াছিল, কিন্তু সে বসিয়াই কত সহজে কলাগাছের মত নামাইয়া দিয়াছে, তাহাই গল্প করিয়া বন্ধুগণকে শুনাইতেছিল।

অমূল্য ঘোষ এক পাশে বসিয়া গাঁজা টিপিতে-ছিল। সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, 'আচ্ছা খুড়োঠাকুর!'

শিবু উত্তর দিল, 'কি রে?'

অমূল্য বলিল, তুমি যে এই পাঁঠাগুলো কাট্‌চো, এর পর এরাও তো তোমাকে কাট্‌বে?'

শিবু হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, 'হাঁ, আমাকে কাটবে! কে বল্লে?'

অমূল্য বলিল, 'শাস্তরে বলচে; কেন শাস্তর দেখনি?'

শিবু ঈষৎ রাগিয়া বলিল, 'না, আমি শাস্তর দেখি নি, আর তুই বেটা গয়লার ছেলে বাঁক বইতে বইতে যত শাস্তর দেখেছিস্।'

অমূল্য ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'তা আমি শাস্তর না দেখি, শুনেছি তো। এই যে সে দিন মনসা-তলায় যাত্রা হ'লো সুরথ রাজার দুর্গোৎসব। তাতে কি হ'লো?'

'কি হ'লো?'

'সুরথ রাজা লক্ষ বলি দিয়েছিল, সেই এক লক্ষ পাঁঠা এক লক্ষ খাঁড়া নিয়ে তাকে কাটতে এলো। তার পর রাজার ভগবতী সহায় ছিল, তাই না হয় বেঁচে গেল।'

তাচ্ছীল্যের সহিত শিবু বলিল, 'ও সব রচা কথা! যাত্রায় অমন বলে।'

অমূল্য বলিল, 'শুধু শুধুই কি বলতে পারে? বেদ পুরাণে না থাকলে বলবে কোথা থেকে?'

তর্কে হারিয়া শিবু বলিল, 'আচ্ছা, আমি পাঁঠা কাটি, আমাকে না হয় তারা কাটবে। কিন্তু যারা খায়, তাদের কি হবে?'

অমূল্য কলিকায় গাঁজা সাজাইতে সাজাইতে বলিল, 'কাটায় আর খাওয়ায় অনেক তফাৎ খুড়ো-ঠাকুর, চোরাই মালের ভাগ লওয়া যায়, কিন্তু চুরী করা যায় না।'

সকলে হাসিয়া উঠিল। শিবু বলিল, 'ধরা পড়লে চোরের সঙ্গে মালের ভাগীদারকেও সাজা পেতে হবে, তা জানিস্?'

অমূল্য বলিল, 'তা হয়, কিন্তু চোরের চেয়ে কম সাজা হয়।'

পুনরায় একটা হাস্যরোল উত্থিত হইল। কলি-কায় অগ্নিসংযোগ হইল; হাস্য হইতে বিরত হইয়া সকলে তাহার সৎকারে মনোনিবেশ করিল। অমূল্য গাহিল—

'জগৎগুরু মায়ের ছেলে জেনেও তুমি তা জান না;
কেমনে সন্তোষ করিবে মাকে
হত্যা ক'রে এক ছাগলছানা।
মন তোমার কি ভ্রম ঘোচে না।'

গান ছাড়িয়া অমূল্য বলিল, 'আচ্ছা খুড়োঠাকুর, তোমার কি একটু দয়া মায়া হয় না? পাঁঠাগুলো ভ্যা ভ্যা ক'রে চেঁচাতে থাকে, তার উপর এক কোপ।'

সহাস্যে শিবু বলিল, 'তোমাদের খুব মায়া হয়, না?'

সাতকড়ি পাল বলিল, 'তা হয় দাঠাকুর, বড্ড মায়া হয়। আমি তো ছুটে পালিয়ে যাই।'

শিবু হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, 'দুর পাগল, এতে কি মায়া করলে চলে? এ যে মায়ের বলি, ওদের পশুজন্ম উদ্ধার হ'য়ে যায়।'

অমূল্য বলিল, 'ডাকাতরাও না কি মানুষ মারবার সময় এই রকম কি একটা কথা বলে, 'এস, তোমায় দেহটা পাল্টে দিই।'

শিবু তিরস্কার করিয়া বলিল, 'ডাকাতদের মানুষ মারার সঙ্গে আর বলিদানের সঙ্গে বুঝি তুলনা? সে হ'লো খুন, আর এ হ'লো মায়ের ভোগ। পাঁঠাদের সৃষ্টি এই জন্যই। হয় নয় বাচস্পতি মশায়কে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখিস্।'

কিন্তু তখন আর জিজ্ঞাসা করিতে যাইবার সময় ছিল না, মাংস প্রস্তুত হইয়াছিল, সুতরাং জিজ্ঞাসার অভিপ্রায়টা ভবিষ্যতের জন্য স্থগিত রাখিয়া সকলে মাংসের সদ্ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইল, এবং নির্ম্মমভাবে নিহত ছাগের মাংসটা যে সম্পূর্ণ মুখরোচক হইয়াছে, সকলে একবাক্যে এইরূপ মত প্রকাশ করিতে লাগিল।

সে রাত্রে শিবু কিন্তু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুমাইতে পারিল না, বিছানায় পড়িয়া অমূল্য ঘোষের কথা-গুলা মনে মনে তোলাপাড়া করিতে লাগিল। মূর্খ অমূল্য বলে কি? দেবতার বলির জন্য পশুবধ নির্দ্দ-য়তা! যজ্ঞে বধ করিবার জন্যই ত পশুর সৃষ্টি। কলিতে যজ্ঞ নাই, দেবতার ভোগই সেই যজ্ঞ। যাহা দেবতা গ্রহণ করেন, তাহা কি অধর্ম্ম হইতে পারে? যাহাতে দেবতার তৃপ্তি, তাহার অনুষ্ঠান কি নিষ্ঠুরতা! কিন্তু সত্যই কি ছাগশোণিতে দেবতা তৃপ্ত হন? সত্যই কি তিনি ইহা গ্রহণ করেন? ভক্তির ভগবান্; ভক্তির সহিত দিলে বোধ হয় গ্রহণ করেন। কিন্তু কুটুম্বগণের ভোজনের উদ্দেশ্যে —তাহাদের জন্য পাতা পাতিয়া দেবতাকে পাঁঠা দিতে আসা, সে পাঁঠা কি দেবতা গ্রহণ করিতে পারেন? তাহাকে বধ করা কি অন্যায় বধ নয়? কে জানে, এখানে শাস্ত্র কি বলে? শিবু শাস্ত্র জানে না, কিন্তু তাহার মনটা যেন খুঁৎ-খুঁৎ করিতে লাগিল।

৪

বৎসরান্তে একবার করিয়া সিদ্ধেশ্বরীর বারো-য়ারী পূজা হয়। গ্রামের ইতর ভদ্র, ধনী নির্ধন,

সকলের চাঁদায় পূজার ব্যয় নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে ; বিশ পঁচিশটা পাঁঠা পড়ে, চণ্ডীর গান হয়, গ্রামখানা যেন উৎসবে মাতিয়া উঠে। যাহার যাহা মানসিক থাকে, তাহা এই সময়েই দিবার জন্য সকলে প্রস্তুত হয়। এই এক দিনের আয়ে শিবুর ছয় মাস সংসার চলে ; পাঁঠা কাটিতে কাটিতে সে ক্লান্ত হইয়া পড়ে।

এ বৎসরও বারোয়ারী পূজার আয়োজন চলিতেছিল। পূজার দিন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল ; ঘরে ঘরে চাঁদা আদায় হইতেছিল ; গ্রামের মধ্যে উৎসবের সাড়া পড়িয়াছিল। চাঁদা আদায় ও পূজার অন্যান্য উদ্যোগের জন্য শিবুকেও খাটিতে হইতেছিল। এ জন্য সে দিন তাহার পূজা করিয়া ফিরিতে অনেকটা বেলা হইয়াছিল। সে গামছার এক খুঁটে ভিজান চাল, অপর খুঁটে ফলমূল বাঁধিয়া লইয়া বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং দীনুর মার ঘরের দিকে চাহিয়া ডাকিল, 'কালু !'

ডাকিয়া শিবু ক্ষণকাল অপেক্ষা করিল, কিন্তু কালু আসিল না। তখন সে আরও একটু উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, 'কেলো ! আয়, আয় !'

কেলো আসিল না ; শিবু ইহাতে যারপরনাই আশ্চর্য্যান্বিত হইল। কেলো যেখানেই থাকুক, তাহার পূজা করিয়া ফিরিবার সময় প্রত্যহ ঐ তেঁতুলতলায় শুইয়া সে তাহার আগমন প্রতীক্ষা করে ; তার পর তাহার প্রদত্ত এক মুঠা ভিজা চাল ও এক মুঠা ভিজা ছোলা, দুই চারিটা কলা মুলা খাইয়া তবে অন্য দিকে চরিতে যায়। কোনও দিনই ইহার ব্যতিক্রম হয় না। কিন্তু আজ সে গেল কোথায় ? রৌদ্রতপ্ত পথের মাঝে দাঁড়াইয়া শিবু উচ্চকণ্ঠে বার বার 'কেলো আয়, কেলো আয় !' বলিয়া ডাকিতে লাগিল।

তাহার ডাক শুনিয়া দীনুর মা বাহির হইয়া আসিল। শিবু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আজ কেলো কোথায় গেল দীনুর মা ?'

দীনুর মা বলিল, 'কেলো তো নাই বাবাঠাকুর।'

বিস্ময়জড়িতকণ্ঠে শিবু বলিয়া উঠিল, 'নাই !'

দীনুর মা বলিল, 'হাঁ বাবা, নাই। আজ তাকে বেচে ফেলেছি।'

গর্জ্জন করিয়া শিবু বলিল, 'বেচে ফেলেছিস্ ? কাকে বেচলি ?'

দীনুর মা বলিল, 'বাচ্চোত মশায় কিনে নিয়ে গেল। মায়ের কাছে তেনার ছেলের মানসিক আছে, তাই আড়াই টাকা দিয়ে নিয়ে গেল।'

শিবু স্তব্ধভাবে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিল, তার পর একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

শিবুর ইচ্ছা হইল, সে আড়াইটা টাকা ফেলিয়া দিয়া কেলোকে ফিরাইয়া আনে। কিন্তু বাচস্পতি ফিরাইয়া দিবে কি ? না হয় আড়াই টাকার স্থলে তিন টাকা, চারি টাকা, পাঁচ টাকা লইবে। কিন্তু তাহাতেই বা কি হইবে ? সে যখন ছাগ-জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তখন এক দিন না এক দিন এইরূপেই তাহার নিয়তি শেষ হইবে। ইহা ভিন্ন তাহার নিয়তিতে আর অন্য বিধান নাই। সুতরাং তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়াই বা ফল কি? আর একটা পাঁঠার জন্য এতটা পাগলামী, লোকে শুনিলেই বা কি বলিবে ? সে যে নিজের হাতে অসংখ্য পাঁঠাকে পশুজন্ম হইতে উদ্ধার করিয়া দিতেছে ! তাহারা যে পদার্থ, কেলোও ত তাই। বিশেষ বাচস্পতি তাহাকে মায়ের নামে লইয়া গিয়াছেন। তাহাকে এখন ফিরাইয়া আনিতে গেলে কি দেবীর কোপে পড়িতে হইবে না ? ছি ছি, সামান্য একটা পাঁঠার জন্য তাহার এ কি পাগলামী !

পাগলামী বলিয়া ভাবিলেও শিবুর মনটা কিন্তু সে দিন এমনই অপ্রসন্ন হইয়া রহিল যে, কিছুতেই তাহার মনে স্ফূর্ত্তি রহিল না। সন্ধ্যার সময় সিদ্ধেশ্বরীর আরতি শেষ করিয়া আসিয়া সে যখন অন্ধকার চালাটিতে একাকী চুপ করিয়া বসিয়াছিল, তখন অমূল্য ঘোষ আসিয়া প্রাতঃপ্রণাম করিয়া পাশে বসিল, এবং বারোয়ারীর আয়োজন সম্বন্ধে গল্প করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল, 'এবার শুনছি নাকি তিরিশ চল্লিশটা পাঁঠা আসবে ?'

অন্যমনস্কভাবে শিবু উত্তর দিল, 'তা হবে।'

অমূল্য বলিল, 'কিন্তু এত পাঁঠা তুমি একা কাট্‌তে পারবে খুড়োঠাকুর ?'

অন্য দিন হইলে সে কত উৎসাহসহকারে এই প্রশ্নের উত্তর দিত, এবং সে যে একদমে এক শত ছাগের শিরশ্ছেদন করিতে পারে, সগর্ব্বে তাহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিত। আজ কিন্তু নিতান্ত নিরুৎসাহভাবেই উত্তর করিল, 'কি জানি।'

অমূল্য বলিল, 'আচ্ছা খুড়োঠাকুর যদি এক আধটা দু'কোপ হয়ে যায় ?'

গভীর ঔদাস্যসহকারে শিবু বলিল, 'হয় হ'লো।'

অমূল্য বলিল, 'তা হ'লে ত তোমার দুর্নাম।'

বিরক্তির সহিত শিবু বলিল, 'তবে আর কি ! নে, মাল তৈরী কর্।'

পাঁঠা কাটার গল্পে খুড়োঠাকুরের এই ঔদাস্য দেখিয়া অমূল্য অতিমাত্র বিস্ময়ের সহিত গঞ্জিকা-প্রস্তুত-করণে ব্যাপৃত হইল।

গাঁজায় শেষ দম দিয়া অমূল্য উঠিয়া যাইবার সময় আপন মনে মৃদুস্বরে গায়িতে গায়িতে গেল—

"জগৎশুদ্ধ মায়ের ছেলে জেনেও তুমি
তা জান না;
কেমনে সন্তোষ করবে মাকে হত্যা
করে এক ছাগলছানা।
মন তোমার কি ভ্রম ঘোচে না।"

শিবু চুপ করিয়া একা বসিয়া রহিল। অমূল্যর গানের প্রতিধ্বনিটা অন্ধকারের ভিতর দিয়া আসিয়া তাহার মনের উপর যেন আঘাত করিতে লাগিল—'জগৎশুদ্ধ মায়ের ছেলে'।

শিবুর এই মানসিক অবসাদটা কিন্তু স্থায়ী হইল না। সে যতই শুনিতে লাগিল, মিত্তিররা মোষের মত একটা পাঁঠা কিনে এনেছে, বারুইদের পাঁঠাটা ওজনে এক মনের কম হবে না, বাগেদের কালো পাঁঠাটার জন্য বোধ হয় একটা নূতন হাড়ীকাঠ তৈরী করতে হবে, ইত্যাদি, ততই একটা নবীন উৎসাহ আসিয়া শিবুর অবসাদ দূর করিয়া দিতে লাগিল, এবং এই সকল প্রকাণ্ডকায় ছাগকুল ছেদন করিয়া সে যে অখণ্ড গৌরব অর্জ্জন করিবে, তাহারই কাল্পনিক আনন্দে তাহার চিত্ত পূর্ণ হইয়া উঠিল।

৫

ধূমধামের সহিত দেবীর পূজা শেষ হইল। পূজক শিবু; সমারোহের পূজা। সুতরাং বাচস্পতি মহাশয় কাছে বসিয়া মন্ত্রাদি বলিয়া দিতেছিলেন। পূজাশেষে বলিদানের পালা। পঁচিশটা পাঁঠা উপস্থিত হইয়াছে; তিনটা বারোয়ারীর পাঁঠা, অবশিষ্ট সব মানসিকী। প্রথমেই বারোয়ারীর পাঁঠা তিনটা উৎসর্গ করা হইল। তার পর মানসিকী পাঁঠা উৎসর্গ। প্রথমেই বাচস্পতি মহাশয়ের মানসিকের পাঁঠা আসিল। তাহাকে দেখিয়াই শিবু শিহরিয়া উঠিল। তাহার মুখ হইতে অজ্ঞাতে উচ্চারিত হইল 'কেলো!'

বাচস্পতি মহাশয় মন্ত্র পড়াইতে লাগিলেন, 'পশুপাশায় বিদ্মহে বিশ্বকর্ম্মণে ধীমহি—'

শিবু মন্ত্র পড়িবে কি, কেলো তখন আহ্লাদে কুর্দ্দন করিয়া তাহার বুকের ভিতর মাথাটা গুঁজিয়া দিয়াছে। শিবু হতবুদ্ধির ন্যায় তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বাচস্পতি মহাশয় পুনরায় মন্ত্রটা আবৃত্তি করিলেন। শিবু কিন্তু মন্ত্র পড়িল না; সে বাচস্পতির দিকে ফিরিয়া বলিল, 'বাচস্পতি মশায়, পাঁঠাটা বড্ড ছোট—'

বাধা দিয়া বাচস্পতি বলিলেন, 'হাঁ হাঁ ছোট, বড় কোথায় পাব, বল। বারোয়ারীর হিড়িকে দেশে কি আর পাঁঠা আছে?'

শিবু একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, 'কিন্তু বলির অযোগ্য—

উগ্রস্বরে বাচস্পতি বলিলেন, 'ওহে বাপু, যোগ্য কি অযোগ্য, তোমার চেয়ে আমার বেশী জানা আছে। 'ন চ ত্রৈমাসিকান্নূনং পশুং দদ্যাচ্ছিবাবলিং,'—কাল এর বয়স তিন মাস উত্তীর্ণ হয়েছে। এখন মন্ত্র কটা বলে নাও।'

অগত্যা শিবু মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিল। কিন্তু মন্ত্রগুলা ভাল করিয়া উচ্চারণ করিতে পারিল না, তাহা জড়াইয়া যাইতে লাগিল।

তার পর মিত্তিরদের বড় পাঁঠাটা উৎসৃষ্ট হইবার জন্য আসিল। সেই প্রকাণ্ডকায় ছাগবীর আপনার বলিষ্ঠ দেহ লইয়া গর্ব্বে শৃঙ্গ উন্নত করিয়া যখন শিবুর পাশে দাঁড়াইল, তখন শিবুর সুপ্ত জিঘাংসা আবার যেন জাগিয়া উঠিল। সে জোরে জোরে মন্ত্র পাঠ করিয়া, তাহাকে উৎসর্গ করিতে লাগিল।

বলির সকলই প্রস্তুত। উৎসৃষ্ট পাঁঠাগুলিকে পর পর আটচালার খুঁটিতে বাঁধা হইয়াছে; গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা বলিদান দেখিবার জন্য আটচালা ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। বাদ্যকরগণ বাদ্যযন্ত্র লইয়া প্রস্তুত হইয়াছে। শিবু সিন্দূরে ললাট চর্চ্চিত করিয়া, দেবীর চরণের বিল্বপত্র কানে গুঁজিয়া, খড়্গহস্তে যূপকাষ্ঠের নিকট আসিয়া বসিল। প্রথম পাঁঠাটিকে আনিয়া হাড়কাঠে ফেলা হইল। দুই তিন জনে পাঁঠাটাকে টানিয়া ধরিল। শিবু দৃঢ়মুষ্টিতে খড়্গ ধরিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিল; ছাগশিশুর আর্ত্ত চীৎকারে, দর্শকমণ্ডলীর উল্লাস-সূচক মা মা শব্দে দেবীমন্দির কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু ঘাতকের উদ্যত খড়্গ ছাগের স্কন্ধে পড়িল না; খাঁড়া তুলিয়া শিবু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মন্দিরমধ্যস্থা দেবীপ্রতিমার দিকে চাহিতেই রজ্জুবদ্ধ ভীতিকম্পিত কেলোর উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল। সে খাঁড়াটা এক পাশে রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং ব্যস্তহস্তে যূপকাষ্ঠমধ্যস্থ পাঁঠার গলাটা মুক্ত করিয়া দিল। জনমণ্ডলী বিস্ময়ে নির্ব্বাক্!

বাচস্পতি রুদ্রগম্ভীরকণ্ঠে ডাকিলেন, 'শিবু!'

শিবু রক্তদৃষ্টি উন্নমিত করিযা তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। বাচস্পতি বলিলেন, 'এ কি তোমার কাণ্ড!'

শিবু উচ্চকণ্ঠে বলিল, 'আমার কাণ্ড নয়, মাযের কাণ্ড। ঐ দেখুন, ছেলেকে কাটতে দেখে মা কাঁদছে।'

জনমণ্ডলী শিহরিযা উঠিল। বাচস্পতি উচ্চ হাসি হাসিযা বলিলেন, 'উন্মাদ! মা কাঁদেন কি? রুধিরপ্রিয়া মা রুধিরোৎসবের আযোজন দেখে হাসছেন!'

শিবু একবার মন্দিরের ভিতর দৃষ্টিপাত করিযাই চীৎকার করিযা বলিয়া উঠিল, 'রাক্ষসী!'

পরক্ষণেই সে ভিড় ঠেলিযা সে স্থান হইতে ছুটিযা পলাইল। বাচস্পতি তাহাকে অর্ব্বাচীন, উন্মাদ, পাষণ্ড প্রভৃতি আখ্যায অভিহিত করিযা কামারকে বলিদানের জন্য আদেশ দিলেন।

সন্ধ্যার পর অমূল্য আসিযা বলিল, 'ও খুড়োঠাকুর, পাঁঠাকাটা ছেড়ে দিলে যে?'

শিবু বলিল, 'শুধু পাঁঠা কাটা নয, যে ঠাকুর পাঁঠা খায, তার পূজো পর্য্যন্ত ছেড়ে দিলাম।'

আশ্চর্য্যান্বিতভাবে অমূল্য বলিল, 'বল কি খুড়োঠাকুর, এত আয়—'

শিবু হাসিয়া বলিল, 'আয হ'লে হবে কি অমূল্যচরণ, আযের চেয়ে যে ব্যয় অনেক বেশী। এখানেই যেন পাঁঠা বেচারীদের আইন আদালত নাই, কিন্তু ও পারে ত আছে। তখন কি হবে বাপ?'

অমূল্য বলিল, 'তখন শাস্তরের দোহাই দেবে।'

শিবু বলিল, 'ও সব শাস্তর টাস্তর বাচস্পতি বিদ্যানিধি মশাযদের জন্য, আমাদের মত গাঁজাখোরদের জন্য নয়।'

অমূল্য হাসিতে হাসিতে বলিল, 'তুমি দেখছি সদ্য সদ্য গোঁড়া বোষ্টমঠাকুর হ'যে পড়লে। এক দিনেই সব ছেড়ে দিলে?'

শিবু বলিল, 'সব ছাড়লেও গাঁজা ছাড়ছি না বাপু। এখন বড় ক'রে একটা ছিলিম তৈরী কর দেখি।'

অমূল্য স্ফূর্ত্তির সহিত ছিলিম তৈরী করিতে করিতে গলা ছাড়িযা গান ধরিল—

'মেষ ছাগল মহিষাদি কাজ কি রে তোর বলিদানে,
জয়কালী জযকালী ব'লে বলি দাও ছয রিপুগণে।
মন তোর এত ভাবনা কেনে।'

সমাপ্ত

ডিক্রীজারি

[উপন্যাস]

নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

মূল্য ১৷৷০ টাকা



ডিক্রীজারি

প্রথম পরিচ্ছেদ

পাঁচুগঞ্জের পতিতপাবন দত্ত বেণেপুকুরের আপীলের মামলায় পরাজিত হইয়া সেই পরাজয়ের বেদনাটা ভুলিবার জন্য যখন সর্ব্বসন্তাপহারী শ্রীহরির চরণে দৃঢ় মনঃসংযোগের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তখন বিজয়ী পক্ষ নরহরি চৌধুরী ঢাক ঢোলের শব্দে গ্রামখানাকে কাঁপাইয়া তুলিতে তুলিতে তাঁহার বাড়ীর সম্মুখের পথ দিয়া সিদ্ধেশ্বরীর পূজা দিতে গিয়া তদীয় পরাজয়জনিত বেদনাকে এমন নির্দ্দয়ভাবে উদ্দীপিত করিয়া দিলেন যে, পতিতপাবনের মনে হইল, সিদ্ধেশ্বরীর সম্মুখে নিহত ছাগশিশুর সহিত তাঁহার মস্তকটাও যেন ছিন্ন হইয়া রুধির-কর্দ্দমিত যূপকাষ্ঠতলে লুটাইয়া পড়িল এবং ছিন্নশির ছাগশাবক ক্ষণমাত্র যন্ত্রণাসূচক পদ সঞ্চালন করিয়াই স্থির হইলেও পতিতপাবন সারাদিনেও সে যাতনার নিদারুণ জ্বালা হইতে অব্যাহতি পাইলেন না।

পতিতপাবন জীবনে মোকদ্দমা অনেক করিয়াছেন; এমন কি, হিসাব করিয়া দেখিলে তাহার সংখ্যা তদীয় বয়সের সংখ্যাকেও অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে। জমিদারের সহিত কত দেওয়ানি, কত ফৌজদারী মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে, জমিজমা লইয়া গ্রামের কত বর্দ্ধিষ্ণু লোকের সঙ্গে মামলা লাঠীবাজী চলিয়াছে; কত মোকদ্দমায় তিনি জিতিয়াছেন, কত মোকদ্দমায় হারিয়া আসিয়াছেন; কত ফৌজদারী মামলায় তাঁহাকে অর্থ দণ্ড দিতে হইয়াছে, জেলখানার দরজায় পর্য্যন্ত পা দিতে হইয়াছে। কিন্তু আজ এই বেণেপুকুরের সামান্য মামলাটায় হারিয়া তিনি আপনার পরাজয়ের বেদনাটা যত তীব্রভাবে অনুভব করিলেন, বড় বড় মামলা —যাহা হাইকোর্ট পর্য্যন্ত গিয়া মীমাংসিত হইয়াছিল, তেমন বড় মামলায় হারিয়াও পতিতপাবন লজ্জা বা অপমানের তাড়না এমন কঠোরভাবে ভোগ করেন নাই। মোকদ্দমায় হার জিত দুই আছে; কিন্তু নরহরি চৌধুরীর মত নিঃসহায় আইনজ্ঞানে অপারদর্শী লোকের সহিত মোকদ্দমায় হারিয়া আসা—পতিতপাবনের কাছে যেন মৃত্যুর মত যন্ত্রণাদায়ক হইল। তাঁহার 'মামলাবাজ' বলিয়া এত দিনের সুনাম বা দুর্নাম জন্য অহঙ্কার ক্ষুদ্র ছাগশিশুটির ছিন্নমস্তকের সঙ্গেই যেন সর্ব্বসমক্ষে পথের ধুলার উপর লুটাইয়া পড়িল।

কিছুতেই হরিনামে মনঃস্থির করিতে না পারিয়া অবশেষে পতিতপাবন মোকদ্দমার নথীপত্রের দপ্তর পাড়িয়া দুঃসহ অপমানে জর্জ্জরিত মনটাকে তাহার জীর্ণ কাগজগুলার মধ্যে নিমগ্ন করিতে চেষ্টিত হইলেন।

কত হাকিমের রায়ের নকল, কত সাক্ষীর জেরা জবানবন্দী, কত কীটাকুলিত জীর্ণ দলিল, কত পুরাতন অব্যবহৃত ষ্ট্যাম্প কাগজ বাহির হইল, পতিতপাবন এক একখানার উপর সোৎসুক দৃষ্টিপাত করিয়াই তাহাকে সরাইয়া রাখিলেন, এবং যেন নিতান্ত আগ্রহের সহিত সেই সকল কাগজপত্রের মধ্যে কি একখানা দরকারী কাগজের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে তাঁহার কাগজের উপর নিবদ্ধ দৃষ্টিটাকে সহসা বিস্ময়ে চমকিত করিয়া দিয়া নরহরি চৌধুরী সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং মাদুরের উপর বিক্ষিপ্ত কাগজগুলার দিকে সহাস্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "এই যে ভায়া, এমন সময় আবার কাগজপত্র নিয়ে ব'সেছ?"

পতিতপাবন গম্ভীর মুখে একটু হাসি আনিবার চেষ্টা করিয়া উত্তর করিলেন; "হাঁ, কাগজপত্র, মামলা মোকদ্দমা, হার জিত এই তো আমার নিত্য কর্ম্ম।"

"সেটা ঠিক" বলিয়া নরহরি হাসিতে হাসিতে মাদুরের এক পাশে বসিয়া পড়িলেন। পতিতপাবন পার্শ্ববর্ত্তী গোশালার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক ভৃত্য গদাধরকে তামাক দিয়া যাইবার জন্য আদেশ করিলেন। নরহরি বলিলেন, "থাক্ থাক্, তামাক দিতে হবে না, এখনি আমাকে উঠতে হবে।"

এখনই উঠিবার প্রয়োজন সত্ত্বেও কি উদ্দেশ্যে তিনি উপস্থিত হইয়াছেন তাহা জানিবার জন্য পতিতপাবন চশমার ভিতর দিয়া চৌধুরী মহাশয়ের মুখের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি সঞ্চালিত করিলেন। তাঁহার সে দৃষ্টির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, "মামলাটার তরে মায়ের কাছে মানত

ক'রেছিলাম। আজ সেই মানসিক শোধ ক'রেছি কি না। তা মায়ের প্রসাদ নিজেরা ঘরে খাব কেন, পাঁচজনের পায়ের ধূলা যদি এই উপলক্ষ্যে নিতে পারি। সেটা তো আর সহজে হ'য়ে ওঠে না।"

গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালনপূর্ব্বক পতিতপাবন তাঁহার কথায় সায় দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তা তো বটেই।"

নরহরি তখন হাতে হাত ঘ'ষিয়া বিনয়নম্র স্বরে বলিলেন, "তা হ'লে ভায়া, আজ যদি দয়া ক'রে—"

বাধা দিয়া পতিতপাবন বলিয়া উঠিলেন, "বিলক্ষণ, আপনি খাওয়াবেন, আমি খেয়ে আসবো, এর আবার দয়া কিসের? যদি বলেন তো এরকম দয়া রোজ দু'বেলা কত্তে পারি।"

বলিয়া তিনি একটু কাষ্ঠহাসি হাসিলেন। নরহরি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তেমন ভাগ্য ক'রে কি এসেছি। কালে কস্মিনে পাঁচজনের পায়ের ধূলো—তাও হ'য়ে ও'ঠ না। যাক্, তা হ'লে ভায়া—"

পতিতপাবন বলিলেন, "অবশ্য, আর আপনাকে বলতে হবে না। তবে বেশী রাত হবে না তো?"

নরহরি বলিলেন, "না না, রাত হবে কেন, বড় জোর সাড়ে ন'টা দশটা। বেশী তো কিছু নয়, লুচী আর মায়ের প্রসাদ। বাড়ার ভাগ একটা মাছের তরকারী। বেণেপুকুরে আজ মাছ ধরিয়েছিলাম কি না। তা কৈ, লোকে বলতো, দশ মণ মাছ আছে, বিশ মণ মাছ আছে। কিন্তু মাছ কোথায়? দু'বার জাল টেনে মোটে মণ দেড়েক মাছ উঠ্‌লো। তা নফরা জেলের কোথায় মাছের বায়না আছে, সে এক মণ নিয়ে গেল। বিলিও হ'লো সের দশেক। বাকী আট দশ সের যা আছে তাই দিয়ে যা হয় হবে। নাঃ, পুকুরটায় মাছ তেমন নাই। বড় জোর আর মণেক দু'মণ থাক্‌তে পারে।"

বলিয়া তিনি পতিতপাবনের মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটা একবার সঞ্চালিত করিয়াই উঠিয়া পড়িলেন, এবং পায়ের ধূলা দিবার জন্য তাঁহাকে আর একবার অনুরোধ করিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন। পতিতপাবন দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া কঠোর দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

নরহরি দৃষ্টিপথের অন্তর্হিত হইলে পতিতপাবন মুখ ফিরাইয়া উচ্চ কণ্ঠে ডাকিলেন, "গদা, ওরে গদা!"

গোশালার মধ্য হইতে গদাধর উত্তর দিল, "কেনে কত্তা?"

দাঁত মুখ খিঁচাইয়া পতিতপাবন বলিয়া উঠিলেন, "বেটাকে কখন্ তামাক দিতে বলেছি, এতক্ষণ পরে কেনে কত্তা!"

খইল ও গোময়ে অপরিষ্কৃত হাতটা কাটা বিচালীর সাহায্যে কতকটা পরিষ্কৃত করিয়া লইয়া গদাধর তামাক সাজিতে বসিল এবং কলিকায় তামাক ভরিতে ভরিতে জিজ্ঞাসা করিল, "চৌধুরী বুড়ো কেনে এয়েছিল কত্তা?"

কাগজের উপর দৃষ্টি রাখিয়া পতিতপাবন উত্তর করিলেন, "নেমন্তন্ন কত্তে।"

"কিসের নেমন্তন্ন? বুড়োর ছরাদ হবে নাকি?"

"বুড়োর ছরাদ নয়—আমার ছরাদ। আজ সিদ্ধেশ্বরী তলায় পূজো দিয়েছে জানিস্ না?"

"জানি না আবার কত্তা? ঢাকের আওয়াজে কাণে তালা লেগে গেল।"

"মামলায় জিতে আমোদ হ'য়েছে কি না। তাই পাঁঠা কেটে লোক খাওয়াবে।"

তাচ্ছীল্যসূচক মুখভঙ্গী করিয়া গদাধর বলিল, "সেই বেরালছানা কেটে ক'জন লোক খাওয়াবে?"

তিরস্কারের স্বরে পতিতপাবন বলিল, "দূর হতভাগা, দেবতার ভোগ, বেরালছানা বলতে আছে?"

গদাধর নিরুত্তরে মুখটা বিকৃত করিয়া কয়লা ধরাইতে লাগিল। পতিতপাবন হাতের কাগজখানা ফেলিয়া অন্য একখানা কাগজ লইতে লইতে বলিলেন, "আজ বেণেপুকুরে মাছ ধরিয়েছিল না?"

গদাধর অগ্নিসংযুক্ত কয়লাটা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "হুঁ, ধরিয়েছিল বৈকি।"

"তুই দেখেছিস্?"

"দেখেছি বৈকি—আমি তখন পাড়ের ঈশেন কোণে শিমুল গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে মুড়ী খাচ্চি। বিস্তর মাছ ছিল। তোমাকে বলবো কি কত্তা, এক একটা মাছ বিশে মোড়লের কেলো দামড়াটার মতন লাফাতে লাগলো।"

ধমক দিয়া পতিতপাবন বলিলেন, "মর বেটা মাছ হ'লো দামড়া গরু! কা'কে কি বলতে হয় বেটা বাগ্দীর ছেলের সে জ্ঞান এখনো হ'লো না।"

ঘাড় নাড়িয়া গদাধর বলিল, "তা এমন কি মন্দ কয়েছি কত্তা? মুখে বললেই কি মাছটা সত্যি সত্যি দামড়া গরু হ'লো?"

"তোর মাথা হ'লো।" বলিয়া পতিতপাবন চক্ষু হইতে চশমা খুলিয়া কাপড়ের খুঁট দিয়া মুছিতে লাগিলেন। গদাধর ফুঁ দিয়া কলিকা ধরাইয়া হস্তসংযোগে তাহাতে একটা

টান দিল, এবং হুঁকার মাথায় কলিকা বসাইয়া কর্তার হাতে হুঁকা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "নেমন্তন্ন খেতে যাবে নাকি কত্তা?"

তাচ্ছীল্যসূচক স্বরে "দেখা যাক্" বলিয়া পতিতপাবন হুঁকায় টান দিলেন। গদাধর স্বকার্য্যে প্রস্থান করিল। পতিতপাবন তামাক টানিতে টানিতে একখানার পর একখানা কাগজের উপর চোখ বুলাইয়া যাইতে লাগিলেন।

হঠাৎ একখানা কাগজ হাতে পড়িতেই পতিতপাবনের চিন্তাগম্ভীর মুখখানা যেন একটা অব্যক্ত আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে কাগজখানা একটা বন্ধকী কোবালা। কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহের সময় নরহরি চৌধুরী এই বন্ধকী কোবালা লিখিয়া দিয়া কেনারাম সমাদ্দারের নিকট সাড়ে তিনশত টাকা লইয়াছিলেন। ছয় বৎসরে সেই সাড়ে তিনশত টাকা পাঁচশত টাকায় পরিণত হইলে মহাজন নালিশ করিয়া টাকা আদায় করিতে উদ্যত হইলেন। তখন পতিতপাবনই মধ্যস্থ হইয়া মহাজনকে নালিশ হইতে বিরত করেন, এবং নরহরির তিন বিঘা নিষ্কর জমি বিক্রয় করাইয়া সেই ঋণ শোধের উপায় করিয়া দেন। পতিতপাবন নিজ হাতে টাকাটা কেনারামকে প্রদান করিয়াছিলেন; সুতরাং বন্ধকী কাগজখানা তাঁহারই হাতে আসিযাছিল, এবং তাহা তাঁহার কাগজপত্রের দপ্তরের মধ্যেই এত কাল অপ্রয়োজনীয় কাগজ রূপে পড়িযাছিল। ঋণ শোধ করিয়াই নরহরি নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, অপ্রয়োজনীয় বোধে কাগজখানা ফেরৎ লওয়া আবশ্যক বোধ করেন নাই।

এক্ষণে সেই অপ্রয়োজনীয় কাগজখানার উপর দৃষ্টিপাত করিতেই পতিতপাবনের মনে হইল, হাজার টাকা খরচ করিলেও এখন এমন একখানা প্রয়োজনীয় কাগজ পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। হর্ষসমুজ্জ্বল দৃষ্টিটাকে বিস্ফারিত করিয়া পতিতপাবন কাগজটা উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া দেখিতে লাগিলেন। বন্ধকী কোবালার মেয়াদ বারো বৎসর। তিনি সন মাস তারিখ হিসাব করিয়া দেখিলেন, এখনো বারো বৎসর অতীত হয় নাই, তামাদি হইতে সাত মাস তেরো দিন বাকী। আরও একটা আশ্চর্য্যের কথা এই যে, টাকা দেওয়া হইয়াছে, অথচ কাগজের পিঠে তাহার ওয়াশীল পড়ে নাই। এটা ভ্রমবশতঃই হইয়াছে, কিন্তু পতিতপাবন নিজেই যে কিরূপে এমন মারাত্মক ভুলটা করিয়াছিলেন, তাহাই ভাবিয়া এক্ষণে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কিন্তু ঈশ্বর যাহা করেন মঙ্গলের জন্য। এমন ভুলটা হইয়াছিল বলিয়াই আজ ইহা দ্বারা পতিতপাবনের একটা মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারিবে।

মঙ্গলময় ঈশ্বরের উদ্দেশে মনে মনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া কাগজখানা উত্তমরূপে ভাঁজ করিতে করিতে পতিতপাবন ডাকিলেন, "গদা!"

গদাধর তখন গোশালার কার্য্য শেষ করিয়া ধূম পানের উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। প্রভুর আহ্বানে সে তাঁহার সম্মুখে আসিতেই পতিতপাবন হুঁকাটা তাহার দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, "সকাল সকাল কাজ সেরে নে। আমার সঙ্গে যেতে হবে।"

একটু আগ্রহের সহিত গদাধর জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা যেতে হবে কত্তা?"

তাহার এই অজ্ঞতায় যেন বিরক্ত হইয়া পতিতপাবন বলিলেন, "চুলোয়! এই একটু আগে চৌধুরী বুড়ো নেমন্তন্ন ক'রে গেল না?"

গদাধর তাহা জানিত, কিন্তু অপমান স্বীকার করিয়া কত্তা সেখানে যাইবেন কি না তাহাই জানিত না। এক্ষণে প্রভুর কথায় তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া সে নিজেই যেন একটু সঙ্কুচিতভাবে বলিল, "তুমি তা হ'লে খেতে যাবে?"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া পতিতপাবন বলিলেন, "যাব না? না গেলে লোকে মনে করবে কি? বলবে ফলনা দত্ত মামলায় হেরেছে বলে সেই লজ্জায় খেতে এলো না। কেমন ঠিক কি না?"

বলিয়া তিনি অনুকূল উত্তরের প্রত্যাশায় গদাধরের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। গদাধর মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল, "তা বৈকি কত্তা। তবে—তবে কি না—"

কথাটা শেষ না করিয়াই সে সঙ্কুচিত ভাবে মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে লাগিল।

বিরক্তিতে মুখখানা বিকৃত করিয়া পতিতপাবন বলিলেন, "তবে কি আবার কি রে বেটা? মামলায় আমার হার হ'য়েছে এই তো!"

গদাধর হাঁ না কিছুই বলিল না। পতিতপাবন ওষ্ঠাধার সংযোগে তাচ্ছীল্যসূচক শব্দ করিয়া বলিলেন, "ওঃ, ভারী তো মামলা, তার আবার হার জিত! বলে—কত দিগ্‌গজ দিগ্‌গজ মামলা চলে গেল, তার কাছে এই বেণেপুকুরের মামলা! হাতীর কাছে ছুঁচোর কেত্তন। মামলা বলি তো সেই গাছকাটার মামলাকে। সে দাঙ্গা তোর মনে আছে গদা?"

ঘাড় নাড়িয়া গদাধর উৎসাহিত কণ্ঠে বলিল, "মনে আবার নাই কত্তা? এই তো সেদিনকর কথা। লাঠির চোটে মানুষের মাথাগুলো পাকা কদ্‌বেলের মত ফটাফট্ ফাটতে লাগলো। আমি তো নিজের হাতেই কেবলা দুলের আর রেমো বাগ্দীর মাথা দু'ফাঁক ক'রে দিলুম। তারপর পুলিশের ধরপাকড়। তিন তিন মাস বোনের বাড়ী গিয়ে গা ঢাকা দিয়ে রইলুম। মাঝে মাঝে তোমার সলা নিতে এয়েচি, তাও রেতে রেতে। একদিন ঘুটঘুটে আঁধার, কুমকুমীর মাঠ পেরিয়ে আসচি; তোমাকে বলবো কি কত্তা, রামদীঘীর পাড়ে ঠিক ঈশেন কোণে সাঁই গাছটার পাশে—বলিলে না বিশ্বাস করবে, ঠিক তাল গাছের মত লম্বা, মাথাটা তিন-মণী জালার মত, দাঁতগুলো মাণিকপাটের মূলোর মত লম্বা লম্বা—"

তাহার বর্ণনায় বাধা দিয়া পতিতপাবন বলিলেন "হাঁ, মামলা বলি, সেই সব মামলাকে। সে সব মামলা ক'রে সুখ, জিতে সুখ, হেরেও সুখ। এ সব তো ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা। কি বলিস্?"

প্রভুর উক্তিতে সায় দিলেও গদাধর কিন্তু একটু 'কিন্তু' রাখিয়া বলিল, "তা বটে কত্তা, কিন্তু তবু এই হারের মামলায় নেমন্তন্ন খেতে যাওয়া—"

পতিতপাবন হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "দূর বেটা আহাম্মক, আমি কি শুধু নেমন্তন্ন খেয়েই আসবো? বুড়োকেও যে আবার এমনিতর খাবার নেমন্তন্ন করবো রে বোকা।"

ভিতরের ব্যাপারটা ভাল রকম না বুঝিলেও গদাধর আঁচে যেটুকু বুঝিল, তাহাতেই সে সন্তুষ্ট হইল, এবং অপেক্ষাকৃত প্রফুল্লমুখে বলিল, "তা হ'লে কিছু দোষ নাই কত্তা।"

বলিয়া সে হাসিতে হাসিতে তামাক আনিতে গেল। পতিতপাবন কাগজের দপ্তর বাঁধিয়া তুলিয়া হরিনামের মালার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং হরিনামের সঙ্গে সঙ্গে দৈবপ্রাপ্ত বন্ধকী কোবালাখানা দ্বারা অচিরে যে নরহরি চৌধুরীর সর্ব্বনাশ সাধনে কৃতকার্য্য হইবেন, তাহাই ভাবিয়া উৎফুল্ল হইতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এমন একদিন ছিল, যখন সর্ব্বনাশের কথা চিন্তা করা দূরে থাক, নরহরি চৌধুরীর পায়ে কাঁটা ফুটিলে পতিতপাবন দত্ত তাহা নিজের দাঁত দিয়া তুলিয়া দিতে ইতস্ততঃ করিতেন না। তখন দুইজনে এক প্রাণ—এক আত্মা ছিলেন; লোকে বলিত নরহরি চৌধুরীর গলায় জল ঢালিলে তাহা পতিতপাবন দত্তের গলায় গিয়া পড়ে। তখন চৌধুরীদের বৈঠকখানাই পতিতপাবনের বিশ্রামাগার, খেলার আড্ডা, আমোদ-প্রমোদের একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ ছিল। সেখানে দাবা খেলিয়া, গল্প করিয়া, গান বাজনায় মাতিয়া শুধু দিনমান নয়, অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কাটিয়া যাইত। রাত্রে মদ খাইয়া, ফুর্ত্তি করিয়া দুইজনে যখন গলা জড়াজড়ি করিয়া নিঃসংজ্ঞ ভাবে পড়িয়া থাকিতেন, তখন চৌধুরীদের চাকর নিধিরাম বারুই তাঁহাদের সেই অবস্থা দেখিয়া আপন মনে বলিত, "এই দু'বেটা যখন মরবে, তখনো দু'জনে গলা জড়াজড়ি ক'রে থাকবে; ম'রে ভূত হ'য়েও বোধ হয় কেউ কাউকে ছাড়বে না।"

নিধিরামের আশঙ্কা কিন্তু সত্যে পরিণত হইল না। হঠাৎ গ্রাম্য দলাদলি একটা দমকা বাতাসের মত আসিয়া পরস্পর আলিঙ্গনবদ্ধ বন্ধুদ্বয়কে উড়াইয়া উভয়কে বিচ্ছিন্নভাবে এত দূরে দূরে ফেলিয়া দিল যে, বন্ধুত্বের সুদৃঢ় আকর্ষণ আর তাহাদের নাগাল পাইল না; কতকগুলা ক্ষুদ্র বৃহৎ বিরোধ একে একে আসিয়া মধ্যে সরিৎসাগর ভূধরের ন্যায় ব্যবধান রূপে দণ্ডায়মান হইল।

রূপচাঁদ তাঁতীর স্ত্রী শশী স্বামীর মৃত্যুতে অনাথা হইয়াও যখন রূপ-যৌবনের অতুল সম্পদ্ লইয়া গ্রাম্য যুবকগণের লুব্ধ দৃষ্টির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল, তখন সর্ব্বাগ্রে মামলা মোকদ্দমায় ব্যস্ত পতিতপাবনের চঞ্চল দৃষ্টিটা তাহার উপর গিয়া পড়িল, এবং চঞ্চলা তটিনী যেমন সাগরবক্ষে পতিত হইয়া আপনার স্বাভাবিক চাঞ্চল্য পরিহার পূর্ব্বক স্থির ভাব অবলম্বন করে, চঞ্চল মধুকর যেমন প্রস্ফুটিত কমলে স্থান পাইলে আর সহজে উড়িয়া বেড়াইতে চায় না, পতিতপাবনের স্বভাব চঞ্চল চিত্তপতঙ্গটাও তদ্রূপ শশীর রূপ-যৌবনের ফাঁদে পা দিয়া একেবারে যেন স্থির হইয়া বসিল। তন্তুবায়-রমণীর রূপতৃষ্ণায় কাতর অন্যান্য যুবকবৃন্দ ঈর্ষান্বিত নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল; কিন্তু তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া শশীমুখীর সম্মুখীন হইতে কাহারও সাহসে কুলাইল না। ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মুখ হইতে শিকার কাড়িয়া লওয়া বরং সহজ, কিন্তু মামলাবাজ এবং লোকের সর্ব্বনাশ সাধনে সুপটু পতিতপাবন দত্তের নিকট হইতে শশীকে ছিনাইয়া লওয়া শুধু কঠিন নয়—এক প্রকার দুঃসাধ্য কার্য্য। সে দুঃসাধ্য সাধনে কেহই অগ্রসর হইল না, কিন্তু তাহারা মনের

ভিতর একটা প্রতিশোধ-স্পৃহা পোষণ করিতে লাগিল।

গ্রাম্যপল্লী বেশ্যাপল্লী নহে, এবং সেখানে বেশ্যাপল্লীর ন্যায় অবাধ ব্যভিচার কেহই সহ্য করিতে পারে না। সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই কথায় বার্ত্তায় লোকের এই অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পাইতে লাগিল। পতিতপাবন কিন্তু তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। পরিশেষে নরহরি একদিন তাঁহার কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া তাঁহাকে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। উন্মত্তপ্রায় পতিতপাবন তদীয় অনুরোধ হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। তখন নরহরি ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "ভায়া, বয়স তো চারের কোটা পার হ'তে যায়, এখন কি ও সব আর ভাল লাগে?"

পতিতপাবন উত্তর দিলেন, "যার ভাল না লাগে তার পক্ষে ভাল না হ'তে পারে, আমার কিন্তু বেশ ভাল লাগে।"

নরহরি বলিলেন, "ভাল লাগে তো বিয়ে কর, বুড়ো বয়সে একটা তাঁতীর মেয়ে নিয়ে চলাচলি করো না।"

পতিতপাবন বলিলেন, "তোমার চাইতে আমি এখনো ঢের যুবো আছি দাদা।"

নরহরি রাগতভাবে বলিলেন, "তাই ব'লে গাঁয়ের বুকের ওপর ব'সে এমন স্বেচ্ছাচার করলে চলবে না।"

পতিতপাবন সদর্পে বলিলেন, "করলে বাধা দেয় কোন বেটা?"

উষ্ণভাবে নরহরি বলিলেন, "আর কেউ না পারে, আমি বাধা দেব।" পতিতপাবন উপহাসের হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন, "পতিতপাবন দত্ত বেঁচে থাকতে নয়।"

নরহরি বলিলেন, "আচ্ছা, শশীকে গাঁ হইতে যদি তাড়াতে না পারি, তবে আমার নাম নরহরি চৌধুরী নয়।"

বন্ধুত্বের নির্ম্মল আকাশে একটু কালো মেঘ উঠিল, এবং দিনে দিনে সেই মেঘটা জমাট বাঁধিয়া উঠিতে লাগিল।

পরিশেষে একদিন গভীর রাত্রে শশীর ঘরের দরজায় চাবী লাগাইয়া কে ঘরে আগুন ধরাইয়া দিল। ঘরখানা দাউ দাউ করিয়া জলিয়া অন্ধকার পল্লীকে আলোকিত ও চমকিত করিল। পতিতপাবন তখন শশীর ঘরে বা নিজের ঘরে ছিলেন না। পরদিবস একটা মোকদ্দমার দিন ছিল; তিনি খানিক রাত্রে শশীর ঘর হইতে উঠিয়া আসিয়া গদাকে সঙ্গে লইয়া মহকুমায় চলিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং প্রজ্বলিত গৃহ হইতে বাহিরে আসিবার উপায় না পাইয়া শশী একাই ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল, অগ্নির গভীর গর্জ্জনকে পরাভূত করিয়া তাহার সকরুণ আর্ত্তনাদ জাগ্রত পল্লীর পথে ঘাটে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু দুশ্চরিত্রার সে আর্ত্ত চীৎকার কাহারও মর্ম্ম স্পর্শ করিল না, সকলেই দূরে দাঁড়াইয়া কৌতুক দেখিতে লাগিল। তাহাদের এই নিশ্চেষ্টতায় অগ্নি যেন দ্বিগুণ উৎসাহে নৃত্য করিয়া গৃহের সহিত শশীকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল।

এমন সময় কে একজন শশীকে সেই বহ্নিরাশির কবল হইতে উদ্ধারের জন্য ছুটিয়া আসিল এবং লাথি মারিয়া দরজা ভাঙ্গিয়া আসন্ন মৃত্যু হইতে শশীকে রক্ষা করিল। আর কেহ তাহাকে না চিনিলেও শশী কিন্তু চিনিল, সেই রক্ষাকর্ত্তা নরহরি চৌধুরী।

পরদিন মহকুমা হইতে ফিরিয়া আসিয়া পতিতপাবন যখন এই সংবাদ শ্রবণ করিলেন, তখন তিনি রোষে ক্ষোভে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। নরহরি নিজের হাতে না করুক, তাহার পরামর্শেই যে এমন ভয়ানক কাজ হইয়াছে সে বিষয়ে পতিতপাবনের বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। ঐ লোকটা ছাড়া আর কাহার এত সাহস আছে যে, জলে বাস করিয়া কুম্ভীরের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইবে? সেই দিন হইতে পতিতপাবন শশীকে নিজের গৃহেই স্থান দিলেন এবং নরহরির বিরুদ্ধে একটা তীব্র বিদ্বেষ পোষণ করিতে থাকিলেন।

এক সামাজিক বাধা ছাড়া শশীকে গৃহে স্থান দিবার পক্ষে আর কোন বাধাই ছিল না। স্ত্রী বহুদিন পূর্ব্বেই গৃহ শূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। মামলা মোকদ্দমায় ব্যস্ত থাকায় পতিতপাবন গৃহের সে শূন্যতাকে পূর্ণ করিবার অবসর পান নাই। নরহরি দুই একবার তাড়া দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার নিজ শূন্য গৃহের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া পতিতপাবন তাঁহাকে নিরস্ত করিয়াছিলেন, এবং বিধবা ভাগিনেয়ী ভবরাণীর উপর সংসারের ভার অর্পণপূর্ব্বক মামলা মোকদ্দমার কাগজপত্র দ্বারা মনের শূন্যতাকে পূর্ণ করিয়া লইয়াছিলেন। সুতরাং শশী বিনা বাধায় তাঁহার গৃহে স্থান লাভ করিল। ভবরাণী আপনার অসহায় অবস্থা স্মরণ করিয়া নীরব রহিল।

পাঁচজনে কিন্তু তাহার মত চুপ করিয়া থাকিল না, এবং বিবাদ বিসংবাদের ভয়ে সমাজের বুকের উপর এমন একটা অত্যাচার সহিয়া থাকিতে প্রস্তুত হইল না। শশীকে স্বগৃহে স্থান দিবার মাস দুই পরেই রতন ঘোষের পিতৃশ্রাদ্ধ উপস্থিত হইল, এবং সেই শ্রাদ্ধে পতিতপাবনকে বাদ দিয়া সকলে কার্য্য

সম্পন্ন করিতে সঙ্কল্পবদ্ধ হইলেন। সে সঙ্কল্পের কথা জ্ঞাত হইয়াও পতিতপাবন স্বীয় সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হইলেন না; বরং তাঁহার জেদ আরও বাড়িয়া গেল। নরহরি উপযাচক হইয়া আসিয়া তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন, এবং ভ্রষ্টা রমণীকে পরিত্যাগ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। পতিতপাবন কিন্তু তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। নরহরি তখন পরামর্শ দিলেন, "যদি ওটাকে একান্ত ত্যাগ কত্তেই না পার, তবে নিজের বাড়ীতে না রেখে ওকে একটা আলাদা ঘর বেঁধে দাও।"

পতিতপাবন তাহাতেও সম্মত হইলেন না, অধিকন্তু তিনি সমাজের উদ্দেশে কতকগুলা কটূক্তি প্রয়োগ করিয়া নরহরিকে জানাইয়া দিলেন, তিনি কিছুতেই শশীকে ত্যাগ করিবেন না, তাহাতে সমাজ যাহা ইচ্ছা করিতে পারে, তাহাতে পতিতপাবন দত্ত কিছুমাত্র ক্ষতিবোধ করে না। রতন ঘোষের বাড়ীতে পাত পাড়িবার জন্য তাঁহার একটুও আগ্রহ নাই, এবং যাহারা আসিয়া তাঁহাকে সেরূপ অনুরোধ করে, তিনি তাহাদের মুখে—ইত্যাদি।

বন্ধুত্বের অনুরোধে নরহরি এতদিন সকল সহ্য করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু এবার তাঁহার সহিষ্ণুতা সীমা অতিক্রম করিল। তিনি এবার পতিতপাবনকে সমাজচ্যুত করিবার পক্ষে অগ্রণী হইয়া দাঁড়াইলেন এবং গ্রামে তাঁহার ধোপা নাপিত হুঁকা পর্য্যন্ত বন্ধ করিবার উপক্রম করিলেন। পতিতপাবনও নিতান্ত নিঃসহায় ছিলেন না, তাঁহার পক্ষেও অনেক লোক ছিল। তাহাদিগকে লইয়া তিনি একটা দল বাঁধিয়া ফেলিলেন এবং নরহরি চৌধুরী, অদ্বৈত ঘোষ, দামোদর চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি কয়েকজনকে আসামী করিয়া মানহানির নালিশ রুজু করিলেন। মামলা যদিও শেষ পর্য্যন্ত টিকিল না, তথাপি আসামী শ্রেণীভুক্ত ভদ্রলোকদিগকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইল। তাহার ফলে কেহ কেহ ন্যায় অন্যায়ের বিচার ছাড়িয়া পতিতপাবনের শরণাপন্ন হইল। নরহরি কিন্তু এত বড় একটা অন্যায়ের নিকট কিছুতেই মাথা নীচু করিলেন না। সুতরাং উভয় বন্ধুর মধ্যে মনোমালিন্য ক্রমেই প্রবল হইয়া নিত্য নূতন বিবাদ বিসংবাদ ও মামলা মোকদ্দমার সৃষ্টি করিতে লাগিল।

এদিকে যাহার জন্য এত কাণ্ড, সেই শশীমুখীকে এক দিন রাস্তায় গুপী মণ্ডলের সহিত হাস্যালাপ করিতে দেখিয়া পতিতপাবন ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং এই বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কারস্বরূপ পদাঘাত করিয়া তাহাকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। শশীমুখী তাঁহার ও তদীয় পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে গালি বর্ষণ করিতে করিতে গুপী মণ্ডলের সহিত কলিকাতা যাত্রা করিল। মাসকতক পরে জীর্ণ শীর্ণ দেহ লইয়া গুপী ঘরে ফিরিয়া আসিল; শশী কিন্তু আর কখনও পাঁচুগঞ্জে পদার্পণ করে নাই।

কালে মানুষ পুত্রশোক বিস্মৃত হয়, পতিতপাবনের অপরাধ কোন্ ছার। শশীর অন্তর্ধানের সঙ্গে লোকে পতিতপাবনের দোষ একটু একটু করিয়া বিস্মৃত হইতে লাগিল, এবং বছর খানেকের মধ্যেই সব ভুলিয়া পুনরায় তাঁহাকে নির্ব্বিবাদে সমাজে গ্রহণ করিল। সব মিটিয়া গেল, মিটিল না শুধু বন্ধুযুগলের মনোমালিন্য। ধূমকেতুটা ঘুরিতে ঘুরিতে পৃথিবীর কক্ষপথের সম্মুখে সহসা আবির্ভূত হইয়া পৃথিবীতে একটা বিপ্লব ঘটাইয়া দিন কতক পরেই অদৃশ্য হইয়া যায় বটে, কিন্তু তাহার আবির্ভাবে প্রাকৃতিক বিপ্লবে পৃথিবীর যে ক্ষতি হয়, বহু শত বৎসরেও সে ক্ষতির পূরণ হয় না। তেমনই অকস্মাৎ শশীর আবির্ভাবে যে সামাজিক বিপ্লব উপস্থিত হইল, তাহার তিরোভাবে সে বিপ্লব শান্ত হইয়া গেল বটে, কিন্তু তাহাতে নরহরি ও পতিতপাবনের যে ক্ষতি হইল, পাঁচ বৎসরেও সে ক্ষতির আর পূরণ হইল না। সামাজিক হিসাবে না হইলেও ব্যক্তিগত ভাবে উভয়ের মধ্যে রীতিমত যুদ্ধ চলিতে লাগিল।

পতিতপাবনের একটা বড় জমির পাশে নরহরির একটা ছোট নিষ্কর জমি ছিল। পতিতপাবন সেটাকে আপনার বড় জমির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়া, ক্ষুদ্র বস্তু যে বৃহৎ বস্তুর সম্মুখীন হইলে বৃহতের প্রবল আকর্ষণে আপনার অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারে না, এই বিজ্ঞানসম্মত নীতির উদাহরণ প্রদর্শন করিতে যত্নবান্ হইলেন। নরহরি কিন্তু বৈজ্ঞানিক যুক্তির অনুসরণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলেন না; তিনি, ক্ষুদ্র চিরকাল ক্ষুদ্রই থাকিবে, বৃহতের সহিত কোন দিনই তাহার সর্ব্বাঙ্গীন সম্মিলন সংঘটিত হইবে না, এই অবৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক পরিবর্ত্তনশীল জগতে রক্ষণশীলতায় মাহাত্ম্যরক্ষায় বদ্ধপরিকর হইলেন। সুতরাং সেই ছোট জমিটুকু লইয়া যে গোল বাধিল, তাহাতে মারামারি ও রক্তপাত হইল, ফৌজদারী ও দেওয়ানী দুই রকমের দুইটা মোকদ্দমা বাধিল। ফৌজদারীতে পতিতপাবনের জয় হইল, দেওয়ানীতে নরহরি জয়ী

হইলেন। উভয় পক্ষেরই সেই জমিটুকুর যাহা মূল্য তাহার দশ গুণ অর্থ ব্যয়িত হইয়া গেল।

কিন্তু এই অপব্যয়েও কাহারও চৈতন্য হইল না বা এই খানেই বিবাদের অভিনয় যবনিকা পড়িল না। পতিতপাবন এই অপ্রীতিকর অভিনয়ে যবনিকাপাত করিয়া অন্য একটা প্রীতিপ্রদ অভিনয় করিতে একবার উদ্যোগী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু নরহরি এবার বাঁকিয়া বসিলেন। সুতরাং পতিতপাবনকে পুনরায় নবোদ্যমে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতে হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পতিতপাবন সেদিন আহারান্তে খাজনা সাধিবার জন্য বেণাপুরে দামু মালিকের ঘরে গিয়াছিলেন। তিনি যখন উপস্থিত হইলেন, তখনও দামু মাঠ হইতে ফিরে নাই। দামুর স্ত্রী মাথায় কাপড় টানিয়া ছোট চালাটিতে একখানা চাটাই পাতিয়া দিল। পতিতপাবন তাহাতে বসিয়া দামুর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই দামু ক্লান্তদেহে ঘর্ম্মাক্তশরীরে মাঠ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইল এবং দত্তমশায়কে দেখিয়া ব্যস্ত সমস্তভাবে কলাপাতার নল প্রস্তুত করিয়া তামাক সাজিয়া দিল। এইরূপে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া দামু বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। পতিতপাবন কলাপাতার নলে মুখ রাখিয়া তামাক টানিতে টানিতে দামুর দুঃখের সংসারের সরস গার্হস্থ্য চিত্র সকৌতুক দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন।

দামু উপস্থিত হইতেই তাহার স্ত্রী ব্যস্ততার সহিত আসিয়া একটা মাদুর পাতিয়া দিল এবং জলের ঘটী ও গামছা আগাইয়া দিয়া পাখা লইয়া ঘর্ম্মাক্ত স্বামীকে বাতাস করিতে লাগিল। দামু তাহার হাত হইতে পাখাখানা লইবার জন্য হস্তপ্রসারণ করিতেই বৌটা একটু হাসিয়া পাখা সরাইয়া লইল, এবং একটু সরিয়া হাসিতে হাসিতে খুব জোরে জোরে বাতাস করিতে থাকিল। তাহার সেই কালো মুখের হাসিটুকুর মধ্যে দামু এমন কি সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইল বলা যায় না, কিন্তু সে তৃষিত নেত্রে সেই দিকে চাহিয়া নিজেও মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

এমন সময় দুই তিনটা কালো কালো ছেলে সর্ব্বাঙ্গে ধূলা কাদা মাখিয়া সেখানে ছুটিয়া আসিল। তাহাদের মধ্যে একজন দামুর কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল, একজন দুই হাতে তাহার গলা জড়াইয়া পিঠের দিকে ঝুলিতে লাগিল। তৃতীয়টি—সেইটিই সর্ব্বাপেক্ষা বড়—পাশে দাঁড়াইয়া দামুর একখানা হাত ধরিয়া টানিতে আরম্ভ করিল। পরিশ্রান্ত স্বামীকে এইরূপে বিরক্ত করায় দামুর স্ত্রী ছেলেগুলাকে ধমক দিয়া সরিয়া যাইতে বলিল, দামু কিন্তু একটুও বিরক্তি প্রকাশ করিল না; সে হাসিতে হাসিতে স্ত্রীকে শান্ত হইতে বলিয়া কোলের ছেলেটাকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া তাহার মুখচুম্বন করিল। মাতার গর্জ্জনে ছেলেগুলা একটু দমিয়া গিয়াছিল, কিন্তু বাপের আদর পাইয়া তাহারা মাতার দিকে উপহাসপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপপূর্ব্বক দ্বিগুণ উৎসাহে পিতার ক্রোড়দেশ অধিকারের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহাদের সেই উল্লাসপূর্ণ চীৎকারে হাস্যে মধ্যাহ্ন-কিরণদগ্ধ ক্ষুদ্র কুটীরটা যেন স্নিগ্ধ শান্তির ছায়ায় মনোরম হইয়া উঠিল। পতিতপাবন সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে স্নেহ ও ভালবাসার এই মধুর অভিনয় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। খাজনার কথা, দেনা পাওনার কথা, মামলা মোকদ্দমার কথা, সব কথাই যেন কিছুক্ষণের জন্য তিনি বিস্মৃত হইলেন।

আহা, কি সুখী এই দামু মালিক! ইহার অর্থ নাই, সম্মান নাই, খ্যাতি নাই, দুই বেলা পেট পূরিয়া খাইবার সংস্থানও নাই; কত শত অভাব আসিয়া ইহার ঐ ক্ষুদ্র কুটীরখানাকে ঘেরিয়া রহিয়াছে, এক মুঠা ভাতের জন্য রৌদ্রবৃষ্টিকে উপেক্ষা করিয়া উহাকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতে হয়। কিন্তু এত অভাব, এত কষ্টের মধ্যেও নিত্য অভাবে জর্জ্জরিত এই ক্ষুদ্র ভগ্ন কুটীরটির মধ্যে উহার জন্য কি অপার্থিব সুখ—কি অনাবিল শান্তিই সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে! আমরা তুচ্ছ ধনের অভিমান—উচ্চপদের অহঙ্কার লইয়া দামু মালিককে দরিদ্র বলিয়া ঘৃণা করিতে পারি, কিন্তু এই দারিদ্র্যের অন্তরালে উহার ধূলা-কাদামাখা বুকখানা যে শান্তি-সুখে ভরিয়া রহিয়াছে, তাহা আমাদের শুধু লোভনীয় নহে—দুষ্প্রাপ্য। এত অভাব, এত দুঃখকষ্টের মধ্যেও দামুর জীবনটা কি সুখময়—কি শান্তিময়!

দামু সেদিন খাজনা দিতে পারিল না, কয়েকদিন পরে দিবার করার করিল। পতিতপাবনও কড়া তাগাদা না করিয়া চিন্তিত মনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

এই দামু মালিকের জীবনের পাশে নিজের জীবনটাকে দাঁড় করাইলে উভয়ের মধ্যে কত প্রভেদ দেখা যায়। যেন উদ্যানের পাশে ঊষর ভূমি, আলোকের পাশে অন্ধকার, সুখের পাশে দুঃখ, সজীবের পাশে নির্জ্জীবতা। উঃ, সত্যই তিনি আপনার জীবনটাকে

কি নির্জ্জীবতার রাজ্যে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন, স্নেহ মমতা, প্রেম প্রীতি—এ সকল কোমল পথ ত্যাগ করিয়া কি ভীষণ মরুভূমির উপর দিয়া তিনি চলিয়াছেন। স্নেহ তাঁহাকে দেখিলে দূরে পলায়ন করে, ভালবাসা তাঁহাকে দেখিলে ভয় পায়, সংসারে শান্তি বলিয়া যে একটা জিনিষ আছে, সেটা এখন যেন স্বপ্নেরও অগোচর। কেন তিনি অশান্তির কঙ্করময় পথে আসিয়া জীবনটাকে মরুভূমির মত ভীষণ করিলেন? এ সকল কথা আর কয় বছর আগে বুঝিলেন না কেন? এখন কুম্ভকর্ণের এই অকাল-জাগরণ শুধু মৃত্যুর জন্য।

আক্ষেপে অনুতাপে পতিতপাবনের চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম করিল। তিনি তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া চারিদিকে সশঙ্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। না না, এই মাঠটাও তাঁহারই জীবনের মত জনশূন্য; এখানে তাঁহার চোখের জল দেখিতে কেহই নাই। ক্ষিপ্রপদে মাঠ পার হইয়া পতিতপাবন গ্রামে প্রবেশ করিলেন।

নরহরির বাড়ীর পাশ দিয়াই রাস্তা। যাইতে যাইতে হঠাৎ রাস্তা হইতে অল্প দূরে একটা হেলিয়া পড়া জামগাছের কাছে, গাছের গায়ে কনুয়ের ভর দিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া একটি বালিকাকে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে দেখিলেন। কে এ বালিকা? নরহরির নাতনি গৌরী নয়? গৌরী এত বড় হইয়াছে? হইবে বৈ কি, প্রায় চার পাঁচ বৎসর তো উহাকে দেখেন নাই। যখন দেখিয়াছিলেন, তখন গৌরী আট নয় বৎসরের বালিকা ছিল মাত্র। তখন সে তাঁহার কোলে পিঠে উঠিয়া কত আবদার অভিমান করিত, নিজের খেলা-ঘরে বসাইয়া কত ইট মাটী শাক পাতার অন্নব্যঞ্জন রাঁধিয়া তাঁহাকে খাইতে দিত, খাইবার ভাণ না করিলে কত ধমক দিত, অভিমান করিত, দাদামশায়ের কাছে গিয়া অনুরোধ করিতে থাকিত। নরহরি তাহার সহিত পতিতপাবনের বিবাহ দিবেন বলিয়া কত কৌতুক করিতেন, এবং ভাবী গৃহিণীর প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন না খাওয়ার জন্য পতিতপাবনকে তিরস্কার করিতে থাকিতেন। রাগে মাথা নাড়িয়া গৌরী বলিত, "আমি কক্ষণো বিয়ে করবো না, ও আমার ভাত খায় না।" আজ না খাইলেও পাঁচ দিন পরে পতিতপাবন যে তাহা অমৃতবোধে উদরসাৎ করিবে, হাসিতে হাসিতে নরহরি তাহাকে এইরূপ আশ্বাস দিয়া তাহার ক্রোধ-ভঞ্জন করিতেন। পতিতপাবন নিজেও নরহরির সমক্ষেই নানাবিধ অনুনয় বিনয় দ্বারা ভাবী গৃহিণীর মানভঞ্জন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। গৌরীও কল্পিত স্বামীর অনুনয়ে বিনয়ে বাধ্য হইয়া ক্রোধ পরিহারপূর্ব্বক তাঁহার মস্তকে পক্ক কেশের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইত।

আজ সেই গৌরীকে কৈশোরের দ্বারে সমুপস্থিত দেখিয়া পতিতপাবন থমকিয়া দাঁড়াইলেন, এবং এক পা এক পা করিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইলেন। গৌরীও তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিল, দেখিয়া যেন একটু সঙ্কুচিতভাবে মুখ হইতে হাত সরাইয়া লইয়া স্থির হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। পতিতপাবন তাহা বুঝিতে পারিয়া ধীর গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিলেন, "গৌরি!"

গৌরী তাঁহার মুখের উপর সলজ্জ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই মুখ ফিরাইয়া লইল। পতিতপাবন ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আমাকে চিন্‌তে পারিস্ গৌরি?"

গৌরী মৃদু হাসিল, এবং ঘাড় দোলাইয়া সে যে তাঁহাকে বেশ চিনিতে পারিয়াছে ইহাই জ্ঞাপন করিল। পতিতপাবন তাহার সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাঁদ্‌ছিলি না?"

লজ্জিতভাবে গৌরী তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়া মুখখানা মুছিয়া ফেলিল। পতিতপাবন সহাস্যে বলিলেন, "মুখ মুছলেও কান্নাটা তো মুছতে পারবি না; তোর চোখের ভিতর এখনও জল টল্ টল্ কচ্চে।"

গৌরী ঠোঁট ফুলাইয়া তাঁহার দিকে সরোষ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। পতিতপাবন হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কাঁদ্‌ছিলি কেন? মা মেরেছে বুঝি?"

নতমস্তকে লজ্জাজড়িত কণ্ঠে গৌরী উত্তর করিল, "না,—বকেছে।"

গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালন করিয়া পতিতপাবন বলিলেন, "তা তো বকবেই, চিরকাল বাপের বাড়ীতে থাকলে কি আদর থাকে? তা বকুনি খেয়ে গাছতলায় এসে কাঁদছিস্ কেন, আমার ঘরে চলে গেলেই তো পারতিস্?"

বলিয়া তিনি গৌরীর মুখের উপর হাস্যস্ফুরিত দৃষ্টি স্থাপন করিলেন। গৌরী একটু চঞ্চলভাবে গায়ের কাপড়টা ঠিক করিয়া লইতে লাগিল। পতিতপাবন বলিলেন, "ওঃ, পুরানো বরকে দেখে এখন আবার তোর লজ্জা হয়?"

পতিতপাবন হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। লজ্জারক্ত মুখে তর্জ্জন করিয়া গৌরী বলিল, "যাও!"

পতিতপাবন স্বরে যেন একটু অভিমানের গাঢ়তা আনিয়া বলিলেন, "এই তো আজ পাঁচ বচ্চর চ'লে গিয়েছিলাম গৌরী, আবার যাব ?"

নতমুখেই গৌরী জিজ্ঞাসা করিল, "এতদিন এস না কেন ?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া পতিতপাবন বলিলেন, "এতদিন—এতদিন আসবার উপায় থাকে নি ।"

গৌরী নীরবে দাঁড়াইয়া নখ দিয়া গাছটা খুঁটিতে লাগিল। পতিতপাবন জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখনো তুই ইটের চচ্চড়ি, কাদার পায়েস রান্না করিস্ ?"

লজ্জার হাসি হাসিয়া গৌরী বলিল, "এখন আর আমি ধুলো খেলা করি না ।"

উচ্চ হাসি হাসিয়া পতিতপাবন বলিলেন, "ওঃ, তুই যে এখন বড় হ'য়েছিস্। ভালই হ'য়েছে ; এখন চল্ তুই আমার ঘরে,—আমাকে সত্যিকার ভাত, সত্যিকার চচ্চড়ি রেঁধে দিবি। যাবি ?"

তাহার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই পতিতপাবন যেন তাহাকে নিজের ঘরে লইয়া যাইবার জন্য তাহার হাত ধরিতে উদ্যত হইল। গৌরী তাড়াতাড়ি হাতটা সরাইয়া লইয়া অভিমান-গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "আমি যাব না ।"

"তা আমার ঘরে না যাস্ দাদামশায়ের ঘরেই চল্" বলিয়া পতিতপাবন তাহার হাতখানা ধরিয়া ফেলিলেন। কিন্তু এ কি, যে কোলে পিটে মানুষ হইয়াছে, তাহার হস্ত স্পর্শ করিতে হাতখানা কাঁপিয়া উঠে কেন ? বুকের ভিতর একটা অস্বাভাবিক শিহরণ অনুভব হয় কেন ? কম্পিত হস্তে গৌরীর হাত ধরিয়া পতিতপাবন অগ্রসর হইলেন, গৌরী নতবদনে তাঁহার অনুসরণ করিল।

বাড়ীর কাছাকাছি গিয়া পতিতপাবন গৌরীর হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "তুই এবার যা গৌরী ।"

গৌরী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আসবে না ?"

"আজ আর নয় ।"

"কবে আসবে ?"

"কাল পরশুর মধ্যে একবার আসবো ।"

স্থির প্রফুল্ল নেত্রে পতিতপাবনের মুখের দিকে চাহিয়া গৌরী একটু আগ্রহপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "ঠিক আসবে তো ?"

"আসবো" বলিয়াই পতিতপাবন অস্থির পদে সে স্থান ত্যাগ করিলেন। খানিক গিয়া একবার পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিলেন ; দেখিলেন, গৌরী তখনও তাঁহার উৎসুক নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাঁহাকে ফিরিয়া চাহিতে দেখিয়া গৌরী তাড়াতাড়ি ফিরিয়া বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। পতিতপাবনও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে নিজের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া পতিতপাবন দেখিলেন, কেনারাম সমাদ্দারের ছেলে রঘুরাম সমাদ্দার তাঁহার অপেক্ষায় বৈঠকখানায় ব'সিয়া রহিয়াছে। পতিতপাবনকে দেখিয়াই রঘুরাম বলিয়া উঠিল, "এই যে দত্তমশায় ! আমি বুঝেছেন কি না, ঘণ্টা দুই ব'সে আছি, তবু বুঝেছেন কি না, আপনার ফেরবার নামটি নাই। আসচে সাতুই,—বুঝেচেন কি না, বোদে কয়ালের মামলার দিন পড়েছে, তা বুঝেছেন কি না—"

বুঝিবার জন্য এতগুলা অনুরোধের ভিতর দিয়া তাহার বক্তব্যটা বুঝিতে পারিলেও পতিতপাবন তাহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না ; যেন কিছুই শুনিতে পান নাই এমন ভাবে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন। রঘুরাম বসিয়া তাঁহার বহির্গমন প্রতীক্ষা করিতে করিতে স্বীয় প্রয়োজনটা দত্তমহাশয়কে কিরূপে বুঝাইয়া দিবে তাহাই ভাবিতে লাগিল।

পতিতপাবন বাড়ী ঢুকিয়াই ডাকিলেন, "ভবি !"

উত্তর না পাইয়া পুনরায় উচ্চ ক্রোধবিকৃত কণ্ঠে ডাকিলেন, "ভবি, ও আবাগের বেটি !"

তথাপি কোন উত্তর আসিল না দেখিয়া তিনি চঞ্চল নেত্রে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, কয়টা ঘরেই চাবী। দেখিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, আহারান্তে ভুক্ত অন্নব্যঞ্জনরাশি পরিপাক করিবার উদ্দেশ্যে আবেগের বেটী হয় চক্রবর্ত্তীদের বাড়ীতে, নয়, নবে মিত্তিরের বাড়ীতে মেয়ে মজলিসে যোগ দিতে গিয়াছে। রোষপূর্ণ ভ্রূকুটীতে পতিতপাবনের মুখখানা বিকৃত হইয়া আসিল ;—তৃষ্ণায় গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু বাড়ীতে আসিয়াও একটু জল পাইবার উপায় নাই দেখিয়া তাঁহার ক্রোধ ও বিরক্তির সীমা রহিল না। ওঃ, ইহাকেই বলে—গৃহিণীশূন্য গৃহ আর জলশূন্য নদী। পতিতপাবন রোষে ক্ষোভে জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে ঘরের দাবার উপর বসিয়া পড়িলেন।

রান্নাঘরের দরজায় চাবী ছিল না, শুধু শিকলটা তুলিয়া দেওয়া ছিল। রান্নাঘরেও তো জল থাকিতে পারে ? তৃষ্ণার তাড়নায় অধীর হইয়া পতিতপাবন উঠিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু আধখানা উঠান পার হইয়াই থমকিয়া দাঁড়াইলেন। এমন তৃষ্ণার সময় নিজের ঘরে আপনাকে জল খুঁজিয়া

খাইতে হইবে! যাহার পিপাসায় একটু জল দিবার লোক নাই, তাহার আবার এত পিপাসা কেন? পিপাসা অসহ্য বোধ হয়, পুকুর তো আছে? এমন ঘরের জল অপেক্ষা পুকুরঘাটের জল যে অনেক ভাল! পতিতপাবন ফিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং দাঁতে দাঁত চাপিয়া দ্রুতপদে বাড়ীর বাহিরে চলিয়া আসিলেন।

তাহাকে দেখিয়া রঘুরাম বলিয়া উঠিল, "উকীল বুঝেছেন কি না, খুব ভালই দিয়েছি—বিপিন মুখুজ্যে বুঝেছেন কি না, ওখানকার সেরা উকীল। এখন সাক্ষী জনকতক বুঝেছেন কি না, চাই তো? তা আপনি বুঝেছেন কি না—"

দাঁত মুখ খিঁচাইয়া পতিতপাবন বলিলেন, "আমি ও সব কিচ্ছু জানি না।"

মোকদ্দমার কথা বা সাক্ষীসাবুদের কথা পতিতপাবন দত্ত জানে না। এমন কথাটা স্বয়ং সিদ্ধেশ্বরী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সম্মুখে আসিয়া বলিলেও রঘুরাম তাহাতে বিশ্বাস করিত কি না সন্দেহ, সুতরাং দত্তমশায়ের কথায় সে যেন অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া হতবুদ্ধির মত তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। পতিতপাবন তখন অপেক্ষাকৃত কোমলকণ্ঠে বলিলেন, "এখন যাও, আর এক সময় এস।"

রক্ষা কর মা সিদ্ধেশ্বরী! তাহা হইলে দত্তমশায় এখনকার মত কিছু জানেন না, পরে সব জানিবেন! আশ্বস্তভাবে রঘুরাম উঠিয়া আর এক সময়ে আসিয়া সমস্ত বুঝাইয়া দিবে বলিয়া প্রস্থান করিল। পতিতপাবন কিছুক্ষণ গম্ভীর ভাবে বৈঠকখানায় এ-মাথা ও-মাথা পদচারণা করিয়া জুতা চাদর ফেলিয়া বসিয়া পড়িলেন। অদূরে বেগুন গাছের গোড়া কোপাইতে কোপাইতে গদা আপন মনে অনুচ্চ কণ্ঠে গাহিতেছিল—

ওরে পাগল মন!
হেলায় তুমি হারিয়ে দিলে অমূল্য রতন।

নাঃ, আর ভাল লাগে না। এতদিন হেলায় হারাইয়াছে বটে, কিন্তু যাহা হারাইয়াছে, এখন কি আর তাহা খুঁজিয়া লইতে পারিবে না? চেষ্টা করিয়া দেখিতে ক্ষতি কি? পতিতপাবন ডাকিলেন, "গদা!"

গদাধর আসিয়া তামাক সাজিতে বসিল। পতিতপাবন বলিলেন, "আচ্ছা গদা, আমি যদি বিয়ে করি?"

সহর্ষে গদাধর বলিয়া উঠিল, "তো হ'লে বেশ হয় কত্তা, ছেলে পিলে নিয়ে সংসারী হও।"

ঈষৎ হাসিয়া পতিতপাবন বলিলেন, "এখন কি সংসারী নই, বনে আছি?"

গদাধর বিষণ্ণভাবে মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিল, "ধত্তে গেলে বন এক রকম বৈকি কত্তা। আমার যখন প্রথম পক্ষের বৌটা মারা গেল, তখন মনে হ'লো ঘরের সাঁঝের পিদ্দীমটা নিবে গিয়েছে। এক দণ্ড ঘরের তলায় তিষ্ঠুতে পাত্তাম না। তারপর—"

পতিতপাবন বলিলেন, "কিন্তু আমার কি আর সময় আছে রে গদা?"

"ঢের সময় আছে কত্তা, ঢের সময় আছে। কত লোক তোমার চাইতে পাঁচ সাত গণ্ডা বেশী বয়েসে বিয়ে কচ্চে, তাদের কাছে তুমি তো ছেলেমানুষ কত্তা।"

হুঁকাটা আগাইয়া দিয়া গম্ভীর ভাবে প্রভুর মুখের দিকে চাহিল। পতিতপাবন হুঁকা লইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "কচি খোকা!"

বলিয়া তিনি হুঁকায় মৃদুমন্দ টান দিতে লাগিলেন।

পরদিন অপরাহ্ণে তিনি ধীরে ধীরে যখন নরহরি চৌধুরীর বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলেন, নরহরি তখন কম্বল পাতিয়া সম্মুখে চৈতন্যচরিতামৃত রাখিয়া তাহা পাঠ করিতেছিলেন। সহসা পতিতপাবনকে উপস্থিত দেখিয়া বিস্ময়ের সহিত তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। পতিতপাবন ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "অনেক দিনের পরে আজ এসেছি দাদা।"

"এস ভায়া" বলিয়া নরহরি গুটান কম্বলটা পাতিয়া দিলেন। পতিতপাবন তাহাতে উপবেশন করিয়া নরহরির দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি পড়া হচ্চে?"

নরহরি পুঁথি হইতে মুখ না তুলিয়াই উত্তর করিলেন, "চৈতন্যচরিতামৃত।"

ঈষৎ হাসিয়া পতিতপাবন বলিলেন, "একেবারে বৈষ্ণব হ'য়ে পড়লে যে।"

চিহ্ন দিয়া পুঁথি মুড়িয়া নরহরি বলিলেন, "পুঁথি পড়লেই যদি বৈষ্ণব হ'তো, তা হ'লে পয়সায় দশটা বৈষ্ণব পাওয়া যেতো।"

বলিয়া তিনি একটু হাসিলেন। পতিতপাবন বলিলেন, "আসল বৈষ্ণব না হোক, নকলও তো হ'তে পারে।"

নরহরি বলিলেন, "নকলের বয়স আর নাই ভায়া, এখন আসল ঠিকানায় যাবার সময় এগিয়ে আসছে; এ সময়ে আর নকলনবিশী চলবে না।"

পণ্ডিত। তুমি দেখছি শীগ গীর কপ্নি নেবে।

নর। সেটা বোধ হয় কাজে কর্ত্তব্যেই নিতে হবে।

পতিত। স্বচ্ছন্দে নাও, আমি কিন্তু এই বয়সে আবার বিয়ে কর্‌বো মনে কচ্ছি।

তাঁহার মুখের উপর বিস্ময়-চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নরহরি বলিলেন, "বিয়ে! মন্দ কি?"

ঈষৎ হাসিয়া পতিতপাবন বলিলেন, "মন্দ না হ'লেও খুব ভালও বল্‌তে পারা যায় না।"

বলিয়া তিনি নরহরির মুখের দিকে আবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিলেন, কিন্তু তাঁহার মুখে হর্ষ বা বিষণ্ণতার কোন চিহ্নই দেখিতে না পাইয়া একটু বিমর্ষ ভাবে বলিলেন, "বাস্তবিক, এ বয়েসে বিয়ে করা কি খুব প্রশংসার কাজ?"

মৃদু হাস্যসহকারে নরহরি বলিলেন, "নিন্দার কাজই বা এমন কি? বিয়েই বল আর যাই বল ভাষা, সকলই প্রবৃত্তি নিয়ে কথা। তোমার যখন বিবাহে প্রবৃত্তি হ'য়েছে, তখন তোমার পক্ষে বিয়ে করাই ভাল।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পতিতপাবন বলিলেন, "তা হ'লে দেখছি তোমার এতে মত আছে।"

গম্ভীরমুখে নরহরি ব'লিলেন, "অমতের তো কিছু দেখতে পাই না।"

পতিতপাবন নীরবে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। নরহরি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিয়ের সব ঠিক হ'য়েছে?"

পতিত। ঠিক এক রকম বৈকি।

নর। মেয়ে?

পতিত। মেয়ে দেখাই আছে।

নর। তবে বিলম্ব কিসের?

পতিত। শুধু মেয়ের অভিভাবকের মত পেতেই যা দেরী।

নর। মত এখনও নাওনি কেন?

পতিত। তাই নিতেই আজ এসেছি।

নরহরি চমকিত ভাবে পতিতপাবনের মুখের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি স্থাপন করিলেন। সে দৃষ্টিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত না হইয়া পতিতপাবন সহাস্যে বলিলেন, "এখন তোমার মত পাওয়া গেলেই শুভকার্য্য সম্পন্ন হইয়া যায়।"

পতিতপাবনের কথায় বার্ত্তায় বা ভাব ভঙ্গীতে কৌতুকের কোন কিছুই দেখিতে না পাইয়া নরহরি শুধু বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন না, তীব্র ক্রোধে ক্ষোভে অন্তরে যেন ফুলিয়া উঠিতে লাগিলেন। তাঁহার এই বিস্ময়বিমূঢ় ভাব দেখিয়া পতিতপাবন জিজ্ঞাসা করিলেন, "অবাক্ হ'য়ে চেয়ে দেখচো কি?"

রোষগম্ভীর কণ্ঠে নরহরি বলিলেন, "দেখছি, তুমি পাগল হ'য়েছ কি না।"

পতিত। পাগলের লক্ষণ কিছু দেখছো কি?

নর। অনেকটা।

পতিত। কিসে দেখলে?

নর। তোমার দুরাশায়।

পতিত। আমার দুরাশা কোন্‌টা? বিয়ের আশা?

নর। না, গৌরীকে পাবার আশা।

পতিত। আমার সঙ্গে কি গৌরীর বিয়ে হ'তে পারে না?

নর। কক্ষণো না।

পতিত। কিন্তু এই একটু আগেই তুমি বলেছ, আমার বিয়ে করা মন্দ কাজ নয়।

নর। তাই ব'লে গৌরীকে তোমার মত বুড়োর হাতে দিতে পারি না।

পতিত। তুমি যদি নিজের নাতনীকে দিতে না পার, তবে অপরে এই বুড়োর হাতে মেয়ে দেব কেন?

বিরক্তিসূচক ভ্রূভঙ্গী করিয়া নরহরি বলিলেন, "অপরের কথা অপরে জানে, আমি আমার নিজের কথাই জানি।"

ম্লান হাসি হাসিয়া পতিতপাবন বলিলেন, "কিন্তু নিজের কথা ঠিক জান না। নিজের অবস্থা নিজে জানলে কখন এমন কথা বলতে পারতে না।"

রোষগম্ভীর স্বরে নরহরি বলিলেন, "হু।"

শ্লেষতীব্রকণ্ঠে পতিতপাবন বলিলেন, "তুমি কি মনে কর, তোমার এমন অবস্থা যে, নাতনীকে কোন রাজপুত্রের হাতে দিতে পারবে?"

কঠোর ভ্রূকুটী করিয়া নরহরি বলিলেন, রাজপুত্রের হাতে দিতে না পারলেও তোমার মত বুড়োর হাতে নিশ্চয় দেব না।"

লজ্জায় ক্ষোভে পতিতপাবনের মুখখানা আরক্ত হইয়া উঠিল। নরহরির কথার উত্তরে তিনি যে কি বলিবেন, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহার মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া উগ্রকণ্ঠে নরহরি ব'লিলেন, "গৌরীর লোভেই বুঝি তোমার হঠাৎ বিয়ে করবার সাধ হ'য়েছিল?"

পতিতপাবন এবার মুখ তুলিয়া শ্লেষতীব্র স্বরে বলিয়া উঠিল, "ষোল বছরের আইবড় মেয়ে দেখলে অনেকেরই তার ওপর নজর পড়ে।"

নরহরির চোখ দুইটা যেন জ্বলিয়া উঠিল; তিনি ক্রোধ-কম্পিত কণ্ঠে উত্তর করিলেন, "ভদ্রলোকে

কখন ভদ্রলোকের ঘরের মেয়েছেলের বয়সের দিকে নজর দেয় না।"

অতঃপর উত্তরে প্রত্যুত্তরে উভয়ের মধ্যে আর যে সকল কথাবার্ত্তা হইল, তাহাতে ভদ্রতার মর্য্যাদা তো কিছুমাত্র রক্ষিত হইল না এবং প্রাচীন বা আধুনিক যে কোন অভিধানেই সেরূপ কথোপকথনের ভাষা ব্যবহারের অনুমোদন করে না। এইরূপ অভিধানবিরুদ্ধ কথোপকথনের পর নৈরাশ্যজনিত একটা তীব্র ক্রোধ লইয়া পতিতপাবন ক্ষুব্ধচিত্তে উঠিয়া আসিলেন, এবং পথে আসিতে আসিতে কিরূপে এই অপমানের প্রতিশোধ লইবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

কয়েকদিন অনবরত চিন্তার পর উপায় একটা স্থির হইল। বিপিন ঘোষের বিধবা স্ত্রী তদীয় নাবালক পুত্রের অছি হইয়া তিন শত টাকায় বেণেপুকুরটা নরহরি চৌধুরীকে বিক্রয় করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই নাবালক শিবচন্দ্র সাবালক হইয়া নিজের নেশা-ভাঙ্গের খরচের জন্য ঘটীবাটিতে পর্য্যন্ত হাত দিতে উদ্যত হইয়াছিল। পতিতপাবন তাহাকে নগদ পঁচিশ টাকা দিয়া তাহার দ্বারা বেণেপুকুরের স্বত্বটা লিখাইয়া লইলেন এবং তাঁহার মাতার লিখিত বিক্রয় কোবালা যে আইনসিদ্ধ হয় নাই ইহাই প্রমাণ করাইবার জন্য পুষ্করিণীতে দখল লইতে উদ্যোগী হইলেন।

ইহার ফলে প্রথমে ঝগড়া, তারপর মারামারি বাধিবার উপক্রম হইল। নরহরি কিন্তু মারামারি বা হাঙ্গামার দিকে না গিয়া আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং গৌরীর বিবাহের জন্য সঞ্চিত টাকা ভাঙ্গিয়া মোকদ্দমার খরচ চালাইতে লাগিলেন। অনেকগুলা দিন পড়িবার পর প্রায় বছরখানেক পরে নিম্ন আদালতের বিচারে নরহরি ডিক্রী পাইলেন বটে, কিন্তু মোকদ্দমার বেড়াজাল হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন না; পতিতপাবন জেলা কোর্টে আপীল রুজু করিলেন। নরহরির অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল। ঘরে চোদ্দ বছরের নাতনি; মামলার তদ্বির করিবেন, না তাহার বিবাহের চেষ্টা দেখিবেন? এদিকে মামলার খরচে সঞ্চিত অর্থও প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিল, জমিজমায় হাত পড়িবার উপক্রম হইল। নরহরি ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

তাঁহার অবস্থা দর্শনে গ্রামের অনেক ভদ্রলোক দয়াপরবশ হইয়া আপোষে মামলা মিটাইবার জন্য পতিতপাবনকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। পতিতপাবন কিন্তু তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। অনেক জেদাজেদির পর শেষে তিনি প্রস্তাব করিলেন, নরহরি যদি তাঁহাকে পুকুরের অর্দ্ধেক অংশ ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে তিনি আপোষে মিটাইয়া লইতে পারেন। নরহরি কিন্তু আপনার ন্যায্য সম্পত্তির অর্দ্ধেক অংশ ছাড়িয়া দিতে রাজি হইলেন না। কাজেই ভদ্রলোকদিগকে আপোষে মীমাংসার আশা ত্যাগ করিতে হইল। মোকদ্দমা চলিতে লাগিল; তাহার শেষ ফল দেখিবার জন্য গ্রামশুদ্ধ লোক উৎসুক হইয়া রহিল।

সাত আট মাস পরে আপীলের রায় প্রকাশিত হইল। সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও নরহরি মোকদ্দমায় জয়ী হইয়া বিজয়জন্য আনন্দপ্রকাশে পরাঙ্মুখ হইলেন না; সিদ্ধেশ্বরীর সম্মুখে পাঁঠা কাটিয়া, বিবাদী পুকুরে মাছ ধরাইয়া স্বজাতি কুটুম্বদিগকে প্রীতিভোজ দিবার উদ্যোগ করিলেন এবং সেই প্রীতিভোজে বিজিত পতিতপাবনকে নিমন্ত্রণ করিতে ছাড়িলেন না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নিমন্ত্রিত হইলেও পতিতপাবন যে সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবেন এমন আশা নরহরি বা তদীয় বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কেহই করেন নাই। কিন্তু তাঁহাদের অনুমানকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ করিয়া দিয়া মোটা লাঠিটার ঠক্ ঠক্ শব্দ করিতে করিতে পতিতপাবন ভৃত্য সমভিব্যাহারে বৈঠকখানার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া যখন ডাকিলেন, "নরহরি দাদা কোথায় হে?" তখন নিমন্ত্রণরক্ষার্থ উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দ সকলেই প্রগাঢ় বিস্ময় অনুভব করিয়া ক্ষণকালের জন্য নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল। নরহরি আস্তে আস্তে ছুটিয়া আসিয়া "এস ভায়া এস" বলিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। পতিতপাবন ধীর গম্ভীর পদে অগ্রসর হইয়া আসন গ্রহণ করিলে পশুরাজের সম্মুখে মৃগযূথের ন্যায় উপস্থিত সকলেই বেশ একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। বৃদ্ধ উমাচরণ ঘোষ বিস্ময়ের আতিশয্যে এতক্ষণ হস্তধৃত হুঁকাটায় টান দিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন; এক্ষণে তাহাতে একটা টান দিয়া সম্মুখবর্ত্তী নয়ন বিশ্বাসকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "এই দেখ বাবাজি, আমি আগেই বলেছি, পতিতপাবন ভায়া নিশ্চয়ই আসবে। তোমরা কিন্তু সকলে বলেছিলে, না না, তিনি আসবেন না।"

অল্পক্ষণ পূর্ব্বে এই 'সকলের' মতের সঙ্গে তাঁহার মতের কোন পার্থক্য না থাকিলেও এক্ষণে ভিন্ন মত

প্রকাশ করিয়া গৌরবপ্রদীপ্ত দৃষ্টিতে পতিতপাবনের দিকে চাহিলেন। পতিতপাবন ভ্রূকুঞ্চন সহকারে আপনার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিটা সকলের মুখের উপর একবার সঞ্চালিত করিয়া ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আসবো না—তার মানে ?"

তাঁহার মুখের কথা লুফিয়া লইয়া ঘোষজা বলিয়া উঠিলেন, "সত্যিই তো, আসবে না তার মানে কি ?"

অধ্যয়নার্থী ছাত্রের অর্থপুস্তক অন্বেষণের ন্যায় কথাটার মানে বুঝিবার আশায় ঘোষজা চঞ্চল দৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। কিন্তু মানে বুঝিতে তাঁহাকে বেশী ব্যস্ত হইতে হইল না; বক্তা পতিতপাবন নিজেই স্বীয় উক্তির মানে বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন, "মামলা মোকদ্দমা হইয়াছে—তাতে কি ? ঘর কত্তে গেলে বিষয় সম্পত্তি নিয়ে অমন ঢের হয়। তাই ব'লে নিমন্ত্রণ রক্ষা কত্তে আসবো না এ কেমন কথা ? নিমন্ত্রণ নিয়ে তো মামলা নয়।"

আহ্লাদসূচক মস্তকসঞ্চালন করিয়া ঘোষজা বলিলেন, "এই তো কথা। মহাভারত পড়নি হে নয়ান, যুধিষ্ঠির বলেছিল—'শত পঞ্চ ভাই মোরা পরসহ রণে।' হাঁ, পুরুষ বাচ্চার মত কথা বটে। বাস্তবিক বাবাজি, গাঁয়ে যদি মানুষ কেউ থাকে, সে এই পতিত দত্ত। কেমন ঠিক কি না ?"

অনুকূল উত্তরের আশায় একে একে অনেকের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও যখন কেহই তাঁহার উক্তির সমর্থন করিল না, তখন তিনি নিজেই স্বীয় উক্তির সমর্থন জন্য বলিয়া উঠিলেন, "কেবল মানুষ হ'লেই তো হয় না, ছাতির জোর চাই। মামলায় হেরে সেই মামলার ভোগের নিমন্ত্রণে আসা—এ কি সহজ ছাতির জোর।"

তাঁহার এই ছাতির জোরটা অপরের পক্ষে আনন্দদায়ক কিনা ইহা জানিবার অভিপ্রায়ে পতিতপাবন একবার চারিদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন, কিন্তু বিরক্তি বা উপহাসের কুটিল হাসি ছাড়া একজনের মুখেও উৎসাহ বা প্রফুল্লতার চিহ্ন দেখিতে না পাইয়া তীব্র ভ্রূকুটী সহকারে দৃষ্টি প্রত্যাবৃত্ত করিয়া লইলেন।

আহারের সময় ভোক্তাদিগের পরিতৃপ্তিসূচক প্রশংসা সত্বেও নরহরি যখন আপনার আয়োজনকে বিদুরের খুদকুঁড়া অপেক্ষা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বিনয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন পতিতপাবন বেশ গম্ভীর ভাবেই বলিলেন, "বেশী বিনয়ে অহঙ্কার প্রকাশ পায় দাদা। আমার মতে এই বাজে অহঙ্কারটুকুর জন্য এতগুলা পয়সা নষ্ট না ক'রে, নাতনীর বিয়ে দিয়ে যদি একটু অহঙ্কার প্রকাশ কত্তে, তা হ'লে সেটা কতক কাজের অহঙ্কার হ'তো।"

এই স্পষ্টোক্তিতে আমোদ অনুভব করিয়া অনেকেই তাঁহার দিকে কৌতূহলপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। নরহরি অপ্রতিভ ভাবে বলিলেন, "নাতনীর বিয়ে, নিজের শ্রাদ্ধ, এ সকল তো আছেই ভায়া, কিন্তু পাঁচজনের পায়ের ধূলো লওয়া—এটা তো সহজে ঘটে ওঠে না।"

মুখগহ্বরে প্রবিষ্ট লুচীর গ্রাস চিবাইতে চিবাইতেই ঘোষজা অস্পষ্ট স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "নিশ্চয় নিশ্চয়, পাঁচ যেখানে, নারায়ণ সেখানে। এই নারায়ণের সেবা দেওয়া—সে কি সামান্য ভাগ্যের কথা। শুধু ক্ষমতা থাকলেই হয় না, মন থাকা চাই। নরহরি বাবাজীর মনটা কিন্তু চিরকালই ভাল। কি বলেন সরকার মশাই ?"

দন্তের অত্যন্তাভাবপ্রযুক্ত সরকার মহাশয় তখন কঠিন পদার্থ লুচীগুলাকে মাংসের ঝোলের রস সংযোগে তরল আকারে পরিণত করিবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছিলেন; সে চেষ্টা হইতে বিরত না হইয়াই তিনি ঘোষজার উক্তিতে সায় দিয়া বলিলেন, "নিশ্চয়! একে মায়ের প্রসাদ, তাতে পক্কান্ন। তবে মষানটা একটু কম হ'য়েছে বোধ হয়।"

তাঁহার পাতে খানকতক গরম লুচী দিবার জন্য নরহরি পরিবেশনকারীকে আদেশ করিলেন, এবং ঘোষজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার আর লুচীর প্রয়োজন আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। ঘোষজা পাতের উপর ডান হাতটা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "না না, লুচীর আর দরকার নাই তবে মায়ের প্রসাদ যদি থাকে, একটু দিতে বল। বড় চমৎকার হ'য়েছে বাবাজি, একে মায়ের প্রসাদ, তায় পরিপাটী রন্ধন। অনেক দিন এ জিনিষটা মুখে ওঠে নি, পূজোর সময় রায়েদের বাড়ীতে যা খেয়েছিলাম। তা সে 'চটকস্ত মাংসং' বুঝলে কি না।"

বলিয়া তিনি হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তখন ভোক্তাদের মধ্যে রায়েদের বাড়ীর খাওয়ার সমালোচনা উপস্থিত হইল, এবং সে সমালোচনার পরিসমাপ্তি না হইতেই পান আসিয়া তাঁহাদিগকে আহারের সমাপ্তি সংবাদ জ্ঞাপন করিল। ঘোষজা জলপানান্তে দীর্ঘ উদ্গার তুলিয়া প্রশংসমান কণ্ঠে বলিলেন "হাঁ, আহার হ'য়েছে বটে—চব্য চোষ্য লেহ্য পেয় যাকে বলে তাই। রাতও তেমন বেশী হয় নি। বড় জোর দশটা হবে। কি বল হে নয়ান ?"

নয়ান উত্তর দিবার পূর্ব্বেই মতিলাল বলিয়া উঠিল, "না, বেশী হবে, বোধ হয় এগারোটা।"

উপেক্ষাসূচক মুখভঙ্গী করিয়া ঘোষজা বলিলেন, "ও দশটাও যা এগারোটাও তাই। কত আর তফাৎ? সেবার চৌধুরীদের বাড়ীতে রাত দু'টো বেজে গেল। সেই ভয়েই তো মেজো নাতিটাকে নিয়ে এলাম না। নৈলে আসবার সময় সে কি ছাড়ে? কত বুঝিয়ে শুঝিয়ে রেখে এসেছি। যাবার সময় খান বার লুচী দিও হে নরহরি, নয় তো সকালে সে ছোঁড়া অনথ বাঁধিয়ে বসবে। ভারী ভ্যাংপিটে ছোঁড়া।"

সরকার মহাশয় দধির সহিত মিশ্রিত লুচীর শেষ গ্রাসটা গলাধঃকরণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমার-ও খান চার চাই হে নরহরি, বাড়ীতে বুঝলে কি না, বাড়ীতে সব ছেলেপিলে আছে তো?"

মতিলাল সহাস্যে বলিল, "আপনার তো ছেলে-পিলের মধ্যে এক গৃহিণী। তা তিনিও আসবার তরে কেঁদেছিলেন নাকি দাদামশায়?"

দন্তহীন মুখে হাসির লহরী তুলিয়া সরকার মশায় বলিলেন, "ওহে, না কাঁদলেও গৃহিণী হচ্ছে অলৃধঙ্গ। গৃহিণী যদি না খেলেন, তা হ'লে অলৃধ ভোজন হ'লো যে।"

একটা উচ্চ হাস্যরোল উত্থিত হইল। এবং সে হাস্যরোলের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকে ছেলে মেয়ে নাতি প্রভৃতির দোহাই দিয়া দুই চারিখানি লুচি প্রার্থনা করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। নরহরি অপ্রসন্ন মুখে তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিলে সকলে উঠিয়া আচমন করিতে গেলেন।

পতিতপাবনের বিদায় গ্রহণের সময় নরহরি তাঁহার সম্মুখে গিয়া বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পেট ভরেছে তো ভায়া?"

পতিতপাবন ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন, "পেট খুব ভরেছে, তবে মনটা একটু ক্ষুণ্ণ হ'য়ে রইলো।"

কুণ্ঠিত ও ব্যগ্রভাবে নরহরি ইহার কারণ জানিতে চাহিলে পতিতপাবন সহাস্যে বলিলেন, "তোমার কোন ত্রুটীতে মন ক্ষুণ্ণ হয় নি দাদা, ক্ষুণ্ণ হ'য়েছে আমার ত্রুটীতে। যে দিন এই রকমে তোমাকে নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়াতে পারবো, সেই দিন মনের ক্ষোভ যাবে।"

নরহরি হাসিয়া বলিলেন, "বেশ তো, কবে যাব তা হ'লে?"

গম্ভীর মুখে পতিতপাবন বলিলেন, "এখন নয়; সময় হ'লে তোমাকে নিমন্ত্রণপত্র দিয়ে যাব।"

আভাসে কতকটা বুঝিলেও নরহরি হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আচ্ছা।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সকালে গাঁজার পুঁটুলীটী খুলিয়া তাহাতে এক ছিলিমের বেশী গাঁজা নাই দেখিয়া রঘুরাম সমাদ্দার মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল, আজিকার দিনটা চলিবার মত বাকী তিন ছিলিম গাঁজা সংগ্রহের জন্য কি উপায় অবলম্বন করিবে। কিন্তু কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া বিধবা ভগ্নী সুভদ্রাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তাহার হাতে দুই পাঁচটা পয়সা আছে কি না। সুভদ্রা কিন্তু স্পষ্ট কথায় জানাইয়া দিল, তাহার হাতে একটিও পয়সা নাই; যে আড়াইটি পয়সা ছিল, তদ্দারা সে কাল লুন তেল আনিয়া চালাইয়া দিয়াছে, আজ আবার শুধু লুন তেল নয়, চাউল পর্য্যন্ত না আনিলে চলিবে না। তাহার এই নৈরাশ্যজনক উত্তরে ক্রুদ্ধ হইয়া রঘুরাম তাহার উপর তর্জ্জন গর্জ্জন আরম্ভ করিল, এবং তাহাকে রাক্ষসী অভিধানে অভিহিত করিয়া, সেই রাক্ষসীই যে তাহার পিতার সর্ব্বস্ব খাইয়া ফেলিয়াছে ও ফেলিতেছে, আক্ষেপসহকারে ইহাই ব্যক্ত করিতে লাগিল। সুভদ্রা কিন্তু ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিল যে, তাহার এক বেলা এক মুঠা খাওয়ায় পিতার এত বড় মহাজনী কারবারের কিছুই নষ্ট হয় নাই, রঘুরামের গাঁজার আগুনেই সমস্ত ছাই হইয়া উড়িয়া গিয়াছে।

ইহার প্রত্যুত্তরে রঘুরাম ভগ্নীকে খুব কড়া রকমের কতকগুলা কথা শুনাইয়া দিতে উদ্যত হইয়াছিল, এমন সময় বাহির হইতে ডাক আসিল, "রঘুঠাকুর!"

রঘুরাম গাঁজা টিপিতে টিপিতেই বাহিরের দরজার দিকে মুখ বাড়াইয়া বলিল, "কে গা?"

উত্তর আসিল, "পতিতপাবন দত্ত।"

হাতের গাঁজা মাটীতে ফেলিয়া রঘুরাম তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিল, এবং সাদরে অভ্যর্থনা দ্বারা দত্তমশায়কে আপ্যায়িত করিতে করিতে বাড়ীর ভিতর লইয়া গিয়া বসাইল। পতিতপাবন বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ঠাকুর, কাজকর্ম্ম কিছু কচ্চো, না শুধু গাঁজা খেয়েই বেড়াচ্চো?"

উত্তরে রঘুরাম জানাইল যে, ব্রাহ্মণসন্তান সে, কাজকর্ম্ম আর কি করিবে? পাঁচজনকে আশীর্ব্বাদ

করিয়া কোনরূপে দিন চালাইয়া দিতেছে। আর গাঁজা—গাঁজার পরিমাণ সে অনেক কম করিয়াছে। আগে আট গণ্ডা পয়সার গাঁজার কমে দিন যাইত না, এখন তাহা আট পয়সায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পরে তাহা চারি পয়সায় দাঁড়াইবে কি না তাহা সর্ব্বজ্ঞ ভগবানই জানেন।

তাহার এই সহজ উত্তরে প্রীত হইয়া পতিতপাবন হাসিয়া বলিলেন, "তবে তো তুমি মস্ত কাজের লোক হ'য়ে উঠেছ। এখন আমার একটু কাজ কর দেখি, এই দলিলখানার পিছনে গোটাকতক কথা লিখে দাও।"

বলিয়া তিনি পকেট হইতে একখানা দলিল বাহির করিলেন। লেখাপড়ার উপর রঘুরামের ঘোর বিতৃষ্ণা বাল্যকাল হইতেই জন্মিয়াছিল, এবং পাছে লেখাপড়ার হাঙ্গামে পড়িতে হয় এই আশঙ্কাতেই পিতার মৃত্যুর পর যে কয়দিন মহাজনী কারবার চালাইয়াছিল, তাহা বিনা লেখাপড়াতেই সম্পন্ন করিয়াছিল। সাবেক যে সকল তমসুক, হাতচিঠা প্রভৃতি ছিল, দিনকতক তাহা উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া, জমা খরচের হিসাবে মাথা গরম হইতে দেখিয়া নিজের মাথাটা আগে রক্ষা করিবার জন্য একটা দেশালাই কাঠির সাহায্যে সেগুলাকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল, এবং তাহারই একটু জ্বলন্ত ছাই কলিকার মাথায় দিয়া এক ছিলিম গাঁজা খাইয়া মাথাটাকে ঠাণ্ডা করিল। তারপর দিনকতক খাতকদের দরজায় আনাগোনা করিয়া, ধর্ম্মের উপর হিসাবের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত মনে গাঁজা টানিতে থাকিল।

আজ আবার লেখাপড়ার কথা শুনিয়া রঘুরাম ভীত হইয়া পড়িল, এবং দলিলখানার দিকে শঙ্কিতদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের দলিল?"

পতিতপাবন বলিলেন, "এ একখানা বন্ধকী কওলা।"

রঘু। কার কওলা?

পতি। কার, কি বৃত্তান্ত, এত কথা জেনে তোমার লাভ কিছু নাই। শুধু গোটাকতক কথা লিখে দাও।"

রঘু। না জেনে শুনে কি লেখা যায়? শেষে যদি জেলে যাই?

পতিত। জেলে যাও, জেল খাটবে। পতিতপাবন দত্ত তোমার মত গোবেচারা বামুনকে জেলে দিতে এসেছে এই তোমার বিশ্বাস, না?

তাঁহার কঠোর দৃষ্টিতে ও রুক্ষস্বরে ভীত হইয়া রঘুরাম মাথা চুলকাইতে লাগিল। পতিতপাবন বলিলেন, "শোন, নরহরি চৌধুরী এই কওলা লিখে দিয়ে তোমার বাপের কাছ থেকে টাকা নিয়েছিল। সে টাকা সুদে আসলে সব তোমরা পেয়েছ, আমি নিজ হাতে দিয়েছি।"

রঘুরাম বলিল, "টাকা যখন পেয়েছি, তখন আবার ওতে লিখে দেবার আমার দরকার কি?"

বিরক্তিসূচক ভ্রূভঙ্গী করিয়া পতিতপাবন বলিলেন, "তোমার কিছুই দরকার নাই, কিন্তু আমার দরকার আছে।"

রঘুরাম নীরবে বসিয়া ভাবিতে লাগিল। পতিতপাবন বলিলেন, "আর তোমারি বা দরকার নাই কেন, কওলাখানায় দরকার না থাক্, কিছু টাকার দরকার তো আছে?"

উৎসুকভাবে রঘুরাম বলিয়া উঠিল, "টাকা! কত টাকা দেবেন?"

পতিত। কত আবার, দশ টাকা দেব।

ওঃ, ইহাকেই বলে, ভগবান্ দেনেওয়ালা। এই মাত্র চারিটি পয়সার জন্য রঘুরাম আকাশ পাতাল ভাবিতেছিল, এমন সময় ভগবান্ একেবারে দশটা টাকা পাওয়াইয়া দিলেন। আহ্লাদে রঘুরামের প্রাণটা যেন নাচিয়া উঠিল। কিন্তু এক কথায় নিজমুখে যখন দশটা টাকা স্বীকার করিয়াছে, তখন চাপ দিলে আরও কিছু বাড়িবার সম্ভাবনা। এই ভাবিয়া রঘুরাম মনের আনন্দটা বাহিরে প্রকাশ না করিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "দশ টাকায় লেখাপড়া হয় না।"

পতিত। তবে কত টাকা চাও?

রঘু। পঞ্চাশ টাকা।

পতিত। সে ক'গণ্ডা বল দেখি?

আপনার মূর্খতার উপর কটাক্ষ করা হইতেছে দেখিয়া রঘুরাম যেন একটু রাগিয়া উঠিল; মুখ ভারী করিয়া বলিল, "অত শত আমি জানি না, এখন পঞ্চাশ টাকা দেবেন কি না তাই বলুন।"

ঈষৎ হাসিয়া পতিতপাবন বলিলেন, "তুমি যেমন বামুনের ঘরের গরু, আমিও তেমন কায়েতের ঘরে গরু হ'লে তাই দিতাম। কিন্তু আমি কায়েত ধূর্ত্ত।"

রঘুরাম ক্রোধগম্ভীর মুখে গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল। পতিতপাবন দলিলখানা পকেটে ফেলিতে ফেলিতে বলিলেন, "তা হ'লে তুমি লিখে দেবে না?"

অসম্মতিসূচক মস্তক আন্দোলন করিয়া রঘুরাম বলিল, "দশ টাকায় আমি দোয়াত কলম ছুঁই না।"

"সেটা দোয়াত কলমের সৌভাগ্য" বলিয়া পতিতপাবন উঠিবার উপক্রম করিলেন। এমন

সময় সুভদ্রা ত্বরিতভাবে ঘরের বাহিরে আসিয়া বলিল, "ব'সো দত্ত কাকা, ব'সো, কি হ'য়েছে আমাকে বল তো?"

পতিতপাবন পুনরায় জাঁকিয়া বসিয়া ব্যাপারটা সুভদ্রাকে বুঝাইয়া দিলেন, এবং দুই কলম লিখিয়া দিলে তিনি যে এখনই নগদ দশ টাকা দিতে পারেন ইহা বুঝাইয়া বলিলেন। সুভদ্রা তখন ভ্রাতাকে তিরস্কার করিয়া বলিল, "তোর আক্কেলটা কি রকম রঘু? কাকার যদি উপকার হয়, তবে অমনিই লিখে দেওয়া উচিত। উনি কি আমাদের পর। না উনি এত অবুঝ যে, সন্তুষ্ট হ'লে বামুনের ছেলেকে দশ টাকার জায়গায় পনরো টাকা দিতে পারবেন না।"

অতঃপর সে পতিতপাবনকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ও সব পঞ্চাশ মঞ্চাশ চুলোয় যাক্, তোমারো কথা থাক্ ওরও কথা থাক্, আর পাঁচটা টাকা তুমি দিও কাকা।"

পতিতপাবন আর এক টাকা স্বীকার করিলেন। সুভদ্রা পাঁচ হইতে চারিতে নামিল। এইরূপে কিছুক্ষণ দর কষাকষির পর শেষে তেরো টাকায় রফা হইয়া গেল। রঘুরাম বলিল, "কিন্তু নগদ চাই।"

পতিতপাবন বলিলেন, "আগে টাকা নিয়ে তার পর কলম হাতে করবে।"

রঘুরাম জিজ্ঞাসা করিল, "কি লিখতে হবে?"

পতিতপাবন বলিলেন, "সে আমি ব'লে দেব। ঘরে দোয়াত কলম আছে?"

লেখাপড়ার প্রধান উপকরণ এই দুটোকে রঘুরাম আগেই দূরীভূত করিয়াছিল। সুতরাং সুভদ্রা বলিল, "আমি গোপাল কাকাদের বাড়ী থেকে এনে দিচ্চি।"

পতিতপাবন বলিলেন, "না না, চক্কোত্তির বাড়ী থেকে নিয়ে এস। কেউ জিগ্যেস্ করলে বলবে, তোমার শ্বশুরবাড়ীতে চিঠি দেবে। আর রামভদ্র চক্কোত্তিকে দেখতে পাও যদি, ডেকে আনবে।"

রঘুরাম জিজ্ঞাসা করিল, "তাকে আবার কেন?"

পতিতপাবন বলিলেন, "একটা সাক্ষী হবে।"

সুভদ্রা চলিয়া গেল, এবং অল্পক্ষণ পরেই দোয়াত কলম ও রামভদ্র চক্রবর্ত্তীকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইল। তখন পতিতপাবনের কথামত রঘুরাম বন্ধকী কোবালার পিঠে লিখিতে লাগিল।

"আমি ৺ কেনারাম সমাদ্দারের পুত্র ও একমাত্র ওয়ারিশান শ্রীরঘুরাম ভট্টাচার্য্য এই বন্ধকী কোবালায় লিখিত সাড়ে তিনশত টাকা ও তাহার সুদ দুইশত তের টাকা তিন আনা বুঝিয়া পাইয়া এই কোবালা অত্রগ্রামবাসী শ্রীযুক্ত পতিতপাবন দত্ত মহাশয়কে বিক্রয় করিলাম। তিনি আমার ন্যায় এই কোবালার স্বত্বে স্বত্ববান্ হইয়া অদ্য হইতে অধমর্ণ শ্রীনরহরি চৌধুরীর নিকট কোবালার সমগ্র টাকা আদায়ের অধিকারী হইলেন।"

তারিখ দিবার সময় পতিতপাবন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাপ কোন্ সালে মারা যান মনে আছে?"

রঘুরাম বলিল, "দশ সালের মাঘ মাসে।"

"তবে লেখ, সন ১৩১১ সাল, তারিখ ২৮শে আষাঢ় "

তারিখ দিয়া রঘুরাম নিজের নাম দস্তখত করিল। পাশে রামভদ্র সাক্ষীরূপে নাম সহি করিলেন। পতিতপাবন দলিলখানি মুড়িয়া পকেটে ফেলিলেন, এবং রঘুরামকে তেরো টাকা ও রামভদ্রকে পান খাইবার জন্য একটি টাকা দিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন; রঘুরাম ও সুভদ্রা এই টাকার ভাগাভাগি লইয়া ঝগড়া কারম্ভ করিয়া দিল। অনেক ঝগড়াঝাটির পর পরিশেষে রঘুরাম বিরক্ত ভাবে বারোটা টাকা ভগ্নীকে ফেলিয়া দিয়া নিজে একটি টাকা লইয়া গাঁজা কিনিতে বাহির হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

"বৌমা, ওগো বৌমা!"

দুইটা হাতই সকড়ি ছিল বলিয়া বাঁ হাতের উল্টা পিঠ দিয়া মাথার কাপড়টা কপালের নীচে পর্য্যন্ত টানিয়া দিতে দিতে বধূ অন্নপূর্ণা উত্তর দিল, "কেন বাবা?"

চটী জুতাটা খুলিয়া কাঁধের চাদরটা আল্‌নার উপর রাখিতে রাখিতে নরহরি বলিলেন, "তোমার মেয়ের বর তো খুঁজে পাচ্চি না বাছা। বর খুঁজে খুঁজে আমার ন'সিকে দামের চটী জোড়াটা ছিঁড়ে গেল, তবু ওর একটা জোড়া-তাড়া ক'রে দিতে পারলাম না।"

মৃদু হাসিয়া অনুচ্চস্বরে অন্নপূর্ণা উত্তর করিল, "এর পর জামায়ের কাছ থেকে জুতোর দাম আদায় করে নিও বাবা।"

ঈষৎ হাসিয়া নরহরি বলিলেন, "হুঁ, সে শালা আমাকে জুতোর দাম দেবে? তাকেই জুতো দিতে দিতে হাতে কড়া প'ড়ে যাবে।"

অন্নপূর্ণা বলিল, "তা হ'লেই বোধ হয় তোমার জুতোর দাম শোধ যাবে।"

নরহরি হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। অন্নপূর্ণা হাত ধুইয়া তাড়াতাড়ি তামাক সাজিল। নরহরি

দাবার উপর বসিয়া মুখ মচ্‌কাইয়া বলিলেন, "নাঃ, সত্যি বৌমা, আমি যেন হায়রাম্‌ হ'য়ে পড়েছি। যেখানে দেখছি, সেইখানেই বুড়ো। কেউ দ্বিতীয় পক্ষ, কেউ তৃতীয় পক্ষ, কারো দাঁতে ভাঙ্গন ধরেছে, কেউ চুলে কলপ ঘস্‌ছে। নাঃ, ওর অদৃষ্টে দেখ্‌ছি বুড়ো বরই আছে।"

কলিকার আগুনে ফুঁ দিতে দিতে অন্নপূর্ণা বলিল, "তা ওর অদৃষ্টে যদি থাকে, তুমি তো তার লঙ্ঘন কত্তে পারবে না বাবা।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া নরহরি বলিলেন, "লঙ্ঘন কত্তে পাচ্চি কৈ বল। আচ্ছা বৌমা, ওর গৌরী নাম কে রাখলে বল তো?"

শ্বশুরের হাতে হুঁকা দিয়া অন্নপূর্ণা বলিল, "মা রেখেছিলেন।"

"কে তোমার শাশুড়ী?"

"হাঁ।"

"ভারী কাজই ক'রেছিল! জগতে নাম আর খুঁজে পেলেন না, নাম রাখলেন কি না গৌরী— রাজার মেয়ে হ'লেও যে ভিখিরী বুড়োর হাতে পড়েছিল। ইঃ, আজ যদি মাগী বেঁচে থাকতো বৌমা, তা হ'লে তাকে বুঝিয়ে দিতাম, এ রকম বেয়াড়া নাম রাখার মজাটা কি রকম। এই বুড়োগুলোর সঙ্গে মাগীর নিকে দিয়ে দিতাম না!"

হাসিয়া কথাটা বলিলেও শেষে নরহরির মুখখানা বিষাদের ছায়ায় অন্ধকার হইয়া আসিল। মুখখানা বিকৃত করিয়া তিনি গম্ভীরভাবে তামাক টানিতে লাগিলেন। অন্নপূর্ণা ধীরে ধীরে স্বকার্য্যে প্রস্থান করিল।

তামাক টানিতে টানিতে নরহরি বধূকে ডাকিয়া বলিলেন, "গৌরী কোথায় গেল বৌমা?"

"দাশু ঠাকুরপোর বৌ এয়েচে, তাই দেখতে গিয়েছে। এত বারণ ক'রলাম, কিছুতেই শুনলে না।"

এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া নরহরি বলিলেন, "তা যাক্‌ গে। ক'দিন আর যাবে বৌমা, যে ক'টা দিন বিয়ে না হচ্চে, একটু বেড়িয়ে বেড়াক্‌। মেয়েছেলে, বিয়ে হ'লে তো ঘরের বাইরে পা দিতে পারবে না।"

ঈষৎ অনুযোগের সুরে অন্নপূর্ণা বলিলেন, "ঐ তো বাবা, আদর দিয়ে তুমিই তো ওকে মাথায় তুলেছ!"

ম্লান হাসি হাসিয়া নরহরি বলিলেন, "আদর আর কৈ পেলে বৌমা? আদর করবার আছে কে? আজ যদি থাকতো বেষ্টা ছোঁড়া! দীনবন্ধু হে, তোমারি ইচ্ছা!"

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসে শোকের তীব্র স্মৃতিটা যেন বাহিরের বাতাসে ছড়াইয়া দিয়া নরহরি হুঁকায় ঘন ঘন টান দিতে লাগিলেন। খানিক পরে হঠাৎ হুঁকা হইতে মুখ তুলিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ দেখ বৌমা, দু'টি সম্বন্ধ এখন হাতে আছে। একটি হচ্চে—ছেলেটি এণ্ট্রেন্স ফেল, বাপ নাই, মা আছে; জায়গা জমিও কিছু আছে; দিতে হবে নগদ সাতশো। আর একটি বর দ্বিতীয় পক্ষ, বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ, ঘরে আছে এক বিধবা বোন, জমি জায়গা মন্দ নয়; শ দুই টাকা হ'লেই কাজ মিটে যায়। এখন কোন্‌টায় মত দিই বল দেখি?"

একটুও না ভাবিয়া অন্নপূর্ণা উত্তর করিল, "কোন্‌টায় আবার? যাতে টাকায় কম, তাতেই মত দেবে।"

"কিন্তু এ যে একে দোজবর, তায় বুড়ো।"

"তেমন টাকায় কম। অত সাত আটশো টাকা কোথায় পাবে এখন?"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নরহরি বলিলেন, "তাইতো ভাবছি বৌমা, এতগুলো টাকা কোথায় পাই। নগদ সাতশো, দু' একখানা গয়না, তার ওপর খরচপত্র, হাজারের কম নয়।"

ডান হাতে হুঁকা ধরিয়া নরহরি চিন্তিতভাবে বাঁ হাতটা মাথায় বুলাইতে লাগিলেন। অন্নপূর্ণা বলিল, "না না, অত ভাবতে হবে না। আমি বলছি বাবা, তুমি দোজপক্ষেই মত কর। পঁয়ত্রিশ বছর—কি এমন বুড়ো।"

চিন্তামলিন মুখে নরহরি বলিলেন, "নেহাৎ ছোকরাও তো নয় বৌমা? লোকেই বা বলবে কি? ওঃ, পতিতপাবনই আমার সর্ব্বনাশ করলে। তা নৈলে গৌরীর বিয়ের তরে কি আজ এত ভাবতে হয়? আজ যে দু'হাজার টাকা খরচ ক'রে গৌরীর বিয়ে দিতাম।"

একটা চাপা নিশ্বাসে নরহরির বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। তিনি মৃদুভাবে হুঁকায় টান দিতে দিতে বলিলেন, "এক কাজ করি বৌমা!"

"কি কাজ বাবা?"

"বিঘে পাঁচেক জমি বিক্রী ক'রে ফেলি। কি হবে আর জমি জায়গায়, ভোগ ক'রবে কে? আমি— আমার তো চোখ বুজলেই হ'লো। তোমার এক বেলা এক মুঠো—তা বাকী যা থাকবে, তোমার, বেশ চ'লে যাবে। তবে থাকলে পরে মেয়েটা পেতো। কিন্তু পরে না পেয়ে এখনই তার কাজে লাগুক।"

বিষাদগম্ভীর স্বরে অন্নপূর্ণা বলিল, "তুমি মহামহিম পাঠ লিখে জমি বিক্রী কত্তে যাবে বাবা ?"

শুষ্কহাসি হাসিয়া নরহরি বলিলেন, "কল্লেই বা বৌমা, আমার এখন আর মান অপমান কি ? চিত্রগুপ্ত আখিরী-খাতায় হাত দিয়েছে, তলব এলেই হ'লো। তখন তো মান অপমান কিছুই সঙ্গে যাবে না ? তবে ওগুলোর ভয়ে মেয়েটাকে জলে ফেলি কেন ?"

অনেক দুঃখেই যে শ্বশুরের মুখ দিয়া এমন কথা বাহির হইয়াছে, ইহা বুঝিতে বধূর বিলম্ব হইল না। তাহার চোখে জল আসিল ; আঁচলে চোখ মুছিয়া অন্নপূর্ণা যেন ঈষৎ তিরস্কারের স্বরে বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা আচ্ছা, সে যা হয় হবে, তুমি এত ব্যস্ত হচ্চো কেন বাবা। বেলা দুপুর হ'তে যায়, এখনো তোমার স্নান আহ্নিক কিছু হয় নি।"

সহাস্যে নরহরি বলিলেন, "আমার এখন আহ্নিক তপ জপ সবই হ'য়েছে গৌরী। তুমি বুঝবে না বৌমা, ওর গতি কত্তে না পারলে আমার মরণেও সোয়াস্তি নাই। আমি এখন যদি আজ ওর বিয়েটা দিতে পারি, তবে কাল যেতে চাই না।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "তুমি আজ বললেই তো আজ হবে না বাবা, বিধাতার যে দিন ইচ্ছা হবে সেই দিন হ'য়ে যাবে।"

নরহরি বলিলেন, "বিধাতার ইচ্ছা যে কবে হবে তা তো বুঝতে পারি না। এ দিকে শুনছি, পতিতপাবন নাকি আবার কি একটা মামলা রুজু করবার যোগাড় কচ্চে।"

সভয়ে অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিল, "আবার কিসের মামলা ?"

বিকৃত মুখে নরহরি বলিলেন, "ভগবান্ জানেন কিসের মামলা। বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা। দূর হোক, তেল একটু দাও, স্নানটা ক'রে আসি। আমি ভেবে কি করবো, তাঁর মনে যা আছে তাই হবে।"

অন্নপূর্ণা তেলের বাটি আগাইয়া দিলে নরহরি বিরক্তভাবে হুঁকাটা এক পাশে রাখিয়া তেল মাখিতে বসিলেন এবং তেল মাখিতে মাখিতে বুড়া বয়সে তাঁহাকে যে আরও কত ভোগ ভুগিতে হইবে, তাহাই চিন্তা করিয়া স্বীয় অদৃষ্টের উপর দোষারোপ করিতে লাগিলেন। স্ত্রী গেল, উপযুক্ত পুত্র গেল, কন্যা জামাতা সব গেল, রহিল শুধু এই বিধবা বৌ আর নাতনীটা। সুখ শান্তি সব চলিয়া গেল, রহিল তাহাদের স্মৃতির কাঁটাটুকু। সেই কাঁটাটুকু যে পরিশেষে শেলের আকারে তাঁহার শোকজীর্ণ বুকখানাকে অহোরাত্র বিদ্ধ করিতে থাকিবে, ইহা কি তিনি জানিতেন ? জানিলে কবে এই ছুটোকে ফেলিয়া আপনার শোকতাপ জীর্ণ হৃদয়টাকে বিশ্বনাথের পায়ে আছাড়িয়া দিবার জন্য ছুটিয়া যাইতেন। দুঃখের উপর এত দুঃখ, জ্বালার উপর এমন তীব্র জ্বালা কি সহ্য হয় ! অসহ্য হইলেও এই প্রচণ্ড জ্বালা সহ্য করিয়াই থাকিতে হইল ; সংসারের শেষ অবলম্বন গৌরীর স্নেহ-আকর্ষণ ছিন্ন করিয়া গৌরীকান্তের কাছে ছুটিয়া যাইতে পারিলেন না।

খুব বড় একটা নদীর জল যতক্ষণ বিস্তৃত খাতের মধ্যে থাকে, ততক্ষণ তাহার বেগের প্রাবল্য অনুভূত হয় না ; কিন্তু সেই বড় নদীর জলটা ছোট একটা খাতের মধ্যে আসিয়া পড়িলে সেই ক্ষীণবেগ জলরাশিই এমন প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হইতে থাকে যে, তাহা উচ্ছ্বাসে সেই ক্ষুদ্র খাতের উভয় কূল প্লাবিত করিয়া দেয়। বৃদ্ধ নরহরির অবস্থাও অনেকটা এই রকম হইল ; তাঁহার শত ধারায় প্রবাহিত স্নেহ-স্রোত যখন আর সকল ধারা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া একমাত্র পৌত্রীটুকুর উপর আসিয়া পড়িল, তখন সে স্রোতের প্রবল বেগে আপনাকে পর্য্যন্ত স্থির রাখা নরহরির পক্ষে যেন দুষ্কর হইয়া উঠিল। ক্ষুদ্র গৌরী তাঁহার সমগ্র অন্তর জুড়িয়া বসিয়া যেন বিশাল শূন্যতাকে পূর্ণ করিয়া দিল। শুধু গৌরীর মুখের দিকে চাহিয়া, শোকতাপ সব বিস্মৃত হইয়া নরহরি ছিন্নপ্রায় বন্ধনের মধ্যে আপনাকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। ভাবিলেন, গৌরীকে পাত্রস্থ করিয়া তারপর ভববন্ধনহারীর চরণপ্রান্তে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক সম্পূর্ণ বন্ধনমুক্ত হইবেন।

গৌরী এগার বৎসরে পা দিতেই নরহরি তাহার জন্য পাত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এত শীঘ্র গৌরীকে পর করিয়া দিয়া পুনরায় সংসারের বিশাল শূন্যতার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতে তাঁহার মনটা যেন ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। সুতরাং তিনি পাত্র খুঁজিয়া পাইয়াও পাইলেন না ; তুচ্ছ এক আধটু খুঁৎ ধরিয়া অনেক প্রার্থনীয় সম্বন্ধও ভাঙ্গিয়া দিতে থাকিলেন। কিন্তু চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, আবার দিন কতক পরেই কর্ত্তব্যের কঠোর আবরণে মমতাকে আবৃত করিয়া পুনরায় নূতন সম্বন্ধ দেখিতে লাগিলেন। এমনই করিয়া কত সম্বন্ধ আসিল, ভাঙ্গিল, কিন্তু গৌরীর বিবাহ হইল না। সে বারো বছরে পা দিয়া, দাদামশায়ের পাকা চুল তুলিয়া, তামাক সাজিয়া, সঙ্গিনীদের সহিত পুকুরে সাঁতার কাটিয়া দিন কাটাইতে লাগিল।

এমনই সময়ে সহসা পতিতপাবন দত্তের সহিত মামলা বাধিল। গৌরীর বিবাহের চিন্তা ত্যাগ করিয়া নরহরি মোকদ্দমার ভাবনায় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তারপর মামলায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যখন দেখিলেন, গৌরী বাল্য অতিক্রম করিয়া যৌবনের দ্বারে পদার্পণ করিতেছে, বসন্তানিল স্পর্শে তাহার দেহলতা পুষ্পে পল্লবে সমৃদ্ধ হইয়া মুকুলিত হইয়া উঠিতেছে, তখন তাহার বিবাহের চিন্তায় নরহরি অস্থির হইয়া পড়িলেন, এবং যেখানে পাত্রের সন্ধান পাইলেন, সেইখানেই ছুটাছুটি করিয়া পূর্ব্বকৃত আলস্যের প্রায়শ্চিত্ত করিতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভাবিতে ভাবিতে নরহরি স্নান করিয়া আহ্নিকে বসিলেন, কিন্তু আহ্নিকে আদৌ মন দিতে পারিলেন না; ইষ্টদেবতার ধ্যান করিতে গিয়া, চাঁইপাশার কুঞ্জ মিত্তির সাত শত টাকার স্থলে পাঁচ শত—অন্ততঃ সাড়ে পাঁচ শত লইয়াও রাজি হইতে পারে কি না তাহাই ভাবিতে লাগিলেন, এবং সেই ভাবনার মধ্য দিয়াই পূজা জপ সব শেষ করিয়া উঠিলেন। অন্নপূর্ণা ভাত বাড়িয়া দিল। আহারে বসিয়াও নরহরি এই চিন্তার হাত হইতে অব্যাহতি পাইলেন না। তবে এবার চিন্তাটা শুধু মনোমধ্যেই আবদ্ধ হইয়া রহিল না, বাক্যের আকারে পরিব্যক্ত হইয়া অন্নপূর্ণাকে পর্য্যন্ত চিন্তিত করিয়া তুলিল, এবং বিনোদ মিত্তিরের মত লোক দেড় শত দুই শত টাকার মায়া ছাড়িতে পারিবে কি না, যদিই ছাড়ে তবে যে কোন উপায়ে টাকাটার যোগাড় করিয়া এই পাত্রের হাতেই গৌরীকে দেওয়া উচিত কি না, এ সম্বন্ধেও মতামত প্রকাশ করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া তাহাকে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতে হইল। যাহা হউক, বধূর নিকট কতকটা অনুকূল, কতকটা প্রতিকূল মত পাইয়া নরহরি স্থির করিয়া ফেলিলেন, বিনোদ মিত্তির যদি ছয়শো টাকাতেও রাজি হয়, তবে আর কোথাও তিনি চেষ্টা দেখিবেন না, 'যাঁহা বায়ান্ন তাঁহা তিপান্ন' করিয়া কাজ শেষ করিয়া দিবেন, এজন্য মহামহিম পাঠ লিখিতে হইলেও তুচ্ছ সম্মানের ভয়ে তাহাতে পশ্চাৎপদ হইবেন না।

এইরূপ স্থির সঙ্কল্প লইয়া নরহরি আহার শেষ করিয়া উঠিলেন এবং আচমনান্তে পান ও হুঁকা কলিকা লইয়া কাল সকালে একবার চাঁইপাশায় যাইবেন কি না ইহা ভাবিতে ভাবিতে বাহিরে চলিলেন। কিন্তু উঠানের অর্দ্ধেক পার না হইতেই থমকিয়া দাঁড়াইলেন; এক দিব্যকান্তি যুবক সম্মুখে আসিয়া উপুড় হইয়া তাঁহার পায়ের ধুলা লইল। নরহরি সহর্ষকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "আরে কেও? হরনাথ যে! কখন্ এলে ভায়া?"

হরনাথ সহাস্যে উত্তর দিল, "আজ সকালে এসেছি। কেমন আছেন দাদামশায়?"

"আমার আর থাকাথাকি কি ভায়া, পাকা আম, বোঁটা খস্‌লেই হ'লো। তোমার খবর কি বল দেখি?"

হরনাথ বলিল, "খবর সব ভাল, এবার 'ল' দিয়েছিলাম, পরশু খবর পেয়েছি, পাশটা হ'য়ে গিয়েছি।"

নরহরি আহ্লাদে যেন লাফাইয়া উঠিলেন; হর্ষ বিস্ময় জড়িত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "এ্যাঁ, পাশ হ'য়েছ? একেবারে ওকালতি পাশ। তা হ'লে তোমাকে এখন আর পায় কে?"

লজ্জিতভাবে ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে করিতে হরনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "মামীমা কোথায়? গৌরী কেমন আছে?"

"মামীমা বুঝি রান্নাঘরে" বলিয়া নরহরি সেই দিকে ফিরিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া বলিলেন, "ও বৌমা, হরনাথ এয়েচে গো, সে হরা নয়, উকীল হরনাথবাবু —শ্রীযুক্ত বাবু হরনাথ মিত্র বি এ, বি এল।"

বলিয়া তিনি হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিতেই হরনাথ লজ্জারক্ত মুখখানা ফিরাইয়া লইয়া রন্ধনশালার দিকে অগ্রসর হইল। অন্নপূর্ণা মাথার কাপড়টা কপাল পর্য্যন্ত টানিয়া বাহিরে আসিলে হরনাথ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "গৌরী কোথায় মামীমা?"

মৃদুস্বরে অন্নপূর্ণা বলিলেন, "পাশের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছে।" বলিয়া সে তাড়াতাড়ি গিয়া ঘরের দাবায় মাদুর পাতিয়া দিল। নরহরি এক হাতে হুঁকা, অন্য হাতে হরনাথের হাত ধরিয়া মাদুরে গিয়া বসিলেন।

এইখানে হরনাথের একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। পতিতপাবনের জ্যেষ্ঠা ভাগিনেয়ী মারা যাইবার সময় যখন বুঝিতে পারিল যে, তাহার মৃত্যুর পরই স্বামী পুনরায় বিবাহ না করিয়া ছাড়িবেন না, তখন সে চার বছরের ছেলে হরনাথকে মাতুলটির হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে পরলোক যাত্রা করিল। নিঃসন্তানা মাতুলানীও এই মাতৃহীন শিশুকে অপত্যনির্ব্বিশেষে লালন পালন করিতে লাগিলেন।

কিন্তু বছর কয়েক প্রতিপালন করিবার পর মাতৃস্থানীয়া দিদিমা স্বর্গারোহণ করিলেন এবং দাদামশায়ের পুনরায় দার পরিগ্রহের কোন উদ্যোগই দেখা গেল না, তখন হরনাথকে অগত্যা বাপের কাছেই ফিরিয়া যাইতে হইল এবং বিমাতার স্নেহসম্পর্কশূন্য আশ্রয়ে থাকিয়াই তাহাকে সুখময় বাল্যজীবন কষ্টে অতিবাহিত করিতে হইল।

কিন্তু জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে কষ্টটা যখন নিতান্তই অসহ্য হইত, তখন সে পাঁচুগঞ্জে দাদামশায়ের কাছে পলাইয়া আসিত, এবং দিনকতক সেখানে থাকিবার পর ক্রোধ হইলে আবার ফিরিয়া যাইত। তারপর মাতৃষসা ভবরাণী বিধবা হইয়া যখন মাতুলগৃহে আশ্রয় প্রাপ্ত হইল, তখন হরনাথের পক্ষে সে স্থানটা নিতান্ত লোভনীয় হইয়া উঠিল; একবার সেখানে আসিলে মাসীমার স্নেহাঞ্চল ত্যাগ করিয়া সহজে যাইতে পারিত না। পতিতপাবন তাহার লেখা-পড়ার ব্যাঘাত হইতেছে বলিয়া অনেক বুঝাইয়া শুঝাইয়া পুনরায় তাহাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিতেন। হরনাথ কখন বুঝিত, কখন বুঝিত না; এক এক সময়ে দাদামশায়ের তাড়নায় ক্ষুব্ধ হইয়া অভিমানে তাঁহার গৃহত্যাগ করিত বটে, কিন্তু বাপের কাছে চলিয়া যাইত না, নরহরির ঘরে আসিয়া লুকাইয়া থাকিত। পতিতপাবন শীঘ্রই তাহা জানিতে পারিতেন, এবং মিষ্ট কথায় তাহাকে শান্ত করিয়া বাপের কাছে দিয়া আসিতেন।

এমনি করিয়া হরনাথ কখন পিত্রালয়ে কখন বা দাদামশায়ের কাছে থাকিয়া অনেক কষ্টে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল, এবং পাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রাণে একটা নূতন আশা—নূতন উৎসাহ জাগিয়া উঠিল। যে লেখাপড়াকে সে হিংস্র ব্যাঘ্রের ন্যায় ভয়ঙ্কর বোধ করিত, সেই লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইবার জন্য তাহার মনে প্রবল আগ্রহ জন্মিল। পিতা কিন্তু তাহার এই আগ্রহ নিবারণে কিছুমাত্র সহায়তা করিলেন না; গ্রাম্য স্কুলে পড়িবার খরচ তিনি কোনরূপে যোগাইয়াছিলেন, কিন্তু কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে পড়িবার মোটা খরচ যোগাইবার সামর্থ্য যে তাঁহার নাই ইহা পুত্রকে স্পষ্ট জানাইয়া দিলেন।

পিতার নিকট হতাশ হইয়া হরনাথ দাদামশায়ের কাছে আসিয়া পড়িল। উচ্চশিক্ষার জন্য তাহার এই ব্যাকুলতা দর্শনে পতিতপাবন তাহাকে নিরাশ করিতে পারিলেন না, কলেজের খরচ যোগাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন। হরনাথ সানন্দে গিয়া কলেজে ভর্ত্তি হইল এবং দাদামশায়ের সাহায্যে পড়াশোনা করিতে লাগিল। বৎসরান্তে গ্রীষ্মের ছুটীর সময় একবার করিয়া পাঁচুগঞ্জে আসিত, এবং এক মাসেই সকলের কাছ হইতে এক বৎসরের প্রাপ্য স্নেহ আদায় করিয়া লইয়া আবার চলিয়া যাইত।

কিন্তু যেবার হরনাথ বি, এ পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া দাদামশায়ের কাছ হইতে একখানা কড়া চিঠী পাইল, সেইবার হইতে সে ছুটীতে দেশে আসা বন্ধ করিয়া দিল, এবং দিনরাত করিয়া পড়িয়া বি, এ পাশ করিল। তারপর আইন পড়িয়া, পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতার শুভ সংবাদ লইয়া তিন বৎসর পরে দাদামশায়ের কাছে উপস্থিত হইল।

এই তিন বৎসরের মধ্যে পতিতপাবন ও নরহরির মধ্যে কি ভীষণ বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা হরনাথ জানিত না। উভয়ের মধ্যে বিবাদের কিছু কিছু সংবাদ পাইলেও সেই সামান্য বিবাদ যে মর্ম্মান্তিক শত্রুতায় পরিণত হইয়াছে এ সংবাদ সে পায় নাই। সুতরাং দাদামশায়ের ন্যায় চৌধুরী দাদাকেও স্বীয় সাফল্যের সংবাদটা জানাইবার জন্য ছুটিয়া না গিয়া থাকিতে পারিল না।

পতিতপাবনের সহিত শত্রুতা থাকিলেও হরনাথের সাফল্যের সংবাদ শ্রবণে নরহরি যেরূপ আহ্লাদিত হইলেন, তাহা পতিতপাবনের আহ্লাদ অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। তিনি যে অন্তরের আনন্দবেগটা কিরূপে প্রকাশ করিবেন, তাহা ভাবিয়া পাইলেন না; হর্ষগদগদকণ্ঠে হরনাথের প্রশংসা করিয়া, তাহার মাথায় পিঠে হাত বুলাইয়া, কখন উচ্চ কখন অনুচ্চ হাসি হাসিয়া, এবং হাসির সঙ্গে হুঁকায় টান দিয়া কাশিতে কাশিতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া নিজের সহিত হরনাথকেও যেন অস্থির করিয়া তুলিলেন। এই অস্থিরতার মধ্যে নরনাথ বৃদ্ধের যে আন্তরিক নিঃস্বার্থ ভালবাসার প্রমাণ প্রাপ্ত হইল, তাহাতে সে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিল না, আনন্দে তাহারও চোখ দুইটা জলে টল্ টল্ করিতে লাগিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আনন্দের প্রথম উচ্ছ্বাসটা এইরূপ অস্থিরতার মধ্য দিয়া ব্যক্ত করিবার পর নরহরি কতকটা স্থির হইয়া বসিলেন, এবং হরনাথ অতঃপর কি করিবে স্থির করিয়াছে, তাহা জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ

করিলেন। হরনাথ কিন্তু তাঁহার এই আগ্রহ নিবারণ করিতে পারিল না; সে বিনীতভাবে জ্ঞাপন করিল যে, ভবিষ্যৎ এখন তাহার নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাতই রহিয়াছে; সে পাশ করিয়াছে মাত্র; পাশের কৃতকার্য্যতা তাহার জীবনকে কোন্ পথে লইয়া যাইবে সে সম্বন্ধে এখনো সে চিন্তা মাত্র করে নাই।

নরহরি ভবিষ্যদ্বক্তার ন্যায় তাহাকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যথেষ্ট আশা দিলেন এবং কালে সে যে একজন প্রতিপত্তিশালী উকীল হইয়া এখনকার সকল উকীলকেই যশে ও অর্থে পরাভূত করিতে পারিবে এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী ব্যক্ত করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। হরনাথ তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণীকে আশীর্ব্বাদস্বরূপে গ্রহণ করিয়া নিজের প্রসঙ্গটাকে চাপা দিবার অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদামশায়ের সঙ্গে না আপনার মামলা বেধেছিল?"

নরহরি হাসিয়া উত্তর করিলেন, "হাঁ, বেধেছিল, মিটেও গিয়েছে। ঘর কত্তে গেলে এমন মামলা মোকদ্দমা হ'য়েই থাকে। তবে একটু আক্ষেপ এই যে, সেই তুমি উকীল হ'লে কিন্তু দিনকতক আগে যদি পাশটা কত্তে পাবতে, তবে দু'জনারি কতকগুলো টাকা জলে যেতো না।"

হরনাথ হাসিয়া বলিল, "দুই পক্ষ থেকেই ওকালতনামা দিতেন নাকি?"

নরহরি বলিলেন, "নিশ্চয় দিতাম। ওপক্ষ থেকে না হোক, এপক্ষ থেকে তো তুমি নিশ্চয়ই ওকালতনামা পেতে। তা হ'লে কি আজ আমাকে গৌরীর বিয়ের ভাবনা ভাবতে হয়, না বুড়ো বর দেখে বেড়াতে হয়।"

কথা শেষ করিয়া নরহরি হাসিতে থাকিলেও তাঁহার সে হাসিটা ঠোঁটের কোল ছাড়িয়া বাহিরে ফুটিয়া উঠিল না। হরনাথ সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল, "গৌরীর জন্যে তা হ'লে বুড়ো বর দেখবেন নাকি?"

মস্তক সঞ্চালনপূর্ব্বক নরহরি উত্তর করিলেন, "কাজেই। ছোকরারা তো একেই বিয়েটাকে মস্ত ঝকমারি মনে করে, অবশ্য মনের ভাব ঠিক তা না হ'লেও মুখে তো এই রকমই ব'লে থাকে। তারপর উপরোধ অনুরোধে প'ড়ে যদিও ঝকমারিটা স্বীকার ক'রে নেয়, কিন্তু এমনি তার মাশুল চেয়ে বসে যে, সেটা মেয়ের বাপেরি ঝকমারির মাশুল হ'য়ে ওঠে।"

হরনাথ বলিল, "মেয়ের বাপ হওয়া আজকাল ঝকমারিই হ'য়ে উঠেছে বটে দাদামশায়, কিন্তু এর তরে ছোকরারা দায়ী নয়, দায়ী তাদের বাপ খুড়োরা —যাঁরা কন্যাদায় কি ভীষণ ব্যাপার এটা জেনেও যেন কিছু জানেন না এমনি ভাবে মাশুলের চাপ দিতে থাকেন।"

নরহরিও ইহা অস্বীকার করিলেন না, এবং পুত্রের বিবাহের সময় তিনিও যে বৈবাহিকের উপর এইরূপ একটা চাপ দিয়াছিলেন, আর প্রকৃতির ঘাত প্রতিঘাত নিয়মের বশে আজ যে তাঁহাকেও বেশ একটা গুরুতর চাপ পাইতে হইতেছে, ইহা সক্ষোভে ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। হরনাথও চিন্তিতভাবে কি উপায়ে গৌরীকে সৎপাত্রের হস্তে সমর্পণ করা যায় নরহরির সহিত তাহার পরামর্শ করিতে থাকিল।

এমন সময় গৌরী ধীরে ধীরে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়াই নরহরি বলিয়া উঠিলেন, "এই নাও, তোমার গৌরী এসেছে। কে এসেছে তা দেখেছিস্ গৌরি।"

গৌরী দেখিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। হরনাথকে সে খুব ভাল রকমেই চিনিত, এবং এক সময়ে তাহার উপরে আবদার উপদ্রবও কম করে নাই। ধূলা খেলা হইতে পড়াশোনা, পুকুরে সাঁতার কাটা প্রভৃতি সকল কাজেই হরনাথ তাহার গুরুর স্থান অধিকার করিয়াছিল এবং অনেক সময়ে হরনাথ গুরুগিরির অধিকার ছাড়িয়া দিতে উদ্যত হইলেও গৌরী জোর করিয়া তাহাকে সে অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছিল।

আজ কিন্তু সেই হরনাথকে দেখিয়া গৌরী লজ্জায় যেন জড়সড় হইয়া পড়িল। তাহার কাছে যাওয়া দূরের কথা, মুখ তুলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিতে পর্য্যন্ত পারিল না। সঙ্কোচজড়িত ভাবে মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহার এই অস্বাভাবিক লজ্জা দেখিয়া নরহরি হাসিয়া বলিলেন, "তুই যে লজ্জায় একেবারে জড়সড় হ'য়ে পড়লি গৌরী! চিন্‌তে পাচ্চিস্ না, এ হরনাথ— তোর বর নয়।"

গৌরীর লজ্জারক্ত মুখখানা প্রগাঢ় রক্তরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। রন্ধনশালা হইতে অন্নপূর্ণা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া মৃদু তর্জ্জন সহকারে বলিল, "মেয়ের রকম দেখ! হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলি যে? এগিয়ে গিয়ে নমস্কার কর্।"

মাতার আদেশ লঙ্ঘন করিতে গৌরীর সাহস হইল না; সে সঙ্কোচবিজড়িত পা দুইটাকে কোনরূপে টানিয়া লইয়া হরনাথের সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং কোনরূপে একবার মাথাটা নোয়াইয়াই দ্রুতপদে ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

লজ্জার তাড়না একা গৌরীই যে অনুভব করিতেছিল তাহা নহে, হরনাথও বড় কম লজ্জা অনুভব করে নাই। শুধু লজ্জা নহে, লজ্জার সঙ্গে সে অনেকটা বিস্ময়ও অনুভব করিতেছিল। একি সেই গৌরী- যাহাকে সে দশবছরের চঞ্চলা বালিকা দেখিয়া গিয়াছে? সেই প্রভাতের কোরকটি ইহারই মধ্যে কিরূপে এমন স্ফুটনোন্মুখ হইয়া উঠিল? ইহার সেই বালিকাসুলভ চাঞ্চল্য, সেই হাসি, সেই রাগ অভিমান কাহার শাসনে এমন স্থির গাম্ভীর্য্যে পরিণত হইল? হরনাথ সলজ্জ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গৌরীর মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিতে পারিল না; একবার মুখ তুলিয়া চাহিতেই দৃষ্টি আপনা হইতেই নত হইয়া আসিল।

কিছুক্ষণ পরে হরনাথ বিদায় গ্রহণ করিল। যাইবার সময় নরহরি বলিলেন, "একদিন হরনাথকে নিমন্ত্রণ করবে না গা বৌমা?"

হরনাথ হাসিয়া বলিল, "বিনা নিমন্ত্রণে ক'দিন খাই তাই আগে দেখুন, তারপর নিমন্ত্রণ করবেন।"

নরহরি হাসিয়া উঠিলেন। হরনাথও হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল।

হরনাথ চলিয়া গেলে অন্নপূর্ণা শ্বশুরের সম্মুখে আসিয়া বলিল, "হাঁ বাবা!"

বধূর বক্তব্য শুনিবার জন্য নরহরি তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। অন্নপূর্ণা কিন্তু কিছুই বলিল না, শুধু মাথার কাপড়টা আর একটু টানিয়া দিয়া সঙ্কুচিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। নরহরি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলছো বৌমা?"

অন্নপূর্ণা নিরুত্তর। নরহরি দেখিলেন, সে যেন কি বলি বলি করিয়াও বলিতে পারিতেছে না। দেখিয়া তিনি যেন তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া লইয়া সহাস্যে বলিলেন, "বুঝেছি বৌমা; সেটা হ'লে খুব ভালই হ'তো, কিন্তু তা যে হ'বার নয়।"

"কেন নয় বাবা?"

"এ হরগৌরীর মিলনে অনেক বাধা আছে।"

"এমন কি বেশী বাধা আছে?"

"খুব মস্ত বাধাই আছে বৌমা। তুমি কি মনে কর, পতিতপাবনের অমতে হরনাথ এ কাজ কর্ত্তে পারবে?"

চিন্তিতভাবে অন্নপূর্ণা বলিল, "তা পারবে না বোধ হয়।"

নরহরি বলিলেন, "আর পতিতপাবনও গৌরীর সঙ্গে নাতির বিয়ে দিতে রাজি হবে না নিশ্চয়।"

একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অন্নপূর্ণা বলিল, "হ'লে কিন্তু ভাল হ'তো বাবা।"

শুষ্ক হাসি হাসিয়া নরহরি বলিলেন, "এই না খানিক আগে বললে বৌমা, এত ভাল মন্দ দেখে আর কাজ নাই।"

ম্লানমুখে অন্নপূর্ণা বলিল, "মন্দই বা হ'চ্চে কই বাবা?"

নরহরি বলিলেন, "মন্দ যদি তোমার পছন্দ হয় তবে তার জন্য ভাবনা কি? আর কোথাও না জোটে, আমি তো আছি; আমার চাইতে মন্দ বর আর খুঁজে পাবে কি?"

বধূও ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিল, "মন্দ তোমার চাইতে অনেক পাব বাবা, ভাল পাওয়াই শক্ত।"

উচ্চ হাসি হাসিয়া নরহরি বলিলেন, "তবে আমার দ্বারা আর হ'লো না বাছা।"

বলিয়া তিনি হুঁকা কলিকা লইয়া হাসিতে হাসিতে বাহিরে চলিয়া গেলেন।

বাহিরে আসিতেই নরহরি দেখিলেন, পতিতপাবন বৈঠকখানায় বসিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে ব্যাগ হাতে একজন ভদ্রলোক আসিয়াছেন। পতিতপাবনকে সম্বোধন করিয়া নরহরি বলিলেন, "ভায়া যে, কি মনে ক'রে?"

পতিতপাবন বলিলেন, "নিমন্ত্রণ কত্তে এসেছি দাদা।"

অতঃপর তিনি পার্শ্ববর্ত্তী ভদ্রলোককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এঁরি নাম নরহরি চৌধুরী। নিমন্ত্রণপত্রটা দিন।"

ভদ্রলোকটি আদালতের একজন পেয়াদা। তিনি ব্যাগ খুলিয়া আদালতের সহি মোহরযুক্ত একখানা কাগজ নরহরির হাতে দিলেন, নরহরি কাগজখানা হাতে লইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "এ যে মস্ত বড় নিমন্ত্রণ ভায়া।"

পতিতপাবন উত্তর করিলেন, "পতিতপাবন দত্ত ছোটখাট নিমন্ত্রণ করে না দাদা।"

পেয়াদা দ্বিতীয় একখানা কাগজে নরহরির সহি লইলে পতিতপাবন তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় বলিলেন "নিমন্ত্রণ রাখতে যাচ্চো তো দাদা?'

নরহরি বলিলেন, "যাব বৈকি ভায়া, তুমি যখন আমার নিমন্ত্রণ রেখেছ, তখন আমি কি তোমার নিমন্ত্রণ না রেখে থাকতে পারি?"

বলিয়া তিনি উচ্চশব্দে হাসিয়া উঠিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

হরনাথের সম্মুখে একতাড়া কাগজ ফেলিয়া দিয়া পতিতপাবন বলিলেন, "দেখ তো ভায়া, কাগজ-গুলো, মামলাটার হাইকোর্টে আপীল চলতে পারে কিনা।"

কাগজগুলার দিকে শঙ্কাব্যাকুল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া হরনাথ বলিল, "কোন্ মামলার কাগজ এগুলা ?

পতিতপাবন বলিলেন, "বেণেপুকুরের মামলার কাগজ। সাক্ষীর জবানবন্দী, জজের রায়ের নকল সব ওর মধ্যেই আছে। বেশ মন দিয়ে রায়ের নকলটা প'ড়ে দেখ দেখি, কোন রকমে খড়ে বড়ে বাড়িয়ে হাইকোর্টে আপীল করা চলে কিনা।"

ওকালতি পাশ করিলেও এবং ভবিষ্যতে এই রকম কাগজপত্র লইয়া নাড়াচাড়া করিতে হইবে জানিলেও উপস্থিত এতগুলা আইনের কূট তর্কে ভরা কাগজ পড়িয়া মতামত প্রকাশ করিতে হইবে শুনিয়া হরনাথের মুখ শুকাইয়া গেল; সে শুষ্কমুখে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত কাগজের তাড়া খুলিয়া তাহার একখানা কাগজে চোখ বুলাইতে লাগিল। পতিতপাবন বলিলেন, "জজের রায়টা খুব ভাল ক'রে দেখবে। আমিও দেখেছি, কিন্তু গলদ তেমন কিছু পাইনি। জজ বেটা একেবারে গোড়া কেটে দিয়ে রায় লিখেছে, ওর উপর নির্ভর দিয়ে আপীল করা শক্ত কথা! তবে হাজার হোক আমরা মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, আমাদের দেখায় তোমাদের দেখায় অনেক তফাৎ। তোমাদের হচ্চে পড়া বিদ্যে।"

বলিয়া তিনি একটু হাসিলেন। এই প্রশংসায় হরনাথের মুখে কিন্তু একটুও হাসি আসিল না, বরং গভীর বিরক্তিতে মুখখানা বিকৃত হইয়া আসিল। তাহার সে বিরক্তির ভাবটুকু পতিতপাবনের তীক্ষ্ণদৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিল না। তিনি সহাস্যে অথচ যেন একটু তিরস্কারের স্বরে বলিলেন, "যখন এই ব্যবসায়ে ঢুকেছ ভায়া, তখন এব পর দিনে এমন দশ বিশ তাড়া কাগজ ঘাঁটকাতে হবে। কাগজপত্র যত ভাল দেখতে পারবে, ততই বড় উকীল হবে। বড় উকীলরা করে কি ? তাদের তো হাত পা দু'টো বেশী নাই, লেজও গজায় না, তারা বাহাদুরী দেখায় শুধু এই কাগজ দেখে। মামলা যায় যায়, কোথাও কোন সূত্র নাই, কিন্তু এই কাগজের ভিতর থেকেই কোথায় একটু কথার গলদ, কোথায় মুন্সেফের রায়ের একটু আঁচড় এমন টেনে বা'র করে যে, নেহাৎ ডুবো মালকে ডিগ্ ডিগ্ বাজিয়ে জিতিয়ে দেয়।"

বড় উকীল হইবার আশা রাখিলেও এইরূপ নিতান্ত নীরস দশ বিশ তাড়া কাগজ প্রত্যহ পড়িতে হইবে শুনিয়া ভয়ে হরনাথের প্রাণটা যেন আঁৎকাইয়া উঠিল, এবং সেরূপ বড় উকীল হওয়া অপেক্ষা দুই শত টাকা মাহিনায় তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ বা সব ডেপুটীর চাকরীতে প্রবৃত্ত হওয়া অপেক্ষাকৃত শ্রেয়ঃ কিনা তাহাই ভাবিতে লাগিল। পতিতপাবন আর কতকগুলা কাগজ ঘাঁটকাইতে ঘাঁটকাইতে তাহার ভিতর হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, এই কাগজ খানা দেখ দেখি, এটা হচ্চে সাক্ষীর জবানবন্দী। ধনা জেলে বলছে—সে বেণেপুকুরে মাছ ধরে বরাবর চৌধুরীমশায়কে মাছের ভাগ দিয়ে আসছে। কিন্তু এখানে আবার জেরায় বলেছে—মাছ বেচে সে টাকা দিয়ে এসেছে, তবে সে টাকা চৌধুরীমশায় একা নিয়েছে, কি অপর কাউকে ভাগ দিয়েছে তা সে জানে না'। দত্তমশায় একবার টাকার তাগাদা করেছিল বটে, কিন্তু সে তাঁকে টাকা দেয়নি। কিন্তু জজসাহেব তো রায়ে কোথাও এ কথাটুকু ধরেনি ?"

রায়ের আধখানা পড়া না হইলেও হরনাথ বলিয়া উঠিল, "হাঁ, ধরেনি বটে।"

পতিতপাবন বলিলেন, "কিন্তু প্রধান সাক্ষীর এত বড় একটা গলদ ধরা তো উচিত ছিল। এ তো একটা কম পয়েন্ট নয়। এমন সব পয়েন্ট কৌঁচুলীদের হাতে পড়লে রক্ষা আছে কি ?"

হরনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি হাইকোর্ট করবেন নাকি ?"

গম্ভীরভাবে পতিতপাবন বলিলেন, "ইচ্ছে তো আছে, তবে একটা বড় উকীল বা কৌঁচুলীকে না দেখিয়ে হাত দিচ্চি না। এখানকার উকীলগুলো কোন কাজের নয়। দেখ না, এমন একটা পয়েন্ট, জজকে ধরিয়ে দিতে পারেনি।"

বলিয়া তিনি যেন অবজ্ঞার সহিত ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন। তারপর কাগজগুলা গুছাইতে গুছাইতে বলিলেন, "তুমি তো এর মধ্যে একবার কলকাতায় যাচ্চো ?"

হরনাথ বলিল, "হাঁ, সার্টিফিকেট নিতে, মেসের বাসাটা তুলে দিতে একবার যেতে হবে বৈকি।"

পতিতপাবন বলিলেন, "তা হ'লে সেই সময়ে তোমার হাতেই কাগজপত্র দেব। ভবানীপুরে রামগোপাল বোসকে দেখাবে। আমি চিঠী লিখে দেব। রামগোপাল বোসকে জান না ? ভবর ভাসুরপোর মামাশ্বশুর। হাইকোর্টের উকীল, মস্ত নামডাক।"

"তা হবে" বলিয়া হরনাথ রায়ের নকলখানা ভাঁজ করিতে লাগিল। পতিতপাবন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল কথা, বুড়োর কাছে গিয়েছিলে না?"

হরনাথ উত্তর করিল, "হাঁ, দেখা কত্তে গিয়েছিলাম।"

পতিত। তা বেশ ক'রেছিলে। মামলা মোকদ্দমার কথা কিছু হ'লো নাকি?

হর। এমন কিছু কথা হয়নি। আমি জিজ্ঞাসা করায় বললেন, ঘর কত্তে গেলে এমন হ'য়েই থাকে।

গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালনপূর্ব্বক পতিতপাবন বলিলেন, "বটে! আচ্ছা, বাছাধনকে একবার হাইকোর্টের জল খাওয়াই, তারপর বোঝাব—ঘর কত্তে গেলে কেমন মামলা মোকদ্দমা হয়। সেখানে তো আর ঘটী বাঁধা দিয়ে মামলা করা চলবে না। সে হাইকোর্ট! একদিন কৌঁচুলীর ফি দিতে হ'লে বাছাধনকে ভিটে বিক্রী কত্তে হবে।"

বলিয়া পতিতপাবন যেন একটু আহ্লাদের হাসি হাসিলেন। হরনাথ কিন্তু হাসিল না বা দাদামশায়ের কথার উত্তরে একটি কথাও বলিল না; সে গম্ভীরভাবে বসিয়া একখানা কাগজ লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। পতিতপাবন তাহার গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নাতনীর বিয়ের কথা বুড়ো কিছু বললে?"

হরনাথ বলিল, "হাঁ, চেষ্টা দেখছে।"

উপহাসের সহিত পতিতপাবন বলিলেন, "সে তো আজ বার বছর দেখে আসছে। চেষ্টা দেখ্‌তে দেখ্‌তে মেয়ে তো ছেলের মা হ'য়ে উঠলো। এর পর ধেড়ে মেয়ে বার করবে কোন্ লজ্জায়?"

হরনাথ বলিল, "কন্যাদায় হ'লে মানুষের লজ্জা সম্ভ্রম থাকে কি দাদামশায়? বৈষ্ণবধর্ম্মে একটা প্রবাদ আছে—'লজ্জা মান ভয়, তিন থাকতে নয়।' এখন এই প্রবাদটা আমাদের ঘরে মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধে প্রযোজ্য হতে পারে।"

গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালন করিতে করিতে পতিতপাবন বলিলেন "কিছুই হ'তো না ভায়া, কিছুই হ'তো না। আমার কথা শুনলে আজ কোন্ দিন গৌরীর বিয়ে হয়ে যেতো। কিন্তু তখন আমি হয়েছিলাম বুড়ো, পাগলা। আচ্ছা এখন বুঝুক, পাগল কে। টাকাকড়ি, গয়নাগাঁটী যা ছিল, সব তো গিয়েছে, এবার আছে ভিটে। আমারও এবার ছ'শো টাকার দাবী। মোকদ্দামার ভাবনায় বুড়োকে যদি পাগল না করি, তবে আমার নাম পতিতপাবন দত্তই নয়।"

প্রতিহিংসার জ্বালায় পতিতপাবনের মুখখানা যেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। হরনাথ বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ভব সম্মুখে আসিয়া বলিল, "হাঁ মামা, এবার তো হরার বিয়ের চেষ্টা দেখলে হয়।"

সচকিতে কাগজের স্তূপ হইতে মুখ তুলিয়া একটু হাসিয়া পতিতপাবন বলিলেন, "ওর বিয়ের চেষ্টা আমাদের দেখতে হবে কেন ভব, কত মেয়ের বাপ ওকে মেয়ে দেবার তরে হাত ধরে ব'সে আছে। এই তো মাসখানেক আগেও সাতপুকুরের উমেশ সিং আমার হাতে ধ'রে অনুরোধ; দু'হাজার নগদ দিতে রাজী। আমি কিন্তু বলে দিয়েছি, চার হাজারের এক পয়সা কম হবে না।"

ভব বলিল, "তার কমে কি উকীল জামাই পাওয়া যায়? আমি কিন্তু একটি কথা ব'লে রাখি বাবু, হাজার লাখ আমি জানি না, মেয়েটি কিন্তু দেখতে শুনতে ভাল হওয়া চাই।"

মৃদু হাস্যসহকারে পতিতপাবন বলিলেন, "তাতো চাই-ই;—তোকে কি সে কথা ব'লে দিতে হবে ভব, আমারও যে নিজের গরজ আছে। হরনাথের বৌ এলে তাতে যে আমার আধা আধি ভাগ। (হরনাথের দিকে চাহিয়া) হাস্‌চো কি ভায়া, কলেজের খরচ জুগিয়েছি, চুল চিরে অর্দ্ধেক ভাগ না নিয়ে ছাড়ব নাকি।"

সহাস্যে ভব বলিল, "তা বৌমা এসে তোমার মাথার পাকা চুল তুলে তার শোধ দেবে মামা।"

পতিতপাবন বলিলেন, "শুধু তাই? তামাক সাজিয়ে, পা টিপিয়ে সুদ আসল সব শোধ নেব। তবে বুড়োর ভয়ে ও ছোকরা আবার বৌ নিয়ে না স'রে যায়।"

বলিয়া তিনি হরনাথের মুখের উপর হাস্যোজ্জ্বল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলে হরনাথ সলজ্জভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। ভব তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "উঠলি যে! বেরুবি নাকি?"

হরনাথ বলিল, "একটু ঘুরে আসি।"

ভব। তবে একটু জল খাবি আয়।

হর। এখন আর কি জল খাব?

ভব। তুই পিঠে ভালবাসিস্, খানকতক খাবি চল্।

উৎসাহিত ভাবে হরনাথ বলিল, "পিঠে করেছ নাকি মাসী মা? তা হ'লে খানকতক হ'লে তো চলবে না, পেট ভরেই খেতে হবে।"

বলিয়া সে ভবর আগেই গিয়া রান্নাঘরে ঢুকিল। পতিতপাবন কাগজপত্র গুছাইয়া বাঁধিয়া তুলিলেন। তারপর কিয়ৎক্ষণ গম্ভীরভাবে বসিয়া থাকিয়া ডাকিলেন, "ভবি!"

ভব উত্তর দিল, "কেন মামা?"

পতিতপাবন বলিলেন, "তোর আক্কেলটা কি রকম বল্ দেখি?"

ভব শঙ্কিতভাবে তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিল। পতিতপাবন তাহার দিকে চাহিয়া কৃত্রিম রোষগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ও ছোকরা উকীল হ'য়েছে ব'লে ওকে তাড়াতাড়ি ডেকে খেতে দিলি, কিন্তু এই বুড়ো বেটা কি কেউ নয়? বুড়ো হ'লে কি তার আর আদর যত্নের দরকার হয় না?"

ভব একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া হাসিয়া উঠিল; বলিল, "সর্ব্বরক্ষে! তুমি কি এখন খাবে মামা?"

মাথা নাড়িয়া পতিতপাবন বলিলেন, "খাই না খাই, একবার জিগেস্ করাও তো উচিত ছিল। নাঃ বুড়ো হ'য়েছি ব'লে এতটা হেনস্তা করা উচিত হয়নি ভবি।"

মৃদু হাসিয়া ভব বলিল, "ঘরের ছেলে চেয়ে খাবে, তার আবার মান অভিমান কি মামা?"

সহাস্যে পতিতপাবন বলিলেন, "ইঃ, বোয়ে গেছে আমার চেয়ে খেতে। কেন, ঘরের ছেলে ব'লে তার মান অভিমান কিছু নাই নাকি? এই আমি ব'লে যাচ্ছি ভবি, খাও খাও ব'লে অন্ততঃ পঞ্চাশবার না সাধলে আমি কখনো খাচ্চি না।"

বলিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন এবং হাসিতে হাসিতেই বাহির হইয়া গেলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

বাহিরে আসিয়া পতিতপাবন ডাকিলেন, "গোবরা, ওরে বেটা গোবরা!"

গোবর্দ্ধন তখন গোসেবায় নিযুক্ত ছিল, এবং অসভ্য গরুগুলাকে সভ্যতাবিরুদ্ধ ভাষায় সম্বোধন করিয়া তাহাদিগকে ভদ্রভাবে চলিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিতেছিল। এমন সময় প্রভুর নিতান্ত অভদ্রোচিত. সম্বোধনে বিরক্ত হইয়া গোশালার বাহিরে আসিল, এবং বিরক্তি সহকারেই প্রভুর আহ্বানে উত্তর দিল, "কেনে গা? গোবরা গোবরা ক'রে চেল্লাতে লেগেচো কিসের লেগে? গোবরা কি ঠ্যাংএর ওপর ঠ্যাং দিয়ে ব'সে আছে?"

হাস্যগম্ভীরস্বরে পতিতপাবন বলিলেন, "না না, গোবরা লম্বা লম্বা ঠ্যাং বাড়িয়ে আমার চোদ্দপুরুষের পিণ্ডী চট্‌কাচ্চে। তুই বেটা ব'সে থাকিস্ না তো করিস্ কি রে? আমার ঘরে কাজটা কি? ঐ তো তিনটে গরু।"

ক্রোধগম্ভীর মুখে গোবরা বলিল, "হাঁ গো, দেখতে তিনটে গরু, কিন্তু ও শালার গরু তিনটেতেই তিন গণ্ডা।"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া পতিতপাবন বলিলেন, "মর্, বেটা বাগ্দীর পুত, শালার গরু কা'কে বলে রে?"

ভারী মুখে গোবরা বলিল, "কা'কে বলে, কেনে বলে, অত শত জানিনে, কিন্তু সাধে বলি কি কত্তা, গরু তো নয়, যেন রাক্কোস; এই দিচ্চি এই নাই। তবু তুমি বলবে খেতে না পেয়ে গরুগুলো রোগা হ'য়ে যাচ্চে। যেমন তোমার গরু, তুমিও তেমনি হ'য়েছ কত্তা।"

তাহার এই নিতান্ত অজ্ঞোচিত উক্তিতে পতিতপাবন ক্রুদ্ধ হইলেন না, বরং হাসিয়া উঠিলেন হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "না, বেটা বাগ্দীর ছেলের বুদ্ধি আর হ'লো না।"

গোবরা বলিল, "সে একেরারে কাঠে খড়ে হবে। বুদ্ধিশুদ্ধি হ'লে কি গতর খাটিয়ে তোমার গাল শুন্‌বো?"

পতিত। তা না শুনিস্ না শুন্‌বি। এখন যা বলি শোন্ দেখি।

গোবরা। কি বল।

পতিত। একবার ছুটে গিয়ে রঘুঠাকুরকে ডেকে আন্ দেখি।

গোবরা। তা যাচ্চি, কিন্তু ছুটে যেতে পারবো না কত্তা। ছেলেবেলায় এক দমে এক কোশ রাস্তা ছুটে গিয়েছি, এখন বুড়ো মিন্‌সে কি ছুটতে পারি? দশ পা ছুটলেই হাঁপিয়ে পড়ি।

হাসিতে হাসিতে পতিতপাবন বলিলেন, "আচ্ছা আচ্ছা, তোকে ছুট্‌তে হবে না, তুই যেমন ক'রে পারিস্ যা।"

গোবরা। এক্ষুণি যেতে হবে?

পতিত। হাঁ এক্ষুণি। একেবারে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসবি, বুঝলি।

গোবরা। বুঝেছি কত্তা বুঝেছি। মুখ্যু সুখ্যু গরীব মানুষ ব'লে কি কথাটা পড়লেও বুঝতে পারি না? তা পারি। বলে—'পড়লে কথা বুঝতে নারে সেই বা কেমন পড়ুনী, ছিপ ফেললে মাছ খায় না সেই বা কেমন বঁড়শী।'

আপন মনে গজ্‌ গজ্‌ করিতে করিতে গোবরা প্রস্থান করিল এবং যাইতে যাইতে ভদ্র লোকেরা যে ছোট লোকগুলাকে একেবারেই নির্ব্বোধ মনে করিয়া তাহাদের উপর নিতান্ত অন্যায় অবিচার করে ইহাই ব্যক্ত করিতে লাগিল। পতিতপাবন বৈঠখানার ভিতর হইতে জলচৌকীটা আনিয়া রোয়াকের একপাশে পাতিয়া বসিলেন। সেখান হইতে অস্তগামী সূর্য্যের সুবর্ণ কিরণধারায় রঞ্জিত পশ্চিমাকাশের কিয়দংশ 'গাছের ফাঁক দিয়া দৃষ্টিগোচর হইতেছিল, এবং সেই রক্তিমামণ্ডিত আকাশতলে যে একখণ্ড ক্ষুদ্র কৃষ্ণ মেঘ আশার মধ্যে নৈরাশ্যের মত, সুখসুপ্তির মাঝে দুঃস্বপ্নের ছায়ার মত ভাসিয়া উঠিয়াছিল তাহারই দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন।

নরহরির নামে বন্ধকী কোবালার নালিশ রুজু করিয়া আসিয়া পতিতপাবন মনে করিয়াছিলেন যে, এইবার তাঁহার প্রতিশোধস্পৃহা চরম সার্থকতা লাভ করিবে সুতরাং স্বীয় চেষ্টার সার্থকতা অনুভব করিয়া এইবার তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন বলিয়া ভাবিয়াছিলেন। কিন্তু নরহরিকে শমন ধরাইয়া ফিরিয়া আসিবার সময় বহির্দ্বারের উপর দণ্ডায়মান গৌরীকে দেখিবামাত্র তাঁহার সে ধারণা যেন সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইয়া গেল। যে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য তিনি দয়া ধর্ম্ম মনুষ্যত্বকে পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হন নাই, সেই চরিতার্থতার মধ্যে বিন্দুমাত্র সার্থকতা—কণামাত্র তৃপ্তি দেখিতে পাইলেন না; একটা কঠোর-নিষ্ফলতা—বিষম অতৃপ্তি আসিয়া তাঁহার সকল আশা—সকল উৎসাহ বিপর্য্যস্ত করিয়া দিল। মনের ভিতর তীব্র নৈরাশ্য লইয়া পতিতপাবন ফিরিয়া আসিলেন।

ওঃ, কি ফল হইল তাঁহার এত চেষ্টায়, এত পরিশ্রমে! জীবনটা তো সেই মরুভূমিই রহিয়া গেল, বরং নৈরাশ্যের তীব্র জ্বালা আসিয়া তাহার কঠোরতাকে আরও প্রচণ্ড—আরও দুঃসহ করিয়া তুলিল। আর সংসারের সুখশান্তি উপহাসের অট্টহাসি হাসিয়া মরীচিকার মত যে দূরে সেই দূরেই রহিয়া গেল। লাভের মধ্যে দুগ্ধ মরুভূমির মধ্য দিয়া ছুটাছুটিই সার হইল। এই অসার উদ্যম—নিষ্ফল চেষ্টা পতিতপাবনের মনে এমনই একটা অবসাদ আনিয়া দিল যে, মামলা মোকদ্দমা, জয় পরাজয় সকল জলাঞ্জলি দিয়া তিনি ছুটিয়া কোন চেষ্টাশূন্য প্রতিশোধস্পৃহাবিহীন নির্জ্জন স্থানে পালাইয়া যান। আর কেন এই সংসারবন্ধন! আর কেন এই মায়ার ছলনা—আশা নিরাশার প্রবল দ্বন্দ্ব! স্থির দৃষ্টিতে গোধূলির ম্লান আলোকমণ্ডিত আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া পতিতপাবন যেন সেই নিরাপদ স্থানের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

আকাশের রক্তিমচ্ছটা অন্ধকারের আবরণে মিলাইয়া আসিল, ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইয়া পশ্চিম আকাশ ঢাকিয়া ফেলিল; দিনের তপ্ত বাতাস মেঘের শৈত্য লইয়া অপেক্ষা অধীরগতিতে প্রবাহিত হইল। পতিতপাবনের কিন্তু কোন দিকেই লক্ষ্য রহিল না; তিনি অন্ধকার আকাশ প্রান্তে স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন।

রঘুরাম আসিয়া বলিল, "এই যে দত্তমশাই, বুঝেছেন কিনা আপনি নাকি ডেকেছেন?"

আকাশপ্রান্ত হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া গম্ভীর স্বরে পতিতপাবন বলিলেন, "হাঁ, ব'সো।"

কাছেই একখানা মাদুর পড়িয়াছিল; তাহার উপর বসিয়া রঘুরাম বলিল, "আমিও বুঝেছেন কিনা, আজ দু'বার আপনাকে খুঁজে গিয়েছি।"

পতিতপাবন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

রঘুরাম বলিল, "সুবি আজ বুঝেছেন কিনা, চৌধুরীদের বাড়ী গিয়েছিলে। তা চৌধুরীমশায় বুঝেছেন কিনা, তাকে নাকি বলেছে—আমাকে বুঝেছেন কিনা, আদালতে দাঁড় করাবে।"

পতিতপাবন বলিলেন, "আদালতে তো তোমাকে দাঁড়াতেই হবে। চৌধুরী না করুক, আমি তো তোমাকে আদালতে দাঁড়াবার জন্যেই ডেকেছি।"

ভীতিপূর্ণ স্বরে রঘুরাম বলিয়া উঠিল, "এ্যাঁ, আমাকে বুঝেছেন কিনা, আমাকে আদালতে দাঁড়াতে হবে?"

পতিত। শুধু দাঁড়ালেই হবে না, সাক্ষী দিতে হবে। তুমি হচ্ছো এই মামলার প্রধান সাক্ষী।

রঘু। আমি কিন্তু বুঝেছেন কিনা, সাক্ষী-টাক্ষী দিতে পারবো না। আমি বামুনের ছেলে হ'য়ে বুঝেছেন কিনা, আদালতে দাঁড়িয়ে হলপ নিয়ে বুঝেছেন কিনা—"

ক্রুদ্ধভাবে পতিতপাবন বলিলেন, "বুঝেছি। বামুনের ছেলে গাঁজায় দম দিয়ে বেড়াতে পার, একবার সুদ আসল বুঝে পেয়ে আবার টাকার লোভে কওলা বেচে ফেলতে পার, আর আদালতে গিয়ে সাক্ষী দিতে পার না?"

ভীতিবিবর্ণ মুখে রঘুরাম বলিল, "টাকা বুঝেছেন কিনা, সুবি বলেছে, ঘটী বাটি বেচে আপনার তের টাকা ফেলে দেব।"

ধমক দিয়া পতিতপাবন বলিলেন, "তের টাকা কিসের? সুদে আসলে সাড়ে চারশো টাকা বুঝে পেয়ে

কওলা বেচেছ, সে টাকা ফেরৎ দিতে পারবে? আর টাকা ফেরৎ দিলেও তো লেখা ফিরবে না। সাক্ষী তোমাকে দিতেই হবে।"

একটু ভাবিয়া মুখে কতকটা সাহসের ভাব আনিয়া রঘুরাম বলিল "যদি সাক্ষী না দিই?"

"একবার টাকা সব পেয়েও ফাঁকি দিয়ে আমার কাছ থেকে টাকা নিয়েছ—প্রবঞ্চনার অপরাধে তোমাকে জেলে যেতে হবে।"

ভয়ে রঘুরামের মুখ শুকাইয়া গেল। ভ্রুকুটি ভঙ্গীতে তাহার ভীতিকে আরও বর্দ্ধিত করিয়া পতিত পাবন বলিলেন, "আমাকে চেন তো? আমার নাম পতিতপাবন দত্ত। আমি দিনকে রাত—রাতকে দিন কত্তে পারি।"

রঘুরাম বসিয়াছিল, কাঁদ কাঁদ মুখে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং পতিতপাবনের একটা হাত ধরিয়া কাতরতার সহিত বলিল, "দোহাই দত্তমশাই, বুঝেছেন কিনা, গরীব বামুন আমি—"

হাতটা সজোরে ছিনাইয়া লইয়া রোষ বিকৃত কণ্ঠে পতিতপাবন বলিলেন, "ও সব বামনাই আমার কাছে খাটবে না। সাক্ষী দেবে কিনা তাই বল।"

রঘুরাম কাঁদিয়া ফেলিল। পতিতপাবন তখন অপেক্ষাকৃত কোমল স্বরে বলিলেন, "আমি যা বলি শোনো, তাতে তোমার ভালই হবে। শুধু মেয়েমানুষের মত কাঁদলে কোন ফল হবে না।"

অগত্যা রঘুরামকে বসিতে এবং স্থির হইয়া পতিতপাবনের আদেশ স্বরূপ উপদেশ শুনিতে হইল। পতিতপাবন তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, সাক্ষী দেওয়ায় তাহার লাভ ভিন্ন ক্ষতি কিছুই নাই। পতিতপাবনের স্কন্ধে ভর দিয়া চব্য চোষ্য খাইবে, অথচ, খোরাকীর পয়সা এবং যাতায়াতের ন্যায্য খরচ পাইবে। তা ছাড়া দত্তজা খুসী হইয়া তাহাকে টাকাটা সিকিটা দিতেও পারেন। ইহার প্রতিদানে সে শুধু আদালতে দাঁড়াইয়া তাঁহার সপক্ষে দুই চারিটা কথা বলিয়া আসিবে মাত্র এবং তাহা বলিলেই যে তাহার ব্রহ্মত্ব লোপ পাইবে এরূপ কোন সম্ভাবনাই নাই।

রঘুরাম বলিল, "কিন্তু হলপ নিয়ে মিছে কথা বলতে হবে তো?"

পতিতপাবন বলিলেন, "মিছে কেন, টাকা নিয়ে তুমি আমাকে দলীল বেচেছ এ তো সত্য কথা। এই কথাই বলবে।"

রঘু। কিন্তু চৌধুরীমশায় তো বুঝেছেন কিনা, টাকা সব মিটিয়ে দিয়েছে।

পতিত। সে তো তোমার হাতে দেয় নি, তোমার বাপের হাতে দিয়েছে। আর দিয়েছে কিনা তুমি তার কি জান? তুমি টাকা দিতে দেখেছ?

রঘু। না।

পতিত। ব্যস্, তবে তোমার মিথ্যা কথা হ'লো কিসে? তুমি তো নিজে টাকা নিয়ে পাই নাই ব'লছো না।

রঘুনাথও বুঝিল, কথাটা ঠিক। সুতরাং সে সাক্ষ্য দিতে স্বীকৃত হইয়া বিদায় গ্রহণ করিল। তাহাকে বিদায় দিয়া পতিতপাবন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকারে ধরণী ক্রমে আচ্ছন্ন হইয়া আসিল; গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি উত্থিত হইয়া পল্লী মুখরিত করিতে লাগিল। পতিতপাবন চমকিত ভাবে উঠিয়া পড়িলেন, এবং বৈঠকখানার ভিতর হইতে হরিনামের মালা আনিয়া পুনরায় চৌকীর উপর বসিলেন।

এমন সময় হরনাথ জামা কাপড় পরিয়া বাহির হইল। পতিতপাবন জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন সময় কোথায় চলেছ?"

হরনাথ বলিল, "চৌধুরীদের বাড়ীতে।"

"এমন সময়?"

"গৌরীকে দেখতে জনকতক ভদ্রলোকের আসবার কথা আছে। তাই দাদামশায় যেতে বলেছেন।"

পতিতপাবন আর কিছু বলিলেন না দেখিয়া হরনাথ ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে চলিয়া গেল। পতিতপাবন ক্ষিপ্রহস্তে মালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে মুখে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

একাদশ পরিচ্ছেদ

সাক্ষ্য দিতে স্বীকৃত হইয়া রঘুরাম বাড়ী ফিরিল বটে, কিন্তু তাহার মনটা যেন কেমন কেমন করিতে লাগিল। সে গাঁজা খাইয়া বেড়াইত বটে, এবং গাঁজার পয়সার টানাটানি হইলে ব্রাহ্মণত্বের দোহাই দিয়া লোকের কাছে দুইটা পয়সা ভিক্ষা করিতেও কুণ্ঠিত হইত না; কিন্তু ধর্ম্মাধিকরণে তাঁমা তুলসী গঙ্গাজল হাতে হলপ লইয়া সাক্ষ্য দিতে তাহার মনটা যেন নিতান্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল, এবং ইহাতে শুধু চতুর্দ্দশ পুরুষের নরকস্থ হইবার আশঙ্কায় ভীত হইল

না, যে ব্রাহ্মণত্বের গর্ব্বে স্ফীত হইয়া ভিক্ষাবৃত্তির মধ্যেও গৌরব বোধ করিত, সেই ব্রাহ্মণত্বের মর্য্যাদাও ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িবে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিল। বুঝিয়া সে অন্তরে যেন নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

বাড়ী ফিরিয়া সে প্রথমতঃ ভগ্নীর উপর তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল। কেন না সুভদ্রাই তো যত নষ্টের মূল। রঘুনাথ তো প্রথমে লিখিতে অস্বীকারই করিয়াছিল, শেষে সুভদ্রার জোর জবরদস্তিতেই লিখিতে বাধ্য হইয়াছিল। এমন কি সুভদ্রা পরের বাড়ী হইতে দোযাত কলম পর্য্যন্ত চাহিয়া আনিয়াছিল। কাজেই সুভদ্রার ঘাড়ে দোষের ভার সম্পূর্ণ চাপাইযা দিযা যাহা মুখে আসিল তাহাই ব'লিয়া ভগ্নীকে তিরস্কার করিতে লাগিল। সুভদ্রাও চুপ করিযা থাকিল না; সেও পিতার সর্ব্বস্ব নষ্টকারী নির্ব্বোধ ভাইকে বেশ দশ কথা শুনাইযা দিল এবং তাহাতেও যখন ভ্রাতার তিরস্কারের প্রত্যুত্তর যথেষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারিল না, তখন চোখের জল ঢালিয়া স্বর্গীয় মাতাপিতা ও হতভাগ্য স্বামীকে স্মরণপূর্ব্বক আক্ষেপ প্রকাশ করিতে থাকিল।

রঘুরাম কিন্তু তাহার এই সকরুণ আক্ষেপে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না, সে ক্রন্দননিরতা ভগ্নীকে চুলো নামক এক অজ্ঞাত স্থানে যাইবার জন্য আদেশ দিয়া, গাঁজা এক ছিলিম ট্যাঁকে গুঁজিয়া নফর নন্দীর বাড়ীতে উপস্থিত হইল, এবং গাঁজায় জোর দম দিয়া মনঃক্ষোভ নিবারণে চেষ্টিত হইল।

মনের ক্ষোভ কিন্তু দূর হইল না। রাত্রে ঘুমাইতে ঘুমাইতেও উকীল মোক্তার পরিবৃত আদালতের ভীষণ দৃশ্য স্বপ্নে দর্শন করিযা চমকিয়া উঠিতে লাগিল। তারপর সকালে উঠিযাই নরহরি চৌধুরীর নিকট উপস্থিত হইল। সে জানিত, একদিকে যেমন পতিতপাবন দত্ত অন্যদিকে তেমনই নরহরি চৌধুরী। মামলাবাজিতে চৌধুরীমশায় পতিতপাবন দত্তের সমকক্ষ না হইলেও মামলা মোকদ্দমার সলা পরামর্শে তিনিও বড় কম নহেন। সুতরাং তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়া সত্য স্বীকার পূর্ব্বক এ অবস্থায় কর্ত্তব্য কি জানিয়া লওযা রঘুরাম শ্রেযঃ বোধ করিল।

বিচারকের সম্মুখে অপরাধীর মত স্বীয় অপরাধের কথা ব্যক্ত করিয়া রঘুরাম পরামর্শ চাহিল। নরহরি সকল শুনিয়া একটু ভাবিয়া বলিলেন, "যখন নিজের হাতে লিখে দিয়েছ, তখন তোমাকে সাক্ষী দিতে হবে।"

রঘুরাম বলিল, "কিন্তু আদালতে হলপ নিয়ে মিথ্যা সাক্ষী দিলে চোদ্দপুরুষ নরকে যাবে যে।"

নরহরি বলিলেন, "কিন্তু সত্য কথা বললে তোমার সাজা হবে তা জান?"

রঘু। ঐ তো একটা মস্ত ভয।

নর। কাজেই মিথ্যা সাক্ষী না দিলে তোমার গতি নাই।

রঘু। আপনি কি তাই কত্তে যুক্তি দেন?

নর। কাজেই।

রঘু। কিন্তু তাতে তো আপনার সর্ব্বনাশ।

নর। আমার সর্ব্বনাশ হ'য়েই আছে, কিন্তু সে জন্য নিরীহ ব্রাহ্মণ তুমি পতিতপাবনের কোপে পড়ো না।

রঘুরাম বসিয়া ভাবিতে লাগিল। কিছুক্ষণ ভাবিযা বলিল, "কিন্তু আমি যদি সাক্ষী না দিই?"

নর। সে তোমার খুসী, কিন্তু পতিতপাবন তোমাকে ছাড়বে কি?

মাথা নাড়িযা রঘুরাম বলিল, "সহজে ছাড়বে না। তবে আমিও সহজে যাচ্চি না চৌধুরীমশায।"

সাক্ষ্যদানে রঘুরামের একান্ত অনিচ্ছা দেখিযা নরহরি চিন্তিত হইলেন। চিন্তা নিজের জন্য নয়, এই নিরীহ ব্রাহ্মণের জন্য। রঘুরাম যে না বুঝিযাই এবং পতিতপাবনের প্রলোভনে ভুলিযাই কাজটা করিযা ফেলিযাছে, সে বিষয়ে নরহরির বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কেন না যে খত তমশুক পোড়াইযা ফেলিযা নিজের প্রাপ্য গণ্ডা আদাযের পথ রুদ্ধ করিযা দিতে পারে, তাহার মনে যে কূটবুদ্ধি স্থান পাইতে পারে এমন বিশ্বাস অতি বড় নির্ব্বোধেও করিতে পারে না। সুতরাং যাহা কিছু হইযাছে, সেটা পতিতপাবনেরই কৌশলে ঘটিযাছে। এখন রঘুরাম যদি তাহার সপক্ষে সাক্ষ্য না দেয, তাহা হইলে পতিতপাবন তাহাকে উদ্বাস্ত না করিয়াই ছাড়িবে না। ব্রাহ্মণ বলিয়া যে তাহাকে ক্ষমা করিবে, পতিতপাবন দত্ত সে পাত্রই নয। ব্রাহ্মণের পরিণাম চিন্তা করিযা নরহরি ব্যাকুল হইযা পড়িলেন।

নরহরি তাহাকে অনেক বুঝাইলেন, অনেক ভয় দেখাইলেন, অনেক উপদেশ প্রদান করিলেন। তাঁহার কথায রঘুরাম বুঝিতে পারিল যে, সাক্ষ্য দিলে বাস্তবিক কোন দোষ হইতে পারে না, বরং না দিলেই তাহার গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা। তখন সে আদালতে উপস্থিতির ভীতি পরিহার করিয়া সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত হইল এবং দাঁও বুঝিয়া পতিতপাবনের নিকট হইতে

অন্ততঃ একমাসের গাঁজার খরচটা আদায় করিয়া লইয়া তবে সম্মতি দিবে ইহা মনে মনে স্থির করিয়া লইল।

কথা কহিতে কহিতে বেলা অনেকটা হইয়া গিয়াছিল। নরহরি স্নান করিতে চলিয়া গেলেন। রঘুরামও উঠিয়া চিন্তিত মনে গৃহাভিমুখে চলিল। কিন্তু চৌধুরীদের বাড়ীর সীমানা পার না হইতেই সহসা কে ডাকিল, "ও ঠাকুর!"

পাশেই একটা ছোট ফুলবাগান। সেই ফুলবাগান হইতেই মৃদু কোমল কণ্ঠে আহ্বানটা আসিয়াছিল। রঘুরাম কিন্তু তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে বাগান হইতে অনুচ্চ হাস্যধ্বনি উত্থিত হইতেই রঘুরাম অপ্রতিভ ভাবে চাহিয়া দেখিল আহ্বানকারিণী আর কেহ নহে, নরহরির পৌত্রী গৌরী। গৌরী স্নানান্তে শুদ্ধ বস্ত্রে দেহ আবৃত করিয়া দাদামশায়ের পূজার জন্য পুষ্প চয়ন করিতেছিল; ভিজা চুলের রাশিতে পৃষ্ঠদেশ ঢাকিয়া গিয়াছিল, সেই কৃষ্ণকেশরাশির পাশে স্নানশুদ্ধ মুখখানা পল্লব পার্শ্বে ফুটন্ত ফুলের স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছিল। সেই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে বিমণ্ডিত মুখের দিকে চাহিয়া রঘুরাম মুগ্ধ দৃষ্টি সহসা ফিরাইয়া লইতে পারিল না।

গৌরী জিজ্ঞাসা করিল, "দলীল বেচে কত টাকা পেয়েছ ঠাকুর?"

নতমুখে রঘুরাম উত্তর দিল, "বেশী নয় তেরো টাকা।"

তীব্র কণ্ঠে গৌরী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "আর ক' টাকা বেশী পেলে মানুষের গলায় ছুরী দিতে পার?"

লজ্জায় রঘুরাম মাথা তুলিতে পারিল না, সে নত মস্তকে দাঁড়াইয়া হাতে হাত ঘষিতে লাগিল। গৌরী তীব্র কণ্ঠটাকে আরও একটু তীব্র করিয়া বলিল, "একবার দলীলের সব টাকা বুঝে পেয়ে আবার সেটাকে বেচতে তোমার লজ্জা হ'লো না? বামুনের ছেলে—ধর্ম্মভয়ও কি একটু নাই?"

লজ্জাবিজড়িত স্বরে রঘুরাম বলিল, "আমি তখন বুঝতে পারি নাই।"

"এখন বুঝেছ কি?"

"বুঝেছি।"

"এখন কি করবে তা হ'লে?"

"তাই জানতেই চৌধুরী মশায়ের কাছে এসেছিলাম।"

বলিয়া সে ধীরে ধীরে চৌধুরী মহাশয়ের নিকট আসিবার কারণ বিবৃত করিল। শুনিয়া গৌরী জিজ্ঞাসা করিল, দাদামশায় কি বললেন?"

রঘু। উনি তো মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে আসতেই পরামর্শ দিলেন।

গৌরী। এমন অন্যায় পরামর্শ দিলেন উনি?

রঘু। হাঁ, কাজেই ওঁকে অন্যায় পরামর্শ দিতে হ'লো। নয় তো দত্ত মশায় আমাকে বিপদে ফেলবে।

চিন্তামলিন মুখে গৌরী বলিল, "কিন্তু দাদামশায় এতে কি রকম বিপদে পড়বে জান? দেনার দায়ে ওঁর মাথা গুঁজে দাঁড়াবার ঠাঁইটুকুও থাকবে না।"

রঘুরাম বলিল, "তা জেনেও শুধু আমাকে বাঁচাবার তরে উনি এই রকম পরামর্শ দিয়েছেন।"

দাদামহাশয়ের স্বার্থত্যাগের মাহাত্ম্যস্মরণে গৌরীর চিন্তামলিন মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; উৎফুল্ল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমার দাদামশায় দেবতা।"

রঘুরাম তাহার হর্ষপ্রফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গৌরী বলিল, "তাঁর কর্ত্তব্য তিনি করেছেন। এখন তোমার কর্ত্তব্য যা, তুমি তাই করবে।"

চিন্তিতভাবে রঘুরাম বলিল, "আমি আর কি করবো?"

গৌরী তিরস্কার-কঠোর স্বরে বলিল, "তুমি কি করবে তা তুমিই জান। তুমি ব্রাহ্মণ উনি শূদ্র; শূদ্র হ'য়ে উনি যে রকম স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন, ব্রাহ্মণ হ'য়ে তুমি তার চেয়ে বেশী না হোক, অন্ততঃ সেই রকম দৃষ্টান্তও কি দেখাতে পার না?"

কথাটা বেশ বুঝিতে না পারিয়া রঘুরাম তাহার মুখের দিকে আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে চাহিয়া রহিল। গৌরী বলিল, "দাদামশায় ভেবেছেন, একজন ব্রাহ্মণকে বাঁচাতে গিয়ে যদি গাছতলায় দাঁড়াতে হয় সেও ভাল। কিন্তু তুমি কি মনে কর, এই বয়সে ওঁর শোকে তাপে জর জর বুকখানা এত বড় আঘাত আর সইতে পারবে? বুড়ো বয়সে বাড়ী ছেড়ে রাস্তায় দাঁড়াতে হ'লে উনি কি আর এক দণ্ডও বাঁচবেন?"

গৌরীর স্বর গাঢ়—চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া আসিল। তাহার সেই অশ্রুকাতর স্বরে রঘুরামের অন্তরটা যেন বিচলিত হইয়া আসিল। গৌরীর এই কথাগুলা যে তাহার উপর প্রযুক্ত তিরস্কার ইহা তাহার মনে হইল না, সংসারের একমাত্র অবলম্বন বৃদ্ধ দাদামশায়কে বাঁচাইবার জন্য যেন সকাতর প্রার্থনা বলিয়াই বোধ হইল। এই সকরুণ প্রার্থনার উত্তরে

সে কি বলিবে তাহা সহসা স্থির করিতে পারিল না। বলিবার অবসরও হইল না; সহসা স্নেহমধুরকণ্ঠে কে ডাকিল, "গৌরি!"

উভয়েই চমকিত ভাবে ফিরিয়া চাহিল, এবং অদূরে পতিতপাবনকে দণ্ডায়মান দেখিয়া রঘুরাম শিহরিয়া উঠিল। সে আর ক্ষণমাত্র সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না; পাশের রাস্তা দিয়া দ্রুতপদবিক্ষেপে পলায়ন করিল।

পতিতপাবন ধীরে ধীরে বাগানের বেড়ার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফুল তুলচো গৌরি?"

গৌরী নিরুত্তরে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। পতিতপাবন ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "গাঁজাখোর বামুনটার সঙ্গে কি এত কথা হচ্ছিল তোমার?"

ক্রুদ্ধা ফণিনীর ন্যায় মস্তক উত্তোলন করিয়া সদর্প কণ্ঠে গৌরী বলিল, "তুমি শত্রু, তোমাকে সে কথা বল্‌তে যাব কেন?"

সহাস্যে পতিতপাবন বলিলেন, "তুমি না বললেও আমি বুঝেছি। বামুন যাতে মোকদ্দমায় সাক্ষী না দেয়, সেই জন্য অনুরোধ কচ্ছিলে। কেমন, ঠিক কি না?"

জোর গলায় গৌরী উত্তর দিল, "হাঁ।"

পতিতপাবন বলিলেন, "কিন্তু মিছে অনুরোধ কত্তে গিয়েছ গৌরি, বামুন সাক্ষী না দিলেও মামলায় আমি নিশ্চয়ই ডিক্রী পাব।"

শ্লেষকঠোর স্বরে গৌরী বলিল, "ডিক্রী পেয়ে বুঝি আমাদের ঘর ভেঙে তাড়িয়ে দেবে?"

সহাস্যে পতিতপাবন বলিলেন, "ঘর ভেঙ্গে তাড়াতে পারি, কিন্তু তা আমি করবো না।"

ব্যগ্রস্বরে গৌরী জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি করবে?"

পতিতপাবন বলিলেন, "ডিক্রীজারি ক'রে নীলামে তোমাকে ডেকে নেব।"

বলিয়া তিনি উচ্চশব্দে হাসিয়া উঠিলেন। গৌরী তাঁহার মুখের উপর জলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দ্রুতপদে বাগান হইতে বাহির হইয়া গেল। পতিতপাবনও ফিরিয়া নিজের গন্তব্য পথ ধরিলেন।

অল্প দূর যাইতেই নরহরির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। নরহরি স্নান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শতনাম গান করিতে করিতে আসিতেছিলেন। পতিতপাবনকে দেখিয়া তিনি দাঁড়াইলেন; সহাস্য মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় গিয়েছিলে ভায়া?"

পতিতপাবন বলিলেন, "গিয়েছিলাম মামলার দু'একটা সাক্ষীর যোগাড় কত্তে।"

নর। যোগাড় হ'লো?

পতিত। কতকটা হ'লো বৈকি। মিথ্যা সাক্ষী দিতে সহজে কি কেউ চায় দাদা?

"তা তো বটেই" বলিয়া নরহরি একটু হাসিলেন। পতিতপাবন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল না গৌরীকে দেখতে এয়েছিল?"

নর। হাঁ।

পতিত। ঠিক হ'য়ে গেল?

নর। অনেকটা। তবে যতক্ষণ না চার হাত এক হয় ততক্ষণ বলা যায় না। কাল পাত্র আশীর্ব্বাদ কত্তে যাব।

পতিত। বিয়েটা তা হ'লে এই মাসের ভিতরেই হচ্চে?

নর। ইচ্ছা তো তাই, তারপর বিধাতার ভবিতব্য।

"সে কথা যথার্থ" বলিয়া পতিতপাবন তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া হাতের ছড়িটা ঘুরাইতে ঘুরাইতে চলিয়া গেলেন। নরহরি পুনরায় "ননীচোরা নাম রাখে যতেক গোপিনী" উচ্চারণ করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বিধাতার ভবিতব্যতা স্বীকার করিলেও নরহরি কিন্তু বিধাতার অলক্ষ্য চেষ্টার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন না, নিজেও রীতিমত চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার সেই চেষ্টাটা এতই প্রবল হইয়া উঠিল যে, তদ্দর্শনে অনেকেই বিস্ময়াপন্ন না হইয়া থাকিতে পারিল না। অন্নপূর্ণা কিন্তু ইহাতে একটুও বিস্ময় অনুভব করিল না; সে বুঝিতে পারিল যে, বৃদ্ধ এত দিনের নিশ্চেষ্টতার প্রায়শ্চিত্ত এই কয়দিনে করিয়া ফেলিবার জন্য উৎসুক হইয়া পড়িয়াছে।

নরহরি কিন্তু নিশ্চেষ্টতার প্রায়শ্চিত্তের জন্য আদৌ উৎকণ্ঠিত ছিলেন না, পতিতপাবন যে বন্ধকী কোবালার মামলা রুজু করিয়াছিলেন, সেই মামলার আশঙ্কাই তাঁহাকে উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছিল। মামলা যখন রুজু হইয়াছে, তখন সহজে তাহার নিষ্পত্তির সম্ভাবনা নাই, এবং মিথ্যা হইলেও তাহার মিথ্যাত্ব প্রমাণ করা সহজসাধ্য হইবে না। হয় তো এই মিথ্যাই শেষে সত্যরূপে প্রমাণিত হইয়া ডিক্রীর দায়ে তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া দিবে। তখন গৌরীর বিবাহ দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া উঠিবে; সুতরাং তাহার আগেই

গৌরীকে পাত্রস্থ করিয়া একটা দিকে নিশ্চিন্ত হইবার জন্য যেন উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন।

অনেক চেষ্টার পর একটি পাত্র জুটিয়াছিল। দ্বিতীয় পক্ষ হইলেও পাত্রের বয়স বেশী নয়, ত্রিশের এদিকে; লেখাপড়ায় ধুরন্ধর না হইলেও মূর্খ নয়, জমিজমাও কিছু আছে। টাকাতেও কম—নগদ তিন শত, আর গহনা-পত্র কিছু কিছু দিতে হইবে। মোটের উপর ছয় শত টাকা খরচ পড়িবে। নরহরি স্থির করিলেন, তিন বিঘা জমি বিক্রয় করিয়া এই টাকা সংগ্রহ করিবেন, এবং যত শীঘ্র পারেন কাজটা শেষ করিয়া তারপর পতিতপাবনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন।

এই সঙ্কল্প লইয়া নরহরি বিবাহের উদ্যোগে ব্যস্ত হইলেন। পাত্র-পাত্রী উভয় পক্ষে আশীর্ব্বাদের পর বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল। নরহরি জমির ক্রেতা খুঁজিতে লাগিলেন। ক্রেতার অভাব হইল না, অনেকেই তাঁহাকে আশা দিল। কিন্তু কার্য্যকালে যখন সকলেই একে একে পিছাইয়া পড়িতে লাগিল, তখন নরহরি বিপন্ন হইয়া যেন অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন।

ক্রেতাদের এইরূপ পিছাইয়া পড়িবার কারণ ছিল। পতিতপাবন যখন শুনিলেন যে, নরহরি গৌরীর বিবাহের দিন পর্য্যন্ত স্থির করিয়া জমি বিক্রয়ের দ্বারা অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন, তখন তিনি ক্রেতাদিগকে সাবধান করিয়া জানাইয়া দিলেন যে, নরহরি চৌধুরী দশ বৎসর আগে এই সকল জমি বন্ধক দিয়া যে টাকা লইয়াছিলেন, সেই বন্ধকী কোবালার মামলা রুজু হইয়াছে, সুতরাং সকলে বিশেষ বিবেচনা করিয়া জমি খরিদ করিবে। নতুবা শেষে বিবাদের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

ঘরের পয়সা দিয়া জমি কিনিয়া কেহই পতিতপাবন দত্তের সহিত সম্ভাবিত বিবাদে অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। সকলেই স্পষ্ট বাক্যে নরহরিকে জানাইয়া দিল যে, "আগে বন্ধকী কোবালার একটা হেস্ত নেস্ত না হ'লে ঘরের কড়ি দিয়ে কে রাস্তার ঝগড়া টেনে আনবে।" নরহরি প্রমাদ গণিলেন। তাঁহার কথায় বন্ধকী কোবালাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অপ্রামাণিক বলিয়া বুঝিলেও বিবাদটা যে সুনিশ্চিত সত্য সে সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ মাত্র রহিল না। কাজেই নরহরি সহজে খরিদদার পাইলেন না।

কিন্তু সস্তায় পাইলে বিবাদী জিনিষের কথা দূরে থাক, চোরাই মাল পর্য্যন্ত খরিদ করিতে কুণ্ঠিত হয় না এমন লোকও অনেক আছে। তেমনই একজন ক্রেতা পাঁচ বিঘা জমি লইয়া তিন বিঘা জমির দাম দিতে সম্মত হইল। নরহরিকেও অগত্যা তাহাতেই রাজি হইতে হইল। দরদস্তুর ঠিক হইয়া গেল, ষ্ট্যাম্প কাগজে লেখাপড়া হইল; বাকী রহিল কেবল রেজেষ্টারী। রেজেষ্টারী করিয়া দিয়া নরহরি টাকা লইবেন স্থির হইল। পতিতপাবন ইহা শুনিলেন; শুনিয়া তিনি মোকদ্দমার আগেই বিবাদীয় সম্পত্তি হস্তান্তর হইবার আশঙ্কা জানাইয়া ক্রোকী পরোয়ানার জন্য হাকিমের নিকট প্রার্থনা করিলেন। নরহরি কিন্তু এ সংবাদ পাইলেন না; তিনি গৌরীর বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

বিবাহের দিন যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, পতিতপাবনের উদ্যোগ ততই যেন বাড়িয়া উঠিতে থাকিল। বিবাহটা তিনি কি কিছুতেই বন্ধ করিতে পারিবেন না? হাকিম কি তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিবেন না? প্রার্থনা যদি মঞ্জুর হয়, তাহা হইলে সদ্যঃ ক্রোকের পরোয়ানা বাহির করিয়া জমিগুলার উপর ক্রোক দিতে—নরহরির টাকা পাইবার পথ রুদ্ধ করিতে হইবে। টাকা না পাইলে বিবাহও বন্ধ হইয়া যাইবে। আর এইবার বিবাহটা বন্ধ করিতে পারিলেই নরহরি আর যে গৌরীর বিবাহ দিতে পারিবে এমন বোধ হয় না। তাহা হইলেই উহার অহঙ্কারের রীতিমত প্রতিশোধ হইবে। ওঃ এত বড় অহঙ্কার! নাতনীর গলায় কলসী বাঁধিয়া জলে ফেলিয়া দিবে, তথাপি পতিতপাবন দত্তের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিবে না। পতিতপাবন এতই হীন—এমনই অপদার্থ! এত মামলা মোকদ্দমাতেও কিছু হইল না, কিন্তু এবার সে বুঝিতে পারিবে, পতিতপাবন দত্ত কে—তাহার ক্ষমতা কত। এবার সত্য সত্যই তাহাকে নাতনীর গলায় কলসী বাঁধিয়া জলে ফেলিতে হয় কি না তাহাই দেখা যাইবে। এখন একবার ক্রোকের হুকুমটা পাইলে হয়। তখন শুধু জমি নয়, ঢোল পিটিয়া গ্রামশুদ্ধ লোককে জানাইয়া উহার বাড়ীখানার উপরেও ক্রোক দিতে হইবে। তাহা হইলেই দলাদলির প্রতিশোধ, শনীর ঘরে আগুন দেওয়ার প্রতিশোধ, বিবাহের প্রার্থনায় প্রত্যাখ্যান করিবার প্রতিশোধ, মামলায় জিতিয়া ভোজ দিয়া সেই ভোজে খাওয়াইবার প্রতিশোধ—সব প্রতিশোধগুলা এক সঙ্গেই শেষ হইয়া যাইবে।

কিন্তু প্রার্থনা যদি নামঞ্জুর হয়? পতিতপাবনের ললাট কুঞ্চিত হইল। তাহা হইলে অন্য উপায়ে কি বিবাহে বাধা দেওয়া যায় না? যদি গৌরীর বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া যায়, তাহা হইলে কি হইবে এই

সব মোকদ্দমায়, কি হইবে ডিক্রী ডিস্‌মিসে? তাহা হইলে এত চেষ্টা—এত পরিশ্রম সবই নিষ্ফল! অন্য উপায় কি কিছুই নাই? হরা ছোঁড়া এ সময়ে কলিকাতায় চলিয়া গেল; কাছে থাকিলে একটা না একটা আইনের পরামর্শ দিতে পারিত।

বিরক্তভাবে পতিতপাবন ডাকিলেন, "গোবরা, ওরে বেটা গোবরা!" গোবর্দ্ধন তখন কার্য্যান্তরে গিয়াছিল, সুতরাং তাহার সাড়া না পাইয়া পতিতপাবন রাগে আগুন হইয়া আপন মনে গোবরা বেটার চতুর্দ্দশ পুরুষের শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন এবং দাঁতে দাঁত চাপিয়া অস্থির ভাবে বৈঠকখানার সম্মুখে পদচারণা করিতে থাকিলেন।

এমন সময় নরহরি তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং পতিতপাবনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ওহে ভায়া, পরশু গৌরীর বিয়ে।"

পতিতপাবনের বিস্ময়স্তব্ধ কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল, "পরশু!"

নরহরি বলিলেন, "হাঁ পরশু। সাতাশে দিন ঠিক হ'য়েছিল, কিন্তু বর পক্ষের তাড়া—তাদের নাকি শুভ অশৌচের সম্ভাবনা আছে। তা আমিও বলি শুভস্য শীঘ্রং। তবে বড্ড তাড়াতাড়ি হ'লো। হোক্, ওর যদি বিয়ের ফুল ফুটে থাকে, আমি তাতে তবে বাধা দিই কেন। জাঁকজমক তো হবেই না, তবু মনে করেছিলাম, পাঁচজনকে নিয়ে একটু আমোদ-প্রমোদও তো কত্তে হবে। তা নাই হোক, আমোদ-আহ্লাদ, এখন আপনা আপনি ক'জনকে নিয়ে কোন রকমে চার হাত এক ক'রে দিতে পারলে হয়। তুমি কি বল?"

পতিতপাবন বলিবে কি, যেন একটা ভয়ানক দুঃসংবাদ শ্রবণে তাঁহার বাক্‌শক্তি পর্য্যন্ত রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল। সুতরাং সৌজন্যের অনুরোধেও একটা হাঁ না বলিয়া কথায় সায় দিতে পারিলেন না, শুধু উদ্বেগ-ব্যাকুল দৃষ্টিতে নরহরির মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। নরহরি কিন্তু তাঁহার সে উদ্বেগটুকু লক্ষ্য করিতে না পারিয়া প্রীতিপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "তা হ'লে যেন ভুলো না ভায়া। আর ভুলবেই বা কি ক'রে, গৌরী তো একা আমার নাতনী নয়। হাজার ঝগড়া বিবাদ কর, ভালবাসার টান যাবার নয়।"

বলিয়া তিনি একটু স্নিগ্ধ হাস্য করিলেন। পতিতপাবন মাথা নীচু করিয়া লজ্জাজড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "তা বটে।"

নরহরি বলিলেন, "নাতনীর বিয়ে, দেখা শোনা সব ভার তোমার। আমি আর বেশী কি বলবো। এখন হরনাথ এসে পড়লে হয়। সে জান্‌তো সাতাশে বিয়ে, সেই মতই আসবে ব'লে গিয়েছিল। আজ তো তাকে টেলিগ্রাম ক'রে দিয়েছি।"

"টেলিগ্রাম করেছ?"

"হাঁ, এগারটার সময় নিজে গিয়ে টেলিগ্রাম ক'রে এসেছি।"

"কিন্তু টাকা কড়ির যোগাড় সব হ'য়েছে?"

"সে এক রকম হওয়াই। নব ঘোষ জমি কিনছে কি না, কাল রেজেষ্টারী হ'য়ে গেলেই—"

তীব্র কণ্ঠে পতিতপাবন বলিয়া উঠিলেন, "কিন্তু কার জমি তুমি বেচতে যাচ্ছো তা জান?"

নরহরি হাসিয়া বলিলেন, "জমি আমার, তবে এখন তোমার হবে কি আমারি থাকবে, মামলা শেষ না হ'লে তার মীমাংসা হবে না। তা হোক্ না ভায়া, গৌরীর বিয়েটা তো হ'য়ে যাক্, তারপর মামলায় যদি ডিক্রীই পাও, টাকা আদায়ের তরে তোমাকে ভাবতে হবে না। জমি জায়গায় আদায় না হয়, আমি তো আছি। আমাকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে জেলে দিও। বুড়ো বয়সে জেলে ব'সে দিব্যি হরিনাম করবো, আর দু'বেলা দু'মুঠো খাব।"

বলিয়া তিনি উচ্চ হাসি হাসিয়া উঠিলেন, এবং হাসিতে হাসিতেই পতিতপাবনের মুখের উপর একটা উজ্জ্বল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন। পতিতপাবন দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া হাত দুইটাকে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

গোবর্দ্ধন তাঁহার সম্মুখে আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "বুড়ো আজ আবার এয়েছিল কেন কত্তা? আবার নেমন্তন্ন নাকি?"

ক্রোধগম্ভীর কণ্ঠে "হুঁ" বলিয়া পতিতপাবন ধীরে ধীরে গিয়া বৈঠকখানায় উঠিলেন, এবং চৌকীখানার উপর অবসন্নভাবে বসিয়া পড়িয়া তামাক দিবার জন্য গোবর্দ্ধনকে আদেশ দিলেন। গোবর্দ্ধন তামাক সাজিয়া আনিল। তাহার হাত হইতে হুঁকা লইয়া পতিতপাবন বলিলেন, "সকাল সকাল কাজ কর্ম্ম সেরে খেয়ে নিবি। আমার সঙ্গে যেতে হবে।"

গোবর্দ্ধন জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যেতে হবে কত্তা?"

পতিত। চুলোয়।

গোব। এই রাত্তিরে?

পতিত। হাঁ।

"আচ্ছা" বলিয়া গোবর্দ্ধন কাজ সারিতে চলিয়া গেল। পতিতপাবন চিন্তিতভাবে হুঁকায় মৃদু মৃদু টান দিতে লাগিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

"সুবি!"

"কেন দাদা?"

"টাকাগুলো ফেরৎ দে তো।"

"কোন্ টাকাগুলো দাদা?"

বিরক্তভাবে রঘুরাম বলিল, "কোন্ টাকা আবার! একেবারে যে নেকী সেজে বস্‌লি।"

সুভদ্রা চুপ করিয়া রহিল। তাহাকে নীরব দেখিয়া রঘুরাম ক্রুদ্ধভাবে বলিল, "দত্তমশাই সেদিন টাকা দিয়ে গিয়েছিল না?"

সুভদ্রা বলিল, "হাঁ, তেরো টাকা দিয়ে গিয়েছিল বৈকি।"

মুখভঙ্গী করিয়া রঘুরাম বলিল, "দিয়ে গিয়েছিল বৈকি! সে টাকা কি হলো?"

সুভ। খরচ হ'য়ে গিয়েছে।

রঘু। কিসে খরচ হ'লো? আমার শ্রাদ্ধে?

সুভ। কতক তোমার শ্রাদ্ধে, কতক আমার শ্রাদ্ধে।

রঘু। তোমার শ্রাদ্ধেই বেশী খরচ হ'য়েছে। খাওয়া তো নয়—যেন রাহুর আহার। ভাতের কাঁড়ি দেখলে ভয় পায়। মেয়ে মানুষগুলো বিধবা হ'লে মনে করে, সংসারটা শুদ্ধ খেয়ে ফেলি।

সুভ। তবু একবেলা খাওয়া।

রঘু। ঐ এক বেলাতেই তিন বেলার শোধ হ'য়ে যায়।

অভিমানক্ষুব্ধ স্বরে সুভদ্রা বলিল, "আমি কি এতই খাই দাদা?"

তাহার স্বরে অভিমানের কাতরতা লক্ষ্য করিয়া রঘুরাম কর্কশ কণ্ঠটাকে অপেক্ষাকৃত কোমল করিয়া বলিল, "আমি কি শুধু তোর কথাই বল্‌চি সুবি, মেয়েমানুষ জাতটাই এই রকম, শুধু খাই খাই। তবে বিধবারা সব চেয়ে একটু বেশী।"

ম্লানমুখে সুভদ্রা বলিল, "হাঁ, কেন না তারা অপরের গলগ্রহ হয় কি না।"

তাহার কথায় সুভদ্রা আঘাত পাইয়াছে দেখিয়া রঘুরাম আর কিছু বলিল না, নীরবে বসিয়া তামাক সাজিতে লাগিল। সুভদ্রা কিন্তু চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না; আঘাতের প্রতিঘাত দিবার উদ্দেশ্যে বেদনাগম্ভীর স্বরে বলিল, "মার পেটের বোন কম খায় কি বেশী খায়, খুব নজরে পড়ে দাদা, কিন্তু বৌ এসে যদি দু'বেলা দু'পাথর খেতো, তাতে একটি কথাও হ'তো না।"

রঘুরাম ঈষৎ হাসিল; বলিল, "হ'তো কি না হ'তো—বৌ এলে দেখতিস্ সুবি।"

সুভদ্রা বলিল, "সে আমার অনেক দেখা আছে দাদা।"

রঘুরাম বলিল, "ঐ দেখা আছে ব'লেই ও চেষ্টাও করি না সুবি।"

রাগে ঠোঁট ফুলাইয়া সুভদ্রা বলিল, "তা বল্‌বে বৈকি দাদা, আমার ভয়েই তুমি বিয়ে কর না? তোমার বৌ আসবে, তাকে নিয়ে তুমি সংসারী হবে, তাতে আমার বড্ড অনিচ্ছে, না?"

রঘুরাম বলিল, "এখন ইচ্ছে আছে সুবি, কিন্তু বৌ এলে এর পর ভিটে তো ভিটে, গাঁয়ে পর্য্যন্ত কাক বসতে পারতো না।"

সুভ। আমার ঝগড়ার চোটে নাকি।

রঘু। একার নয়, দু'জনের ঝগড়ার চোটে। এই দেখ না, কোথায় বৌ তার ঠিক নাই, এরি মধ্যে তার দু'বেলা দু'পাথর খাওয়া দেখছিস্; সত্যি সত্যি বৌ এলে কি তুই বাঁচতিস্? হিংসেয় ফেটে ম'রে যেতিস্।"

রোষগম্ভীর মুখে সুভদ্রা বলিল, "তুমি সেই রকমই মনে কর দাদা। কিন্তু বৌ এনেই দেখ দেখি, আমি ফেটে ম'রে যাই কি বেঁচে থাকি।"

গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালনপূর্ব্বক রঘুরাম বলিল, "দেখে আর কাজ নাই সুবি, না দেখে বরং বেশ আছি। ভাই বোনে দিব্যি রয়েছি; তুই গাল দিচ্চিস, আমি শুনছি, আমি গাল দিচ্চি, তুই কাঁদচিস্; আমি ডাকচি সুবি, তুই ডাকচিস্ দাদা। এর ভেতর একটা পরের মেয়েকে আনলে তুই আমার পর হ'য়ে যাবি, আমিও তোর পর হ'য়ে যাব।"

ভায়ের কথায় সুভদ্রা না হাসিয়া থাকিতে পারিল না; বলিল, "তাই ব'লে কি তুমি বিয়ে করবে না দাদা?"

রঘুরাম বলিল, "একেবারেই যে বিয়ে করবো না এমন কথা বলতে পারি না। তবে বিয়ে ক'রবো বললেই তো বিয়ে হয় না, এক রাশ টাকা চাই।"

সুভদ্রা বলিল, "হাঁ, তোমাকে ব'লেছে এক রাশ টাকা চাই। বড় জোর শ'চারেক টাকা।"

রঘুরাম হাসিয়া বলিল, "চার টাকার সংস্থান নাই, চারশো টাকা আসবে কোথা হ'তে সুবি?"

সুভদ্রা বলিল, "সে যেখান থেকে হোক আসবে। তুমি চেষ্টা দেখ দেখি।"

ভগ্নীর মুখের উপর সহাস্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রঘুরাম বলিল, "কোথা থেকে আসবে তাই বল্।"

সুভ। সে আমি যোগাড় ক'রে দেব।

রঘু। যোগাড় করবি? না তোর নিজের পুঁজি ভাঙবি?

সুভ। হাঁ, আমি মস্ত টাকার মানুষ কি না, আমার এত টাকা পুঁজি আছে।

রঘু। নিশ্চয় আছে। না থাকলে তুই ভরসা দিস্ কোথা থেকে?

সুভ। সে আমি যেখানে থেকেই দিই, তুমি চেষ্টা ক'রেই দেখ না।

রঘু। আচ্ছা তা দেখবো। এখন তোর পুঁজি থেকে তেরোটা টাকা দিয়ে তার নমুনা দেখা দেখি।

সুভ। কপাল আর কি। আমার আবার পুঁজি! আমার পুঁজি কোথা থেকে আসবে দাদা?

রঘুরামের মুখখানা বিরক্তিতে বিকৃত হইয়া আসিল; বলিল, "সে আমি জানি সুবি, বাইরে তুই মহাজনী করিস্, আর আমি চাইলেই তোর পুঁজি পাটা সব উড়ে পুড়ে যায়। আমাকে একেবারে কপাল দেখিয়ে দিস্!"

সুভদ্রা চুপ করিয়া রহিল। তাহার এই নীরবতায় ক্রুদ্ধ হইয়া রঘুরাম বলিল, "চুপ ক'রে রইলি যে? টাকা দিবি না?"

"টাকা থাকলে তো দেব।" ঝঙ্কারের সহিত কথাটা বলিয়া সুভদ্রা ঘরে ঢুকিয়া পড়িল, এবং প্রদীপ জালিয়া সন্ধ্যা দিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। রঘুরামের কলিকার আগুন তখন ধরিয়া উঠিয়াছিল; সে সুভদ্রার স্পষ্ট জবাবে চিন্তিত হইয়া গম্ভীর ভাবে হুঁকায় টান দিতে থাকিল।

এমন সময় বাহির হইতে পতিতপাবন ডাকিলেন, "রঘুঠাকুর!"

সে আহ্বানে রঘুরাম শিহরিয়া উঠিল, এবং দত্ত মহাশয়ের আহ্বানে উত্তর দিবে কি না, তাহাই ভাবিতে লাগিল। পতিতপাবন পুনরায় উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলেন। সুভদ্রা ঘরের বাহিরে আসিয়া ভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মানুষ ডাকচে, শুনতে পাও না?"

বিরক্তির সহিত ভ্রূভঙ্গী করিয়া রঘুরাম বলিল, "না, আমি কি কিছু শুনতে পাই?"

সুভ। তবে সাড়া দাও না কেন?

রঘু। তুই তো সাড়া দিলেই পারিস্।

সুভ। তুমি থাকতে আমি সাড়া দেব? তুমি বল কি দাদা?

রঘু। কি এমন মন্দ বলছি। পাড়ায় পাড়ায় দালালী ক'রে ঘুরে বেড়াতে পারিস্, আর সাড়া দিতেই বুঝি যত দোষ।

সুভদ্রা ভ্রাতার মুখের উপর তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। এমন সময় পুনরায় ডাক আসিল, "শুনতে পাও না ঠাকুর?"

ভগ্নীর দিকে চাহিয়া রঘুরাম ক্রুদ্ধভাবে বলিল, "হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলি যে, বল না বাড়ী নাই।"

সুভদ্রা বলিল, "ও মা, বাড়ী নাই বলবো কেমন ক'রে! ঠায় ব'সে রয়েছ যে।"

রাগে দাঁত মুখ খিঁচাইয়া রঘুরাম বলিয়া উঠিল, "আমি ব'সে থাকি, শুয়ে থাকি, তাতে তোর বাবার কি? তুই শুধু বল্‌বি যে বাড়ীতে নাই।"

সুভদ্রাকে কিছুই বলিতে হইল না; তৎপূর্ব্বেই পতিতপাবন বাড়ীর ভিতর আসিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "সে কথা তুমি নিজেই এতক্ষণ বললে পারতে তো ঠাকুর, তা হ'লে আমাকে এত ডাকাডাকি কত্তে হ'তো না।"

হুঁকা ফেলিয়া ত্রস্তে উঠিয়া রঘুরাম লজ্জিতভাবে বলিল, "দেখুন তো দত্তমশাই, কখন থেকে আবাগীকে বল্‌ছি, তা বুঝেছেন কি না—"

ঈষৎ হসিয়া পতিতপাবন বলিলেন, "বুঝেছি বৈ কি, কিন্তু আজ চৌধুরীদের বাড়ীতে কেন গিয়েছিলে, সেইটাই বুঝতে পাচ্চি না।"

সুভদ্রা তাড়াতাড়ি আসন আনিয়া দিল। পতিতপাবন কিন্তু বসিলেন না; বলিলেন, "আমার ব'সবার সময় নাই। তোমারও ব'সে থাকলে চলবে না রঘুঠাকুর, এখুনি আমার সঙ্গে যেতে হবে।"

রঘুরাম ভীত ভাবে কোথায় যাইতে হইবে জিজ্ঞাসা করিলে পতিতপাবন তাহাকে জানাইলেন যে, রাতারাতি তিনি মহকুমায় যাইবেন, তাঁহার সঙ্গে রঘুরামকেও যাইতে হইবে। এবং যদি প্রয়োজন হয়, তাঁহার সপক্ষে দুইটা কথা বলিয়া আসিবে। রঘুরাম ভীতিবিহ্বল ভাবে বলিল, "কাল থেকে আমার মাথা ধ'রে আছে।"

পতিতপাবন বলিলেন, "গাঁজা টেনে ঘরের ভিতর ব'সে থাকলে মাথা ধ'রেই থাকে। রাত্রে পথ হাঁটলে মাঠের ঠাণ্ডা হাওয়ায় মাথা ছেড়ে যাবে। যদি তাতেও না ছাড়ে, তবে এক ভরি গাঁজা কিনে দেব।"

এক ভরি গাঁজার লোভে রঘুরামের চোখ দুইটা মুহূর্ত্তের জন্য উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু মুহূর্ত্তেই লোভটাকে দমন করিয়া পতিতপাবনকে বলিল যে, এক ভরি কেন, তিন ভরি গাঁজা পাইলেও সে যাইতে

পারিবে না। কেন না তাহার শরীর বড়ই অসুস্থ। পতিতপাবন ভ্রূকুটী করিয়া তাহার মুখের উপর স্থির গম্ভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক বলিলেন, "চৌধুরী বুঝি এর চাইতেও বেশী দিতে চেয়েছে রঘুঠাকুর ?"

রঘুরাম নতমস্তকে নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। পতিতপাবন তখন পকেট হইতে একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিলেন, এবং নোটখানা রঘুরামের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া স্থির গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "চৌধুরী এর চাইতে বেশী বোধ হয় দিতে পারবে না। খেয়ে দেয়ে ঠিক হ'য়ে থাক, যাবার সময় তোমাকে ডেকে নিয়ে যাব। যদি ঠিকমত বল্‌তে পার, আমার কাজ যদি সিদ্ধ হয়, তবে ফিরে এসে আর একখানা পাবে।"

উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই পতিতপাবন দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন। রঘুরাম স্তব্ধ বিহ্বল দৃষ্টিতে নোটখানার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

সুভদ্রা বলিল, "তা হ'লে উঠে খেয়ে নেবে চল।"

রঘুরাম উত্তর দিল না। সুভদ্রা ক্ষিপ্রহস্তে নোটখানা তুলিয়া লইয়া আঁচলে বাঁধিতে বাঁধিতে ভাত বাড়িতে চলিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

ও গৌরি, তোর নাকি বিয়ে ?"

পতিতপাবনকে দেখিয়া গৌরী যেন একটু সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল, এবং হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্রের মধ্যে হস্তস্থিত কাজলপাতাখানা লুকাইবার চেষ্টা করিল। পতিতপাবন ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "কাজলপাতাখানা ঢেকে ফেললেই কি লজ্জাটাকে ঢাকতে পারবি গৌরি ?"

গৌরী নতমুখে লজ্জার মৃদু হাসি হাসিল। পতিতপাবন ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "চৌধুরী কোথায় ?"

গৌরী উত্তর করিল, "কোথায় গিয়েছেন।"

পতিত। গিয়েছেন কখন্ ?

গৌরী। সকালে।

পতিত। এখনো ফেরেন নি ?

গৌরী। না।

পতিত। কখন্ ফিরবেন ?

গৌরী। জানি না।

একটু ভাবিয়া পতিতপাবন বলিলেন, "তা হ'লে বোধ হয় জমি রেজেষ্টারী ক'রে দিতে গিয়েছে ?"

গৌরী বলিল, "তা হবে।"

মাথা নাড়িয়া পতিতপাবন বলিলেন, "তা হবে নয়, নিশ্চয়ই তাই। কিন্তু রেজিষ্টারী আর হচ্চে না।"

"কেন হবে না ?"

"সে পথ বন্ধ ক'রে তবে ঘরে এসেচি। এ আর কেউ নয় গৌরী, পতিতপাবন দত্ত। পতিতপাবন যা ধরে তা সহজে ছাড়ে না।"

গৌরী তাঁহার উক্তির মর্ম্ম বুঝিতে পারিল না, সুতরাং সে নীরবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পতিতপাবন সহাস্যে বলিলেন, "বুড়ো এতক্ষণ হতাশ হ'য়ে মুখখানাকে অন্ধকার ক'রে ফিরে আসছে নিশ্চয়। সেই সঙ্গে অভিশাপে আমাকে ভস্ম ক'রে দিচ্চে, কিন্তু আমি যে এখানে দিব্যি দাঁড়িয়ে তোর সঙ্গে গল্প কচ্চি, তা তো জানছে না।"

বলিয়া তিনি হা হা শব্দে হাসিয়া উঠিলেন। তাঁহার সে হাস্যধ্বনি যেন কঠোর বজ্রধ্বনির ন্যায় গৌরীর কর্ণে প্রতিহত হইয়া তাহার মুখখানাকে বিকৃত করিয়া দিল। তাহার সেই বিকৃত মুখের দিকে চাহিয়া পতিতপাবন বলিলেন, "আমার কথায় তোর রাগ হচ্চে, না গৌরী ?"

গম্ভীর কণ্ঠে গৌরী উত্তর দিল, "রাগের কথা শুনলেই রাগ হয়।"

পতিতপাবন বলিলেন, "তোর আরও বেশী রাগ হবে গৌরী, যদি শুনিস্ বিয়ে আজ আর হবে না।"

বলিয়া তিনি গৌরীর মুখের উপরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই গৌরী মুখ নীচু করিল। পতিতপাবন বলিলেন, "সত্যিই বলছি গৌরী, আজ তো বিয়ে কিছুতেই হচ্চে না।"

ঠোঁট ফুলাইয়া রোষ-বিকৃত কণ্ঠে গৌরী বলিয়া উঠিল, "তবে আর কি !"

পতিতপাবন বলিলেন, "তবে আর কি নয় গৌরী, আজ বিয়ে না হ'লে কি হ'বে জানিস্ ?"

"কি হবে ?"

"বুড়োর মুখে চূণকালি পড়বে, জাত কুল মান ইজ্জৎ সব যাবে।"

গৌরীর চোখমুখ দিয়া যেন আগুন ছুটিতে লাগিল; মুখ তুলিয়া রোষক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল, "তাতে তোমার লাভ ?"

তীব্র হাস্যস্ফুরিত কণ্ঠে পতিতপাবন উত্তর করিলেন, "আমার লাভ—আমাকে অপমান ক'রবার প্রতিশোধ।"

তাঁহার উপহাস-কঠোর মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া অশ্রুগাঢ় স্বরে গৌরী বলিল, "আচ্ছা,

দাদামশায়কে না খুন করলে কি তোমার আশা পূর্ণ হবে না ?”

মস্তক সঞ্চালনপূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে পতিতপাবন বলিলেন, “ঠিক তাই গৌরী। খুন করলে যদি ফাঁসীর ভয় না থাকতো, তবে এদ্দিন নিজের হাতেই বুড়োর বুকে ছুরী বসিয়ে দিতাম। কিন্তু তার জন্য আমার আক্ষেপ নাই। এবার যে ছুরী তুলেছি, তাতে বুড়োর বুকের হাড়গুলো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কাটবে ; মরবে না, অথচ জ্বালায় ফটফট্‌ করবে।”

পতিতপাবনের মুখখানা ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, চোখ দুইটা ক্রুদ্ধ শার্দ্দূলের মত জ্বলিতে লাগিল। গৌরী ভয়ে তাঁহার দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল। পতিতপাবন চাদরের খুঁটে কপালের ঘাম মুছিয়া অপেক্ষাকৃত শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, “বুড়ো ফিরে এলে বলিস্, আমি এসেছিলাম। সন্ধ্যার পর বিয়ের লগ্নের সময় আর একবার আসবো। এখনো যদি সে বাঁচতে চায়, এই পতিতপাবন দত্তের হাতে পায়ে ধরে তার হাতে তোকে সম্প্রদান করবে।”

কথা শেষ করিয়াই পতিতপাবন ঠিক ঘূর্ণী ঝড়ের মত ছুটিয়া চলিয়া গেল। গৌরী নিশ্বাস ফেলিয়া বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িল।

অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন, “কার সঙ্গে কথা কইছিলি গৌরী ? ও বাড়ীর ঠাকুর না ?”

বিরক্তির সহিত মুখ মচ্‌কাইয়া গৌরী উত্তর দিল, “হাঁ, তিনিই।”

“কি এত বলছিলেন ?”

“কত কথা।”

“কিসের কত কথা ?”

“আমি জানি না।”

“তোর কাছে বল্‌ছিলেন, আর তুই জানিস্ না ? কি বিয়ের কথা, পায়ে ধরার কথা হচ্ছিল।”

ঝঙ্কার দিয়া গৌরী বলিল, “শুনতে পেয়েছ তো আবার জিগ্যেস ক’চ্চো কেন ?”

অন্নপূর্ণা বলিলেন, “দু’ চারটে কথাই কাণে এয়েচে ; আমি কি সব শুনতে পেয়েছি।”

“না পেয়ে থাক, না পেয়েছ ; আমি এখন এত বকতে পারবো না।”

বলিয়া গৌরী মায়ের মুখের উপর একটা বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মাতার সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইতে উদ্যত হইতেছিল, এমন সময় নরহরি বাড়ী ঢুকিয়া আর্ত্তকণ্ঠে ডাকিলেন, “বৌমা !”

আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গে তিনি থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া পড়িয়া যাইতেছিলেন, অন্নপূর্ণা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পতনোন্মুখ দেহটাকে ধরিয়া ফেলিল এবং মায়ে ঝিয়ে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে দাবার উপর বসাইয়া দিল। গৌরী পাখা আনিয়া তাঁহাকে বাতাস করিতে আরম্ভ করিল, অন্নপূর্ণা তাঁহার চোখে মুখে জলের ছিটা দিতে দিতে ক্রন্দন-জড়িত কণ্ঠে ডাকিতে লাগিল, “বাবা ! বাবা !”

কিছুক্ষণ পরে চোখ মেলিয়া চাহিয়া নরহরি ক্ষীণ কাতর কণ্ঠে বধূকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, “কেঁদো না বৌমা, গৌরীর বিয়ে না দিয়ে আমি মত্তে পরবো না।”

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

গভীর দুশ্চিন্তা ও নিদারুণ লজ্জার ভার লইয়া সন্ধ্যার অন্ধকার যতই পৃথিবীর বুকের উপর চাপিয়া বসিতে থাকিল, নরহরি ততই উৎকণ্ঠা-ব্যাকুল দৃষ্টিতে ঘন ঘন পথের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। পুরোহিত রামবল্লভ চক্রবর্ত্তী বলিলেন, “আটটার পরেই লগ্ন, কিন্তু কৈ, বর বা বরযাত্রী কারো দেখা নাই যে ?”

উমেশ ঘোষ মুখের কাছ হইতে হুঁকাটা একটু সরাইয়া বলিলেন, “একটু এগিয়ে দেখলে না কেন হে নরহরি ? পথ ভুলে মাঠে ঘুরে বেড়ায়নি তো ?”

নরহরি চিন্তিতভাবে উত্তর করিলেন, “এই সন্ধ্যার সময় পথ ভুলে ঘুরে বেড়াবে ?”

ঘোষজা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, এই মুখ-আঁধারের সময়েই দিশা লাগিয়া পথ হারাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। বলিয়া তিনি স্বীয় উক্তির প্রমাণ স্বরূপে কবে মদীয় কনিষ্ঠ শ্যালকের বিবাহ দিতে গিয়া দিশাহারা হইয়া সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত একটা মাঠকে সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত গল্প আরম্ভ করিয়া দিলেন। সে গল্পের শেষ পর্য্যন্ত শুনিবার মত ধৈর্য্য তখন নরহরির ছিল না, তিনি পাড়ার দুইজন যুবককে মাঠ পর্য্যন্ত আগাইয়া দেখিতে পাঠাইলেন।

অনেকক্ষণ পরে তাহারা ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে, মাঠের অর্দ্ধেক দূর পর্য্যন্ত গিয়াও তাহারা কাহাকেও দেখিতে পায় নাই। অনেক ডাকাডাকি করিয়াও কাহারও কোন সাড়াশব্দ পায় নাই। তাহাদের কথায় সকলেই হতাশ হইয়া নীরবে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল।

সেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া সকলকে আশ্বাস দিয়া পুরোহিত চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, “ঠিক হ’য়েছে,

শেষ রাত্রে একটা লগ্ন আছে ; বোধ হয় সেই লগ্ন ধরেই আসবে।”

“কোন লগ্ন ধরেই তারা আসবে না চক্কোত্তি মশাই, তাদের বদলে আমরাই এসেছি।”

লাঠীর ঠক্ ঠক্ শব্দ করিতে করিতে পতিতপাবন হরনাথের সহিত উপস্থিত হইলেন এবং সকলের বিস্ময়চকিত দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়াইয়া সহাস্য কণ্ঠে বলিলেন, “টাকার যোগাড় যখন হ’লো না, তখন ভদ্রলোকেরা অনর্থক এসে ফিরে যাবে, একটা কেলেঙ্কারী হবে, গাঁয়ে হৈ চৈ পড়ে যাবে,—এই সব সাত পাঁচ ভেবে চিঠি একখানা লিখে গোবরাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। সন্ধ্যার আগে গোবরা ফিরে এসেছে।”

শুনিয়া সকলেই শিহরিয়া উঠিল। বিষাদগম্ভীর কণ্ঠে নরহরি বলিলেন, “আমার এমন সর্ব্বনাশ করলে পতিতপাবন ?”

পতিতপাবন হাসিয়া উত্তর করিলেন, “তোমার সর্ব্বনাশে আমার পৌষ মাস, চৌধুরী।”

ব্যর্থরোষে নরহরির ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল। পতিতপাবন বসিয়া ঘোষজার হাত হইতে হুঁকা লইলেন, এবং তাহাতে মৃদু টান দিতে দিতে বলিলেন, “এখন কি করবে চৌধুরী ?”

নরহরি নিরুত্তর। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, “এখন করা করি আর কি, যেমন তেমন একটা পাত্র পাওয়া গেলে জাত কুল মান রক্ষা হ’তো, কিন্তু তেমন তো কেউ নাই ?”

“থাকবার মধ্যে এক আমি আছি” বলিয়া পতিতপাবন উচ্চ হাসি হাসিয়া উঠিলেন। কিন্তু তাঁহার সে হাসি কাহারও ভাল লাগিল না, সকলেই ঘৃণায় মুখ বিকৃত করিল। তাহাদের সে অবজ্ঞা পতিতপাবনের দৃষ্টি অতিক্রম করিল না। কিন্তু তিনি, তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না ; নরহরির দিকে ফিরিয়া সহাস্য মুখে বলিলেন, “আর উপায় নাই চৌধুরী, মেয়ের হাতে সুতো বাঁধা হ’য়েছে। এখন আমার হাতে তাকে দিয়ে জাত কুল মান রক্ষা কর।”

ক্রোধগম্ভীর স্বরে নরহরি বলিলেন, “তার চাইতে জাত কুল মান সব যাওয়া আমি ভাল মনে করি।”

শুষ্ক হাসি হাসিয়া পতিতপাবন বলিলেন, “সবই যাবে চৌধুরী। ডিক্রীজারি করলে ভিটেটুকু পর্য্যন্ত থাকবে না।”

শান্তগম্ভীর স্বরে নরহরি বলিলেন, “আবার চোখ বুজলে মামলা মোকদ্দমা, ডিক্রী ডিস্‌মিস্ কিছু থাকবে না, এটা মনে রেখো পতিতপাবন।”

“কিন্তু পতিতপাবন দত্ত সহজে চোখ বুজছে না চৌধুরী। অন্ততঃ তোমার উপর ডিক্রীজারি না ক’রে।”

বাহিরে কে গাহিল—

“তুমি কোন্ বিচারে আমার উপর
কল্লে দুঃখের ডিক্রীজারি,
মাগো তারা ও শঙ্করি।”

রঘুরাম ধীরে ধীরে আসিয়া ব্রাহ্মণের আসনের এক পাশে বসিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় নরহরিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “এখন চুপ ক’রে ব’সে থাকলে চলবে না, আজ বিয়ে না হ’লে মেয়ে অন্যপূর্ব্বা হ’য়ে পড়বে। যা হয় একটা উপায় দেখ।”

গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নরহরি বলিলেন, “উপায় আর কি দেখবো বলুন।”

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, “কি উপায় দেখবো বললে চলে কি ? মেয়েটার যে পরকাল নষ্ট হবে। এর পর কেউ কি আর তাকে গ্রহণ করবে ?”

দুঃখগম্ভীর স্বরে নরহরি বলিলেন, “সে তার কপাল।”

চক্র। চেষ্টা আগে, কপাল পরে। কাছাকাছি তেমন ছেলে নাই।

নর। ছেলে অনেক আছে, নাই আমার টাকা।

চক্র। কিন্তু দেশে কি এমন ভদ্র লোক কেউ নাই যে টাকার চাইতে ভদ্রলোকের জাত কুল মানকে বড় মনে করে ?

পতিতপাবন বলিয়া উঠিলেন, “তেমন ভদ্রলোক আমি ছাড়া আর একজনও নাই চক্কোত্তি মশাই। কিন্তু চৌধুরীর প্রতিজ্ঞা শুনলেন তো ?”

রঘুরাম এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল ; এক্ষণে সে মুখ বাড়াইয়া বলিয়া উঠিল, “কেন দত্তমশাই, হরনাথ বাবু তো রয়েছেন।”

পতিতপাবন হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, “ও অনেক উচু ডালের ফুল রঘুঠাকুর, ওখানে হাত বাড়ানো পাগলামী ছাড়া আর কিছুই নয়।”

নরহরি বসিয়াছিলেন, হঠাৎ উঠিয়া পড়িলেন ; এবং পতিতপাবনের কাছে গিয়া তাঁহার হাত দুইটা বাড়াইয়া ধরিয়া সকাতর কণ্ঠে বলিলেন, “আমি আজ সত্যিই পাগল হ’য়েছি পতিতপাবন, তাই যা কখন মনে করি নাই আজ তা কাজে কচ্চি। এই বছরে অনেক শত্রুতা করেছ পতিতপাবন, কিন্তু আজ একবার বন্ধুর কাজ কর। হরনাথকে ভিক্ষা দিয়ে আমার জাত কুল মান রাখ।”

পতিতপাবন নিরুত্তরে ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। নরহরি তাহার মুখের উপর অশ্রুসজল দৃষ্টি স্থাপন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে

বলিলেন, "শুধু আমার মুখের দিকে চেয়ে তোমাকে দয়া কত্তে বল্‌ছি না, গৌরীর মুখের দিকে চেয়ে একটু দয়া কর। গৌরী শুধু একা আমার নাতনী নয়, সে তোমারও স্নেহের গৌরী। কিন্তু আজকার রাতটা পোয়ালে তার জীবনটা নিষ্ফল হ'য়ে যাবে, আর কেউ তাকে গ্রহণ করবে না।"

তাঁহার দরবিগলিত অশ্রুধারায় পতিতপাবনের হাত দুইটা ভিজিয়া গেল। কিন্তু তাঁহার প্রাণটা বোধ হয় ভিজিল না। তিনি নরহরির হস্তবেষ্টন হইতে নিজের হাত টানিয়া লইয়া ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "তুমি ভুল ব'কচো চৌধুরী, মরুভূমির মাঝে বরং জলের প্রত্যাশা কত্তে পার, কিন্তু পতিতপাবন দত্তের কাছে দয়া এক ফোঁটাও পেতে পার না। তার প্রাণটা মরুভূমির চাইতে বেশী শুক্‌নো তা জান না কি?"

নরহরি নতমস্তকে দাঁড়াইয়া কাপড়ে চোখের জল মুছিতে লাগিলেন। পতিতপাবন কণ্ঠটাকে আর একটু তীব্র করিয়া বলিলেন, "একদিন আমি বড় প্রাণের জ্বালায় বুকভরা তৃষ্ণা নিয়ে তোমার কাছে ছুটে এসেছিলাম, কিন্তু সেদিন তুমি আমাকে কি ব'লেছিলে, তা কি তোমার মনে আছে চৌধুরী? তোমার মনে না থাকলেও আমার কিন্তু বেশ মনে আছে; কেন না সেই দিন থেকে আমার প্রাণের যেখানে যেটুকু রস ছিল, সব জ্বলে পুড়ে জীবনটাকে একেবারে শুক্‌নো ক'রে দিয়েছে। আজ তোমার এই কয় ফোঁটা চোখের জলে সে শুক্‌নো প্রাণ সহজে ভিজবে না।"

পতিতপাবনের চোখ দুইটার ভিতর দিয়া পুঞ্জীভূত ক্রোধটা যেন আগুনের শিখার মত ছুটিতে লাগিল। সেই আগুনে নরহরিকে যেন দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়া জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বলিলেন, "যে গৌরীর দোহাই দিয়ে আজ আমার দয়া ভিক্ষা কচ্চো, সেই গৌরীকে আমিও একদিন তোমার কাছে ভিক্ষা চেয়েছি। কিন্তু সেদিন তুমি ভিক্ষা দিয়েছিলে কি? তুমি না দিলেও আমি কিন্তু ভিক্ষা দেব, তবে আজ নয়। যে দিন ডিক্রীজারীর পরোয়ানা নিয়ে আসবো, সেই দিন গৌরীরও উপায় ক'রে দেব।"

পতিতপাবনের এই সক্রোধ দম্ভোক্তিতে নরহরির মথা যেন মাটীর সঙ্গে মিশিয়া যাইবার উপক্রম হইল; কিন্তু উপস্থিত আর সকলের মুখ ঘৃণায় ও বিরক্তিতে কুঞ্চিত হইয়া আসিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

রঘুরাম ধীরে ধীরে বলিল, "ডিক্রীজারি ডিক্রীজারি কচ্চো দত্তমশায়, কিন্তু বুঝেছেন কি না ডিক্রী যদি না হয়।"

মস্তক সঞ্চালনপূর্ব্বক দৃঢ়স্বরে পতিতপাবন বলিলেন, "হ'তেই হবে। এ মোকদ্দমার ডিক্রী না হ'য়েই যায় না।"

রঘুরাম বলিল, "তা তো যায় না, কিন্তু বুঝেছেন কি না, মনে করুন যদিই না হয়।"

পতিত। হবে না কেন?

রঘু। ধরুন, আমি যদি বুঝেছেন কি না, থাক্ সত্যি কথাগুলি ব'লে ফেলি।

পতিত। বেশ তো,—ব'লো না। ব'লে মজাটা কি তা দেখবে।

রঘু। মজা তো বুঝেছেন কি না, টাকা ক'টা আমাকে ফেরৎ দিতে হবে?

পতিত। টাকা ফেরৎ দাও না দাও, প্রবঞ্চনার কেসে জেলে ঢুকতে হবে।

রঘু। তা বেটা ছেলে তো, দিন কতক বুঝেছেন কি না জেলের ভাত জলই খেয়ে এলাম।

ক্রুদ্ধভাবে পতিতপাবন বলিলেন, "বেশ, তাই খেয়ে দেখবে সে ভাত জলের ভিতর মজা কত। জেলটা বাইরে থেকে দেখতে যেমন, ভিতরে ঠিক তেমন নয় এটা জেনো ঠাকুর।"

রঘুরাম বলিল, "জেলের ভিতর বা'র কোথাও বুঝেছেন কি না ভাল নয় দত্তমশায়। তবে বুঝেছেন কি না, বামুনের ছেলেকে কি আপনি জেলে দিতে পারবেন?"

রোষদীপ্ত কণ্ঠে পতিতপাবন বলিলেন, "তোমার মত দু'শো বামুনকে আমি জেলে দিতে পারি।"

রঘুরাম হাসিয়া উঠিল; বলিল, "তা যদি পার দত্তমশায় তবে আমিও বুঝেছেন কি না, খুব জেলে যেতে পারবো। বামুনের ছেলে—মিছে দলিল লিখে দিয়ে যে পাপ করেছি, জেল খেটে বুঝেছেন কি না, তার প্রায়শ্চিত্ত ক'রে আসবো।"

রোষক্ষুব্ধ কণ্ঠে পতিতপাবন বলিলেন, "সে সাহস তোমার আছে?"

রঘুরাম বলিল, "আছে কি না তা মামলার দিনেই দেখে নেবেন। জেল কি, যদি ফাঁসি যেতে হয়, তা হ'লেও বুঝেছেন কি না, সত্যি কথা আমি বলবো, নয় তো আমি বামুনের ছেলেই নই।"

পতিতপাবন বসিয়াছিলেন, উঠিয়া দাঁড়াইলেন; ক্রোধ কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "বটে! আজ ক'ছিলিম গাঁজা টেনে এসেছ ঠাকুর?"

শান্তস্বরে রঘুরাম বলিল, "গাঁজাই টানি আর যাই করি, বামুনের ছেলে আমি। চৌধুরী মশায়ের চোখের জলে বুঝেছেন কি না, গাঁজার নেশা ছুটে গিয়েছে, বামুনের প্রাণটা সাড়া দিয়ে উঠেছে।"

পতিতপাবন দেখিলেন, সকলেরই প্রশংসাসমুজ্জ্বল দৃষ্টি রঘুরামের উপর নিপতিত হইয়াছে, আর তাঁহার দিকে এক একবার ঘৃণাপূর্ণ তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে। ক্রোধে ক্ষোভে পতিতপাবনের চোখ দুটো যেন জ্বলিয়া উঠিল। তিনি রঘুরামের মুখের উপর জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তীব্রকণ্ঠে বলিলেন, "গাঁজার ঝোঁকে খুব বাহাদুরী দেখিয়েছ ঠাকুর। কিন্তু মনে ক'রো না, পতিতপাবন দত্ত তোমার চাইতে ছোট লোক। তাই তাকে ছোট ক'রে দিয়ে সকলের সামনে তুমি উচু হ'য়ে উঠবে।"

বলিয়া তিনি নরহরির দিকে ফিরিয়া ডাকিলেন, "চৌধুরী!"

নরহরি এতক্ষণ নতমুখে নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন, পতিতপাবনের আহ্বানে তিনি মুখ তুলিলেন। পতিতপাবন বলিলেন, "আমাকে কিছুতেই তোমার পছন্দ হবে না?'

দৃঢ়স্বরে নরহরি উত্তর করিলেন, "না।"

পতিতপাবনের চোখে মুখে একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। তিনি কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে থাকিয়া পুরোহিতের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখনো লগ্ন আছে?"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "খুব আছে। এগারোটা পর্য্যন্ত লগ্ন; এখন বোধ হয় ন'টা বাজে।"

পতিতপাবন ভ্রূকুটী করিলেন। নিকটেই হরনাথ নীরবে বসিয়াছিল। পতিতপাবন ধাঁ করিয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া ফেলিলেন এবং অন্য হাতে নরহরির একটা হাত ধরিয়া উচ্চহাসি হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন, "যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়। এ ছোঁড়া সন্ধ্যার আগেই এসেছিল, আর বাড়ীতে পা দিয়ে অবধি এখানে আস্‌বার জন্য ছট্‌ফট্ কচ্ছিল। কিন্তু পাছে এই রকমটা ঘটে, সেই ভয়ে আসতে দিই নাই, নিজে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছি। কিন্তু যে ভয় করেছিলাম তাই ঘটে গেল। আমি এত জাল জালিয়াতি ক'রে কত্তে গেলাম ডিক্রীজারি, আর তার ফলটা ভোগ করলে হরা ছোঁড়া। তা করুক, আমি কিন্তু দেখবো, ঐ গাঁজাখোর বামুনটা কি ক'রে জেলে যায়।"

সকলে সমস্বরে সাধু সাধু বলিয়া উঠিল। পতিতপাবন দাঁতে ঠোঁট চাপিযা নরহরি ও হরনাথকে টানিতে টানিতে বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন।

* * *

বিষাদময় অন্ধকার গৃহে আলোকমালায় সমুজ্জ্বল—মঙ্গল-শঙ্খে মুখরিত হইয়া উঠিল। বধূবেশে সজ্জিতা গৌরীর লজ্জারক্ত নবীন আশার জ্যোতিতে প্রদীপ্ত মুখের দিকে হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া পতিতপাবন হাস্যরোল কণ্ঠে বলিলেন, "হাস্‌চিস কি গৌরী, আমার প্রতিজ্ঞা আমি ঠিক বজায় করেছি। ডিক্রীজারি ক'রে না হয় বুড়োর ঘর ভিটে বা দু'খানা পেতল কাঁসা নীলামে ডেকে নিতাম। কিন্তু ডিক্রীর আগেই বুড়োর সব চেয়ে যা সেরা জিনিস, যা ওর পাঁজরার হাড়ের মত, তাই নীলাম ক'রে নিয়ে চল্‌লাম। কেমন চৌধুরী হার হ'ল কার? তোমার না আমার?"

হর্ষ গদ্‌গদ কণ্ঠে নরহরি বলিলেন, "আমিই হেরেছি পতিতপাবন। ঝগড়া বিবাদে তোমার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া আমার কাজ নয়।"

কৃত্রিম বিষাদে মুখখানা ভারী করিয়া পতিতপাবন বলিলেন, "তবু তো তুমি মামলায় জিতে আমাকে ভোজ খাইয়ে দিয়েছ। আমি কিন্তু—"

নরহরি বলিয়া উঠিলেন, "তার চাইতে ভাল ভোজ বৌ ভাতের দিনে তুমি খাইয়ে দেবে।"

কৌতুক কলহাস্যে বিবাহসভা শব্দিত হইয়া উঠিল।

সম্পূর্ণ



ভবঘুরে

[উপন্যাস]

নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

মূল্য ১৷০ টাকা

ভবঘুরে

১

গ্রামের মধ্যে ভোলা ঠাকুরের মত অপ্রয়োজনীয় ও নিষ্কর্ম্মা লোক যে একজনও ছিল না, এ কথা গ্রামের ছেলে বুড়া সকলেই জানিত। শুধু যখন মড়া-পোড়াইবার লোক জুটিত না, তখনই ভোলা ঠাকুরের ডাক পড়িত; যখন ক্রিয়াকর্ম্মে লোকাভাবে ভাত রাঁধা হইত না, তখনই লোকে নিষ্কর্ম্মা ভোলা ঠাকুরকে ডাকিয়া লইয়া যাইত। ভিন্ন গ্রামে ডাক্তার ডাকিবার দরকার হইলে ভোলানাথের খোঁজ হইত। খোঁজ পড়িলে ভোলানাথও চুপ করিয়া থাকিত না, বিনা প্রতিবাদে গিয়া লোকের কর্ম্মোদ্ধার করিয়া দিত। কাজ শেষ হইলে কোন কোন প্রবীণ ব্যক্তি নিষ্কর্ম্মা বলিয়া যখন তাহাকে তিরস্কার করিত, তখন সে নীরব মৃদু হাস্যে তাহার উত্তর দিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিত। ঘরে সঙ্গীর মধ্যে ছিল একটি সেতার; ভোলানাথ এই সুখে দুঃখে উদাসীন সঙ্গীটিকে লইয়াই জীবন কাটাইয়া দিত।

এই সেতারের একটু ইতিহাস ছিল। একবার ভোলানাথ জনৈক মুন্সেফের পাচকরূপে বিষ্ণুপুর অঞ্চলে গিয়া কিছুদিন বাস করিয়াছিল। বিষ্ণুপুর চিরকালই সঙ্গীতবিদ্যার জন্য প্রসিদ্ধ। এই প্রসিদ্ধ স্থানে গিয়া এবং মধ্যে মধ্যে মুন্সেফ বাবুর বৈঠকখানায় ওস্তাদদিগের সঙ্গীত আলোচনা শুনিয়া এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিদ্যাটিকে আয়ত্ত করিবার জন্য তাহার আগ্রহ জন্মিল। সে নিকটবর্ত্তী এক ওস্তাদের শরণাপন্ন হইল, এবং অবসরমত তাঁহার ফরমাস খাটিয়া, গাঁজা সাজিয়া দিয়া সা রে গা মা সাধিতে লাগিল।

বয়স পঁচিশের উপর হইলেও ভোলানাথ তখনও অবিবাহিত। বিবাহের কোন সম্ভাবনাও ছিল না। এই ভীষণ কন্যাদায়ের যুগেও তাহার মত অগ্নিদগ্ধা ও মূর্খকে কন্যাদান করিয়া কোন পিতাই যে কন্যাদায় হইতে উদ্ধারলাভে ব্যস্ত নহেন, কয়েকবার চেষ্টার পর ভোলানাথ ইহা বুঝিতে পারিয়াছিল। কোন কোন সহৃদয় পিতা উপযুক্ত মূল্য লইয়া কন্যা-বিক্রয়ে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু সে মূল্যের পরিমাণ এত অধিক যে, ভোলানাথ তদপেক্ষা আপনার দুই চারি বিঘা ব্রহ্মোত্তর ও ভদ্রাসনখানিকে অধিকতর মূল্যবান্ জ্ঞান করিয়াছিল, এবং বিবাহিত জীবনের দুঃখ-দুর্দ্দশা-পূর্ণ অংশগুলিকে মনোমধ্যে জাগাইয়া অবিবাহিত জীবনটাকেই সুখ-শান্তির আস্পদ বলিয়া স্থির করিয়া লইয়াছিল।

কিন্তু বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতবন্ধুরা তাহার এই সঙ্কল্প বিচলিত করিয়া দিল, এবং বিবাহ না করিলে জীবনটা যে আধখানা হইয়া থাকে, ও সে অসম্পূর্ণ জীবনে ধর্ম্ম-কর্ম্ম কোনটাই সফল হয় না, ইহা তাহাকে বুঝাইয়া দিল। তাহাদের কথায় ভোলানাথ একটু কাতর হইয়া পড়িল। বন্ধুবর্গ তাহাকে আশ্বাস দিয়া পাত্রীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। পাত্রী মিলিল, সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল। ভোলানাথের মাহিনার টাকা কিছু জমিয়াছিল, মুন্সেফ বাবুও অগ্রিম বেতন এবং ব্রাহ্মণের বিবাহে দানস্বরূপ কিছু টাকা দিলেন। তারপর একদিন ভোলানাথ হাতে সূতা বাঁধিয়া, পাল্কী চড়িয়া, বরযাত্রী সমভিব্যাহারে বিবাহ করিতে চলিল। কিন্তু বিবাহ হইল না, সম্প্রদানের পূর্ব্বেই প্রকাশ পাইল, মেয়েটি অধিকারী ব্রাহ্মণের কন্যা। ভোলানাথ হাতের সূতা ছিঁড়িয়া পদব্রজেই পলাইয়া আসিল।

বিবাহের ব্যয়স্বরূপ কন্যার পিতাকে এক শত টাকা অগ্রিম দেওয়া হইয়াছিল। ভোলানাথ টাকার তাগাদা করিতে লাগিল। টাকা কিন্তু আদায় হইল না, গরীব ব্রাহ্মণ টাকাটা খাইয়া ফেলিয়াছিলেন। সুতরাং দুই চারিটা করারের পর শেষে তিনি নিজ সঙ্গীতসহচর সেতারটি ভোলানাথকে দিয়া, অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়া রেহাই পাইলেন। অনেকেই নালিশ করিবার জন্য ভোলানাথকে পরামর্শ দিল। ভোলানাথ কিন্তু লজ্জাকর ব্যাপারটাকে আদালত পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে ইচ্ছুক হইল না।

সেতার পাইয়া ভোলানাথ এবার নবোদ্যমে সেতার-শিক্ষায় মনোনিবেশ করিল। শিক্ষা কিন্তু সম্পূর্ণ হইল না, তৎপূর্ব্বেই মুন্সেফ বাবু নোয়াখালীতে বদলী হইলেন। ভোলানাথ পদ্মা পার হইয়া সে দূরদেশে যাইতে রাজী হইল না, দেশে ফিরিয়া আসিল। আসিবার সময় বিষ্ণুপুরের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ দুইটি জিনিষ সঙ্গে আনিল;—একটি সেতার, অপরটি গাঁজা।

দেশে আসিয়া ভোলানাথ দিনকতক সেতার লইয়া খুব নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। লোকে তাহার সেতারটির দাম জিজ্ঞাসা করিলে, ভোলানাথ সগর্ব্বে উত্তর করিত "দাম বড় কম নয়, নগদ একশত টাকা। এ কি আজকালকার খেলো জিনিষ। এ সব খাঁটি যন্ত্র আজকাল আর বাজারে নাই।"

বলিয়া সে সেতারের তারের উপর অঙ্গুলিসঞ্চালনে পিড়িং পিড়িং শব্দ বাহির করিয়া তাহার প্রাচীনত্ব ও মূল্যবত্তা বুঝাইতে চেষ্টা করিত। অজ্ঞলোকে দাম শুনিয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিত, বিজ্ঞলোকে মুখ টিপিয়া হাসিত।

কিন্তু দিন কয়েক ব্যবহারের পরই ভোলানাথ উপযুক্ত শিক্ষাদাতা ও শ্রোতার অভাবে বিরক্ত হইয়া সেতারটিকে তুলিয়া রাখিল। কেবল গাঁজাটাই সকালে সন্ধ্যায় তাহার চিত্তে বিষ্ণুপুরের স্মৃতিটা জাগাইয়া রাখিল। তবে যেদিন স্তব্ধ মধ্যাহ্নটা বড় অলস, বড় দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইত, অন্ধকারময়ী রজনী প্রাণের উপর একটা গভীর নৈরাশ্যের ছাপ মারিয়া দিত, সেইদিন ভোলানাথ সেতারটি পাড়িয়া, তাহার ধুলা ঝাড়িয়া, তার বাঁধিয়া বাজাইতে বসিত। সে বাজনা কেহ শুনিত না; ভোলানাথ নিজেই বাজাইত, নিজেই কান খাড়া করিয়া শুনিত। এই নির্জ্জীব সঙ্গীটি মৃদু পিড়িং পিড়িং শব্দে তাহার কানের ভিতর যেন সুধার প্রবাহ ঢালিয়া দিয়া, তাহার সকল বেদনা, সকল বিরক্তি মুহূর্ত্তে মুছাইয়া দিত।

দুই চারি ঘর পৈতৃক যজমান-শিষ্য ছিল। ভোলানাথ তাহাদের দরজায় যাইত না। যজমানেরা যাইতে বলিলে ভোলানাথ উপহাসের হাসি হাসিয়া বলিত, "আমি আচমন কর্ত্তে জানি না, আমি গিয়ে কি করবো?"

পাঁচ সাত বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমি ছিল, জ্ঞাতি খুড়া লোচন চক্রবর্ত্তী তাহার অধিকাংশই অধিকার করিয়া বসিলেন। লোকে ভোলানাথকে খুড়ার নামে নালিশ করিতে পরামর্শ দিল; কিন্তু ভোলানাথ তাহাদিগকে পাগল উপাধি প্রদান করিয়া বলিল, "খুড়োর নামে নালিশ!"

পাঁচজনে ইহাতে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া স্থির করিল, লোকটা শুধু অপদার্থ নয়, নেহাৎ নিষ্কর্ম্মা। ভোলানাথ কিন্তু তাহাদের এই বিরক্তিতে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বেশ প্রসন্নভাবেই দিন কাটাইতে লাগিল। পাঁচজনের বেগার খাটিয়া মড়া পোড়াইয়া, গাঁজা খাইয়া দিনগুলাকে বেশ সহজ করিয়া আনিল। যখন একটু কঠোর বোধ হইত, তখন সেতারটা পাড়িয়া তাহার ধুলা ঝাড়িয়া, তার বাঁধিয়া বাজাইতে বসিত, এবং তাহার পিড়িং পিড়িং শব্দের মধ্যে আপনার সকল দুঃখ-দৈন্য ডুবাইয়া দিয়া মনটাকে স্থির করিয়া লইত।

শুধু বিবাহের কথায় মনটা একটু চঞ্চল হইয়া উঠিত; কিন্তু লোকে যখন বলিত, "নিষ্কর্ম্মা লোকের বিয়ে ক'রে কি হবে?" তখন ভোলানাথ আপনার অক্ষমতা স্মরণ করিয়া একটা ক্ষুদ্রনিশ্বাস ত্যাগ করিত।

২

"ভোলা!"

"কেন গা দিদি?"

"দুদিন যে তোর সাড়া পাইনি?"

মৃদু হাসিয়া ভোলানাথ বলিল,—"আর সাড়া! ম'রে গেছলাম দিদি।"

দিদি একটু বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"সে আবার কি রে?"

"ভয়ানক জ্বর! জ্বরে একেবারে বেহুঁস!"

"ও মা, তোর জ্বর হ'য়েছিল?"

"জ্বর ব'লে জ্বর দিদি, যেমন মাথার যাতনা, তেমনি তেষ্টা। আবার গেরোর ফের দেখ, আগের দিন জলটুকু পর্য্যন্ত তুলে রাখ্‌তে ভুল হয়েছিল। এক ফোঁটা জলের তরে—হায় হায়, সে যে কি যাতনা দিদি, তা আর তোমাকে কি বল্‌বো।"

ব্যথিত-কণ্ঠে দিদি বলিলেন,— "ও মা গো, তা তুই কোন্ আমাকে একটু খবর দিলি?"

ম্লান হাসি হাসিয়া ভোলানাথ বলিল,—"খবর দেবার ক্ষমতা থাক্‌লে তো দেব। চরণ মোড়ল এক-বার এসেছিল, তাকে বলেছিলেম, 'দিদিকে খবর দিয়ে যা।' কিন্তু বোয়ে গেছে তার খবর দিতে। আমি এই দিদি আসে, এই দিদি আসে ক'রে সারা দিনরাত কাটিয়ে দিলাম, কিন্তু কোথায় দিদি, কোথায় কে?"

দিদি ব্যস্ত কণ্ঠে বলিলেন,—"হরি হরি, সে আমাকে মোটেই খবর দেয়নি।"

ভোলানাথ বলিল,—"সে আমি বুঝেছি দিদি, খবর পেলে কি তুমি না এসে থাক্‌তে পাত্তে? আচ্ছা আসুক শালা এবার তামাক খেতে, জুতো মেরে তাড়াব।"

দিদি নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভোলানাথ বলিল,—"দেখ্‌ছি দিদি, লোকগুলা উপোসের কেউ নয়, পারণার ঠাকুর। পর বৈ তো নয়। কিন্তু

কোন্‌দিন হয় তো এমনি ক'রে ম'রে প'ড়ে থাক্‌তে হবে, মুখে এক গণ্ডূষ জল দেবারও কেউ থাক্‌বে না।"

দিদি কিয়ৎক্ষণ গম্ভীরভাবে থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—"এই জন্যেই তো বলি, বিয়ে কর্।"

ম্লান হাসি হাসিয়া ভোলানাথ বলিল,—"আরে বিয়ে! বে একেবারে কাঠে খড়ে হবে।"

ভোলানাথ হাসিয়া উঠিল। কিন্তু তাহার সেই হাসির অন্তরালে যে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস রহিয়া গেল, তাহা দিদির দৃষ্টি অতিক্রম করিল না। তিনি তিরস্কারের স্বরে বলিলেন, "কথার ছিরি দেখ! এমন কথাই বুঝি বল্‌তে হয়?"

মস্তক-সঞ্চালন করিতে করিতে ভোলানাথ বলিল, —"সাধে কি বলি, অনেক দুঃখেই যে বল্‌তে হয় দিদি! বিয়ের তরে না করেছি কি, হাতে সুতো পর্য্যন্ত বেঁধে ফিরে এসেছি।"

দিদি দাঁড়াইয়াছিলেন; তিনি দাবার উপর পা ঝুলাইয়া বসিলেন; বলিলেন,—"আচ্ছা, এবার আমি একবার দেখবো। তুই কিছু টাকার যোগাড় দেখ দেখি।"

ভোলানাথ বলিল,—"আমার তো দেড় শো টাকা মজুদ আছে।"

ঈষৎ চিন্তিতভাবে দিদি বলিলেন,—"তাতে তো হবে না, অন্ততঃ শ' তিনেক টাকা চাই।"

ঘাড়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে ভোলানাথ বলিল, —"এত টাকা কোথায় পাব?"

দিদি নিরুত্তরে বসিয়া রহিলেন। ভোলানাথ বলিল,—"তুমি তো মহাজনী কর, টাকাটা ধার দাও না।"

বলিয়া ভোলানাথ সতৃষ্ণ-দৃষ্টিতে দিদির মুখের দিকে চাহিল। দিদি বলিলেন,—"আচ্ছা, তার তরে আট্‌কাবে না। তা হ'লে আমি যোগাড় দেখি, কি বলিস্?"

ভোলানাথ ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল—"তাই দেখ। সত্যি বল্‌তে কি দিদি, আমারও আর ভাল লাগছে না। ধর, একটু অসুখ-বিসুখ হ'লে মুখে জল দেবার লোক নাই।"

দুঃখ-মিশ্রিত স্বরে দিদি বলিলেন,—"তা তো বটেই।"

ভোলানাথ সোৎসাহে বলিল—"ধর না, কতদিন এখন বাঁচতে হবে, কে জানে। কালই তো মরুছি না।"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া দিদি বলিলেন,—"দূর হতভাগা!"

ভোলানাথ মৃদু হাসিল। অতঃপর দিদি তাহাকে বিবাহ বিষয়ে আশ্বাস দিয়া প্রস্থান করিলেন। ভোলানাথ উঠিয়া কোঁচার কাপড়টা কোমরে জড়াইয়া উনান ধরাইল এবং তাহাতে ভাতের হাঁড়ীটা চাপাইয়া দিয়া সোৎসাহে গান ধরিল—

"আমার এমন দিন কি হবে তারা।"

৩

এখানে দিদির একটু পরিচয়ের প্রয়োজন। ভোলানাথের জ্ঞাতিসম্পর্কীয় এক জ্যেঠা ছিলেন। দিদি তাঁহারই মেয়ে, নাম সুভদ্রা। জ্যেঠার এই মেয়েটি ছাড়া আর কেহ ছিল না, মেয়েটিরও বাপ ছাড়া আর কেহ ছিল না। অল্পবয়সেই বিধবা হইয়া সে বাপের কাছে আসিয়াছিল। শ্বশুরবাড়ীর ভিটা পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া যে দুই চারি শত টাকা আনিয়াছিল, তাহাই লইয়া মহাজনী আরম্ভ করিয়াছিল এবং সুদে সুদে তাহাকে অনেকগুলি টাকায় পরিণত করিয়াছিল। লোকে বিপদে আপদে পড়িলেই সুবো ঠাক্‌রুণের কাছে আসিয়া হাত পাতিত। হাত পাতিয়া তাহাদিগকে নিরাশ হইয়া ফিরিতে হইত না। লেখাপড়া কখন হইত, কখন হইত না। কিন্তু সেজন্য টাকা আদায়ে কোন ব্যাঘাত হইত না। বামুনের মেয়ে যখন দ্বারে গিয়া হত্যা দিয়া পড়িত এবং তাহার মুখ দিয়া যখন অভিশাপের কঠোর বাণী নির্গত হইতে থাকিত, তখন লোকে সুদ আসলের পাই পয়সা পর্য্যন্ত মিটাইয়া না দিয়া থাকিতে পারিত না।

বাপ বুড়া, চোখেও কম দেখিতেন, সুতরাং তাঁহাকে সুভদ্রার উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইত। সুভদ্রারও মহাজনী ছাড়া আরও অনেক কাজ ছিল। বিবাহে ঘটকালী করা, লোকের ঘরাঘরি বিবাদ মিটাইয়া দেওয়া, মেয়ে-জামায়ের বাড়ীতে কিরূপ তত্ত্ব দেওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে উপদেশ-দান ইত্যাদি নানাবিধ কাজ লইয়া সে সারাদিন ঘুরিয়া বেড়াইত। গ্রামে এমন লোক ছিল না—যাহার ভাতের হাঁড়ীর খবর পর্য্যন্ত সুভদ্রার অগোচর ছিল। এইরূপে গ্রামের মধ্যে সুবো ঠাক্‌রুণের নাম খুব জাহির হইয়া পড়িয়াছিল। অনেকে তাহাকে শ্রদ্ধা করিত, অনেকে ভয় করিত, অনেকে মুখে শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেও মনে মনে তাহার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করিত।

বিধবা সুভদ্রা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত, যৌবনও তখন সম্পূর্ণ অপগত হয় নাই। সুতরাং দুষ্ট লোকে কয়েকবার তাহার কলঙ্ক রটনা

করিয়াছিল ; কিন্তু মহাজনী কারবারে সুভদ্রা গ্রামের এত লোককে বশীভূত করিয়া ফেলিয়াছিল যে, দুষ্ট লোকের সে সকল নিন্দায় তাহার কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই।

ভোলানাথের সহিত সুভদ্রার একটু বাধ্য বাধকতা ছিল। সুভদ্রার নিকট অর্থ সম্বন্ধে বাধ্য না থাকিলেও সে মধ্যে মধ্যে আসিয়া ভোলানাথের গৃহকার্য্যে যে সহায়তা করিত, অসুখ-বিসুখ হইলে এক মুঠা পথ্য রাঁধিয়া দিয়া যাইত, তাহাতেই সে সুবো দিদির নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, এবং সুবো দিদির হাট-বাজার করিয়া দিয়া, জমি-জায়গার দেখা-শুনা করিয়া তাহার প্রতিদান দিবার চেষ্টা করিত। কিন্তু ইহা ছাড়া যেন স্নেহ ভক্তিরও একটু বাধ্যবাধকতা ছিল। সহায়-স্বজনশূন্য এই অলস লোকটির উপর স্বভাবতই সুভদ্রার একটু মমতা জন্মিয়াছিল, এবং ঠিক সেই কারণেই ভোলানাথও তাহাকে একটু ভক্তিশ্রদ্ধা করিত।

তবে মমতা থাকিলেও এবং ভোলানাথকে বিবাহিত করিবার জন্য ইচ্ছুক হইলেও সুভদ্রা তাহার বিবাহের কোন উপায় দেখিতে পায় নাই। চারিশত টাকার কমে বিবাহ হইবে না, আর ভোলানাথ এত টাকা ঋণ করিয়াও বিবাহে সম্মত নহে ; সুতরাং সুভদ্রাকে মনের ইচ্ছা মনেই চাপিয়া রাখিতে হইয়াছিল। কিন্তু সহসা এমন একটি সুযোগ আসিল, যাহাতে তাহার স্বার্থ পরার্থ উভয়ই সাধিত হইতে পারে।

গ্রামের কৈলাস আকুলি পুত্রের বিবাহ দিবার জন্য সুভদ্রার নিকট দুই শত টাকা কর্জ্জ লইয়াছিলেন। তিনি তিন বৎসরে সুদের দেড়শত টাকামাত্র মিটাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু আসলের এক পয়সাও শোধ করিতে পারে নাই। শোধ করিবার উপায়ও তেমন ছিল না। শুধু তাঁহার দশ বছরের একটি মেয়ে ছিল, সেইটিকে বিক্রয় করিয়া ঋণ শোধ করিবেন, আকুলি মহাশয় এইরূপই আশা করিয়াছিলেন।

সুভদ্রা স্থির করিল, ভোলানাথের সহিত এই মেয়েটির বিবাহ দিয়া সে একদিকে ভোলানাথকে যেমন সংসারী করিবে, অন্যদিকে তেমনই তাহার নিকট হইতে আসলের টাকাটা বুঝিয়া লইবে। আকুলি তাহার খাতক, সে অবাধ্য হইতে পারিবে না।

আকুলিও অবাধ্য হইলেন না। না হইবার কারণও ছিল ; তাঁহার কালো মেয়েটিকে টাকা দিয়া কেহই গ্রহণ করিতে রাজি ছিল না। ভোলানাথ যখন রাজি হইল, তখন আকুলি তাহাতে সহজেই রাজি হইলেন। তিনি সুভদ্রার দুই শত টাকা শোধ দিয়া এবং ঘর-খরচস্বরূপ পঞ্চাশটি টাকা লইয়া কন্যা দিতে প্রস্তুত হইলেন। ভোলানাথের দেড় শত টাকা মজুদ ছিল, বাকী একশত টাকার জন্য সুভদ্রাকে তমশুক লিখিয়া দিবে স্থির হইল। শুভস্য শীঘ্রং, অগ্রহায়ণের শেষেই বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল।

গ্রামের লোকে কথাটা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। যাহাদের ধারণা ছিল, অবিবাহিত ব্রাহ্মণ-সন্তান মারা গেলে ব্রহ্মদৈত্যযোনি প্রাপ্ত হয়, তাহারা ভবিষ্যতে একটা ব্রহ্মদৈত্যের ভীতি হইতে উদ্ধার পাইল বলিয়া আনন্দিত হইল, কিন্তু এই আনন্দের মধ্যেও বিষাদের একটু কারণ ঘটিল। তাহারা সুখে দুঃখে আপদে বিপদে, যে একটি লোককে না ডাকিয়াও পাইত, এখন আর তাহাকে ডাকিয়াও পাইবে না।

৪

এমন কোন কোন প্রাণী আছে, যাহারা জীবনের কতকটা সময় অসাড়ে পড়িয়া ঘুমায়, তারপর সহসা একদিন জাগিয়া উঠিয়া এমনই ব্যস্তভাবে খাদ্যান্বেষণে প্রবৃত্ত হয়, যেন তাহার সমগ্র নিদ্রাকালের ক্ষুধাটা একদিনের জাগরণেই মিটাইয়া লইতে চাহে। ভোলানাথও ঠিক তাহাদেরই মত এতকাল লোকের বেগার খাটিয়া জীবনে যে ক্ষতি করিয়াছে, বিবাহের প্রস্তাবে সহসা সচেতন হইয়া বিশ বৎসরের ক্ষতিটা বিশ দিনেই পোষাইয়া লইতে ব্যস্ত হইল। এখন আর সে উদাসীন নহে—গৃহী ; আজ একা আছে, কা'ল দুই জন হইবে ; পাঁচ দিন পরে আরও পাঁচজন আসিয়া সংসারটাকে খুব বড় একটা গৃহস্থালীতে পরিণত করিবে। এখন হইতে অর্থ সঞ্চয়ে মন না দিলে, তখন কি হইবে? তখন কিরূপে এতগুলি প্রাণীর ভরণপোষণ করিবে? ভবিষ্যতের সে দিনগুলাকে যেন খুব নিকটবর্ত্তী দেখিয়া ভোলানাথ অতিমাত্র ব্যস্ততার সহিত অর্থসঞ্চয়ে মনোনিবেশ করিল।

ভোলানাথ লেখাপড়া জানিত না, শুধু পাচকের কাজ জানিত। যাহা জানিত, তাহা লইয়াই ব্যবসায় আরম্ভ করিল। স্বগ্রামে ও ভিন্নগ্রামে ক্রিয়াকর্ম্মে যেখানে পাচকের দরকার হইত, ভোলানাথ টাকা লইয়া সেইখানে কাজ করিয়া আসিত। সুতরাং পয়সা'র কাজের জন্য বেগার কাজটা কম পড়িল।

ভোলানাথ হিসাব করিয়া দেখিল এই দশটা বছরে বেগার না খাটিয়া যদি নিজের কাজ করিত, তাহা হইলে খুব কম করিয়া বৎসরে এক শত টাকা ধরিলেও দশ বৎসরে অন্ততঃ হাজার টাকাও হাতে জমিত। ওঃ! হাজার—দশ শো টাকা! হায় হায়, সে কি নির্ব্বোধের কাজই করিয়াছে! আজ কি না তাহাকে এক শত টাকার জন্য তমশুক লিখিতে হইবে। ভোলানাথ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, আর বেগার নয়, এবার নিজের কাজ, শুধু নিজের কাজ।

পরেশ চক্রবর্ত্তী আসিয়া বলিলেন, "ওহে ভোলানাথ, কা'ল বৌমার সাধ, বেশী তো পারবো না, তবু শ খানেক লোক হবে। কিন্তু তোমার খুড়ীর অবস্থা জান তো, হাঁড়ী ধরবার ক্ষমতা নাই। দিদি একা। কি হবে বাবা?"

ভোলানাথ গম্ভীরভাবে উত্তর করিল, "বেশ, কত দেবেন?"

দিবার কথা শুনিয়া চক্রবর্ত্তী আশ্চর্য্যান্বিতভাবে ভোলানাথের মুখের দিকে চাহিলেন। ভোলানাথ মাথা নীচু করিয়া স্থিরস্বরে বলিল, "দু'টাকা চাই।"

চক্রবর্ত্তী মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে করিতে, "আচ্ছা, বাড়ীতে বুঝে দেখি" বলিয়া প্রস্থান করিলেন, এবং পথে যাইতে যাইতে যাহাকেই সম্মুখে দেখিলেন, তাহাকেই ভোলানাথের চক্ষুলজ্জাহীনতা সম্বন্ধে নানাবিধ কথা বলিতে লাগিলেন।

নীলু সামন্ত একদিন আসিয়া সকাতরে বলিল,—"বাবাঠাকুর গো, বৌটা যায় যায়, তাকে একা ফেলে ওষুদ আন্‌তে যেতে পাচ্চি না। কি হবে বাবা-ঠাকুর?"

ভোলানাথ স্পষ্টবাক্যে জবাব দিল,—"আমার আজ গোপালগঞ্জে রায়েদের বাড়ীতে রান্নার বায়না আছে। তিন টাকা দেবে।"

বলিয়াই ভোলানাথ ঘরে চাবী দিয়া হাতা-খুন্তী লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। নীলু হাঁ করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

সে দিন কিন্তু ভোলানাথ বেশ মন দিয়া রাঁধিতে পারিল না। রাঁধিতে রাঁধিতে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতে লাগিল। সেদিন রান্না খাইয়া কেহই ভোলানাথের প্রশংসা করিতে পারিল না। দুই একজন আসিয়া বলিল,—"হাঁ ঠাকুর, আজ কি রকম রেঁধেছ?"

ভোলানাথ রাগিয়া উত্তর করিল,—"সব দিন কি রান্না সমান হয়?"

আগে বারোয়ারীতলায় ঠাকুরের কাঠাম বাঁধা হইতে ঠাকুর জলে পড়া পর্য্যন্ত ভোলানাথ সেস্থান ত্যাগ করিত না, এখন কিন্তু সেখানে যাত্রার ঢোলে ঘা পড়িলেও ভোলানাথকে সেখানে দেখা যাইত না। মেরাপ বাঁধা বা বাজার করার জন্য তাহাকে ডাকিলে সে বিরক্তির সহিত উত্তর করিত,—"সবাই চাঁদা দেয়, আমিও দিই। তবে আমিই বা কেন মজুরের মত খাটিতে যাব?"

কেন যে যাইবে এ কথার উত্তর কেহ দিতে পারিত না, তবে ইহাতে সকলেই তাহার উপর যেন একটু বিরক্ত হইয়া পড়িত।

আগে যে ভোলানাথ কান্নার শব্দ শুনিলেই ছুটিয়া যাইত, একাই মড়া কাঁধে লইয়া, কাঠ কাটিয়া পোড়াইয়া আসিত। শূদ্রের মড়া হইলে কাঠ কাটিয়া, চিতা সাজাইয়া এবং দাহ করার সম্বন্ধে নানাবিধ উপদেশ দিয়া সাহায্য করিত, এখন কাহারও ঘরে তিন দিন মড়া পড়িয়া থাকিলেও ভোলানাথ গিয়া উঁকি মারিত না। ভোলানাথের এই অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তনে অনেকে আশ্চর্য্যান্বিত হইল, অনেকে তাহার এই ঘোর স্বার্থপরতা দর্শনে, তাহার উপর রাগিয়া উঠিল।

৩

শেষ অগ্রহায়ণের সন্ধ্যাটা খুব জমাট শীত এবং ঘন কুয়াশা লইয়া সেদিন খুব বিষাদ-গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছিল। ভোলানাথ গাঁজা ছাড়িয়া দিয়াছিল, সুতরাং তামাকেই শরীরটা কোনরূপে গরম করিয়া সেতারটা লইয়া বসিয়াছিল। একে কন্‌কনে শীত, তাহার উপর ঘন অন্ধকার; গ্রামের কোন্ এক প্রান্ত হইতে একটা কান্নার সুর উঠিয়া অন্ধকারটাকে যেন আরও গম্ভীর আরও স্তব্ধ করিয়া তুলিতেছিল। সেতারের ঝঙ্কারে সেই কান্নার সুরটাকে ঢাকিয়া দিবার জন্য ভোলানাথ তারগুলার উপর দ্রুত অঙ্গুলিসঞ্চালন করিতে লাগিল।

প্রকৃতির গায় বিষণ্ণতার মধ্যে সেতারটাও আজ এমনই বিষণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিল যে, কিছুতেই গলা ছাড়িয়া ঝঙ্কার দিতে পারিতেছিল না; খানিকটা ছপ্‌ছপ্‌ ঝপ্‌ঝপ্‌ করিয়াই যেন এলাইয়া পড়িল; কট্ করিয়া একটা তার কাটিয়া গেল। ভোলানাথেরও বেশ ভাল লাগিতেছিল না; সে আর তার বাঁধিল না, সেতারটা কোলের উপরে ধরিয়া বাহিরের ঘন' অন্ধকারের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। দূরের কান্নার সুরটা মৃদুভাবে কানে আসিয়া বাজিতে লাগিল।

কে কাঁদে? রসিক মালিকের মা নাকি? রসিকের ভারী অসুখ বলিয়া বুড়ী কা'ল সন্ধ্যার সময় আসিয়া তাহাকে ডাক্তার ডাকিতে অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু ভোলানাথ অনুরোধ রক্ষা করিতে পারে নাই; সে তখন সাতপুকুর হইতে আসিয়া সবে মাত্র বসিয়াছে। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পর দুই ক্রোশ রাস্তা হাঁটিয়া আসিয়া আবার কি ডাক্তার ডাকিতে রামনগরে যাওয়া যায়? কেনই বা যাইবে? তাহাতে তাহার লাভ?

রসিকই কি মারা গেল? ঠিক তাহার মায়ের মতই আওয়াজ। আহা, বুড়ীর ঐ ছেলেটি ছাড়া আর কেহ নাই। যেমন তেমন ছেলে নয়, আঠার বৎসরের রোজগারী ছেলে। ছেলের বিবাহ দিবার জন্য বুড়ী তাড়াতাড়ি করিতেছিল। উঃ!

ভোলানাথের বুকটা কাঁপাইয়া একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল। আহা, যদি সে যাইত, যদি ডাক্তার আসিত, তাহা হইলে বোধ হয়, ছেলেটা বাঁচিতে পারিত। তাহারই আলস্যে—তাহারই উদাসীনতায় ছেলেটা বুঝি মারা গেল। ভোলানাথ সেতারের পিঠে মাথাটা রাখিয়া স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল।

সহসা ভোলানাথ মাথা তুলিয়া সোজা হইয়া বসিল। কেন, সে ছাড়া ডাক্তার ডাকিবার লোক গ্রামে আর কেহ নাই? সে কি ইতর ভদ্র সকলের চাকর? সকলেই নিজের নিজের কাজ লইয়া থাকিবে, আর সে একা দেশ শুদ্ধ লোকের বেগার খাটিবে? তাহার কি ঘর-দ্বার নাই? তাহাকে কি সংসারী হইতে হইবে না? হইবে না কি, আর পাঁচটা দিন মাত্র বাকী, পাঁচ দিন পরেই তো সে পুরা সংসারী। ভোলানাথ আবার সেতারের উপর মাথা রাখিয়া চোখ দুইটা মুদ্রিত করিল।

আর পাঁচ দিন পরে বিবাহ। বিবাহ—সে কি এক অপূর্ব্ব জিনিষ! সে আর একা থাকিবে না; রাত্রির এই স্তব্ধ অন্ধকার এমন করিয়া আর তাহাকে বিদ্রূপ করিতে পারিবে না। এমন অন্ধকারের ভিতরেও তাহাকে আর চুপ করিয়া থাকিতে হইবে না। তখন ঘরে আলো জ্বলিবে, একটি তরুণী সম্মুখে বসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবে; আর ভোলানাথও তাহার মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া কত সুখ-দুঃখের গল্প করিবে। সে গল্পে কত সুখ, সে দৃষ্টিতে কত আশা, কত আনন্দ।

ভোলানাথ শিহরিয়া মাথা তুলিল। তখন অনেকটা রাত্রি হইয়াছে; চন্দ্ররশ্মি কৃষ্ণা চতুর্থীর কুজ্ঝটিকার আবরণ ভেদ করিয়া বাঁশঝাড়ের ভিতর দিয়া উঁকি দিতেছে, অন্ধকারটা অনেক পাতলা হইয়া আসিয়াছে। সেই অস্পষ্ট আলোক-অন্ধকারের দিকে চাহিয়া ভোলানাথ খানিকটা বসিয়া রহিল, তারপর উঠিয়া আলো জ্বালিয়া ভাত বাড়িবার জন্য রান্নাঘরের দরজায় উপস্থিত হইল

৬

"বাবাঠাকুর গো!"

হাতের আলোটা উঠানের দিকে বাড়াইয়া দিয়া ভোলানাথ উত্তর দিল,—"কে গা?"

"আমি শন্ন গো বাবাঠাকুর।"

ভোলানাথ আলোটা রান্নাঘরের দরজার উপর রাখিয়া নামিয়া আসিল, এবং ধীরে ধীরে গিয়া বাহিরের দরজা খুলিয়া দিল। দরজা খুলিবামাত্র শন্ন তাহার পায়ের উপর আছাড় খাইয়া পড়িল, এবং আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল,—"বাবাঠাকুর গো, আমার ক্ষুদে বুঝি যায় গো।"

ভোলানাথ একটি কথাও বলিতে পারিল না, শুধু স্তব্ধগম্ভীরভাবে তাহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শন্ন জেলের মেয়ে। আঠার বৎসর বয়সে তিন মাসের ছেলেটি লইয়া যখন বিধবা হইল, তখন তাহার দাঁড়াইবার জায়গাটুকু পর্য্যন্ত ছিল না। সম্বলের মধ্যে ছিল শুধু একটু রূপ আর ভরা যৌবন। এই সম্বলটুকু লইয়া পথে দাঁড়াইলে অদৃষ্টে যাহা হয়, শন্নর তাহাই হইল; পাঁচজনের প্রলোভনে সে আপনাকে ঠিক রাখিতে পারিল না; সুখের আশায় প্রলুব্ধ হইয়া সমাজের সংস্রব ত্যাগ করিল। সে সমাজের সংস্রব ত্যাগ করিল বটে, কিন্তু সমাজের মস্তকস্বরূপ অনেকে তাহার সংস্রব ত্যাগ করিতে পারিল না, তাহারা এই সমাজচ্যুতের দ্বারে আতিথ্য স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইল না!

কিন্তু সে সব অনেক দিনের কথা, অতীতের একটা গুপ্ত কাহিনী। এখন আর সেদিন নাই, শন্নর সে রূপ সে যৌবন কিছুই নাই, আছে শুধু একটা কুৎসিত কলঙ্ক-কাহিনী। শন্ন এখন ঘৃণিত বেশ্যা, গ্রামপ্রান্তে সমাজের বাহিরে কুটীর বাঁধিয়া বাস করে, আর ধান ভানিয়া, মোট বহিয়া ছেলেটিকে মানুষ করে। শন্নর সুখ, সৌভাগ্য, ইহকাল পরকাল সব গিয়েছে, থাকিবার মধ্যে আছে শুধু এই ছেলেটি। ক্ষুদে চৌদ্দ বছরে পা দিয়াছে, আর দুই চারিটা বৎসর কোনরূপে কাটাইতে পারিলেই সে মানুষ হইয়া উঠিবে, খাটিয়া আপনি খাইতে, মাকে খাওয়াইতে পারিবে, এইটুকুই শন্নর

শেষ আশা। কিন্তু সে আশাটুকুও বুঝি যায়; গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যৎ জীবনপথের এক প্রান্তে যে একটি ক্ষীণ আলোক মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে, তাহাও বুঝি নির্ব্বাপিত হয়।

শন্ন আকুল কণ্ঠে কাঁদিয়া বলিল,—"বাবাঠাকুর গো, আমার কি হবে?"

একটা গভীর দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভোলানাথ বলিল,—"আমি কি কত্তে পারি শন্ন?"

শন্ন কাঁদিয়া বলিল,—"আমাকে ব'লে দাও বাবাঠাকুর, আমি কি করে ক্ষুদেকে বাঁচাব? সাত দিন একজ্বরী, বুকে কফ বসেছে, কথা বন্ধ হয়ে গেছে।"

ভোলানাথ স্তব্ধ-শ্বাসে দাঁড়াইয়া রহিল। শন্ন বলিল,—"লোকের দরজায় দরজায় মাথা খুঁড়ে এলাম, কেউ ফিরেও চাইলে না। কেশব ঠাকুর জুতো নিয়ে মাত্তে এলো। ঐ কেশব ঠাকুর একদিন কিন্তু আমার দরজায়—"

বাধা দিয়া তিরস্কারের স্বরে ভোলানাথ বলিল;—"ছি শন্ন!"

শন্ন বলিল,—"গায়ের জ্বালায় যে বল্‌তে হয় বাবাঠাকুর। আমার যে সব গেছে, শুধু ঐ গুঁড়োটুকু নিয়েই যে সংসারে আছি।"

জ্যোৎস্নার অস্পষ্ট আলোকে ভোলানাথ শন্নর বেদনা কাতর মুখের দিকে চাহিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর ধীরে-ধীরে গিয়া রান্নাঘরের দরজায় পুনরায় শিকল তুলিয়া দিল, এবং গোটাকতক টাকা ট্যাঁকে গুঁজিয়া ঘরে চাবী দিয়া শন্নকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"চল্।"

শন্ন একবার কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ দৃষ্টিতে ভোলানাথের মুখের দিকে চাহিয়া অগ্রসর হইল। ভোলানাথ দরজা বন্ধ করিয়া গম্ভীরভাবে তাহার অনুসরণ করিল।

ভোলানাথ তিন দিন তিন রাত ক্ষুদের রোগশয্যার পাশে বসিয়া কাটাইল; ডাক্তার আনিল, ঔষধ-পথ্য যোগাইল, কিন্তু সমাজপরিত্যক্তা ঘৃণিতা বেশ্যার একমাত্র আশার দীপটিকে কালের ঝটিকা হইতে কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিল না; চতুর্থ দিবসের সন্ধ্যাকালে দিবসের আলোকের সঙ্গে সঙ্গে তাহা নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। শন্নর চীৎকারে সান্ধ্য-গগন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। ভোলানাথ কুটীরের বাহিরে বসিয়া ভাবিতেছিল,—"আজ গায়ে হলুদের দিন ছিল বোধ হয়।"

মাঠপুকুরের ধারে ধু ধু করিয়া চিতা জ্বলিতেছিল, অদূরে শন্ন মড়ার মত পড়িয়াছিল। অবশ্য গাছের পাতার ভিতর দিয়া উষার রক্তিম রাগ ফুটিয়া উঠিতেছিল। ভোলানাথ পাড়ের উপর গাছতলায় বসিয়া, কোঁচার খুঁটটা গায়ে জড়াইয়া গুণ গুণ করিয়া গাহিতেছিল—

"মুদলে আঁখি সব যে ফাঁকি,
চিতের ছাই নিশানা রবে।"

৭

পরদিন ভোলানাথ হারু মুদীর দোকানে গিয়া তামাক খাইতে বসিলে, হারু নিজের হুঁকা হইতে কলিকাটা খুলিয়া তাহার হাতে দিল। ভোলানাথ জিজ্ঞাসা করিল,—হুঁকাটা কোথায় হে দাসের পো?"

দাসের পো দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া বলিল,—"আর হুঁকায় খেয়ে কাজ নাই। খান্‌কীর ছেলেকে পুড়িয়ে এসে বামুনের হুঁকায় তামাক খাবে!"

ভোলানাথ কলিকা-হাতে কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিল; তারপর আস্তে আস্তে কলিকা রাখিয়া উঠিয়া আসিল।

সুভদ্রা আসিয়া বলিল,—"হাঁ রে ভোলা, ওরে হতভাগা, তোর রকমটা কি বল্ তো?"

মৃদু হাসিয়া ভোলানাথ বলিল,—"আর কি দিদি, মেয়েমানুষটা কাঁদতে লাগ্‌লো, কি করি বল। তা বিয়েটা মাঘমাসে হ'লেই ক্ষতি কি?"

রাগতভাবে সুভদ্রা বলিল,—"তোর মাথা! তোরে আবার মেয়ে দেবে কে?"

"কেন দেবে না?"

"তুই বামুনের ছেলে হয়ে বেউশ্যের ছেলেকে পুড়িয়ে এলি কোন্ লজ্জায়?"

"পুড়িয়ে এলাম? কে বল্‌লে?"

"কেশব চক্রবর্ত্তী নিজের চোখে দেখে এসেছে। মড়া পোড়াতে পোড়াতে গান হচ্ছিল আবার। কেমন, না?"

সহাস্যে ভোলানাথ বলিল,—"ঠিক কথা দিদি! কেশব ঠাকুরের আর যত দোষই থাক, তিনি সত্যি ছাড়া কখন মিথ্যা বলেননি।"

সুভদ্রা রোষ-গম্ভীরভাবে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। ভোলানাথ বলিল,—"কি করি দিদি, ছেলেটা মারা গেল, মাগী তো আছাড়ি পিছাড়ি ক'রে মরে। ওদের জাতভাইদের জনে জনে হাতে পর্য্যন্ত ধর্‌লাম, টাকা কবুল কর্‌লাম, কিন্তু কোন বেটাই এগুলো না। ভারী রাগ হ'লো দিদি। শনিকে বল্‌লাম,—'ধর মাগী তুই পায়ের দিকটা, আমি বামুন, মাথার দিক্‌টা ধরি।' কাঠ কেটে পায়ে হাতে বেদনা হয়ে গেছে দিদি।"

সুভদ্রা বিস্ময়-স্তব্ধভাবে ভোলানাথের এই স্বীকারোক্তি শুনিতে লাগিল। শুনিয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিল,—"ভারী কাজই করেছিস্! বিয়ে কিন্তু আর হবে না।"

মাথা নাড়িয়া ভোলানাথ বলিল "'না হয় না হবে দিদি, আমি দেখ্ছি, বিয়ের চাইতে এই মড়া পোড়ান কাজটা খুব সহজ। চরণ, ওহে চরণ!"

চরণ রাস্তা দিয়া যাইতেছিল, ভোলানাথের আহ্বান শুনিয়া বাড়ী ঢুকিয়া বলিল,—"পেন্নাম। কেন গা খুড়োঠাকুর?"

ভোলানাথ বলিল,—"তুই বেটাকে যে আর দেখতেই পাই না। এই সিকিটা নিয়ে আধ ভরি গাঁজা নিয়ে আয় বাপ, গাঁজা না খেলে এ গায়ের বেদনা সারবে না।"

সুভদ্রা তাহার মুখের উপর রোষক্ষুব্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। ভোলানাথ হো হো করিয়া হাসিয়া গান ধরিল—

"তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা,
লোকে বলে করি আমি।"

আদান প্রদান

১

নয়ানজুলির ব্রজ সরকার নিজে বিবাহ না করিয়া যখন খুড়তুত ভাই রসিকের বিবাহের উদ্যোগ করিল, তখন পাঁচ জনে এই নির্ব্বোধ লোকটির বুদ্ধিহীনতা-দর্শনে বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিল না। তাহারা শুধু বিস্ময় অনুভব করিয়াই ক্ষান্ত রহিল না, অযাচিতভাবে মূর্খ ব্রজ সরকারকে নিজের বাপের বংশ বজায় রাখিবার জন্য অনেক উপদেশও দিল। বুদ্ধিহীন ব্রজ কিন্তু এই সকল বুদ্ধিমান্ হিতৈষীদিগের উপদেশের সার্থকতা অনুভব করিল না; সে হাসিয়া উত্তর করিল,—'রসিকের বাপের বংশ আর আমার বাপের বংশ কি আলাদা!'

আসল কথা, ছোট মুদীখানার দোকানটির আয়ে দুইটি পেট চালাইয়া দীর্ঘ সাত বৎসরের চেষ্টায় সে যে তিন শত টাকা সঞ্চয় করিয়াছিল, তাহাতে এক জনের বিবাহ হইতে পারে। সে একজন ব্রজ নিজে হইলে, আবার যে অতগুলি টাকার যোগাড় করিয়া রসিকের বিবাহ দিতে পারিবে, এমন সম্ভাবনা ছিল না। বিবাহ করিলে আর একটি পেটের খরচ বাড়িবে। এই সামান্য দোকানের আয়ে তিনটি পেটের খরচ যোগাইয়া আর দশ বৎসরেও সে এত-গুলি টাকা সংগ্রহ করিতে পারিবে কি না সন্দেহস্থল। এ দিকে রসিকেরও বিবাহের বয়স হইয়াছে। অগত্যা ব্রজ নিজে বিবাহ না করিয়া সঞ্চিত টাকায় রসিকের বিবাহ দিতে উদ্যত হইল।

খুড়া ধনঞ্জয় সরকার অনেকদিন পূর্ব্বে পৃথক্ হইয়াছিল, এবং জমীদারের সহিত মোকদ্দমা করিয়া মৃত্যুকালে এত দেনা রাখিয়া গিয়াছিল যে, জমী-জমা ঘর-ভিটা সব বেচিয়া লইয়াও মহাজন সমগ্র টাকার উশুল পাইল না। সাত বছরের ছেলে আর পাঁচ বছরের মেয়ে উমার হাত ধরিয়া খুড়ী কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহত্যাগ করিলেন। ব্রজ তাঁহাকে সাহস দিয়া বলিল,—'ভাবনা কি খুড়ী, আমার কুঁড়ে তো আছে!'

অনেকদিন আগে ব্রজ মাতৃপিতৃহীন হইয়াছিল। ঘরে আর কেহ ছিল না। সে নিজে রাঁধিত নিজে খাইত; বাকী সময়টা তাসের আড্ডায় ও কীর্ত্তনের আখড়ায় ঘুরিয়া দিন কাটাইয়া দিত। যে দুই পাঁচ বিঘা জমী ভাগজোতে বিলি ছিল, তাহারই আয়ে কোনরূপে দিন চলিয়া যাইত। আর দিন চলিবার জন্য তাহার উদ্বেগও কিছুমাত্র ছিল না। শুধু এক এক দিন স্তব্ধ সন্ধ্যার গাম্ভীর্য্যের মধ্যে আপনাকে যখন নিতান্ত একা বলিয়া মনে হইত, তখন সে ঘরে চাবি লাগাইয়া কীর্ত্তনের আখড়ায় ছুটিয়া যাইত, এবং কীর্ত্তনীয়াদের সঙ্গে গলা মিলাইয়া গাহিতে থাকিত—

"আমি ভবে একা দাও হে দেখা,
ওহে বাঁকা বংশীধারী!"

সুতরাং ব্রজ শূন্য সংসারে খুড়ীকে পাইয়া খুবই উৎসাহিত হইল। প্রতিবেশী যদু সান্যাল মহাশয় বলিলেন,—'হাঁ হে ব্রজ, এ সব আবার জড়ালে কেন?'

ব্রজ মাথা নাড়িয়া বলিল,—'ক'ও কথা দাদা-ঠাকুর, এ আবার জড়াজড়ি কি? মা আর খুড়ী কি আলাদা?'

কিন্তু দিন কতক পরে যখন দিন চলিবার ভাবনা আসিল, তখন ব্রজনাথের আনন্দের মাত্রাটা যেন কিয়ৎপরিমাণে হ্রাস হইয়া পড়িল। তবে সে একেবারে নিরুৎসাহ হইল না, মায়ের এক যোড়া কাণের পাশা আর দুই গাছা রূপার পৈছে ছিল। তাহা পঞ্চাশ টাকায় বেচিয়া একটি ছোট মুদিখানার দোকান খুলিল। দোকানের আয়ে কোনরূপে সংসার চলিতে লাগিল। ব্রজ রসিককে পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দিল।

একদিন ব্রজ মধ্যাহ্নে ঘরে শুইয়া শুনিতে পাইল, প্রতিবেশিনী বামার মা আসিয়া খুড়ীর দুর্ভাগ্যের জন্য আক্ষেপ প্রকাশ করিতেছে, এবং এখনও যদি তিনি ছেলেটিকে মানুষ করিয়া তাহার মাথায় এক গণ্ডূষ জল দিয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলেও যে তাঁহার যথেষ্ট সৌভাগ্য, ইহাও ব্যক্ত করিতেছে। তাহার আক্ষেপ শুনিয়া খুড়ী হতাশভাবে বলিতেছেন,—'হায় মা, মাথা পেতে দাঁড়াবার জায়গা নাই, আর মাথায় জল দেব। কপাল আমার!'

ব্রজ চুপ করিয়া শুইয়া এই সকল আক্ষেপোক্তি শুনিতে লাগিল।

তারপর উমার বিবাহ হইল। খুড়ী মারা গেল। ব্রজ তিলকাঞ্চনে খুড়ীর শ্রাদ্ধ করিল। রসিক তখন

পাঠশালা ছাড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জমিদারী-কাছারীর গোমস্তা শিবু চক্রবর্ত্তীকে ধরিয়া ব্রজ তাহাকে পাটোয়ারী কাজের শিক্ষানবীশ নিযুক্ত করিয়া দিল।

চারি বৎসর শিক্ষানবীশীর পর রসিকের মাসিক পাঁচ টাকা মাহিনা হইল। ব্রজনাথের আনন্দের সীমা রহিল না। সে মহোৎসাহে ভ্রাতার বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিল। লোকে বলিল,—'ব্রজ, আগে নিজে বিয়ে ক'রে তারপর ভায়ের বিয়ে দেবে।'

ব্রজ উত্তর করিল,—'আমার কি আর বিয়ের বয়স আছে? এখন ছোঁড়াটার মাথায় এক গণ্ডুষ জল না দিয়ে নিজে টোপর মাথায় দেওয়া কি সাজে?'

তাহাই হইল। ব্রজনাথ দুই শত টাকা কন্যাপণ দিয়া রাধানগরের নকুড় ঘোষের বারো বছরের মেয়ে থাকমণিকে ঘরে আনিল। বিবাহের এক মাস পরেই রসিক নরুণচকের গোমস্তার পদে নিযুক্ত হইল। নকুড় ঘোষ গর্ব্ব সহকারে ব্রজনাথকে বলিল,—'আমার মেয়ের আয়-পয়টা দেখলে হে সরকারের পো?'

আহ্লাদে গদগদকণ্ঠে ব্রজনাথ বলিল,—'ছোট বৌমা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।'

কিন্তু মাস কয়েক পরে যখন উমার বৈধব্য-সংবাদ আসিয়া ব্রজনাথের আনন্দটাকে ম্লান করিয়া দিল, তখন সে ছোট বৌমার লক্ষ্মীত্বের উপর সন্দেহ না করিয়া থাকিতে পারিল না। সে নিজে গিয়া সদ্যোবিধবা উমাকে গৃহে লইয়া আসিল। রসিক বলিল,—'রায় মহাশয়ের (উমার স্বামীর) জমি জায়গাগুলার কি বন্দোবস্ত করলে?'

ব্রজনাথ উদাসভাবে বলিল,—'সে উমির দেওর যা হয় করবে।'

রসিক বলিল,—'সে একা ভোগ করবে?'

বিরক্তির সহিত ব্রজনাথ বলিল,—'ভোগ করুক, বিলিয়ে দিক্, সে তার খুশী। আমার কি অত ঝঞ্ঝাট ভাল লাগে? আমার তিন তিন দিন দোকান বন্ধ!'

জ্যেষ্ঠের নির্ব্বুদ্ধিতায় রসিকের হাসি আসিল। হাসি চাপিয়া সে মনে মনে স্থির করিল, সুবিধামত একদিন গিয়া জমিজয়গাগুলার বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিয়া আসিবে। অল্প জমি ত নয়, আট দশ বিঘা লাখরাজ জমি, অন্ততঃ সাত আট শো টাকায় বিক্রয় হইবে।

২

'উমি ও উমি, ও পোড়ারমুখী!'

'কেন গা দাদা?'

'বলি—এ সব কি হয়েছে?'

'কি হয়েছে আবার? বলিয়া উমা ছুটিয়া আসিল, এবং অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল,—'ঐ ত তোমার তামাক সাজা রয়েছে, ধরিয়ে খাও না।'

'আর এই গাড়ুর জল? এটাও খেতে হবে নাকি?'

রাগে চোখ মুখ ঘুরাইয়া উমা বলিল,—'না, আমার ছরাদ করতে হবে।'

ব্রজনাথ হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল; হাসিতে হাসিতে বলিল,—'এই পোড়ারমুখী রেগে মরেছে।'

মুখখানা ভারি করিয়া উমা বলিল,—'তোমার কথায় মরা মানুষেরও রাগ হয়, আমি তো জ্যান্ত মানুষ। তামাক সাজা রয়েছে, খাবে; গাড়ুতে জল আছে, মুখ হাত পা ধোবে; তা নয় এটা কি হবে, ওটা কি হবে?

তাহার মুখের সম্মুখে হাত নাড়িয়া ব্রজ হাসিতে হাসিতে বলিল, 'মর পোড়ারমুখী, সাধে কি বলি? তোর আক্কেলটা কি রকম? আমি মুদী মানুষ, আমার কি এই সাজা তামাক খাওয়া, গাড়ুর জলে পা ধোয়া পোষায়?'

ভ্রাতার মুখের উপর একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, উমা গাড়ুটা তুলিয়া লইল, এবং জলটা উঠানে ঢালিয়া ফেলিতে ফেলিতে ক্রোধরুদ্ধকণ্ঠে বলিল,—'আমার ঝকমারি হয়েছে; তুমি পুকুরঘাটে পা ধুয়ে এস; নিজে তামাক সেজে খাও; আমি যদি আর কক্ষণও তোমার কাজ করিতে যাই, আমাকে গুণে সাত ঝাঁটা মেরো।'

ব্রজ তাহার হাত হইতে গাড়ুটা কাড়িয়া লইয়া হাস্যপ্রফুল্লকণ্ঠে বলিল,—'দূর পাগলী, তুই না করলে আমার কাজ করবে কে?'

'ভূতে' বলিয়া উমা রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে চলিয়া গেল। ব্রজনাথ কিন্তু তাহার রাগ দেখিয়া একটুও শঙ্কিত বা বিমর্ষ হইল না; উমার এই তীব্র ক্রোধের ভিতর দিয়া যে একটা স্নেহের আভাস ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহারই মাধুর্য্য উপভোগ করিতে করিতে সে প্রফুল্লমুখে কলিকায় আগুন ধরাইল। তার পর ফুঁ দিয়া আগুনটা জমকাইয়া লইয়া তামাকে টান্ দিতে দিতে ডাকিল,—'উমি, ও উমি!'

দুই তিন বার ডাকের পর উমা আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল এবং ভারী মুখে গম্ভীরস্বরে বলিল,—'আবার

কি? হুঁকোর বাসি জলটা চাই নাকি? কিন্তু তা তো আর পাবার উপায় নাই।'

ব্রজ এমনই জোরে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল যে, সে হাসি তামাকের ধোঁয়ার সঙ্গে মিলিয়া বিষম কাশি উৎপাদন করিল। খানিকটা খুব কাশিয়া হাসিয়া সে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল,—'নাঃ, তুই নেহাৎ হাসালি উমি।'

উমা গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। ব্রজনাথ হুঁকায় একটা জোর টান দিয়া একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল,—'তুই রাগ করিস্ কেন? আমি বল্‌ছিলাম কি জানিস্?'

'কি বল্‌ছিলে?'

'আমি বলি যে, আমার এত কর্‌বার দরকার কি? যার না কর্‌লে চলে না, তাকে একটু দেখ্‌বি শুন্‌বি।'

'তাকে দেখবার লোক কোন্ নাই?'

'থাক্‌লেও ছোট বৌমা একা, সংসারের কাজ কর্ম্ম আছে। আর আমি যেমন সব নিজের হাতে করে নিতে পারি, সে তা পারে না। তার পান থেকে চূণটি খস্‌লে কি কাণ্ডটা করে, তা জানিস্ তো?

'খুব জানি।'

'সেই তরেই তো বলি, তার দিকে একটু নজর রাখ্‌বি।'

ভ্রূভঙ্গী করিয়া উমা বলিল,—'সে হ'লো দশ টাকা মাইনের গোমস্তাবাবু, আর তুমি দোকানদার।'

ব্রজ পুনরায় হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে বলিল,—'এই দেখ্‌দেখি তোর ছেলেমানুষী। নাঃ, তোর কোনও কালেই বুদ্ধি হবে না।'

উমা ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—'না হয় না হবে।'

ব্রজনাথ মস্তক আন্দোলন করিতে করিতে অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে বলিল,—'না হয় না হবে! একটু বুঝে দেখ্‌না। আমার তরে তো কিছু আট্‌কায় না। আর হাজার হোক, রস্‌কে হ'লো তোর মার পেটের ভাই। বলে—আক চেয়ে কি সোঁদর মিঠে?'

ক্রোধ-তীব্রকণ্ঠে উমা বলিল,—'তাই ভেবেই তুমি বুঝি আমার কাজ পছন্দ কর না দাদা? আমাকে তুমি আজকাল পর ভাব?'

হাসিতে হাসিতে ব্রজনাথ বলিল,—'মনে কর্ না—তাই ভাবি। আর আমার দেখাদেখি তুইও আমাকে একটু পর ভাব্ দেখি।'

উমা রাগে মুখ ভার করিয়া নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল। ব্রজনাথ বলিল,—'আসল কথাটা কি জানিস্, আমার কাজ কর্‌তে গিয়ে তোকে যে লাঞ্ছনা সইতে হবে, সেটা কি ভাল?'

উমা বলিল,—'আমার আবার কিসের লাঞ্ছনা বল তো?'

মৃদু হাসিয়া ব্রজনাথ বলিল,—'কিসের লাঞ্ছনা, তা তুইই জানিস্ উমি, তবে আমাকে আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিস্ কেন? একে তো তোর কপাল পুড়ে আমার বুকে বাজ পড়েচে, তার উপর আমার তরে যদি তোকে দু'কথা শুন্‌তে হয়—না উমি, তা আমার সহ্য হবে না।'

ব্রজনাথের স্বরটা গাঢ় হইয়া আসিল। উমা জোরে মাথা নাড়িয়া ভারি গলায় বলিল,—'না হয় না হবে; কিন্তু আমি কারও দাসী বাঁদী নই যে সকলের কাজ কত্তে যাব। আমি কারও কিছু কর্‌তে পার্‌ব না, তাতে আমাকে ভাত কাপড় দাও—চাই, না দাও।'

উমার দুই চোখ দিয়া ঝর-ঝর করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। সে তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ ঢাকিয়া ছুটিয়া পলাইল। ব্রজনাথের চক্ষুও শুষ্ক ছিল না; সে কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিয়া আপন-মনে বলিল,—'না, মেয়েমানুষগুলোর সঙ্গে পেরে উঠবার যো নাই।'

সে হুঁকায় ঘন ঘন টান দিতে লাগিল। হঠাৎ রন্ধনশালা হইতে ছোট বোয়ের মৃদু অথচ তীব্র কণ্ঠস্বর তাহার কাণে আসিল। সে মুখের কাছ হইতে হুঁকাটা সরাইয়া কাণ খাড়া করিয়া রহিল। শুনিতে পাইল, ছোট বৌ উমাকে উদ্দেশ করিয়া আপন-মনে বলিতেছে,—'দরদ দেখেও বাঁচি না। আদরের বোন; একটা সংসার পেটে পুরে এসেছেন, এখন আবার এ সংসারটা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাচ্চেন।'

হুঁকাটা বাঁ হাতে ধরিয়াই ব্রজনাথ ঘরের বাহির হইয়া আসিল এবং ক্রুদ্ধ-কণ্ঠে ডাকিল,—'ছোট বৌমা!'

ছোট বোয়ের কণ্ঠ নীরব হইল। ব্রজনাথ রোষ-ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল, —'মুখ সাম্‌লে কথা কইবে বৌমা, উমি কারও বাবার ঘরে যায় নি, সেটা মনে রেখো।'

সে হুঁকাটা রাখিয়া দ্রুতপদে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

৩

মেয়েমানুষ বিধবা হইয়া ভ্রাতৃগৃহে আশ্রয় লইলে, তাহাকে ভ্রাতার না হউক, অন্ততঃ ভ্রাতৃবধূর পাঁচ কথা শুন্‌তে হয়। ইহার উপর উমা যখন ব্রজনাথের উপর একটু বেশী টান দেখাইতে লাগিল, তখন এই

পক্ষ-পাতিতার জন্য তাহাকে বেশ দশ্‌, কথা শুনিতে হইল। কথা শুনিলেও উমা কিন্তু এই পক্ষপাতিত্ব না দেখাইয়া থাকিতে পারিত না। সে যখন দেখিল দাদা—যে এই সংসারের স্তম্ভস্বরূপ, আপনার সকল শক্তি সামর্থ্য দিয়া যে এই সংসারটিকে খাড়া করিয়াছে, এবং সে জন্য যাহার নিজের দিকে চাহিবার অবসর একটুও হয় নাই, সেই লোকটির নিঃস্বার্থতা কাহারই সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই; তাহার দিকে কেহ ফিরিয়াও চাহে না; অথচ সে সংসারের এই গভীর অবজ্ঞাকে এমনই অনায়াসে সহ্য করিয়া যাইতেছে, যাহা রক্ত মাংসের শরীরে নিতান্তই অস্বাভাবিক ও আশ্চর্য্যজনক; সময়ে এক ঘটী জল, এক মুঠা ভাত পাইলেই সে কৃতার্থ হয়, অথচ সেটাও যেন তাহার ন্যায্য প্রাপ্যের মধ্যেই নয়; শুধু অপরের দয়ার উপরেই তাহার জীবনটা নির্ভর করিতেছে; যেন রাজ্যেশ্বর আপনার রাজৈশ্বর্য্য সব বিলাইয়া দিয়া ভিক্ষুকের বেশে লোকের করুণা চাহিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; তখন ব্রজনাথের এই মহত্বপূর্ণ ভিক্ষা উমার হৃদয়ে সম্ভ্রম ও ভক্তির উদ্রেক করিলেও লোকের নিদারুণ অকৃতজ্ঞতা তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল; সুতরাং সে এই সকল অকৃতজ্ঞ লোকের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া অন্যায়ের প্রতীকারে উদ্যত হইল।

কিন্তু এই অন্যায়ের প্রতিরোধ-চেষ্টাই যে কাহারও কাহারও নিকট নিতান্ত অন্যায় বলিয়া বোধ হইল, তাহা উমা বুঝিল না। আমার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আমি পালন করি বা না করি, অন্যে আসিয়া যে আমার কর্ত্তব্যের অসম্পূর্ণতাটুকু পূরণ করিয়া দিবে, ইহা সহ্য করিতে পারি না; মানুষের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা আসিয়া এখানে কৃতজ্ঞতার পরিবর্ত্তে একটা বিদ্বেষ উৎপাদন করে এবং তাহাতেই অপরের অযাচিত উপকারও শ্লেষ ছাড়া আর কিছুই বোধ হয় না। সুতরাং জ্যেষ্ঠের উপর উমার পক্ষপাতে ছোট বোয়ের অন্তর বিদ্বেষে ভরিয়া উঠিল। সে বিদ্বেষটা ব্রজনাথের উপর নয়, উমার উপরেও নয়, শুধু নিজের অসম্পূর্ণ কর্ত্তব্যের উপর উমা যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে, সেইটুকুর উপরেই তাহার সকল ক্রোধ, বিদ্বেষ আসিয়া পড়িল, এবং তাহার ফলে সময়ে সময়ে উমাকে বেশ দুই পাঁচ কথা শুনিতে হইল। উমা কিন্তু সে সব কথা গায়ে মাখিয়া সংসারে অশান্তির সৃষ্টি করিতে চাহিত না। সে সহিষ্ণুতার সহিত আপনার কাজ করিয়া যাইত।

কিন্তু সেদিন তাহার জন্য ব্রজনাথকে বিচলিত হইতে এবং ছোট বোয়ের পিতৃ-উচ্চারণ করিতে শুনিয়া, সে শঙ্কিত হইয়া উঠিল। সন্ধ্যার পর ব্রজনাথ দোকান বন্ধ করিয়া ঘরে আসিলে, সে জ্যেষ্ঠের নিকট গিয়া তিরস্কারের স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—'তোমার রকম কি দাদা?'

ব্রজনাথ স্বাভাবিক মৃদু হাস্যের সহিত উত্তর দিল,—'কিসের রকমটা উমি?'

উমা ঘাড় দোলাইয়া হাত নাড়িয়া বলিল,—'তোমার উপর অন্যায় হইলে আমি কিছু বল্‌তে পাব না, তবে আমার কথায় তুমি কথা কইতে যাও কেন?'

তাহার মুখের উপর হাস্য-প্রফুল্ল দৃষ্টি স্থাপন করিয়া ব্রজনাথ বলিল,—'তুই যে ছোট বোনটি।'

উমা ঘাড় নাড়িয়া ক্রোধ-কম্পিতস্বরে বলিল,—'কক্ষণো না, তুমিই বলেছ, মার পেটের ভাই নও, পর।'

উমার চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসিল। ব্রজনাথ ঘাড় নীচু করিয়া তামাক সাজিতে লাগিল। উমা ভারি গলায় বলিল,—'আমার তা হ'লে এখানে থাকা হবে না, দাদা!'

ব্রজনাথ মুখ না তুলিয়াই জিজ্ঞাসা করিল,—'কেন?'

উমা বলিল—'পরের জন্য কথা কইতে গিয়ে তুমি যে একটা অনর্থ বাধাবে, তা আমি দেখ্‌তে পারব না।'

মুখ তুলিয়া সহাস্যে ব্রজনাথ বলিল,—'দূর পোড়ারমুখী, তুই পর?'

উমা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে ব্রজনাথ বলিল,—'সত্যি উমি, মুখের কথা আর হাতের শর, একবার ছাড়্‌লে আর ফেরে না। ছোট বৌমাকে কথাটা ব'লে অবধি মনটা খারাপ হয়ে আছে।'

উমা নিরুত্তর। ব্রজনাথ বলিল,—'দাঁড়িয়ে রইলি যে, বোস না।'

উমা বসিল। ব্রজনাথ হুঁকার মাথায় কলিকা বসাইয়া ফুৎকার দ্বারা হুঁকার ধুলা ঝাড়িয়া তাহাতে টান দিল। ঘরের ভিতর রেড়ীর তেলের আলোটা মিট্‌ মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছিল। সেই অস্পষ্ট আলোকে ঘরের জিনিস-পত্রগুলা ঝাপসা দেখাইতেছিল। বাহিরে মেঘের গুরুগম্ভীর ধ্বনির সঙ্গে ঝিম্‌-ঝিম্‌ বৃষ্টি পড়িতেছিল। ঘরের পিছনে খিড়কীপুকুরের পাড় হইতে ভেকের অশ্রান্ত চীৎকার উত্থিত হইতেছিল। ঠাণ্ডা বাতাসটা রহিয়া রহিয়া উদাসভাবে বহিয়া যাইতেছিল।

উমা ডাকিল,—'দাদা !'
'কেন উমি ?'
'আমার একটা কথা রাখ্‌বে ?'
'তোর কোন্ কথা না রাখি ?'
'সে ছোট খাট কথা।'
'বড় কথাই একটা ব'লে দেখ্।'
'বল্‌লে রাখ্‌বে ?'
'রাখ্‌বো।'
'তুমি বিয়ে কর।'

এই অসম্ভাবিত প্রস্তাবে ব্রজনাথ যেন আকাশ হইতে পড়িয়া চোখ দুইটা বিস্তৃত করিয়া উমার মুখের দিকে চাহিল। বিস্ময়স্তব্ধকণ্ঠে বলিল,—'বিয়ে! আমি!'

জোর গলায় উমা বলিল,—'হাঁ, তুমি! কেন, তোমাকে কি বিয়ে কত্তে নাই ?'

ব্রজনাথ নিঃশব্দে তামাক টানিতে লাগিল। উমা তাহার মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া আগ্রহপূর্ণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—'কি বল ?'

ব্রজনাথ হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে বলিল,—'পাগল! বিয়ে!—এই বয়সে ?'

উমা বলিল,—'কত আর বয়স তোমার ? জোর তিরিশ হবে।'

ব্রজনাথ বলিল,—'দূর, আট গণ্ডা সাড়ে আট গণ্ডা হবে।'

উমা ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল,—'তবে আর কি তোমার বিয়ের বয়স আছে ? তোমার বোনকে কত বয়সের ছোকরার হাতে দিয়েছিলে ?'

'যতই হোক, তিরিশের বেশী হবে না।'

বলিয়া ব্রজনাথ একটু ম্লান হাসি হাসিল। বাহিরে বিদ্যুৎস্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে মেঘ গড়-গড় শব্দে ডাকিয়া উঠিল। ব্রজনাথ জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া তামাক টানিতে আরম্ভ করিল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া উমা জিজ্ঞাসা করিল,—'কি বল দাদা ?'

ব্রজনাথ মুখখানাকে একটু বিকৃত করিয়া বলিল,—'ছিঃ, লোকে কি বলবে ?'

'কিন্তু লোকে কি অসময়ে তোমার মুখে এক গণ্ডূষ জল দিতে আসবে ?'

'লোকে না দেয়, তুই দিবি।'

'আমার দায় পড়েছে।'

বলিয়া উমা রাগে মুখ ফিরাইয়া লইল। ব্রজনাথ গম্ভীরভাবে হুঁকায় টান দিতে দিতে বলিল,—'কিন্তু বিয়ে তো মুখের কথা নয়, তিন চার শো টাকা চাই।'

উমা বলিল,—'সে সব আমি জানি না, তুমি কর্‌বে কি না, তাই বল।'

সহাস্যে ব্রজনাথ বলিল,—'যদি না করি ?'

উমা উঠিয়া দাঁড়াইল, তর্জ্জনী উদ্যত করিয়া ক্রোধগম্ভীর স্বরে বলিল,—'তা হ'লে এই ভিটেয় যদি তেরাত্তির পোয়াই, তবে আমার নাম উমিই নয়।'

বলিয়া উমা ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল। ব্রজনাথ ডাকিল,—'শোন্ উমি, শোন্।'

উমা কিন্তু ফিরিল না। ব্রজনাথ হুঁকাটা মুখের কাছে ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বাহিরে বৃষ্টির ঝম্ ঝম্ শব্দটা একটু প্রবল হইয়া আসিল।

৪

পরদিন রসিক বাড়ী আসিলে, উমা তাহাকে ধরিয়া বসিল। দাদা বিবাহ করিবে শুনিয়া রসিক প্রথমে খুব খানিকটা হাসিল; তারপর বিজ্ঞোচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল,—'বিদ্যা নাই, বুদ্ধি নাই, রোজগারের ক্ষমতা নাই, ওকে মেয়ে দেবে কে ?'

রসিকের কথায় উমার রাগ হইল; রাগিয়া বলিল,—'দাদার রোজগারের ক্ষমতা না থাকলে আজ তুমি রোজগারী হ'তে না ছোটদা।'

রসিক এই রূঢ় উত্তরে ভ্রূকুটী করিল। উমা বলিল,—'টাকা পেলে মেয়ে দেবার অনেক লোক আছে, তুমি মেয়ের চেষ্টা দেখ।'

রসিক বলিল,—'তা যেন দেখবো, কিন্তু টাকা ? দাদার হাতে টাকা আছে ?'

'তা আমি জানি না।'

'কিন্তু সেটা আগে জানা দরকার। দেনা আমি কর্‌তে পারব না; ঋণ-পাপকে আমার বড্ড ভয়।'

উমা বলিল,—'দেনাই হোক, পাওনাই হোক, বিয়ের চেষ্টা তুমি দেখ।'

উমা চলিয়া গেলে ছোট বৌ স্বামীকে বলিল,—'আসল কথাটা কি জান, ঠাকুরঝিই ওঁকে বিয়ের তরে ধরে বসেছে।'

রসিক গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালন করিয়া উত্তর করিল,—'সেটা আমি বুঝি; তা নৈলে এতদিনের পর দাদার বিয়ের ঝোঁক উঠ্‌বে কেন ? বুড়ো বয়সে চুড়োকরণ!'

ছোট বৌ বলিল,—'তা চুড়োকরণই হোক, আর যাই হোক, তুমি চেষ্টা দেখ। নয় তো ভারী লোকনিন্দে হবে। অমনই তো লোকে কত কথা বলে, নিজে বিয়ে কর্‌লে না, ভায়ের বিয়ে দিলে!'

বিরক্তিপূর্ণস্বরে রসিক বলিল,—'কেন দিলে? আমি কি বিয়ের তরে কেঁদে বেড়িয়েছিলাম?'

ছোট বৌ বলিল,—'তা তুমি কেঁদে বেড়াও, আর হেসেই বেড়াও, উনি যেমন তোমার বিয়ে দিয়েছেন, তেমনি তুমিও দিয়ে দোষ থেকে খালাস হও।'

ক্রোধে মুখভঙ্গী করিয়া রসিক বলিল,—'বিয়ে দেব, টাকা কোথায়? তিন চার শো টাকা চাই।'

ছোট বৌ বলিল, 'তুমিও কতক দাও, উনিও কতক যোগাড় করুন। তুমি তো আমাকে দুশো টাকার নেকলেস দেবে বলেছিলে, তুমি সেই টাকাটাই না হয় দাও না।'

বলিয়া ছোট বৌ একটু হাসিল। রসিক কিন্তু সে হাসিতে একটুও প্রীত হইল না; রাগে হাত নাড়িয়া বলিল,—'সে টাকা আমার বাক্সে তোলা আছে কি না? পুজোর কিস্তী না এলে হবে না।'

অগত্যা ছোট বৌ নিরস্ত হইল। উমা কিন্তু নিরস্ত হইল না; সে শুধু ছোটদার উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না, প্রতিবেশীদিগকেও চেষ্টা দেখিবার জন্য অনুরোধ করিল। প্রতিবেশীরা সরলপ্রাণ ব্রজনাথের উপর সন্তুষ্ট ছিল এবং সে বিবাহ না করায় তাহাদের অনেকে দুঃখিত হইয়াছিল। এক্ষণে ব্রজনাথ বিবাহ করিবে শুনিয়া তাহারা মহোৎসাহে পাত্রীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল।

পাত্রীর অভাব হইল না। তিন শত টাকা পণে একটি মেয়ে স্থির হইল। বিবাহের দিনও নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেল। সব ঠিক হইয়া গেলে রসিক জ্যেষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিল,—'টাকার যোগাড় আছে তো দাদা?'

ব্রজনাথ হাসিয়া বলিল,—'টাকার যোগাড় না ক'রে কি কাজে হাত দিয়েছি রে ভাই?'

রসিক শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। ঐ তো সামান্য তিন পয়সার দোকান; উহার দ্বারা সংসার চলে; তাহার উপর এক কথায় এত টাকার যোগাড় কিরূপে হইল? কথাটা বুঝিতে না পারিলেও রসিক মুখ ফুটিয়া জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না, নিজেই তোলাপাড়া করিতে লাগিল। রসিক জানিত না যে, সঞ্চয়ী ব্রজনাথ যে উপায়ে কিছু কিছু জমাইয়া তাহার বিবাহ দিয়াছিল, সেই উপায়েই এই কয় বৎসরে সে আড়াই শত টাকা জমাইয়াছিল; বাকী শ' খানেক টাকা কর্জ্জ করিবে, স্থির করিয়াছিল।

রসিক ভিতরের কথা জানিত না; সুতরাং সে আপনার পাটোয়ারী বুদ্ধির দ্বারাও এই অর্থ-সংগ্রহের রহস্য উদ্ভেদ করিতে পারিল না। অনেক চিন্তার পর অবশেষে সে যেন একটা সূত্র খুঁজিয়া পাইল এবং সেই সূত্র ধরিয়া সে একেবারে উমার শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইল।

সেখানে গিয়া রসিক যাহা দেখিল, তাহাতে সে যেন সহসা গাছ হইতে পড়িল। সে দাদাকে বিদ্যা-বুদ্ধিশূন্য বলিয়াই জানিত; কিন্তু, সে যে এতটা বিশ্বাস-ঘাতক, এমন জুয়াচোর হইতে পারে, ইহা কোনও দিন কল্পনাতেও আনিতে পারে নাই। সে উমার দেবরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জমি জায়গাগুলার বন্দোবস্তের কথা তুলিতেই উমার দেবর তাহাকে একখানা বিক্রয়-কোবালা দেখাইয়া দিল। রসিক দেখিল, তাহাতে উমা আপনার অংশের সমস্ত সম্পত্তি ছয় শত টাকায় দেবরকে বিক্রয় করিয়াছে। দলীলে ব্রজনাথ বকলমে উমার নাম স্বাক্ষর করিয়াছে। তাহার নীচে উমা বুড়া আঙ্গুলের ছাপ দিয়া দলিল রেজিষ্টারী করিয়া দিয়াছে। দেখিয়া রসিকের ক্রোধ ও ক্ষোভের সীমা রহিল না; এতক্ষণে সে দাদার বিবাহের টাকা যোগাড়ের গুপ্ত রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল।

৫

গাত্রহরিদ্রার পূর্ব্বদিনে সন্ধ্যার আগে ছোট বৌ বরণডালা সাজাইতেছিল; উমা পাশে বসিয়া কাল কখন কি করিতে হইবে, ছোট বৌকে তাহার উপদেশ দিতেছিল। ব্রজনাথ নিজের ঘরের দাবার উপর বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে উমাকে ডাকিয়া বলিল,—'আর কি কি চাই, এই সময়ে বল্ উমি; এর পর কাজের সময় এটা চাই, ওটা নিয়ে এস, ব'লে যেন জ্বালাতন করিস্‌নে।'

উমা সহাস্যে বলিল,—'কও কথা, দাদা এর মধ্যেই জ্বালাতনের ভয়? এই তো কলির সন্ধ্যা! এর পর বৌ এসে যে দিনরাত জ্বালাতন করবে। কি বল বৌদি?'

ছোট বৌ ভ্রূভঙ্গী করিয়া নিম্নস্বরে বলিল, 'দূর!'

ব্রজনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—'সে জ্বালাতন শুধু আমি একা হব না উমি, তোরা দুজনেও তার ভাগ পাবি।'

উমা হাসিয়া উঠিল। ছোট বৌ মৃদুস্বরে বলিল,—'মেয়ের গায়ে হলুদের কাপড়টা কিন্তু ভাল হ'ল না।'

উমা ডাকিয়া বলিল,—'শুন্‌ছো দাদা?'

ব্রজনাথ বলিল,—'ওগো! বুড়ো বরের কনে, তার কাপড়ের ভাল মন্দ নাই।'

উমা হাসিতে হাসিতে বলিল,—'তুমি বুড়ো ব'লে কনে তো বুড়ী নয় ?'

ব্রজনাথ একটু হাসিয়া হুঁকায় ঘন-ঘন টান দিতে লাগিল। হঠাৎ একবার মুখের কাছ হইতে হুঁকাটা সরাইয়া বলিল,—'এ ছোঁড়া গেল কোথায় ? কাল গায়ে হলুদ, আজ পর্য্যন্ত দেখা নাই। নিজের বিয়ের বাজার আপনাকে করতে হবে জানলে উমি, কখনও তোর কথা শুনতাম না। ছি ছি, লোকে বলবে কি ?'

উমা বলিল,—'বলবে কেন, বলছে।'

'কি বলছে ?'

'নিন্দে। পাড়ায় কাণ পাতা দায়।'

'তোর মাথা!' বলিয়া ব্রজনাথ হাসিয়া উঠিল। তাহার হাসির বেগ না থামিতেই রসিক ধীরে ধীরে বাড়ী ঢুকিল। ব্রজনাথ ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিল,—'এই যে, কোথায় ছিলি রে ? আমাকে গাছে তুলে দিয়ে বুঝি সরে দাঁড়িয়েছিলি ?'

গম্ভীর ভাবে 'হুঁ' বলিয়া রসিক ধীর গম্ভীরপদে নিজের ঘরে ঢুকিল। মুখ হাত ধুইয়া ঠাণ্ডা হইয়া রসিক নিজের ঘরের দাবায় বসিল। ব্রজনাথ লণ্ঠন জ্বালিয়া গাত্রহরিদ্রার পান সুপারি আনিবার জন্য বাহির হইতেছিল; এমন সময় রসিক ডাকিল,— 'দাদা!'

লণ্ঠনটা উঠানে রাখিয়া ব্রজনাথ উত্তর দিল,—'কি রে রসিক ?'

রসিক বলিল,—'সত্যি কথা বলবে ?'

ব্রজনাথ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া বলিল,—'সত্যি কথা ? মিছে কথাই বা বলবো কিসের তরে ?'

তীব্রকণ্ঠে রসিক বলিয়া উঠিল,—'আর তোমার সাধুতা জানাতে হবে না। বিয়ের টাকাটা কোথা থেকে যোগাড় হলো শুনি ?'

বিস্ময়ের সহিত ব্রজনাথ বলিল,—'কেন বল্ তো ?'

রসিক বলিল,—'কেন কি ? বলে ফেল না।'

সহাস্যে ব্রজনাথ বলিল,—'চুরি করেছি।'

গর্জ্জন করিয়া রসিক বলিল,—'চুরি নয়, জুয়াচুরি করেছ।'

ব্রজনাথ বিস্ময়ে নীরব। ছোট বৌ রন্ধনশালার দরজা দিয়া মুখ বাড়াইল। উমা দাবার খুঁটিটা ধরিয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, রসিক বলিল,—'একটা অবীরা বিধবার সর্ব্বনাশ ক'রে বুড়ো বয়সে বিয়ে করতে লজ্জা করে না ?'

ব্রজনাথ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া ধীরপ্রশান্ত কণ্ঠে বলিল,—'তুই কি বলছিস্ রসিক ?'

রসিক বলিল,—'উমার জমিজায়গা কত টাকায় বেচে এসেছ ?'

বিস্ময়রুদ্ধকণ্ঠে ব্রজনাথ বলিল,—'কত টাকায় ?'

রসিক চীৎকার করিয়া বলিল,—'হাঁ, ছ'শো টাকা নিয়ে ওর দেবরকে বিক্রীকোবালা লিখে দিয়ে এসেছ। আর সেই টাকাগুলো এতদিন গাপ করে রেখে, এখন বিয়ে করতে যাচ্ছ। কেমন, ঠিক কি না ?'

ব্রজনাথ এমনই জোরে হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল যে,তাহাতে রসিকও চমকিত না হইয়া থাকিতে পারিল না। খুব খানিকটা হাসিয়া লইয়া সে হাস্যপ্রফুল্লকণ্ঠে বলিল,—'আচ্ছা চুরি তুই ধরেছিস্ রসিক। ও'র মুখ্যু, গোপাল রায় যখন কাঁদতে কাঁদতে বললে, —'এই ক' বিঘে জমিই পুঁজি দাদা, এই নিয়ে যদি তোমরা হাঙ্গামা বাধাও, তা হ'লে ছেলেপিলে নিয়ে আমি মারা যাব।' তখন আমিও ভেবে দেখলাম, কথাটা ঠিক। কিন্তু মানুষের মন নয় মতিভ্রম। তাই উমিকে দিয়ে একেবারে সাফ বিক্রী কোবালা লিখে দিয়ে এলাম। ব্যস্, হাঙ্গামার মূলোচ্ছেদ। বুঝলি ?'

রসিক কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া শ্লেষপূর্ণস্বরে বলিল,—'চমৎকার গল্প বলেছ দাদা; কিন্তু আমিও পাটোয়ারীতে ঘুণ। এখন যদি ভাল চাও, টাকাগুলি বের করে দাও।'

ব্রজনাথ জোর গলায় বলিল, 'যদি না দিই ?'

রসিক বলিল, 'মগের মুল্লুক নাকি ? কালই দশ জন ভদ্রলোক ডেকে এর বিচার করবো। আমি রসিক সরকার, সহজে ছাড়বো, মনে করো না।'

ব্রজনাথ কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর ধীরগম্ভীর কণ্ঠে বলিল, 'ভদ্রলোক ডাকিয়ে আমাকে অপমান করাবি ?'

রসিক মাথা নাড়িয়া বলিল, 'নিশ্চয়।'

'কিন্তু উমির টাকায় তোর কি অধিকার ?'

'সম্পূর্ণ অধিকার। কেন না, সে আমার বোন।'

ব্রজনাথের হৃদয় ভেদ করিয়া একটা গভীর দীর্ঘ-নিশ্বাস বাহির হইল।

রসিক বলিল, 'যদি ভাল চাও, অন্ততঃ অর্দ্ধেক টাকা আমায় দাও।'

ব্রজনাথ লণ্ঠনটা তুলিয়া লইয়া নিজের ঘরে ঢুকিল, এবং অবিলম্বে বাহির হইয়া আসিয়া রসিকের সম্মুখে তিন শত টাকা রাখিয়া দিল। উমা চীৎকার করিয়া বলিল, 'কর কি দাদা, কাল যে গায়ে-হলুদ।'

ব্রজনাথের ওষ্ঠপ্রান্তে একটু ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল। উমা ছুটিয়া আসিয়া নোটের তাড়াগুলা

তুলিয়া লইতে উদ্যত হইল, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই রসিক সেগুলাকে হস্তগত করিল। উমা চীৎকার করিয়া বলিল, 'নিমকহারাম, দাদা যে নিজের বিয়ের টাকায় তোমার বিয়ে দিয়েছে! তোমার এই অন্যায় কি ধর্ম্মে সইবে?'

ব্রজনাথ তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, 'ছি উমি, আমার সামনে ওকে শাপসম্পাৎ দিস্ নে!'

সহাস্যে ব্রজনাথ বলিল, 'আর বিয়ে নয় উমি, বিয়ে না হ'তেই যে রসিক পর হ'তে যাচ্ছিল, বিয়ে হ'লে সে কি হতো বল দেখি।'

ছোট বৌ অগ্রসর হইয়া নিম্নস্বরে বলিল, 'সে যা হয় হবে, কিন্তু তুমি বল ঠাকুরঝি, ঐ টাকা ক'টার তরে বিয়ে আটকাবে না!'

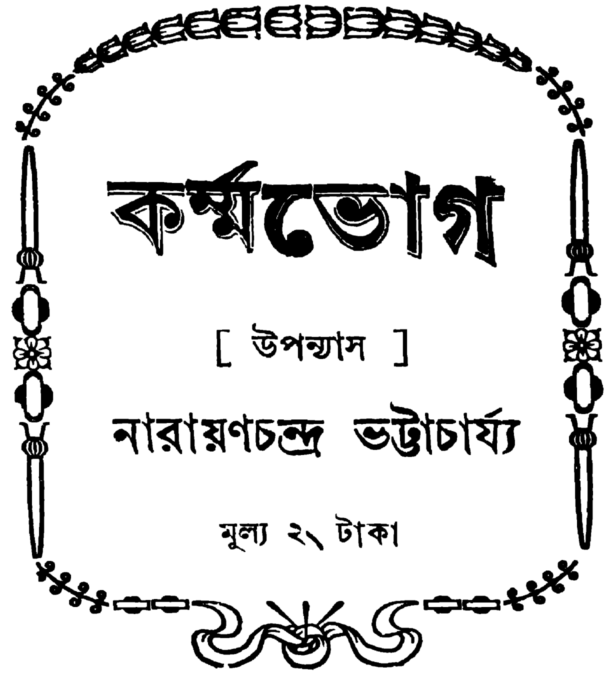
বলিয়া সে আপনার গায়ের গহনাগুলা খুলিয়া ব্রজনাথের পদপ্রান্তে স্থাপন করিল। ব্রজনাথ সবিস্ময়ে বলিল, 'এ সব কি হবে ছোট বৌমা?'

মৃদুস্বরে ছোট বৌ বলিল, 'আপনার বিয়ে?'

ব্রজনাথ আবার হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, 'তবে আজ আর একবার বলি বৌমা, এগুলা কি তোমার বাবার যে, যাকে তাকে দান করতে বসেছ? আমার বিয়ে আটক করে কে?'

বলিয়া সে আস্তে আস্তে গিয়া রসিকের হাতটা ধরিল, এবং তাহার হাত হইতে নোটের তাড়া কাড়িয়া লইয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। রসিক হতবুদ্ধির ন্যায় বসিয়া রহিল।

সমাপ্ত



কর্ম্মভোগ

[উপন্যাস]

নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

মূল্য ২৲ টাকা

চ—১৯

কর্ম্মভোগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

তারণ ভট্‌চাজ্যির ভাই গোপীনাথ ভট্‌চাজ্যি মেডিকেল কলেজ হইতে এল, এম, এস্ উপাধি লইয়া যখন দেশে আসিয়া বসিল, তখন দৈনিক পাশার আড্ডা জমিবে বলিয়া যজ্ঞেশ্বর দত্ত এক যোড়া নূতন পাশার ছক কিনিয়া আনিল। তারণ ভট্‌চাজ্যি কিন্তু ডেলী প্যাসেঞ্জারির মায়া ত্যাগ করিয়া যজ্ঞেশ্বর দত্তের পাশার আড্ডায় যোগ দিল না।

বন্ধুবান্ধবেরা উপদেশ দিল, "ভট্‌চাজ, আর তোমার এ কর্ম্মভোগ কেন? কষ্ট ক'রে ভাইকে মানুষ করলে, এখন ব'সে তার রোজগার খাও।"

তারণ হাসিয়া উত্তর করিল, "খাব বৈকি ভায়া, খাব বৈকি। তবে যে ক'টা দিন চলে চলুক।"

কিন্তু মাসের পর মাস চলিয়া গেলেও যখন তারণের উদ্দিষ্ট 'কয়টা দিন' পূর্ণ হইল না, এবং গোপীনাথ পশার জমাইয়া প্রত্যহ ভায়েব হাতে পাঁচ সাত টাকা আনিয়া দিলেও তারণ মাস কাবারে চল্লিশটি টাকার জন্য সপ্তাহেব ছয় দিন সকালে সাতটায় নাকে মুখে ভাত গুঁজিয়া সাড়ে আটটার গাড়ী ধরিতে ছুটাছুটী করিতে লাগিল, তখন স্ত্রী বিন্দুবাসিনী সাতটায় ভাত তৈরী করিয়া দিতে অসামর্থ্য জানাইয়া তিরস্কার করিয়া বলিল, "ভাল, চিরকালটাই কি সাতটায় নাকে মুখে ভাত গুঁজে গাড়ী ধত্তে ছুটবে? ঠাকুর পো যখন দু'পয়সা আনচে, তখন এই ক'টা টাকার তরে তোমার আর কর্ম্মভোগ কেন?"

তারণ উত্তর দিল, "কি জান বড় বৌ, ছ্যাক্‌রা গাড়ীর ঘোড়া, আর আপিসের কেরাণী, এরা ছুটলেই ভাল থাকে।"

. বিন্দু মুখ ভার করিয়া বলিল, "খুব ভাল থাকে! দিন দিন শরীর কি রকম শুকিয়ে পাকিয়ে যাচ্চে সেটা দেখ্‌চো কি?"

তারণ মাথা নাড়িয়া সহাস্যে বলিল, "দেখছি বৈকি, কিন্তু মাসকাবারে নোট চারখানা পকেটে গুঁজে যখন বাড়ীতে আসি বড় বৌ, তখন মনে হয় আমিই বা কে, আর দিল্লীর বাদশাই বা কে।"

বিন্দু রাগিয়া বলিল, "বেশ, তুমি তোমার বাদশাগিরি নিয়ে থাক, আমি কিন্তু সাতটায় ভাত দিতে পারবো না, তা ব'লে রাখছি। কেন, আমার কি বেঁচে সুখ নাই!"

তারণ মুখখানাকে একটু গম্ভীর করিয়া বলিল, "সে কথা তুমি দু'শোবার বলতে পার।"

বিন্দু বলিল, "কেবল মুখে বলা নয়, এইবার কাজে দেখিয়ে দেব।"

একটু ভাবিয়া তারণ বলিল, "উত্তম, টাকা চারেক মাইনে আর খোরাক পোষাক দিয়ে একটা রাঁধুনী রাখলেই দিব্যি চলে যাবে। তুমিও আজ প্রায় বিশ বচ্ছর বেঁধে খাওয়াচ্চো, দিন কতক রান্না ভাত খাও।"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া বিন্দু বলিল, "ইঃ, আমার উপর এত দরদ দেখাতে হবে না। রাঁধুনী রাখার আগে নিজের জামা কাপড়গুলা পাল্‌টাও দেখি।"

গম্ভীর ভাবে মস্তক সঞ্চালন করিয়া তারণ বলিল, "এইবার পাল্‌টাব বড় বৌ, এইবার পাল্‌টাব। দিন কতক যেতে দাও, তখন সকলকে দেখাব, বাবুয়ানি কি রকমে কত্তে হয়।"

হাসি চাপিয়া বিন্দু বলিল, "কে বাবুয়ানি করবে —তুমি? বাবুয়ানির কপাল।"

তারণ হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা আচ্ছা, বাবুয়ানির কপাল, কি তারণ ভট্‌চাজ্যির কপাল তা দেখিয়ে দেব।"

বিন্দু এবার হাসিয়া উঠিল; বলিল, "সে আজ বিশ বচ্ছর দেখে আসছি। কাপড়ে জামায় তালি দিতে দিতে আমার আঙ্গুলে কড়া পড়ে গেল।"

তারণ বলিল, "সে গত কথা ছেড়ে দাও। চাকরী ক'রে সংসার চালাতে হলে কি বাবুয়ানি করা চলে?"

ঝঙ্কার দিয়া বিন্দু বলিল, "কেন চলবে না গা? ঐ তো নরেশ ঠাকুর পো কুড়িটাকা মাইনের চাকরী করে, কিন্তু তার জামা-জুতো-কাপড় দেখলে দু'দণ্ড চেয়ে থাকতে ইচ্ছা হয়। যত দস্যি দশা হ'য়েছে তোমার বৈ তো নয়।"

একটু উপহাসের হাসি হাসিয়া তারণ বলিল, "এঃ, তুমি নেহাৎ পাগল বড় বৌ, তাই নরে ছোঁড়ার

সঙ্গে আমার তুলনা দিচ্চো। আরে পাগল, আমার মত তাকে কি সংসার চালিয়ে ভাইকে কলেজে পড়াতে হ'য়েছে, না তার স্ত্রী সোয়ামীর ভাত কম পড়বে ব'লে পেটকামড়ানর অছিলায় উপোস দিয়ে রাত কাটিয়েছে! তার স্ত্রী যদি নিজে সাত-গেরো দেওয়া কাপড় পরে, চাল ডালের পয়সা বাঁচিয়ে লুকিয়ে সোয়ামীর কাপড় কিনে আনাত, তা হ'লে দেখতাম বড় বৌ, নরে কেমন ক'রে বাবুয়ানি কত্তে পারে।"

বলিয়া সে গর্ব্ব প্রফুল্ল দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিল। তাহার কথায় বিন্দুর চোখ দুইটা ছল ছল করিলেও সে স্বরে একটা জোর আনিয়া বলিল, "না, পারতো না। তোমার মত সব্বাই কিনা মেয়ে মানুষের মুখের দিকে চেয়ে নিজে কষ্টভোগ করে।"

তারণ হাসিয়া বলিল, "এই দেখ এক পাগল! আরে, সংসারে মেয়ে মানুষের মুখের দিকে চাইবে না তো কার মুখের দিকে চাইবে? অনাবৃষ্টির দিনে লোকে যেমন মেঘের দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে থাকে, দুঃখ কষ্টের সময়ে সেই রকম মেয়ে মানুষের মুখের পানে চাইতেই হবে যে? নয় তো দম ফেটে যে মরে যাবে। দুঃখে সান্ত্বনা, নিরাশায় আশা দিতে এমন আর কেউ পারে কি?"

বলিয়া তারণ স্ত্রীর মুখের উপর প্রশংসমান দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। বিন্দুও ছল ছল চোখে হাস্যপ্রফুল্ল মুখে স্বামীর দিকে নীরবে চাহিয়া রহিল।

দুঃখ দৈন্য তারণকে অনেক সহ্য করিতে হইয়াছে। সেই যে কবে ষোলবৎসর বয়সে পিতৃহীন হইয়া তাহাকে স্কুলের সেকেণ্ড ক্লাস হইতে বিদায় লইতে হইয়াছিল, এবং এগার বৎসরের ভাই গুপী, সাত বৎসরের ভগ্নী সরোজিনী, এবং তের বছরের স্ত্রী বিন্দুকে কিরূপে প্রতিপালন করিবে তাহাই ভাবিয়া সংসার অন্ধকার দেখিয়াছিল, তাহা আজও বেশ মনে পড়ে। তারপর এক বস্ত্রে কলিকাতায় গিয়া যখন চাকরীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল, তখন মাথা গুঁজিয়া থাকিবার স্থান পর্য্যন্ত পাইত না, যদি চিনিবাস নন্দীর বাপ তিনকড়ি নন্দী আপনার মুদীখানার দোকানের একপাশে স্থান না দিত। তাহারই দোকানের চাল ডাল নিজের হাতে রাঁধিয়া খাইয়া, চার মাস হাঁটাহাঁটি করিয়া তারণ রেলীর গুদামে আট টাকা মাহিনায় একটি কাজ পাইল এবং চাকরী পাইয়া স্বতন্ত্র বাসা করিতে ইচ্ছুক হইল। তখন তিনু নন্দী তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিল, "আট টাকায় ঘর ভাড়া দিয়ে খেয়ে প'রে কি থাকবে বল তো ঠাকুর? তার চাইতে এই দোকানেরই একপাশে এক মুঠো ফুটিয়ে খেয়ে পড়ে থাক। তবু নুনটা তেলটাও তো কিনতে হবে না।"

অগত্যা তারণকে এই প্রস্তাবেই সম্মতি দিতে হইল এবং তিন টাকায় খাওয়া খরচ চালাইয়া পাঁচ টাকা বাড়ীতে পাঠাইতে লাগিল। এই অবস্থাতেই সে ভাইকে পাঠশালা হইতে ছাড়াইয়া লইয়া ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিল এবং তাহার মাহিনা ও বহির খরচের জন্য দুই টাকা মাহিনায় একটা ছেলে পড়ান যোগাড় করিয়া লইল।

বছর তিন পরে মাহিনা পনরো টাকা হইল বটে, কিন্তু তিনু নন্দী মারা যাওয়ায় তারণকে স্বতন্ত্র বাসা করিতে হইল। ক্রমে সরোজিনী বিবাহযোগ্যা হইয়া উঠিলে দুই বিঘা জমি বাঁধা দিয়া তাহার বিবাহ দিল।

আরও বছর দুই পরে বারাসত রেল লাইন খুলিল। মাহিনাও তখন আর পাঁচ টাকা বাড়িয়াছিল। তারণ কলিকাতায় বাসা উঠাইয়া দিয়া ডেলি প্যাসেঞ্জারি আরম্ভ করিল। ইহাতে রেলভাড়া পাঁচ টাকা লাগিলেও সন্ধ্যার পর গোপীনাথকে যেটুকু পড়াইতে পারিত, তাহাকেই সে পাঁচ টাকার অধিক লাভ বলিয়া মনে করিত। সারা দিন আফিসে খাটিয়া, যাতায়াতে তিন ক্রোশ পথ হাঁটিয়াও শুধু গুপীর দূর ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়াই তারণ আপনার ক্লান্ত অবসন্ন মনটাকে উৎসাহে সবল করিয়া লইত।

ক্রমে গোপীনাথ এণ্ট্রান্স পাশ করিল। পাঁচ-জনে পরামর্শ দিল, "গুপীকে গবর্ণমেণ্টআফিসে ঢুকিয়ে দাও, এক কথায় পঁচিশ টাকা মাইনে হবে।" তারণ কিন্তু এই পরামর্শ শুনিল না; কেরাণী-জীবনের যে দৈন্য তাহা সে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিল। সুতরাং সে উচ্চ আশায় বুক বাঁধিয়া গুপীকে কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিল। লোকে পরিহাস করিয়া বলিল, "তারণ ভট্চাজ্যি এবার জজের ভাই হবে।"

তারণ এই পরিহাসে বিচলিত না হইয়া হাসিয়া উত্তর করিল, "কেরাণীর ভাই হওয়ার চেয়ে জজের ভাই হওয়া মন্দ নয় তো।"

এই উত্তরে তারণ ভট্চাজ্যির মাথার ভিতর যে একটু গোলমাল আছে ইহা অনেকেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিল; কিন্তু পঁচিশ টাকা মাহিনার পাঁচ টাকা রেল ভাড়া বাদে বাকী কুড়ি টাকায় সংসার চালাইয়া তারণ কিরূপে যে কলেজের খরচ যোগাইত, ইহা কাহারও বোধগম্য হইত না। এই নিতান্ত অসাধ্য কাজ-টাকে সুসাধ্য করিয়া আনিতে তারণকে যে কতটা কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল, তাহা একমাত্র বিন্দুবাসিনী

ছাড়া আর কেহ জানিত না। কেন না স্বামীর আপিসের জামা কাপড়ে তালি দেওয়া তাহার নিত্য-কার্য্য মধ্যে পরিগণিত ছিল; তাহা ছাড়া বাড়ী হইতে ষ্টেশন পর্য্যন্ত জুতাটা পায়ের পরিবর্ত্তে হাতে যাইত বলিয়া তারণের পায়ে যে কাঁটা ফুটিত, প্রতি রবিবারে সেই কাঁটা বাহির করিয়া দিবার সময় বিন্দু স্বামীকে তিরস্কার না করিয়া থাকিতে পারিত না। এক এক দিন কাঁটা বাহির করিতে যখন খানিকটা রক্ত আসিয়া তাহার হাতে লাগিত, তখন সে খুব জোর করিয়াই স্বামীকে বলিত, "দেখ, আর তোমার জজের ভাই হ'তে হবে না। ঠাকুর পোকে একটা চাকরী জুটিয়ে দিয়ে নিজেকে অপঘাতের হাত হ'তে বাঁচাও।"

তারণ হাসিয়া উত্তর করিত, "বাঁচাব বড় বৌ, বাঁচাব। তুই আর চারে ছ'টা বচ্ছর; তারপর দেখবে তারণ ভট্‌চাজ্জি পায়ের উপর পা দিয়ে কেবল ব'সে ব'সে বাবুয়ানি কচ্চে।"

এই ছয়টা বৎসর বিন্দুর নিকট ছয়টা যুগ বলিয়া বোধ হইত, এবং সেই ছয়টা যুগকে হাতে ঠেলিয়া দিবার জন্য তাহার প্রবল আগ্রহ জন্মিত।

তারণ সেই সকালে সাতটার একমুঠা খাইয়া বাহির হইয়া যাইত, তারপর রাত্রি নয়টায় খাইতে বসিয়া যখন শূন্যগর্ভ ভাতের হাঁড়ির দিকে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিত, এবং বিন্দুর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও অর্দ্ধেক ভাত পাতে রাখিয়া উঠিয়া পড়িত, তখন বিন্দু চোখের জল রাখিতে পারিত না। প্রথম প্রথম সে অম্বলে বুক জ্বালা, পেটের যন্ত্রণা, মাথা ভার ইত্যাদি অনেক হেতুবাদ প্রদর্শন করিত, কিন্তু তারণ যখন তাহার এই সকল হেতুবাদ মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে পারিল, তখন সে আর বিন্দুর কোন কথাই শুনিত না। এজন্য এক একদিন বিবাদ পর্য্যন্ত বাধিয়া যাইত।

তারণ পাতে ভাত রাখিয়া উঠিবার উপক্রম করিলে বিন্দু জোর করিয়া বলিত, "দেখ একমুঠো ভাত ফেলে যদি উঠবে, তা হলে তোমার পায়ে মাথা কুটে মরবো।"

তারণ বলিত, "মাথা কুটলে কেউ মরে না বড় বৌ, রোজ এক সন্ধ্যে খেলেই বরং মারা যায়।"

বলিয়া তারণ হাসিতে হাসিতে উঠিয়া পড়িত। বিন্দু রোষে ক্ষোভে দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া তাহার পায়ের কাছে মাথা কুটিতে যাইত। তারণ কিন্তু তাহাকে মাথা কুটিবার অবকাশ না দিয়াই রান্নাঘর হইতে ছুটিয়া পলাইত। বিন্দু অগত্যা আঁচলে চোখ মুছিয়া খাইতে বসিত; আর মনে মনে বলিত, হায়, এ কষ্ট কবে ঘুচিবে? ভগবান, মুখ তুলিয়া চাও!

এত কষ্টের মধ্যেও তারণ যখন যজ্ঞেশ্বর দত্তের বৈঠকখানায় পাশার আড্ডায় যোগ দিত, তখন তাহার ছ' তিন নয় পোয়া বারর জন্য উল্লাসপূর্ণ চীৎকার শুনিয়া কেহই মনে করিতে পারিত না, এই লোকটাকে মাসের অর্দ্ধেক দিন অর্দ্ধাশনে দিনপাত করিতে হয়। তারণ প্রায়ই যজ্ঞেশ্বর দত্তকে আশ্বাস দিয়া বলিত, "থামনা দত্তজা, গুপে ছোঁড়া মেডিকেল কলেজে ঢুকেছে। আর তিনটে বছর, তারপর রোজ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ছ' তিন নয় চালাব।"

সে তিনটা বৎসর কাটিয়া গেল, গোপীনাথ মেডিকেল কলেজ হইতে বাহির হইয়া দেশে আসিয়া বসিল, দত্তজা নূতন পাশার ছক আনাইল, তারণ কিন্তু রবিবার ছাড়া আর কোন দিনই পাশার আড্ডায় যোগ দিতে পারিল না; সে তালি-দেওয়া জুতা, ছেঁড়া জামা আর ময়লা কাপড়ের ভিতর দিয়া কেরাণী-জীবনের দৈন্য প্রকাশ করিতে করিতে সপ্তাহের অবশিষ্ট ছয়টা দিন নিয়মিত রূপে ষ্টেশনে যাতায়াত করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দত্তজা জিজ্ঞাসা করিল, "ভায়া এখন কত আনছে হে ভট্‌চাজ?"

তারণ বলিল, "গেল মাসে একাশি টাকা হ'য়েছে।"

দত্ত। সে তো তোমার মাহিনার ডবল।

তারণ। বরং এক টাকা বেশী।

দত্ত। তা হ'লে চাকরী তুমি ছাড়চো কবে?

তারণ। দেখি আর দু'চার মাস।

দত্ত। দু'চার মাস, না দু'চার বছর?

তারণ হাসিয়া উত্তর করিল, "যা বলেছ দত্তজা, পরের গোলামী—এ কর্ম্মভোগ যে কতদিন অদৃষ্টে আছে কে জানে।"

বলিয়া সে হাঁকিল, "ছ'তিন নয়।"

পাশায় পড়িল পোয়া বারো। দত্তজা হাসিয়া বলিল, "তোমার এখন পোয়া বারো হে ভট্‌চাজ, অন্য দান আস্‌বে না।"

ভ্রূকুটী করিয়া তারণ বলিল, "ড্যাম পোয়া বারো! তোমার ঘুঁটীটা পেকে গেল।"

সহাস্যে দত্তজা বলিল, "পরের পাকা ঘুঁটী দেখে হিংসা করো না ভট্‌চাজ, নিজের কাঁচা ঘুঁটী পাকাও।"

তারণ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; বলিল, "যা বলেছ দত্তজা, আমার কাচা ঘুঁটী পাকা একটু শক্ত বটে।"

দত্তজা বলিল, "সেটা বড় মিথ্যে নয় ভট্‌চাজ, কেন না পাকা ঘুঁটী কাঁচাতে তুমি খুব মজবুত।"

তারণ হাসিতে হাসিতে বলিল, "সতের পাশা সতের।"

দত্তজা পাশার চাল দিতে দিতে বলিল, "তুমি কিন্তু চাকরী ছাড়তে পারবে না, ভট্‌চাজ।"

"কেন বল দেখি?"

"চাকরীর উপর তোমার একটা মায়া ব'সে গেছে।"

তারণ হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল, হাসিতে হাসিতে বলিল, "তুমি পাগল হ'য়েছ দত্তজা, চাকরীর উপর আবার মায়া! মনে করলে আমি কালই চাকরী ছেড়ে দিতে পারি।"

দত্তজা জিজ্ঞাসা করিল, "পার?"

জোরে মাথা নাড়িয়া তারণ বলিল, "খু-উ-ব পারি।"

দত্তজা একটু উপহাসের হাসি হাসিল। সে হাসির মধ্যে বিদ্রূপের আভাস পাইয়া তারণ ঈষৎ রুষ্টভাবে বলিল, "আচ্ছা, তোমরা কি মনে কর আমি চাকরী ছাড়তে পারি না?"

মস্তক সঞ্চালনপূর্ব্বক দত্তজা বলিল, "কক্ষনো না ভট্‌চাজ, কক্ষনো না। তুমি যদি চাকরী ছাড়তে পার—"

"যদি পারি?"

"তা হ'লে এই পাশা—এই পাশা খেলাই ছেড়ে দেব।"

কৃত্রিম ভীতির ভাব প্রদর্শন করিয়া তারণ বলিল, "সর্ব্বনাশ, আমি ছাড়বো চাকরী, আর তুমি ছাড়বে পাশা, তা'হলে দুনিয়ায় থাকবে কি? না দত্তজা, অমন দিব্যি করো না।"

দত্তজা হাসিয়া বলিল, "হাঁ হাঁ, তুমিও চাকরী ছাড়চো, আর আমিও পাশা ছাড়চি। রাধাও নাচবে না, সাত মণ তেলও পুড়বে না।"

মাথা নাড়িতে নাড়িতে তারণ বলিল, "আচ্ছা আচ্ছা, দেখাব দত্তজা, দেখাব, চাকরী কি রকমে ছাড়তে হয় তা তোমাদের একবার দেখিয়ে দেব।"

দত্তজা বলিল, "সে আজ এক বৎসর দেখে আস্‌ছি হে ভট্‌চাজ।"

একটু রাগত ভাবে তারণ বলিল, "এক বৎসর কি দেখছো বলচো? চাকরী লক্ষ্মী, তাকে কি ছাড়লেই হ'লো?"

দত্তজা সহাস্যে বলিল, "কিন্তু লক্ষ্মীছাড়া না হ'লে কেউ চাকরী করে না, ভায়া।"

তারণ রুক্ষ দৃষ্টিতে দত্তজার মুখের দিকে চাহিল। দত্তজা বলিল, "রাগ ক'রো না ভট্‌চাজ, কয়টা মারোয়ারী, কয়টা ইংরেজ চাকুরে বল দেখি? অথচ লক্ষ্মী তাদের ঘরেই বাঁধা। আর চাকুরে যত এই লক্ষ্মীছাড়া বাঙ্গালীর দল।"

তারণ বলিল, "কাজেই চাকুরে হ'তে হয়। সবাই তো তোমার মত বাপের বিষয় পায় না যে, তাই নেড়ে চেড়ে খাবে।"

তাহার রাগ দেখিয়া দত্তজা হাসিয়া উঠিল; হাসিতে হাসিতে বলিল, "তুমিও এবার ভায়ের পয়সা নেড়ে চেড়ে খাবে হে ভট্‌চাজ।"

হাতের পাশাটা আছাড়িয়া দিয়া তারণ বলিল, "কি, আমি তারণ ভট্‌চাজ্যি, আমি ভায়ের রোজগারের পয়সা খাব?"

মস্তক সঞ্চালনপূর্ব্বক সহাস্যে দত্তজা বলিল, "দেখা যাবে হে, দেখা যাবে। এর পর এই পয়সা নিয়ে ঝগড়া না বাধে।"

তারণ নিরুত্তরে গম্ভীরভাবে পাশাগুলা তুলিয়া লইয়া চালিতে লাগিল। খেলিতে খেলিতে দত্তজা জিজ্ঞাসা করিল, "রাগ করলে ভট্‌চাজ?"

তারণ সহাস্যে উত্তর করিল, "ভয়ানক।"

দত্তজা বলিল, "রাগ কর আর যা কর, একটা কথা তোমায় ব'লে রাখি, যেমন বেশী স্বার্থপর হওয়া ভাল নয়, তেমনি বেশী উদার হওয়াও কিছু নয়।"

তারণ বলিল, "কথাটা স্পষ্ট ক'রে বল দাদা।"

দত্তজা বলিল, "এই দেখ, যেমন ভাইকে ফাঁকি দিয়ে তার সর্ব্বস্ব হাত করা ভাল নয়, তেমনি ভাই আনচে ব'লে তাতে আমার কোন অধিকার নাই, এটা মনে করাও খারাপ।"

তারণ হাসিয়া বলিল, "তুমি পাগল হয়েছ দত্তজা, আমাকে কি এমন কচি খোকা পেয়েছ? রোজ সন্ধ্যার পর গুপের কাছ হ'তে পাই পয়সাটি হিসাব ক'রে নিই। তাতে আমি বেশ পাকা আছি।"

দত্তজা বলিল, "ঐ পর্য্যন্ত পাকা, কিন্তু খরচের বেলাতেই কাঁচা। কালও তো দেখলাম, তোমার জামার হাতায় তিনটে তালি দেওয়া।"

"তবু জুতোর অবস্থা দেখ নি" বলিয়া তারণ হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে বলিল,

"মাইরি দত্তজা, বাড়ীতেও এই নিয়ে রাত দিন খিটিমিটি করে।"

দত্তজা বলিল "তাতো ক'রবারই কথা। ঈশ্বর কৃপায় তোমার এখন অভাব কি। তবু যদি তুমি সেই ছেঁড়া জুতো, তালি দেওয়া জামা প'রে বেড়াও তা'হলে সেটা ভা'ল দেখায় না। এতে তোমার ভায়েরও মাথা হেঁট হয়।"

দত্তজার মুখের দিকে চাহিয়া তারণ একটু বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "তাই হয় নাকি ?"

দত্তজা বলিল, "হয় না ? এতে লোকে তোমার ভাইকে দোষ দিতে পারে। বলবে, গুপী ডাক্তার এত টাকা রোজগার করে, কিন্তু ভায়ের সেই ছেঁড়া কাঁথা ঘুচলো না।"

চিন্তিত ভাবে মস্তক সঞ্চালন করিতে করিতে তারণ বলিল, "ঠিক কথা। কিন্তু কি জান দত্তজা, চল্লিশ টাকা মাইনেব কেরাণী হ'য়ে বাবুযানি কত্তে লজ্জা করে। তবে বাবুয়ানি কি ক'রবো না? ক'রবো, আগে চাকরীটা ছাড়ি। তারপর মাইরি দত্তজা, এমন ভাল ভাল কাপড় জামা পরবো যে, তা দেখে তোমাদের পর্য্যন্ত হিংসা হবে।"

মৃদু হাসিয়া দত্তজা বলিল, "যদি তত দিন বেঁচে থাকি।"

সে দিন পাশার আড্ডা হইতে ফিরিবার সময় তারণ ভাবিতে ভাবিতে আসিল, বাস্তবিক কি তাহার হীন পরিচ্ছদের জন্য গুপীর নিন্দা হয ?

ভাবিতে ভাবিতে বাড়ী আসিয়া তারণ স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দেখ বড় বৌ, কাল আমাকে গোটা পাঁচেক টাকা দিও তো। জামা জুতো গুলো পাল্টাতে হবে।"

বিন্দু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, ওগুলোতে এখনো তো তালি দেওয়ার জায়গা আছে ?"

মাথা নাড়িয়া তারণ বলিল, "তা থাক্, তুমি বুঝচো না বড় বৌ, এতে নিন্দা হয়। শুধু আমার নয়, গুপীর পর্য্যন্ত নিন্দা হয়। আর নিন্দা হোক্ না হোক্, আমাকে কি একটু ভাল কাপড় জামা পরতে নাই ? চিরকালই কি ছেঁড়া কাপড় গুছিয়ে বেড়াব ? আমি চোরের দায়ে ধরা পড়েছি নাকি ?"

বলিয়া সে মুখখানাকে ভারি করিয়া হুঁকা কলিকার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। বিন্দু মুখ টিপিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন খাইতে একটু দেরী হইয়া গিয়াছিল। তাড়াতাড়ি জামার বোতাম না আঁটিযাই হাতের পানটা মুখে গুঁজিতে গুঁজিতে তারণ বাড়ীর বাহিরে আসিতেই দেখিল, চিনিবাস নন্দীর ছেলে খুদিরাম ম্লানমুখে ডাক্তারখানা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। তারণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিরে খুদে, কোথায় গিয়েছিলি ?"

খুদিরাম বলিল, "ডাক্তার বাবুর কাছে।"

"কেন রে ?"

"বাবার বড্ড অসুক।"

"কার ? চিনিবাসের ? কি অসুক রে ?"

"জ্বর—বুকে ব্যাথা।"

শঙ্কিত স্বরে তারণ জিজ্ঞাসা কবিল, "নিমুনিয়া নাকি ?"

খুদিরাম নিরুত্তরে মাথা চুলকাইতে লাগিল। তারণ জিজ্ঞাসা করিল, "গুপী কি বললে ?"

ম্লানমুখে খুদিরাম বলিল, "বললে, এখন সময় নাই।"

আশ্চর্য্যান্বিতভাবে তারণ বলিল, "সময় নাই ? কেন, সময়ের হ'লো কি ? এই দেখ এক পাগল, একি আমাদের গাড়ীর সময় যে, এক মিনিটের তরে ফেল হ'য়ে যাবে !"

খুদিরাম হাঁ করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারণ বলিল, "আচ্ছা, আয় তুই।"

বলিয়া সে ব্যস্তভাবে ডাক্তারখানার দিকে চলিল।

গোপীনাথ তখন বাহিরের ডাকে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া সিগারেট ধরাইবার উদ্যোগ করিতেছিল; সহসা দাদাকে উপস্থিত দেখিয়া সেটা মুঠার মধ্যে চাপিয়া ধরিল। তারণ দরজার উপর দাঁড়াইয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "হাঁরে গুপী, চিনিবাস নন্দীর অসুখ, একবার দেখতে যাবি না ?"

মুখ ফিরাইয়া লইয়া যেন উপেক্ষার সহিত গোপীনাথ বলিল, "শুধু দেখে হবে কি ? ভিজিট তো দিতেই পারবে না—"

অতিমাত্র বিস্ময়ের সহিত তারণ বলিয়া উঠিল, "ভিজিট ? চিনে নন্দী তোকে ভিজিট দেবে ? এক বেলা জোটে তো এক বেলা জোটে না, কোন রকমে ধড়ে প্রাণটা রেখে বেঁচে আছে, সে তোকে ভিজিট দেবে ? তোর আশাও তো কম নয় !"

বলিয়া তারণ হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

গোপীনাথ বিরক্তিসূচক ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল, "ওষুধের দামটা তো দেওয়া চাই।"

তারণ একটু অপ্রতিভ ভাবে বলিল, "তা চাই বই কি, ওষুধ তো কিনতে হয়েছে। তবে গরীব লোক যদি না দিতেই পারে—"

গোপীনাথ বলিল, "গরীব লোক দেশে লক্ষ লক্ষ আছে। তা'হলে তো ব্যবসা চলে না।"

বিস্ময়ে দৃষ্টি বিস্ফারিত করিয়া তারণ বলিল, "ব্যবসা কত্তে হবে ব'লে গরীবে এক ফোঁটা ওষুধ পাবে না? তুই বলিস্ কিরে গুপী! না না, একবার গিয়ে দেখে আয়, ওষুধ দে। এর পর চিনিবাস খেটে শোধ দেবে।"

গোপীনাথ বলিল, "গেলেও এখন তো নয়, আমি এখন রামনগরে যাচ্চি। চৌধুরীদের বাড়ীতে ডাক আছে, গেলেই চার টাকা ভিজিট।"

তারণ প্রস্থানোদ্যত হইয়াছিল, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, "চুলোয় যাক তোর ডাক! চুলোয় যাক টাকা। তুই জানিস্, ওর বাবা তিনু নন্দীর দোকানে আমি ছ'বচ্ছর ছিলাম। দোকানের যা সেরা চাল, তাই মিনি পয়সায় আমাকে দিয়েছে। সে কি চাল রে! কি চমৎকার ভাত হ'তো; কুঁদ ফুল হার মেনে যায়।"

ভাতের চমৎকারিত্ব স্মরণেই হউক, বা তিনু নন্দীর দয়ার কথা মনে করিয়াই হউক, তারণের চক্ষুদ্বয় আর্দ্র, স্বর গাঢ় হইয়া আসিল। সে আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু দূরে গাড়ীর শব্দ শ্রুত হওয়ায় আর বলা হইল না; "যাঃ, আটটার গাড়ী ধত্তে পারলাম না" বলিয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিল।

সন্ধ্যার সময় আফিস হইতে ফিরিবার পথে চিনিবাসের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তারণ ডাকিল, "চিনিবাস কোথায় হে, কেমন আছ?"

চিনিবাস ঘরের দাবায় একটা ছেঁড়া ময়লা কাঁথার উপর শুইয়াছিল। সে ক্ষীণস্বরে উত্তর দিবার পূর্ব্বেই তারণ আসিয়া তাহার বিছানার পাশে দাবায় পা ঝুলাইয়া বসিয়া পড়িল, এবং চিনিবাসের বুকে কপালে হাত দিয়া মুখ সিটকাইয়া বলিয়া উঠিল, "ইঃ, বড্ড জ্বর যে। গুপী এয়েছিল? ওষুধ দিয়েছে?"

চিনিবাস বলিল, "ঠাকুর বেলা এয়েছিলেন; দামের তরে ওষুধ আনা হয় নি। বৌ থালাখানা নিয়ে বেরিয়েচে।"

তার। বাঁধা দিতে বুঝি?

চিনি। হাঁ, শুধু হাতে কে দেবে দাদাঠাকুর! থালাটা রেখে যদি গণ্ডা বারো পয়সা পায়—"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তারণ বলিল, "দেখছি তোমরা সবাই পাগল। ওষুধটা ধারে আনলেই তো হতো। এর পর না হয়—চুলোয় যাক্।"

বলিয়া সে পকেট হইতে পাঁচটা টাকা বাহির করিয়া বিছানার উপর ফেলিয়া দিল, এবং একটু তীব্রকণ্ঠে বলিল, "এই নাও, ওষুধ পত্তর নিয়ে এস। ভাগ্যে টাকাগুলো খরচ ক'রে ফেলি নাই।"

চিনিবাস বিস্ময়স্তব্ধ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারণ তাহার সে দৃষ্টিকে উপেক্ষা করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "ক্ষুদে কোথায়, আমার সঙ্গে গিয়েই ওষুধটা আনতো। হাঁ দেখ, আমি যে টাকাটা দিয়েছি, এটা গুপী যেন জানতে না পারে।"

নিতান্ত সঙ্কুচিতভাবে চিনিবাস বলিল, "তা দাদাঠাকুর, এই টাকা—"

বাধা দিয়া তারণ বলিল, "এত কিন্তু হচ্চো কেন চিনিবাস? বুঝতে পাচ্চো না, এ টাকা তো আমার বাক্সেই উঠবে। শুধু হাত-ফেরতা। আমার টাকা আমিই পাব, মাঝে হতে তুমি সেরে উঠবে। একেই বলে—গঙ্গার জল গঙ্গায় রৈলো, পিতৃলোক উদ্ধার হলো।"

বলিয়া তারণ খুব একটা কৌতুকের হাসি হাসিয়া উঠিল, এবং দুই চারি পদ অগ্রসর হইয়া সহসা পশ্চাতে ফিরিয়া বলিল, "তবে পত্তির জন্যে যেটা তোমার খরচ হবে, সেটা এর পর খেটে খুটে শোধ দিও। আমার তো দান ধ্যান করবার ক্ষমতা নাই। বুঝলে কি না।"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই তারণ দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। চিনিবাস রোগশয্যায় পড়িয়া সজল দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

বাড়ীতে আসিয়া তারণ স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিল, "গুপেটার একটুও চক্ষুলজ্জা নাই বড় বৌ, চিনে নন্দীর ব্যারাম, তা বলে—দাম না দিলে ওষুধ দেব না। কি আশ্চর্য্য, লোকের জীবনটা বড়, না তোর ওষুধের দামটা বড়?"

বিন্দু বলিল, "মানুষের জীবন বড় বটে, কিন্তু ব্যবসা কত্তে গিয়ে এত চক্ষুলজ্জা রাখলে চলে কি?"

রাগতভাবে তারণ বলিল, "না গো না ব্যবসা কত্তে গেলে দয়া ধর্ম্ম সব পুড়িয়ে খেতে হয়। গুপে দেখছি তোমাকে শুদ্ধ ব্যবসাদার করে তুলেছে।"

বিন্দুও একটু রাগ দেখাইয়া চোখ নাচাইয়া বলিল, "তুলবে না তো কি? তোমার মত চিরকাল ছেঁড়া নেকড়া গুছিয়ে বেড়াবে?"

তারণ হাসিয়া বলিল, "যা বলেছ বড় বৌ, যার

যেমন কপাল। এই দেখ না, জামা জুতো কিনতে টাকা নিয়ে গেলাম—"

অসতর্কভাবে কথাটা বলিয়া ফেলিয়া তারণ যেন ভয়ে ভয়ে থামিয়া গেল। বিন্দু কিন্তু তাহার এই শঙ্কিত ভাব লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভাল কথা, টাকা নিয়ে গেলে, তোমার জামা জুতো কোথায়?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া তারণ বলিল, "আজ আর কেনা হলো না। দেরী হয়ে গেল। যাক্, এই ক'টা দিন গেলেই তো মাস কাবার।"

স্বামীর মুখের উপর ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বিন্দু বলিল, "মাস কাবারের প্রত্যাশায় টাকাগুলো বুঝি ফেরৎ নিয়ে এলে? ধন্যি তোমাকে!"

তারণ মৃদু হাসিতে হাসিতে মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে লাগিল। বিন্দু বলিল, "আমি সে কথা শুনবো না। আজই যেন হ'লো না, কাল কিনতেই হবে।"

"কাল—কাল তো হবে না বড় বৌ।"

"কেন হবে না শুনি।"

"টাকাগুলো বেহাত হয়ে গিয়েছে।"

বিন্দু যেন একটু তর্জ্জনের সহিত বলিল, "ওঃ তাই বল। কিন্তু বেহাত হলো কিসে? কাউকে ধার দিয়েছ বুঝি?"

"না, ধার নয়" বলিয়া তারণ চারিদিকে একবার সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। তারপর মৃদুস্বরে বলিল, "গুপেকে যেন ব'লো না, ওষুধের দামের তরে চিনিবাসের বৌ থালা বাঁধা দিতে গিয়েছিল।"

"তাই বুঝি তাকে টাকাগুলো খয়রাৎ ক'রে এলে?"

"খয়রাৎ! আমাকে কি এমনি পাগল পেয়েছ?"

"খয়রাৎ না হয় ধার।"

"ধার! তোমরা বুঝতে পাচ্চো না। এই যে টাকা ক'টা দিয়ে এলাম, তাই দিয়েই তো ওষুধ নিয়ে যাবে। তা হ'লেই সে টাকা আমার হাতেই আসবে। আর বাকী যা পত্তিতে খরচ হবে, সেটা খেটে শোধ দেবে, এ পর্য্যন্ত ব'লে এসেছি। আমাকে কি এমনি ছেলে মানুষ পেয়েছ?"

বিন্দু হাসি চাপিতে পারিল না; বলিল, "না না, তুমি খুব বিজ্ঞ বুদ্ধিমান্। এখন উঠে মুখে হাতে জল দাও দেখি।"

বলিয়া সে জলের গাড়ুটা আগাইয়া দিল। তারণ মুখ হাত ধুইয়া একটু জল খাইল; তামাক টানিতে টানিতে ডাকিল, "বড় বৌ!"

রন্ধনশালা হইতে বিন্দু উত্তর দিল, "কেন?"

"কি কচ্চো, শুনে যাও না।"

বিন্দু আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। তারণ হুঁকায় একটা জোর টান দিয়া, এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, "সেই যে বছর বাবা মারা যান, তোমার খুব ব্যারাম হয়, মনে আছে?"

সলজ্জভাবে বিন্দু বলিল, "একটু একটু মনে হয়।"

তারণ বলিল, "আমার কিন্তু বেশ মনে আছে। কম অসুখ কি, সাত দিন সাত রাত অজ্ঞান অচৈতন্য, মুখে মাছি সেঁদিয়ে যেতো। বাঁচবার কি আশা ছিল।"

মৃদু হাসিয়া বিন্দু বলিল, "না বাঁচলেই বোধ হয় ভাল হ'তো।"

তিরস্কারের স্বরে তারণ বলিল, "দিব্যি ভাল হ'তো।"

তাহার মুখের উপর হাস্যোজ্জ্বল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বিন্দু বলিল, "মন্দই বা কি হ'তো। তুমি আবার একটা সুন্দরী দেখে বিয়ে কত্তে। কিন্তু সে কখনো সাতটায় ভাত তৈরী ক'রে দিত না।"

মুখভঙ্গী করিয়া তারণ বলিল, "না, জগতের মধ্যে তুমিই কেবল সাতটায় ভাত তৈরী ক'রে দাও। তুমি মস্ত কাজের লোক কি না।"

গ্রীবা আন্দোলন করিয়া সগর্ব্বে বিন্দু বলিল, "কাজের লোক নয় তো কি? আমার মত কাজের লোক একটা খুঁজে নিয়ে এস দেখি।"

বলিয়া, সে হাসিতে হাসিতে প্রস্থানোদ্যত হইল। তারণ ডাকিয়া বলিল, "চলে যাচ্চো যে?"

বিন্দু বলিল, "আমার রান্না হচ্চে।"

তারণ বলিল, "তা হোক না। হাঁ, যে জন্যে ডেকেছিলাম শোন। তোমার তো সেই অসুখ, হাতে একটি পয়সা নাই, চার দিকে দেনা। যে দিন অসুখের বাড়াবাড়ি, সেইদিন পরেশ ডাক্তার বললে, ওষুধের দাম সাত টাকা হ'য়েছে, মিটিয়ে দিয়ে ওষুধ নিয়ে যাবে। ওঃ, তোমাকে কি বলবো বড় বৌ, মাথায় যেন বজ্রাঘাত ভেঙ্গে পড়লো। কি করি, টাকা কোথায় পাই? দু'টো টাকার জন্যে যার কাছে না হাত পেতেছি সে মানুষই নয়। তারপর হাতুড়ে হোক, ভাগ্যে শিবু ডাক্তার ছিল। সে ভরসা দিয়ে বললে, ভয় কি ভট্‌চাজ্যি মশায়, আমি ভাল করবো। করলেও তাই। সেই দিন মনে করেছিলাম কি জান, পারি যদি ডাক্তারীটা শিখবো।"

ঈষৎ হাসিয়া বিন্দু বলিল, "তাই বুঝি নিজে পাশ-করা ডাক্তার হয়েছ?"

মাথা নাড়িয়া তারণ বলিল, "হ'বার আর সময় পেলাম কোথায় বড় বৌ, সংসার যেঁ ঘাড়ে পড়লো। তারপর গুপী যখন এফ, এ পাশ করলে, তখন ঠিক করলাম, নিজের দ্বারা কিছু হলো না, গুপেকে ডাক্তারী শেখাব। করেছিও তাই। এখন আমার মত অবস্থায় যারা পড়ে, তারা এক কৌটা ওষুধ না পেলে বড্ড কষ্ট হয় বড় বৌ। মনে হয়, আমার এত আশা এত কষ্ট সব নিষ্ফল হ'য়ে গেল।"

তারণের স্বরটা বেদনার ভারে যেন আর্দ্র হইয়া আসিল। বিন্দু প্রশংসমান দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া সহাস্যে বলিল, "নিষ্ফল হ'তে যাবে কেন? ভগবানের কৃপায় তোমার কষ্ট নিশ্চয়ই সফল হবে। কিন্তু তাই ব'লে নিজের জামা জুতোর টাকাটা এ রকমে খয়রাৎ করা ভাল হয় নি।"

তারণ বলিল,"তুমি এমন কথা বলো না বড় বৌ। আচ্ছা মনে কর, আমার ঐ রকম কঠিন ব্যারাম হ'য়েছে, ঘরে এমন সঙ্গতি নাই, যাতে এক বিন্দু ওষুধ পেতে পারি। সে অবস্থায় কেউ যদি—"

বাধা দিয়া তর্জ্জন সহকারে বিন্দু বলিল, "আচ্ছা গো আচ্ছা, তোমাকে এত বক্তৃতা দিতে হবে না। আমি বলছি, টাকা দিয়ে এসে তুমি খু-উ-ব ভাল কাজ করেছ।"

বলিয়া সে যেন ক্রোধভরে দ্রুতপদে রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল। তারণ বসিয়া আপন মনে হুঁকায় টান দিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গতিশীল ট্রেণখানাকে দেখিয়া গরুর গাড়ীগুলা যেমন তাহার দিকে ঈর্ষাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মনে মনে বলিতে থাকে, এরূপ দ্রুত ধাবন আদৌ সঙ্গত নয়, এবং এই অত্যধিক দ্রুত ধাবনের ফলে সে যে কোন মুহূর্ত্তে কোন এক অতলস্পর্শী গহ্বরমধ্যে নিপতিত হইয়া অতি দ্রুতগতিশীলতার পরিসমাপ্তি করিয়া দিতে পারে, তেমনই তারণ ভট্টচাজ্যির দ্রুত উন্নতি দেখিয়া গ্রামের অনেক লোক এরূপ সম্ভাবনা করিতে লাগিল যে, আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ হইলে সে অঙ্গুলিটা প্রায়ই বিনাশের কারণ হইয়া থাকে। অতিশয় কিছুই ভাল নয়; "অতি দর্পে হতা লঙ্কা" ইত্যাদি।

ঘরের খাইয়া বনের মহিষ বিতাড়ন ঠিক বুদ্ধিমানের কাজ না হইলেও প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই এমন কতকগুলি লোক থাকেন, যাঁহারা ঠিক এই ভাবেই পরের হিত চিন্তা করিয়া দিনযাপন করিতে ভালবাসেন। তাঁহাদের যে আপন আপন সাংসারচিন্তা থাকে না এমন নহে, কিন্তু তাঁহারা এমনই পরার্থপরায়ণ যে, তাহারই মধ্যে কতকটা সময় পরের হিতচিন্তায় ব্যয় করিয়া সময়ের সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন। গ্রামের কোন্ লোকটা কি ভাবে জীবনযাপন করিতেছে, কাহার উন্নতি হইতেছে, কে অবনতির পথে অগ্রসর হইয়াছে, কে নীতিপথ হইতে বিচ্যুত হইয়া সমাজকে কলুষিত করিবার চেষ্টা করিতেছে, পরের পয়সা লইয়া কে বড়মানুষী চালে চলিতেছে, সিন্দুকভরা টাকা থাকিতেও তাহা কাহার ভোগে আসিতেছে না, ইত্যাদি বিষয় সমূহ তাঁহাদের নখদর্পণের মধ্যে থাকে, এবং এই সকল বিষয়ের আলোচনা ও অন্যায়ের প্রতীকার চিন্তা লইয়াই তাঁহারা সর্ব্বদা ব্যস্ত হইয়া থাকেন।

মুড়াগাছিতেও এইরূপ পরার্থ-পরায়ণ লোকের অভাব ছিল না। সুতরাং তালি দেওয়া জামা এবং ছেঁড়া জুতার ভিতর দিয়াই তারণ ভট্টচাজ্যি যখন কিনু দত্তের জায়গা কিনিয়া সেখানে পাকাবাড়ীর পত্তন করিল, তখন গ্রামের অনেকেরই দৃষ্টি সেই পাকা বাড়ীর দিকে আকৃষ্ট হইল। এককড়ি দত্ত বলিল, "তারণ ভট্টচাজ্যি আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হয়েছে।"

অম্বিকা ঘোষাল বলিলেন, "কিন্তু ঝড়ে টিকলে হয়।"

গোপাল হাজরা বলিল, "পাগলা বামুনের কপাল ভাল।"

এককড়ি বলিল, "কে পাগল? তারণ ঠাকুর? দিব্যি পাগল ঠাউরেছ যা হোক। জমিটা কার নামে কিনেছে জান?"

গোপাল হাজরা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "কার নামে কিনেছে? নিজ নামে?"

এককড়ি বলিল, "ঐ তো খুড়ো, ভিতরের খবর রাখ না, আর পাগল পাগল বল। নিজের স্ত্রীর নামে খরিদ করেছে।"

গোপাল বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে এককড়ির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অম্বিকা ঘোষাল বিজ্ঞভাবে মস্তক সঞ্চালন পূর্ব্বক বলিলেন,"জানি হে জানি, যখন কওলার খসড়া তৈরী হয় তখনই শুনেছি। আর কোন্ টাকায় জমি কেনা হলো তা জানতেও আমার বাকী নাই। ঐ যে ভায়ের বিয়েতে হাজার দুই টাকা পেয়েছিল না? তারই হাজার খানেক টাকায় ভাইকে ডাক্তারখানা ক'রে দিয়েছে। বাকী টাকাটা এত দিন ব্যাঙ্কে জমা ছিল, সেই টাকাতেই জমি কিনেছে।"

দীনু মাইতি জিজ্ঞাসা করিল, "কত টাকায় কিনলে বাবা ঠাকুর ?"

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "আটশো সাতান্ন টাকায় ।"

দীনু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "সে ক' গণ্ডা ?"

এককড়ি বিরক্তভাবে বলিল, "তিনশো তের গণ্ডা। বেটা চাষা, সাড়ে আটশো টাকাকে বলে ক'গণ্ডা ।"

গোপাল বলিল, "ভাইয়ের বিয়ের টাকা, সে তো ভায়েরি প্রাপ্য। সে টাকায় নিজের পরিবারের নামে জমি কিনলে ?"

এককড়ি বলিল, "ভাইকে ফাঁকি দেওয়ার মতলব। এর পর পৃথক্ হ'লে, ভাই বাড়ীটার ভাগ নিতে পারবে না।"

দীনুর হাত হইতে কলিকা লইয়া হুঁকার মাথায় বসাইতে বসাইতে ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "উদ্দেশ্য তাই বটে, কিন্তু আইনে টিকবে না। স্ত্রীধন প্রমাণ কত্তে না পারলে মেয়ে মানুষের নামে বেনামী সম্পত্তি আইন-সিদ্ধ হয় না।"

বলিয়া ঘোষাল মহাশয় গম্ভীরভাবে হুঁকায় টান দিতে লাগিলেন। গোপাল বলিল, "আইনে না টিকুক, কিন্তু তারণ ঠাকুরের এমন কাজটা করা ভাল হয় নি।"

এককড়ি বলিল, "ভাইটাও হ'য়েছে তেমনি। এ দিকে হাতটি টিপলেই দাও টাকা; রুগী মরুক বাঁচুক, বিজিটটি চাই। ওদিকে যা আনচে, সর্ব্বস্ব ভায়ের হাতে তুলে দিচ্চে। শুনতে পাই নাকি, একটি পয়সার দরকার হ'লে ভায়ের কাছে হাত পাততে হয়।"

গোপাল বলিল, "আহা শোনা কেন, আমার নিজের চোখে দেখা। সেদিন খোকার তরে ওষুধ আনতে গিয়েছিলাম। কিসের তরে দু'টো পয়সার দরকার হ'লো, তা চাকরটাকে বড় বোয়ের কাছ হ'তে পয়সা চেয়ে আনতে বললে।"

এককড়ি বলিল, "হাঁ হাঁ, সর্ব্বস্ব ঐ দাদা আর বড় বোয়ের হাতে। এর পরে টের পাবেন।"

ঘোষাল মহাশয় গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "আহা, ও যা কচ্চে তা ঠিক ধর্ম্মসঙ্গতই কচ্চে। তারপর বড় ভাই অধর্ম্ম করে, তার ফল সে নিজেই ভুগবে।"

গাঁজাখোর কানাই দাস এতক্ষণ এক পাশে গুম্ হইয়া বসিয়াছিল। এক্ষণে সে ঘোষাল মহাশয়ের দিকে হাতটা বাড়াইয়া দিয়া বলিল, "পেসাদটা দাও দাদা ঠাকুর। কলিতে বামুনরা ধর্ম্ম ঠাকুরকে মানে না।"

বলিয়া সে ঘোষাল মহাশয়ের মুখের উপর শ্লেষপূর্ণ তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেই ঘোষাল মহাশয় মুখ মচকাইয়া তাহার হাতে কলিকা দিলেন, এবং সতর্ক দৃষ্টিতে একবার সকলের মুখের দিকে চাহিয়া লইলেন। কিন্তু কানাই দাসের কথায় তাঁহার উপর কাহারও লক্ষ্য পড়ে নাই দেখিয়া যেন কতকটা আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, "ওহে, কলিই হোক বা দ্বাপরই হোক, ধর্ম্ম চিরকাল সমান আছে; আর তার কাছে বামুন শূদ্র বিচার নাই। তবে সকলে ধর্ম্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব বুঝে উঠতে পারে না, বুঝবার উপায়ও নাই। শাস্ত্রেই আছে—ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং।"

কনিষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হইলে ঘোষাল মহাশয় যখন তদীয় পত্নীকে শিশু পুত্র সহ গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন এবং বিষয় সম্পত্তিতে তাহাদের কোন অধিকার থাকিলে আদালতের সাহায্যে তাহা অধিকার করিতে উপদেশ প্রদান করিলেন, তখন ঘোষাল মহাশয়ের ব্যবহারটা যে আদৌ ধর্ম্মসঙ্গত হয় নাই, এবং ধর্ম্মের সূক্ষ্ম আদালত হইতে ইহার একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি শীঘ্রই দৃষ্ট হইবে, এরূপ সম্ভাবনা অনেকেই করিয়াছিল। কিন্তু দিনের পর দিন অতীত হইয়া গেলেও যখন সে আদালত হইতে বিচারের কোন রায়ই প্রকাশিত হইল না, এবং অনাথা বিধবা লোকের ঘরে দাসীবৃত্তি করিয়া শিশু পুত্রকে প্রতি-পালন করিতে থাকিলেও ঘোষাল মহাশয় তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি দেখিতে পাইলেন না, তখন ধর্ম্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কাহারও কাহারও মনে ঘোরতর সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু ঘোষাল মহাশয় নিজেই যখন তাহাদের বুঝাইয়া দিলেন যে, তদীয় ভ্রাতৃবধূর এরূপ দুর্গতিভোগ তাহার পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত অধর্ম্মের ফল, এবং সে ফলের অন্যথা করিবার সামর্থ্য কোন মানুষেরই নাই, তখন অনেকেরই ধর্ম্ম সম্বন্ধে সংশয় অপনীত হইল, এবং ধর্ম্মের তত্ত্ব এত সূক্ষ্ম ও তাহা এমন অজ্ঞাত অন্ধকারময় গুহামধ্যে নিহিত যে, তাহাকে বুঝিবার শক্তি কাহারও নাই ইহা বুঝিয়া ঘোষাল মহাশয়ের উপর সঞ্জাত ক্রোধ পরিহার করিল।

আজও ঘোষাল মহাশয় সকলকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তারণ ভটচাজ্যির এই বেনামী কার্য্যের মধ্যেও ধর্ম্মের সেই সূক্ষ্ম তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে; কারণ, এই বেনামীর ফলে ভবিষ্যতে যে মামলা মোকদ্দমা বাধিবে, তাহাতে গুপী ডাক্তার চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করিয়া নিতান্ত নির্ম্মম ভাবে লোকের যে অর্থ শোষণ করিতেছে, সেই অর্থের যথার্থ সদ্গতি হইবে।

ঘোষাল মহাশয়ের কথায় সকলেই তাঁহার সূক্ষ্ম বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া ভবিষ্যতে তারুণ ভট্টচাজ্যি ও গোপী ভট্টচাজ্যির মধ্যে একটা গজকচ্ছপের যুদ্ধ দেখিবার আশায় উৎফুল্ল হইল। কিন্তু সে যুদ্ধে আবগারীর দর কিছুমাত্র নামিবে না শুনিয়া কানাই দাস একটুও প্রফুল্ল হইতে পারিল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

"বড় বৌ, ওগো বিন্দুবাসিনি, বৃন্দাবন-বিলাসিনি!"

বিন্দু রান্নাঘরে ছিল; উত্তর দিল, "কেন গো?"

"কোথায় তুমি? কি হচ্ছে?"

"রান্না ঘরে ভাত নামাচ্চি।"

বিরক্ত ভাবে তারণ বলিল, "আঃ, তোমার এক হ'য়েছে রান্নাঘর। যখনই ডাকবো তখনই রান্না ঘরে। দু'টো কথা যে শুনবে তারও সময় নাই।"

বলিয়া সে রন্ধনশালার দরজায় গিয়া দাঁড়াইল। বিন্দু ব্যস্তভাবে বলিল, "ওকি, জুতো নিয়ে রান্না ঘরে ঢুকচো যে?"

জুতা তারণের পায়ে ছিল না, হাতে ছিল, ব্যস্ততা-প্রযুক্ত সেটাকে বাহিরে ফেলিবার কথা মনে আসে নাই। বিন্দুর কথায় যেন সচেতন হইয়া বলিয়া উঠিল, "সত্যিই তো, এই দেখ, তাড়াতাড়িতে জুতোটা রাখতেও ভুলে গিয়েছি।"

হাসিতে হাসিতে জুতা বাহিরে রাখিয়া তারণ দরজা চাপিয়া বসিল। বিন্দু বলিল, "ওমা, চেপে বসলে যে? কাপড় ছাড়বে না?"

মস্তক সঞ্চালনপূর্ব্বক তারণ বলিল, "আরে, রেখে দাও তোমার কাপড় ছাড়া! আগে মজার কথাটা শোন।"

একটু কৌতূহলের সহিত বিন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "এমন কি মজার কথা গা?"

তারণ বলিল, "বড্ড মজার কথা বড় বৌ, বড্ড মজার কথা। শুনে তুমি না হেসেই থাকতে পারবে না।"

বলিয়া সে নিজেই হাসিয়া উঠিল। বিন্দু দুই হাতে ভাতের হাঁড়ির কাণা ধরিয়া বর্দ্ধিত বিস্ময়ে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারণ বলিল, "আজ আসবার সময় গাড়ীতে অম্বিকে ঘোষালের সঙ্গে দেখা। ঐ পূব পাড়ার অম্বিকে ঘোষাল গো, যে গোমস্তাগিরি কত্তো, তারপর তবিল ভেঙ্গে—"

বিন্দু বলিল, "হাঁ হাঁ, নিমায়ের জ্যাঠা তো?"

তারণ বলিল, "হাঁ, নিমায়ের জ্যাঠা। নিমায়ের বাপ কেষ্টধন মারা গেলে ছোট ভাইয়ের যথাসর্ব্বস্ব হাত ক'রে নিলে না? শেষে বিধবাটাকে তাড়িয়ে দিলে। বৌটা এখন সোণাপুরের রায়েদের বাড়ীতে রাঁধুনিগিরি কচ্চে।"

বিন্দু। সে তো শুনেছি। তা তার হয়েছে কি?

তারণ। তার আবার হবে কি? সে তো দুঃখ কষ্ট ক'রে ছেলেটিকে মানুষ কচ্চে। কিন্তু বুড়ো তার কত দুর্ণামই না রটিয়ে বেড়ায়।

বিন্দু। তা বেড়াক, সে যদি ঠিক ধর্ম্মপথে থাকে, তবে দেখবে ঐ ছেলে হ'তেই তার সুখ হবে।

তারণ। নিশ্চয়! নয় তো দিন রাতই যে মিথ্যা হবে।

বিন্দু ভাতের হাঁড়ীর ফেন ঝাড়িতে দিয়া হাত ধুইল।

তারণ বলিল, "যা বলছিলাম, ঘোষাল কি বলে জান?"

আগ্রহের সহিত বিন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "কি বল্লে?"

তারণ বলিল, "বলে, তারণ, কষ্ট ক'রে ভাইটিকে মানুষ করেছ, সে দু'পয়সা আনতেও শিখেছে, জমি কিনে বাড়ীর পত্তনও দিয়েছ। কিন্তু জমিটা স্ত্রীর নামে না কিনে আর কারো নামে বেনামী করলেই ভাল হ'তো।"

বিস্ময় সহকারে বিন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "সে আবার কি?"

তারণ বলিল, "বুঝতে পাচ্চো না; বেনামী বেনামী। এই ধর তোমার নামে জমিটা খরিদ হয়েছে, এটাও বেনামী, কিন্তু ঘোষাল বলে, এটা ঠিক আইনসিদ্ধ হয় নি। এর চাইতে তোমার ভাই কি ঐ রকম আর কারো নামে খরিদ করাই উচিত ছিল।"

"তাতে কি হ'তো?"

"এর পর পৃথক হ'বার সময় গুপী তার ভাগ পেতো না।"

গালের উপর হাত রাখিয়া আশ্চর্য্যান্বিতভাবে বিন্দু বলিল, "ওমা, বল কি গো? ওর উপায়ের পয়সা, আর ঐ ভাগ পাবে না?"

মাথা নাড়িয়া তারণ বলিল, "বেনামীর মজাই এই। এই যে তোমার নামে জমি কেনা হ'য়েছে, তাই কি সহজে ঐ জমির ভাগ পাবে?"

বিন্দু ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সহাস্যে তারণ জিজ্ঞাসা করিল, "ভাবচো কি?"

রোষক্ষুব্ধ কণ্ঠে বিন্দু বলিল, "তুমি বুঝি আজকাল এই সব ভাবতে শিখেছ?"

হাসিতে হাসিতে তারণ বলিল, "আমি কি ভাবি বড় বৌ? পাঁচ জনে যে আমার ভাবনা ভাবে।"

বিন্দু একটু চুপ করিয়া থাকিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "দেখ, এই পাঁচ জনের কি খেয়ে দেয়ে কাজ নাই?"

তারণ হাসিয়া বলিল, "কাজ থাকবে না কেন বড় বৌ, কিন্তু এটাও কি কম কাজ?"

"ছাই কাজ" বলিয়া বিন্দু মুখ ঘুরাইয়া লইল। তারণ বলিল, "এই দেখ, আমি মনে ক'রেছিলাম, এমন একটা মজার কথা শুনে তুমি কতই হাসবে, কিন্তু তুমি মুখখানাকে এমন বিশ্রী ক'রে বসলে—"

বিন্দু বলিল, "এমন সব বিশ্রী কথায় আমার হাসি আসে না।"

তারণ এবার মুখখানা একটু গম্ভীর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা বড় বৌ, তুমি কি মনে কর, ঘর কখনো ভাঙ্গবে না?"

জোরে মাথা নাড়িয়া দৃঢ়স্বরে বিন্দু বলিল, "কক্ষনো না।"

তাহার মুখের উপর স্থির প্রশান্ত দৃষ্টি স্থাপন করিয়া তারণ সহাস্যে বলিল, "এমন কথা মনেও ঠাঁই দিও না বড় বৌ। যা চিরকাল সকলের ঘরে হ'য়ে আসছে, আমাদের বেলাতেই কি তার অন্যথা হবে? আজ কাল না হোক, দু'বছর দশ বছর পরেও ঘর যে ভাঙ্গবে এ তুমি দেখে নিও। অন্ততঃ আমি বেঁচে থাকতে যদি না হয়, আমি চোখ বুজলেই—"

তর্জ্জন করিয়া বিন্দু বলিল, "উঠে যাও তো। আপিস থেকে এসে না কাপড় ছাড়া, না মুখে হাতে জল দেওয়া, যত সব অলক্ষুণে কথা নিয়ে ব'সেছেন।"

তাহার রাগ দেখিয়া তারণ হাসিয়া উঠিল; বলিল, "ভয় নাই বড় বৌ, আজই আমি চোখ বুজছি না, আর গুপেও আজি আলাদা হচ্চে না। তবে এক দিন যে হবে তাই ব'লে রাখছি।"

ভ্রূকুটী করিয়া বিন্দু বলিল, "আচ্ছা আচ্ছা, যখন হবে তখন তুমি প্রাণ ভরে হেসে নিও। এখন কাপড় চোপড় ছাড়বে কি না বল তো?"

মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে তারণ বলিল, "এই যাই। তুমি যে বুঝতে পাচ্চো না বড় বৌ, আমি কি আলাদা হ'বার কথায় হাসচি, আমি হাসচি অম্বিকে ঘোষালের যুক্তি শুনে। আমি তারণ ভটচাজ্যি, পাতের খাইয়ে যাকে মানুষ করেছি, তার পয়সা ফাঁকি দিয়ে নিতে যাব? লোকের যুক্তিটা শোন একবার।"

বলিয়া তারণ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং দরজা হইতে নীচে নামিয়া ফিরিয়া বলিল, "ভাল কথা, গুপী কাল বলছিল, একেবারে উপরেও দু'খানা ঘর তুলে নেওয়া যাক্"

বিন্দু। মন্দ কি?

তারণ। মন্দ তো নয়, কিন্তু এখন ইটের বাজার যে রকম চড়া। তা ছাড়া দেখা শোনাই বা করে কে? আমার তো রবিবার ছাড়া নিশ্বাস ফেলিবার সময় নাই। ও ছোঁড়া সারাদিন রুগী নিয়েই ব্যতি-ব্যস্ত, নাইবার খাবার সময় নাই বললেই হয়।

বিন্দু। তুমি না বলেছিলে, বাড়ী তৈরীর সময় ছুটী নেবে?

সচকিত ভাবে তারণ বলিল, "ছুটী! সর্ব্বনাশ, সে দিন ছুটীর কথা বলাতে ছোট সাহেব বেটা যেন মারতে এলো।"

ঈষৎ হাসিয়া বিন্দু বলিল, "শুধু মারতে এলো, মারলে না তো?"

তারণ। মারলে বুঝি তোমার খুব আমোদ হ'তো?

বিন্দু। খুব না হোক, একটু আমোদ হ'তো।

পরিহাসের স্বরে তারণ বলিল, "তুমি এমনি পতিব্রতাই বটে।"

বিন্দু বলিল, "আমি না হয় অ-পতিব্রতাই হতাম, কিন্তু তুমি তো চাকরী ছাড়তে।"

তারণ হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। বলিল, "না, তোমারা সকলে মিলে আমার চাকরীটুকুর উপর যে রকম নজর দিয়েছ, তাতে চাকুরী বুঝি আর থাকে না।"

সহাস্যে বিন্দু বলিল, "আহা, তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। আমি সে দিন সওয়া পাঁচ পয়সার হরির লুট দেবো।"

বলিয়া সে আলো লইয়া অগ্রসর হইল। তারণ তাহার পশ্চাতে যাইতে যাইতে বলিল, "ইঃ, সন্ধ্যা-বেলাই বাড়ীখানা যেন নিঃঝুম হ'য়ে পড়েছে। ছোট বৌমা কোথায়?"

বিন্দু উত্তর করিল, "শুয়ে পড়েছে বুঝি।"

বিস্ময় প্রকাশ করিয়া তারণ বলিল, "শুয়ে পড়েছে? এই সন্ধ্যা রাতে? অসুখ বিসুখ কিছু হ'য়েছে নাকি?"

বিন্দু বলিল, "না না, অসুখ করবে কেন? ছেলে মানুষ ব'সতে পারে না, তাই শুয়েছে।"

তারণ বলিল, "বসতে পারে না ব'লেই এমন সময় শুয়ে প'ড়বে? না না, এ রকম তো ভাল নয়।"

"আচ্ছা আচ্ছা, কাপড় ছাড় তো" বলিয়া বিন্দু আলনা হইতে কাপড় লইয়া তারণের হাতে দিল। তারণ কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল, "তা তুমি যাই বল, ছোট বৌমার কিন্তু এটা খুব অন্যায়। গেরস্ত ঘরের বৌ, এমন সময়ে শুযে থাকবে—"

বাধা দিয়া বিন্দু বলিল, "শোবে না তো কি করবে? রেঁধে ভাত দেবে?"

তার। রেঁধে ভাত না দিক, দু'একটা ছোট খাটো কাজ কত্তেও তো পারেন। আর রেঁধে ভাতই বা দেবেন না কেন? তুমি যে ওর চাইতে কম বয়সে দু'বেলা রেঁধে ভাত দিযেছ বড় বৌ।"

ঘাড় নাড়িয়া বিন্দু বলিল, "সে আমার উপায় ছিল না, কাজেই কত্তে হ'য়েছে। আর আমি ওর কাজের পিত্যেশী? কপাল আমার!"

তারণ গম্ভীর ভাবে বলিল, "তুমি প্রত্যাশী না হ'তে পার, কিন্তু ওঁর তো কর্ত্তব্য আছে। দেখ বড় বৌ, একটা কথা তোমায় ব'লে রাখি, কাজের তরে কিছু আসে যায় না, কিন্তু এর ভিতর কেরাণীর স্ত্রী আর ডাক্তার বাবুর স্ত্রী এই প্রভেদটুকু যেন না আসে।"

বিন্দু কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু উঠানে জুতার শব্দ শুনিয়া থামিয়া গেল। তারণ জিজ্ঞাসা করিল, "কে গুপী?"

"হাঁ" বলিযা গোপীনাথ নিজের ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। তারণ বিন্দুকে লক্ষ্য করিযা বলিল, "এই দেখ দেখি, ও ঘরে ফিরে এল, কোথায আলো, কোথায় কাপড়, তিনি দিব্যি আরামে ঘুমচ্চেন।"

"আচ্ছা, তুমি থাম" বলিয়া বিন্দু আলো লইয়া চলিয়া গেল। তাহাকে আজ এত জোরে ছোট বোয়ের পক্ষ সমর্থন করিতে দেখিয়া তারণ আশ্চর্য্যান্বিত হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এফ, এ পাশ করিয়া গোপীনাথ যখন মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করে, তখন অনেক কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা তারণ ভটচাজ্যির দ্বারস্থ হইতে লাগিল। আপাতত গোপীনাথের বিবাহ দিবার ইচ্ছা না থাকিলেও তারণ এই সকল আগন্তুককে কিছুতেই ঠেকাইয়া রাখিতে পারিল না। অনেকগুলি ভদ্রলোকের অনুরোধ ঠেলিবার পর শেষে চাঁদবাটীর উমেশ ঘোষালের অনুরোধ রক্ষা করিতে হইল। সনাতনগঞ্জের উকীল রামেশ্বর গাঙ্গুলির তিন হাজার টাকাতে উপেক্ষা করিয়া উমেশ ঘোষালের সহিত দেড় হাজার টাকায় রফা করিয়া ফেলিল।

একে টাকায় কম, তাহার উপর মেয়েও তেমন সুন্দরী ছিল না; সুতরাং এরূপ সম্বন্ধে মত দেওয়ায় অনেকেই তারণের বুদ্ধির দোষ দেখাইতে লাগিল। এমন কি, বিন্দু পর্য্যন্ত তাহাকে দোষ দিতে ছাড়িল না। তারণ কিন্তু কাহারও কথায় কর্ণপাত করিল না; বলিল, "কেবল টাকা দেখলেই তো চলে না, বনেদী ঘরের মেয়ে চাই।"

বিবাহের পর বৌ দেখিয়া সকলে ছি ছি করিতে লাগিল। বিন্দু কয়েকদিন স্বামীর সহিত কথা পর্য্যন্ত কহিল না। তারণ ইহাতে বেশ আমোদ বোধ করিল এবং বিন্দুর ক্রোধের সীমা কতদুর, তাহা জানিবার জন্য উৎসুকভাবে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু বেশী দিন তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইল না; একদিন সে আফিস হইতে ফিরিয়া মাথা ধরার ভাণ করিয়া যখন শুইয়া পড়িল, তখন বিন্দুকে অগত্যা কথা কহিতে হইল। সে আপন মনে তর্জ্জন করিয়া বলিল, "সহজ মানুষ এরূপ দিনরাত বোবা সেজে থাকলে মাথা ধ'র্‌বে না?"

তারণ মনে মনে হাসিল, কোন উত্তর করিল না। বিন্দু অসহিষ্ণুভাবে বলিল, "আচ্ছা, আমি এমন কি অপরাধ করেছি যে, আমার সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত কইবে না।

তারণ হাসিযা বলিল, "তবু ভাল বড় বৌ, অপরাধটা তুমি নিজের ঘাড়ে নিয়েছ।"

মুখ ভারী করিযা বিন্দু বলিল, "কাজেই। তোমরা পুরুষ, তোমাদের হাজার দোষেরও মার্জ্জনা আছে; কিন্তু মেয়ে মানুষের পান থেকে চুণটি খস্‌লে আর রক্ষা নাই।"

তার। অথচ মেয়ে মানুষের রাগটুকু আঠার আনা আছে।

বিন্দু। সে রাগে তোমাদের তো ষোল আনাই ক্ষতি। একবার ভুলেও জিগ্যেস করবে না, হাঁ গা, কেন রাগ করেছ।

বলিয়া বিন্দু অভিমানভরে মুখ ফিরাইয়া লইল। তারণ বলিল, "সে জিজ্ঞাসায় রাগটা যখন বাড়বে বই কমবে না, তখন জিজ্ঞাসা ক'রে ফল কি?"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া বিন্দু বলিল, "হাঁ গো হাঁ, তোমরা আমাদের এমনি অপদার্থ মনে কর বটে। কিন্তু তোমাদের মত রাগ যদি আমাদের থাক্‌তো, তা হ'লে এতটা বাহাদুরি দেখাতে পার্‌তে না।"

তারণ হাসিয়া বলিল, "বাহাদুরি আমার চাইতে তুমি বেশী দেখিয়েছ বড় বৌ। পাঁচ পাঁচটা দিন আমার সঙ্গে কথা না ক'য়ে তুমি দিব্যি আছ, কিন্তু আমাকে কথা কইবার তরে শেষে মাথাধরার ছল কত্তে হলো।"

ঈষৎ হাসিয়া বিন্দু বলিল,"ওঃ, তা হ'লে তোমার মাথা ধরা মিথ্যে বল।"

তারণ শুইয়া ছিল, সবেগে উঠিয়া বসিল ; হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমার শত্রু যে তার মাথা ধরুক। খুব ছেলে বেলায় কি হ'য়েছে জানি না, কিন্তু জ্ঞান হওয়া অবধি আমার মাথা ঠিক আমারই আছে, কেউ কখনও ধর্‌তে সাহস করে নি।"

বিন্দু। যেন খুব আশ্বস্তভাবে বলিল, "সর্ব্বরক্ষে, আমার তো শুনেই এমনি ভয় হয়েছিল! কেন না আমি তো কখনো তোমার মাথা ধরতে দেখি নি।"

তারণ বলিল, "ভবিষ্যতে বোধ হয় কখনো দেখবে না, যদি তুমি নিজে দেখতে না চাও।"

"সত্যি নাকি" বলিয়া বিন্দু স্বামীর মুখের উপর হাস্য-সমুজ্জ্বল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। তারণ একটু হাসিয়া জিজ্ঞসা করিল, "আচ্ছা বড় বৌ, ছোট বৌ-মাকে তোমার কি আদৌ পছন্দ হয় নি?"

মুখখানাকে একটু গম্ভীর করিযা বিন্দু বলিল, "খুব পছন্দ হয়েছে। তুমি যখন পছন্দ করে এনেছ, তখন কি আমার অপছন্দ হতে পারে?"

গম্ভীরভাবে তারণ বলিল, "তুমি বুঝচো না বড় বৌ। মেয়েই বল আর পুরুষই বল, গুণটা দেখা দরকার, রূপে কি আসে যায়। এই যে তুমি — তুমি কি নিজেকে সুন্দরী বলে মনে কর?"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বিন্দু বলিল, "না গো না, আমি আপনাকে সুন্দরী মনে করি না। আমি খুব কালো, খুব কালো, খুব কুচ্ছিত।"

একটু ব্যস্তভাবে তারণ বলিল, "আহা, রাগ কর কেন বড় বৌ, আমি কি তোমাকে কালো কুচ্ছিত বলছি। তবে তুমি যে সুন্দরী নও এ কথাটা যোদ্দা ঠিক।"

ঘাড় বাঁকাইয়া বিন্দু বলিল, আমিও সেটা অস্বীকার করি না, বা সে জন্য কারো পায়ে পড়তে যাই না। আমি যা তাই আছি।"

হাস্যতরল কণ্ঠে তারণ বলিল, "তা তো রয়েছ, কিন্তু নিজে যা নও, তার তরে এত রাগ কর কেন?"

রাগে চোখ মুখ নাচাইয়া বিন্দু বলিল, "রাগ করে বড্ড অন্যায় করেছি। আমি মন্দ বলে সকলকেই বুঝি মন্দ হতে হবে।"

উচ্চহাস্য সংকারে তারণ বলিল, "যা বলেছ বড় বৌ, তোমার মত মন্দ যদি সকলে হয়, তবে ভাল আমি মোটেই চাই না।"

"আচ্ছা, খোসামুদি শিখেছ", বলিয়া বিন্দু স্বামীর মুখের উপর একটা সহাস্য কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

এইরূপে স্বামী স্ত্রীর দ্বন্দ্বের অবসান হইয়া গেল, কিন্তু নবদম্পতীর মধ্যে যে একটা মনোমালিন্যের সূচনা হইয়াছিল, তাহার অবসান বড় সহজে হইল না। একে সরোজিনীর রূপ গোপীনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিল না ; ইহার উপর ব্রীড়া-সঙ্কুচিতা নববধূ বিবাহের পরবর্ত্তী কয়টি মাত্র দিনে এমন কোন গুণ প্রদর্শন করিতে পারিল না, যাহাতে তাহার রূপের দৈন্য ঢাকিয়া যায় এবং পাঁচজনের নিন্দাবাদে স্বামীর তিক্ত মনে একটুও সরসতা বা সহানুভূতির উদ্রেক হইতে পারে। সে যে লজ্জা লইয়া আসিয়াছিল, সেই লজ্জা লইয়াই পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল ; যাইবার সময় শুধু স্বামীর উপর কতকটা বিরক্তির ভাব লইয়া গেল।

এক বৎসর পরে সরোজিনী পুনরায় স্বামি-গৃহে আসিল বটে, কিন্তু সেখানে পাঁচমাস থকিয়াও এক দিনের জন্য স্বামীর সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিল না। এই পাঁচমাসের মধ্যে গোপীনাথ কলেজের ছুটী পাইল না। সরোজ কিন্তু ছুটী অপেক্ষা নিজের উপর স্বামীর অবজ্ঞাকেই ইহার মুখ্য কারণ স্থির করিয়া লইল, এবং এই উপেক্ষার প্রতিদানে স্বামীর উপর গভীর অশ্রদ্ধা লইয়া সেবারের মত স্বামি-গৃহ ত্যাগ করিল।

তারপর গোপীনাথ ডাক্তারী পাশ করিয়া বাড়ীতে আসিয়া বসিলে সরোজকে পুনরায় স্বামি-গৃহে আগমন করিতে হইল। এবারে আসিয়া সে কিন্তু স্বামীর একটু পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল। গোপীনাথ তাহার প্রতি বেশ প্রীতি-কোমল ব্যবহার না দেখাইলেও কোনরূপ কঠোরতা প্রকাশ করিল না। নিজের দরকারী জিনিষ ষ্টেথিস্‌কোপ বা থার্ম্মোমিটারটাকে দরকারের সময় যেমন ঝাড়িয়া মুছিয়া ব্যবহার করিত, তারপর সেগুলা সারাদিন পকেটে পড়িয়া থাকিলেও তাহাদের দিকে কিছুমাত্র মনোযোগ থাকিত না, সরোজের সঙ্গেও ঠিক সেই দরকারী

জিনিষের অনুরূপ ব্যবহার করিত। দিবসের অধিকাংশ সময়ই গোপীনাথকে বাহিরে থাকিতে, হইত, রাত্রিতেও ডাক্তারী বহিগুলার পাতা উল্টাইতে অনেকটা সময় কাটিয়া যাইত, সুতরাং স্ত্রীর সহিত প্রণয়ালাপের অবসর বড় একটা থাকিত না। অথচ খুব ব্যস্ততার সময়েও সরোজ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে এমন সহজ শান্তভাবে তাহার উত্তর দিয়া যাইত যে, তাহার স্ত্রীর উপর একটুও বিরাগের লক্ষণ প্রকাশ পাইত না।

কিন্তু যে জিনিষটাকে প্রচ্ছন্ন রাখিবার জন্য চেষ্টা করা যায়, সেই জিনিষটাই যেন গোপন রাখিবার চেষ্টার ভিতর দিয়াই খুব স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ হইয়া পড়ে। সুতরাং গোপীনাথের চেষ্টাকৃত সহজ শান্ত উত্তরের মধ্যেই যে বিরক্তিটুকু প্রকাশ পাইত, গোপীনাথ নিজে তাহা বুঝিতে না পারিলেও সরোজ বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারিত। কেবল সে একা নহে, বিন্দুও ইহা বুঝিয়া লইয়াছিল, এবং সরোজ যে ইহা বুঝিয়াও বুকের বেদনাটা বুকের মধ্যেই গোপন করিয়া রাখিবার প্রয়াস পাইতেছিল এটাও আপনার অন্তর দিয়াই অনুভব করিতে পারিয়াছিল। ইহার ফলে তাহার বিদ্রোহী চিত্তটা সহানুভূতির আকর্ষণে ক্রমেই সরোজের দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছিল। এই আকর্ষণের নিকট সরোজিনীর রূপের অভাবজনিত ক্ষোভ অনেকটা ম্লান হইয়া আসিল।

রূপ! জগতে রূপটা এমন কি লোভনীয়, যাহার জন্য একটা জীবন উপেক্ষিত হইতে পারে? গুণ অপেক্ষা রূপের মর্য্যাদা কি অধিক? তবে কালো কোকিলের এত আদর কেন? রূপে বাহিরটা উজ্জ্বল হয় বটে, কিন্তু ভিতরটা তো অন্ধকারময় হইয়া থাকে। তবু পুরুষগুলা রূপের জন্যই লালায়িত; যাহার রূপ নাই, তাহার জীবনটাকে একেবারে ব্যর্থ বলিয়া জ্ঞান করে। পুরুষ জাতিটা কি স্বার্থপর! বিন্দু এই স্বার্থপর জাতিটার ন্যায় অন্যায় বিচারের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া রূপহীনা সরোজিনীর পক্ষপাতী হইয়া পড়িল, এবং তাহার রূপহীনতার জন্য নিজে যে এক সময়ে স্বামীর সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

"দিদি!"

"কেন সরো!"

দিদির মুখের দিকে চাহিয়া একটু বিস্ময়ের সহিত সরোজ জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি সরি ছেড়ে আজ যে বড সারা ধ'রলে দিদি!"

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বিন্দুর পক্ষে একটু কঠিন বলিয়া বোধ হইল। সরোজের উপর যতদিন সে খুব বিরক্ত ছিল, ততদিন তাহাকে ছোট বৌ বলিয়া ডাকিয়া আসিয়াছে। তারপর সে বিরক্তির মাত্রাটা যখন হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল, তখন ছোট বৌ ছাড়িয়া সরি সম্বোধন ধরিল। কিন্তু আজ একেবারে সরি ছাড়িয়া কেন যে সরো বলিয়া ফেলিল তাহার উত্তর সহজে দিতে পারিল না।

তাহার উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই সরোজ বলিল, "না দিদি, তুমি আমাকে সরি বলেই ডাকবে।"

বিন্দু বলিল, "ছি, নাম বিগড়ে ডাকতে আছে?"

মাথা নাড়িয়া সরোজ বলিল, "খুব আছে। কেন, মা তো তামাকে সরি ব'লেই ডাকতো।"

বিন্দু বলিল, "সে আলাদা কথা। মা যাই ব'লেই ডাকুক তাতে রাগ হয় না। মায়ের মত কেউ ভালবাস্‌তে পারে কি?"

সরোজ বলিল, "ভাল বাস্‌তে পারে না ব'লেই ডাক্‌তে সাহস করে না। যে ভালবাসে সে স্বচ্ছন্দে যা ইচ্ছা তাই ব'লে ডাকে।"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া বিন্দু বলিল, "আচ্ছা আচ্ছা, এখন হ'তে তোকে সরি ব'লেই ডাকবো। এখন কি বলছিলি তাই বল্‌ দেখি।"

মাথাটা একটু নীচু করিয়া সরোজ ধীরে ধীরে বলিল, "বড় ঠাকুর নাকি আমার উপর খুব রেগেছেন?"

বিন্দু বলিল, "খুব না হ'ক, কতকটা রেগেছেন বটে।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সরোজ বলিল, "কি হবে দিদি?"

ঈষৎ হাসিয়া বিন্দু বলিল, "বড় ঠাকুরের পায়ে ধ'রে মাপ চেয়ে আয়।"

তাহার মুখের উপর সহাস্য কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া সরোজ বলিল, "যাও।"

উভয়ে খাইতে বসিয়াছিল; সরোজের কথার উত্তরে "তবে যাই" বলিয়া উঠিতে উদ্যত হইল সরোজ জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাচ্ছো?"

"তোর বড়ঠাকুরকে ডেকে আনি।"

"দূর!" বলিয়া সরোজ বাঁ হাত দিয়া বিন্দুর পিঠে একটা ঠেলা দিল। বিন্দু হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল। সরোজ বুলিল, "তামাসা নয় দিদি, সত্যি কি বড়ঠাকুর বড্ড রেগেছেন?"

মুখ মচকাইয়া বিন্দু বলিল, "তুইও যেমন! ওর আবার রাগ! একটুতেই তালপাতার আগুন, আবার একটুতেই গঙ্গার জল।"

সরোজ নীরবে নখ দিয়া আলুর খোসা ছাড়াইতে লাগিল। বিন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "উনি রেগেছেন ব'লে তোকে কে ব'লুলে?"

সরোজ কোন উত্তর দিল না, মাথা হেঁট করিয়া রহিল। ঈষৎ হাসিয়া বিন্দু বলিল, "ঠাকুরপো বুঝি ব'লেছে?"

সরোজ সলজ্জভাবে সম্মতিসূচক মস্তক আন্দোলন করিল। বিন্দু বলিল, "হঁা হঁা, তুই কাল সন্ধ্যার সময় শুয়েছিলি কি না, তাই উনি একটু যেন রাগ কচ্ছিলেন। ঠাকুরপো বুঝি তাই শুনতে পেয়েছে। তা ঠাকুরপোরও যেমন খেয়ে দেয়ে কাজ নাই, সে কথা আবার তোকে বলতে গিয়েছে।"

সরোজ বলিল, "ব'লে ভালই ক'রেছে দিদি, আর আমি সন্ধ্যার সময় শোব না।"

বিন্দু বলিল, "সে তোর খুসী। কাজকর্ম্ম কিছু থাকে না ব'লেই—"

সরো। কাজকর্ম্ম থাকে না তো এত রাত পর্য্যন্ত তুমি কি কর?

বিন্দু। ফলার করি। তুই করবি?

সরো। হঁা, করবো।

তাহার মুখের উপর ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বিন্দু বলিল, "আচ্ছা, তুই কত বড় কাজের লোক হ'য়েছিস্ তা দেখবো।"

তাহার ক্রোধে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সরোজ মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল? বিন্দু মুখ ভার করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। সরোজ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "রাগ করলে দিদি?"

রোষগম্ভীর স্বরে বিন্দু বলিল, "তুমি কাজ করবে, ভালই তো, আমি তাতে রাগ কত্তে যাবো কেন?"

বলিয়া বিন্দু তাড়াতাড়ি আহার শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং রাগে গুম্ হইয়া জোরে জোরে পা ফেলিতে ফেলিতে পুকুরঘাটে চলিয়া গেল। সরোজ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে ভাতের গ্রাস মুখে তুলিতে লাগিল।

এমন সময় ডাক আসিল, "ভাই গঙ্গাজল!"

সরোজ উঠানের দিকে ব্যগ্র দৃষ্টি করিয়া উত্তর করিল, "আর ভাই ফটিক জল।"

আগন্তুকা বিধবা যুবতী হাসিয়া বলিল, "আমি তো ফটিক জল হ'তে পারবো না ভাই। আমি এঁদো ডোবার ঘোলা জল।"

"এই দুপুর রোদে তাই বা কে পায় বল্।"

"তোর মত যার অদৃষ্টের বল।"

সরোজ হাসিয়া উঠিল, এবং তাড়াতাড়ি উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিতে করিতে বলিল, "তা ভাই ঘোলা জল, রোদে গরম না হ'য়ে আমার ঘরে চল্।"

বলিয়া সে এঁটো বাসনগুলা বাঁ হাতের তেলোর উপর বসাইয়া বাহিরে আসিল। গঙ্গাজল জিজ্ঞাসা করিল, "কতক্ষণ একা থাকতে হবে?"

সরোজ উত্তর করিল, "বেশীক্ষণ নয়, এগুলা ঘাটে ফেলেই আসচি।"

সরোজ দ্রুতপদে খিড়কীর ঘাটে চলিয়া গেল। গঙ্গাজল ধীরে ধীরে গিয়া তাহার ঘরে ঢুকিল।

গঙ্গাজলের সহিত এই আখ্যায়িকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক; সুতরাং এস্থলে তাহার পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সরোজের বাপের বাড়ী আর মোহিনীর বাপের বাড়ী কেবল এক গ্রামে নহে, একই পাড়ায়। খুব পাশাপাশি বাড়ী। মোহিনী সরোজ অপেক্ষা তিন বৎসরের বড় হইলেও উভয়ের মধ্যে সখিত্ব জন্মিয়াছিল। যতদিন না বিবাহ হইয়াছিল, ততদিন নিতান্ত বাধ্য না হইলে কেহ কাহারও সঙ্গ ত্যাগ করিত না।

মোহিনীর বাপ ছিল না, মা গরীব; দুই চারি বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমির আয়ে কোনরূপে দিন চালাইত। সরোজের মা বাপ বড়লোক না হইলেও যতটা পারিত, এই অনাথাকে সাহায্য করিত। সুতরাং এই সূত্রে মোহিনীর সহিত সরোজের ঘনিষ্ঠতা খুব বাড়িয়াই উঠিয়াছিল।

তারপর মোহিনীর বিবাহের বয়স উপস্থিত হইলে সরোজের বাপই চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন, এবং অনেক খুঁজিয়া শেষে গঙ্গাপুরে তারণ ভট্চাজ্যির প্রতিবেশী সর্ব্বেশ্বর বিদ্যানিধির ছোট ভাই বীরেশ্বর চক্রবর্ত্তীর সহিত সম্বন্ধ স্থির করিলেন। বিধবা জীবিকার সম্বল ব্রহ্মোত্তর জমিরই কিয়দংশ বিক্রয় করিয়া বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহ করিল। গঙ্গাপুরে

বিবাহের পর হইতে সরোজ মোহিনীর সহিত গঙ্গাজল সম্বন্ধ পাতাইয়া লইল।

মোহিনীর মা বেশী খরচ করিতে না পারিলেও বিবাহ যে খুব মন্দ ঘরে হইয়াছিল তাহা নহে। বীরেশ্বর কলিকাতায় ত্রিশ টাকা মাহিনার চাকরী করিত। বড় ভাই সর্ব্বেশ্বর বিদ্যানিধিও বড় কম উপায় করিতেন না; অধ্যাপক বিদায়, ক্রিয়াকাণ্ড ইত্যাদিতে তিনি মাসে চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা ঘরে আনিতেন। ইহার উপর লাখরাজ ও ব্রহ্মোত্তরে যে জমিজমা ছিল, তাহাতে বার মাসের মধ্যে ভাতের অভাব হইত না; কাপড় গামছা কিনিবার প্রয়োজন ছিল না, কাপড়ের বস্তা পোকায় কাটিত। সুতরাং বিদ্যানিধির বাড়ীতে মোটা ভাত মোটা কাপড়ের কষ্টের সম্ভাবনা ছিল না।

লোকে বিদ্যানিধিকে পণ্ডিত ও নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ বলিয়া সম্মান করিলেও তাঁহার উপর কার্পণ্য দোষের আরোপ করিতে ছাড়িত না। তাঁহার একটি ছোটখাট টোল ছিল, এবং সেখানে দুই চারিটি ছাত্র ব্যাকরণ ও স্মৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। কিন্তু বিদ্যানিধি কোন ছাত্রকেই অন্ন ও পাঠ এক সঙ্গে দিতে পারিতেন না। যে সকল ছাত্র এই উভয়ের আশায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত, তাহাদিগকে নিরাশ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইত, আর যাহারা ঘরের খাইয়া পড়িতে আসিত, তাহাদিগকেই তিনি যত্ন সহকারে পাঠ দিতেন। অথচ ছাত্রপোষণের হেতুবাদ প্রদর্শন করিয়া তিনি উচ্চ বিদায় ও বার্ষিক বৃত্তির দাবী করিতে ছাড়িতেন না।

কেবল শাস্ত্রীয় ব্যবস্থায় নহে, সংসারের ব্যবস্থাতেও বিদ্যানিধি বেশ পাকা ছিলেন। তাঁহাকে কেহ কখন বাজার করিতে দেখে নাই। বাড়ীতে যে তরি-তরকারীর গাছ জন্মিত, তদ্দ্বারাই বাজারের কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যাইত। এই সকল গাছপালা উৎপাদন করিতে ভৃত্যের প্রয়োজন হইত না, টোলের ছাত্রেরাই তাহা সম্পন্ন করিত। কোন ছাত্র এই ভৃত্যোচিত কার্য্য সম্পাদনে অসম্মতি প্রকাশ করিলে বিদ্যানিধি তাহাকে আরুণি ও উদ্দালকের উপাখ্যান শুনাইয়া দিতেন। সুতরাং ছাত্রদিগকে বাধ্য হইয়া গুরুভক্তি প্রদর্শন করিতে হইত।

তা বিদ্যানিধি মহাশয়ের কার্পণ্যদোষে মোহিনীকে যে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইত তাহা নহে। স্বামীর আদরের যত্নে তাহার ক্ষুদ্র বুকটা এমনই ভরিয়া উঠিয়াছিল যে, সংসারের এই সকল ছোট খাট ত্রুটি তাহার চোখেই পড়িত না। স্বামীর ভালবাসার অগাধ সমুদ্রে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়া সে সংসারটাকে মধুময় নিরীক্ষণ করিত।

মোহিনীর বিবাহের এক বৎসর পরে সরোজের বিবাহ হইল। একই গ্রামে এক পল্লীতে বিবাহ হওয়ায় উভয়েরই আনন্দের সীমা রহিল না। একই ক্ষেত্রে উৎপন্ন লতা দুইটি স্থানান্তরিত হইয়াও একই ভূমিতে পাশাপাশি বর্দ্ধিত হইবার সুযোগ পাইয়া বিধাতাকে ধন্যবাদ প্রদান করিল।

কিন্তু হর্ষে বিষাদ উপস্থিত হইল, সরোজের বিবাহের মাস-কতক পরেই বিধাতা মোহিনীর সীঁথার সিন্দুর মুছিয়া দিলেন। অদৃষ্টের এই কঠোর নিষ্পেষণে মোহিনী অপেক্ষা সরোজ কম কাতর হইল না। সদ্যোবিধবা সখার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার তপ্ত বুকে অনেক চোখের জল ঢালিল।

মায়ের কাছে থাকিয়াই মোহিনী এই ভীষণ দুঃসংবাদ পাইয়াছিল; সেখান হইতে স্বামিগৃহে আসিয়া স্বামীর পারলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিল। কনিষ্ঠের মৃত্যুতে বিদ্যানিধি দিন কতক শোকে অভিভূত হইয়া রহিলেন। কিন্তু তাঁহার জ্ঞানবলে বলীয়ান্ হৃদয়ে শোক মোহ সুদৃঢ় আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিল না। "কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ" এই মহাজন বাক্য স্মরণে তিনি আপনার চিত্ত হইতে শোকসন্তাপ বিদূরিত করিয়া দিলেন এবং অসামান্য ধৈর্য্যবলে সুখদুঃখকে পরাজিত করিয়া পুনরায় বৈচিত্র্যময় সংসারধর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন।

সংসারে মন দিতেই প্রথমে বিধবা ভ্রাতৃবধূর দিকে তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। তিনি গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছোট বৌমার মনস্থ কি? এখানেই থাকবেন, না মায়ের কাছে যাবেন?"

গৃহি। সে কথা তো কিছু বলে নি।

বিদ্যা। বলা তো দরকার। এখানে যদি থাকেন, তা থাকুন, কিন্তু মেয়ে বিধবা হ'লে মা বাপের কাছেই থাকে।

গৃহি। সেখানেই বা ওর আছে কে?

বিদ্যা। মা আছে। ছেলে মেয়ে মায়ের কাছে যতটা যত্নে থাকে, তত যত্ন কি আর কোথাও পায়? আহা! "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

মাতার বাৎসল্য স্মরণে বিদ্যানিধি মহাশয়ের চক্ষু অশ্রুপ্লুত হইল। গৃহিণী কিন্তু মাতৃ-মাহাত্ম্য এতটা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা নিজেই খেতে পায় না, মেয়েকে কি খাওয়াবে।"

বিদ্যানিধি যেন বিরক্তভাবে উত্তর করিলেন, "তোমাদের যেমন মেয়েলী বুদ্ধি! গাছের পক্ষে কি ফল ভারী হয়? মা পেটে ঠাঁই দিয়েছেন, হাঁড়ীতেও ঠাঁই দিতে পারবেন। নিজের এক মুঠো জোটে, মেয়েরও জুটবে।"

গৃহিণী স্বামীর এই যুক্তিসঙ্গত উক্তির প্রতিবাদ করিতে পারিল না। সে একদিন কথায় কথায় মোহিনীর নিকট কথাটা পাড়িল। মোহিনী শুনিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ব'লল, "আমি সেখানে যাব না দিদি। তোমার দাসীবৃত্তি ক'রে এই ভিটের এক পাশেই পড়ে থাকবো।"

গৃহিণী তাহার এই ক্ষুদ্র প্রার্থনাটুকুকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। বিদ্যানিধি বলিলেন, "এখানে থাকতে হ'লে কিন্তু ওঁকে রীতিমত শুদ্ধাচারে থাকতে হবে। একাহার, হবিষ্য, নির্জ্জলা একাদশী ইত্যাদি শাস্ত্রের বিধানের একটু অন্যথা করলে চলবে না।"

গৃহিণী একটু সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "ছেলে মানুষ অতটা কি পারবে? তবে যতদুর পারে ক'রবে।"

বিদ্যানিধি রাগতভাবে বলিলেন, "যতদুর পারে কি, শাস্ত্রের যা আদেশ তা মানতেই হবে। ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে ছেলে বুড়া নাই। 'গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ।' বিশেষ, আমি শাস্ত্রের ব্যবস্থাদাতা, আমার ঘরে শাস্ত্রবিধির অমর্য্যাদা চলতে পারবে না।"

অগত্যা মোহিনীকে বাধ্য হইয়া শাস্ত্রবিধি যথাযথ প্রতিপালন করিতে হইল। প্রথম প্রথম ইহাতে বড়ই কষ্টবোধ হইতে লাগিল। তখন মোহিনীর মনে হইত, দূর হউক, মায়ের কাছে চলিয়া যাই। কিন্তু সেখানে গিয়াই কি শাস্ত্রের কঠোর বিধান হইতে অব্যাহতি পাইবে? সেখানেও তো এই একাহার এই হবিষ্যান্ন, এই একাদশীর মধ্যাহ্নে তৃষ্ণার প্রাণঘাতী যাতনা!! বিধাতার কঠোর অভিশপ বজ্রের মত যাহার উপর পতিত হইয়াছে, শাস্ত্র যাহার অভিশপ্ত জীবনের জন্য কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে, সমাজ যাহাকে ঘৃণার সহিত একপাশে ঠেলিয়া দিয়াছে, সে কোথায় গিয়া শান্তিলাভ করিবে? করুণাময় স্রষ্টার করুণাবিন্দু হইতে যে বঞ্চিত, করুণালাভের আশায় 'সে আর কাহার দ্বারস্থ হইবে? সুতরাং মোহিনীকে নীরবে সকল কষ্টই মাথা পাতিয়া লইতে হইল।

অভ্যাসে সব সহিয়া যায়। মোহিনীরও এই সকল কষ্ট ক্রমে সহিয়া গেল। এই সময়ে সরোজ শ্বশুরবাড়ীতে আসিলে মোহিনী যেন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। কাজের একটু অবসর পাইলেই সে সরোজের কাছে গিয়া বসিত; নানাপ্রকারের নানা কথা কহিত, এবং সেই সকল কথার মধ্যে সহানুভূতির আভাস পাইয়া আপনার দুঃখময় জীবনে অনেকটা সুখ ও সান্ত্বনা লাভ করিত। এজন্য তাহাকে মধ্যে মধ্যে বড় জায়ের কাছে যে তিরস্কার সহ্য করিতে হইত না তাহা নহে, কিন্তু ঐটুকু সুখের আশায় সে এই সকল তিরস্কারকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিত না।

মোহিনী একাই যে সরোজের সঙ্গ পাইয়া উপকৃত হইয়াছিল তাহা নহে, সরোজও মোহিনীকে পাইয়া অনেকটা আশ্বস্তি অনুভব করিয়াছিল। একে অপরিচিত স্থানে প্রথম আগমন; সকলেই নূতন, সকলেই অপরিচিত; যে জিনিষটার সহিত পরিচয় থাকিলে সব নূতন ও পুরাতন বোধ হয়, সেই স্বামিপ্রেম তাহার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত; বিন্দুও তখন তাহাকে কাছে টানিয়া লয় নাই। এ অবস্থায় বাল্যসখী মোহিনীর সঙ্গ সরোজের নিকট যে লোভনীয় হইয়া উঠিবে, ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

এইরূপে উভয়ে উভয়ের সঙ্গ দ্বারা যখন জীবনের সকল দুঃখ গ্লানি মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছিল তখন হঠাৎ একদিন মাতার কঠিন পীড়ার সংবাদ পাইয়া মোহিনী মায়ের কাছে চলিয়া গেল। সরোজ একা পড়িয়া তাহার প্রত্যাগমন সম্ভাবনায় দিন গণিতে লাগিল।

মাস দুই মায়ের কাছে থাকিবার পর মা আরোগ্যলাভ করিলে মোহিনী পুনরায় শ্বশুরবাড়ীতে ফিরিয়া আসিল।

——

নবম পরিচ্ছেদ

"কবে এলি ভাই গঙ্গাজল?"

"কাল এসেছি ভাই।"

"তাই বুঝি আজ দয়া ক'রে দেখা দিতে এলি?"

"কাল আজ—অনেকটা তফাৎ বটে। কিন্তু আমি তো জানতাম না, এমন অসীম সাগরের মাঝে ব'সে এই ঘোলা জলের তরে হাঁ ক'রে আছিস্।"

ঈষৎ হাসিয়া সরোজ বলিল, "সাগরের লোণা জলে কি তেষ্টা মেটে ভাই, বরং গলা আরও শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে যায়।"

সহাস্য তিরস্কারের স্বরে মোহিনী বলিল, "দূর ছুঁড়ি, এ কি লবণ-সাগর? এ যে ক্ষীরোদ সমুদ্র।"

সরোজ হাসিয়া বলিল, "আ কপাল, জানিস্ না, 'অভাগা যদ্যপি চায়, সাগর শুকায়ে যায়।' কপাল-গুণে ক্ষীর-সমুদ্রের জলও যে লোণা হ'য়ে পড়ে।"

"সত্যি ?"

"গঙ্গাজল সামনে রেখে মিছে বলতে পারি কি ?"

"তা হ'লে বলতে হবে তোর জিভের দোষ হ'য়েছে।"

"দোষ যার হয় একটার হ'য়েছে। কিন্তু তেষ্টা তো দোষ গুণ দেখে না ; কাজেই ফটিক জল ফটিক জল ক'রে প্রাণটা যায় যায় হয়েছিল।"

"যায় যায় হ'য়েছিল —যায় নি তো ?"

"আর দিন কতক দেরী হ'লেই যেতো বোধ হয়। ছ'মাস সাত দিন, আর মাসখানেক হ'লেই—"

"দেখছি দিনগুলাও গুণে রেখেছিস্।"

"কাজেই, যার যেখানে ব্যথা, তার সেখানে হাত।"

"তোর ব্যথাটা দেখছি সাংঘাতিক। এত বড় ডাক্তার হাতে থাকতেও ব্যথা সারলো না ?"

"হাতে থাকলে বোধ হয় সারতো।"

"তবে কি হাতের বাইরে ?"

"কি জানি কোথায়" বলিয়া সরোজ যেন সঙ্কোচে মস্তক নত করিল, এবং কথাটা ফিরাইয়া দিবার জন্য তাড়াতাড়ি বলিল, "ভাল কথা, জেঠাই মা বেশ সেরেছেন ?"

ঈষৎ ব্যথিতস্বরে মোহিনী বলিল, "বেশ আর তিনি সারবেন না। তবে মন্দের ভাল বটে।"

"তুই কেমন ছিলি ?"

"চেহারা দেখেই তো বুঝতে পাচ্চিস্।"

"কতকটা রোগা হ'য়েছিস্।"

হাসিয়া মোহিনী বলিল, "দূর! বরং একটু মোটা হ'য়েছি।"

সরোষ প্রতিবাদের সুরে সরোজ বলিল, "কক্ষণো না। একে বুঝি মোটা হওয়া বলে! আমি দিব্যি ক'রে বলতে পারি, তুই রোগা হ'য়েছিস্।"

উচ্চহাসি হাসিয়া মোহিনী বলিল, "আচ্ছা আচ্ছা, আমি না হয় রোগাই হ'য়েছি। হ'লেও আমার রোগা মোটায় তো কিছু আসে যায় না। তুই কিন্তু এত মোটা হ'য়েছিস্ কেন বল্ দেখি।"

মুখ মচকাইয়া সরোজ বলিল, "আমার কথা ছেড়ে দে।"

মোহিনী হাসিয়া বলিল, "ভাল, তাই ছেড়েই দিলাম। এখন ডাক্তার বাবুর খবর কি ? বাবু কোথায় ?"

সরো। যেখানে রোগী সেইখানে ডাক্তার।

মোহি। ঘরে যে এমন একটা রুগী ছট্‌ফট্ কচ্চে, সে দিকে বুঝি ডাক্তারের হুঁস্ নাই ?

সরো। হুঁস থাকলে কি হবে ? ঘরে তো ভিজিট পাবে না ?

মোহি। কেন, তুই ভিজিট দিস্ না ?

সরো। আমি ভিজিট দিতে কোথায় পাব ভাই?

তাহার চিবুকটা একবার নাড়িয়া দিয়া মোহিনী বলিল, "আ লো, এতও জানিস্! কেন তোর কি কিছুই নাই ?"

ম্লান হাসি হাসিয়া সরোজ বলিল, "কিছু থাকলে কি আমার এমন দশা হয়।"

তাহার মুখের উপর হাস্যোজ্জ্বল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া মোহিনী বলিল, "তা বটে, তোর দুর্দ্দশা দেখে সত্যিই কান্না পায়। পোড়ার মুখ আর কি।"

সরোজ নীরবে নতমুখে বসিয়া মাটীতে আঁক কাটিতে লাগিল। মোহিনী একটু চুপ করিযা থাকিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "একটা কথা সত্যি বলবি ?"

সরোজ মুখ তুলিয়া সহাস্যে বলিল, "ভয়ে না নির্ভয়ে ?"

"নির্ভয়ে বল্ না।"

"আচ্ছা কি বলতে হবে বল।"

"খুব সোজা কথা। ডাক্তার বাবু কি তোকে পছন্দ করে না ?"

"পছন্দ ক'রবার মত আমার কি আছে ?"

"কি নাই ? অভাব তো শুধু কটা চামড়ার।"

"সেটাও খুব কম অভাব নয়।"

"অপরের কাছে অভাব হ'তে পারে. কিন্তু যারা ছুরি চালিয়ে নাড়ী ভুঁড়ি পর্য্যন্ত ঘাঁটাঘাঁটি করে, তাদের কাছে বাইরের এই চামড়াখানার মূল্য কি ?"

"মূল্য কিছু আছে কি না সেটা যে ছুরি চালায় তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখতে পার।"

"তুই নিজে কখন জিজ্ঞাসা করিস্ নাই ?"

"সাহস হয় না।"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া মোহিনী বলিল, "সাধে কি বলি, পোড়ার মুখ। তাকে জিজ্ঞাসা কত্তে সাহস হয় না, —না আমাকে বল্‌তে সাহস হয় না ?"

মৃদু হাসিয়া সরোজ উত্তর করিল, "বোধ হয় দু'রকমই আছে।"

ক্রুদ্ধস্বরে মোহিনী বলিল, "চুলোয় যাক্ তোর সাহস! এখন বড় দিদির খবর কি বল।"

সরো। কোন্ খবরটা বলবো ?

মোহি। যেটা তোর খুশী।

সরো। কাল বঁটীতে দিদির আঙুল কেটে গিয়েছিল।

হাসি চাপিয়া মোহিনী জিজ্ঞাসা করিল, "ক'টা আঙুল?"

সরো। একটা।

মোহি। কতটা রক্ত পড়েছিল?

সরো। দু' তিন ফোঁটা।

কৃত্রিম আতঙ্কের ভাব প্রকাশ করিয়া মোহিনী বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! তারপর?"

সরো। তারপর আমি তাড়াতাড়ি আঙুলে ভিজে ন্যাকড়া বেঁধে দিলাম।

মোহি। ন্যাকড়া বেঁধে দিতে পার, আর বঁটী নিয়ে তরকারী কুটতে পার না? তোমার গতরে কি পক্ষাঘাত হ'য়েছে?

ঘাড় নাড়িয়া সরোজ বলিল, "পক্ষাঘাত হয় নি। তবে ভাই, কাজ কর্ম্ম কিছু কত্তে পারি না।"

মোহিনী বলিল, "তা পারবে কেন? এমন শরীরটি নিয়ে দিব্যি ব'সে ব'সে খেতে পার।"

সহাস্যে সরোজ বলিল, "তা এক রকম পারি ভাই, কিন্তু কাজ মোটেই পারি না। শরীর এই যা দেখছো, এতে কোন পদার্থ নাই।"

মোহিনী বলিল, "তুমি যে একটি খাঁটী অপদার্থ, তা বেশ বুঝতে পেরেছি।"

সরোজ ইহাতে যেন অতিমাত্র হর্ষ প্রকাশ করিয়া সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, "বুঝতে পেরেছিস? সত্যি? মাইরি? কেমন ক'রে বুঝলি কৈ বল্ দেখি।"

বলিয়া সে দুই হাতে মোহিনীর গলা জড়াইয়া তাহার মুখের কাছে মুখটা লইয়া যাইতেই মোহিনী খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। সরোজও তাহার সঙ্গে হাসিতে লাগিল। সখীদ্বয়ের কলহাস্যে গৃহখানা যেন সজীব হাস্যময় হইয়া উঠিল।

ঠিক সেই সময়ে গোপীনাথ দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাস্য প্রফুল্ল কণ্ঠে বলিল, "আজ যুগল মিলন যে!"

সরোজ তাড়াতাড়ি মাথার কাপড় টানিয়া দিল; মোহিনী আপনার গাত্রবস্ত্র সংযত করিয়া লইল, এবং গোপীনাথ ঘরে ঢুকিবার আগেই ধীরে ধীরে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

দশম পরিচ্ছেদ

মোহিনীর পশ্চাৎ সরোজ বাহির হইয়া যাইতে উদ্যত হইলে গোপীনাথ তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "শোন।"

সরোজ থমকিয়া দাঁড়াইল। গোপীনাথ তাহার দিকে পিছন ফিরিয়া জামা কাপড় ছাড়িতে লাগিল। সরোজ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলছিলে?"

যেন একটু বিরক্তির সহিত গোপীনাথ বলিল, "তুমি বড় ব্যস্ত আছ বুঝি?"

মৃদুস্বরে সরোজ উত্তর করিল, "ঘাটে এঁটো বাসনগুলো প'ড়ে আছে।"

"আমি ঘরে আসতেই বুঝি হুঁস্ হ'লো?"

সরোজ লজ্জানত মস্তকে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। গোপীনাথ কাপড় ছাড়িয়া চৌকীটা টানিয়া লইল, এবং তাহাতে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, তুমি কি মনে কর বল দেখি?"

কোন্ বিষয়ের কি মনে করে তাহা বুঝিতে না পারায় সরোজ কোন উত্তর দিতে পারিল না। তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া গোপীনাথ ঈষৎ রুষ্টস্বরে বলিল, "তুমি কি আমাকে দেখলে বিরক্ত হও?"

শঙ্কিত স্বরে সরোজ বলিল, "না।"

মুখভঙ্গী করিয়া গোপীনাথ বলিল, "ছোট্ট একটি উত্তর দিয়ে ফেল্‌লে—না। তবে আমাকে দেখলেই তোমার মুখখানা বর্ষার মেঘের মত ভারী হয় কেন?"

কেন যে হয় তাহা জানিলেও সরোজ মুখ ফুটিয়া সে কথাটা বলিতে পারিল না; নীরবে দাঁড়াইয়া আঁচলের খুঁটে পাক দিতে লাগিল। গোপীনাথ তাহার মুখের উপর তীব্র দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিল, "এতক্ষণ তো গঙ্গাজলের সঙ্গে খুব হাসি খুসী কচ্ছিলে। কিন্তু আমি এসে দাঁড়াতেই ঝড়ের সামনে আলোর মত দপ্ ক'রে সে হাসি নিবে গেল; তাড়াতাড়ি উঠে পালিয়ে যাচ্ছো কেন?"

সরোজ বলিল, "পালিয়ে যাই নাই, কাজ আছে তাই—"

তীব্রকণ্ঠে গোপীনাথ বলিয়া উঠিল, "ড্যাম্ কাজ! আমাকে দেখলেই বুঝি যত কাজের তাড়া হয়?"

সরোজ চুপ করিয়া রহিল। গোপীনাথ বলিল, "কাজ তোমাকে কত্তে হবে না।"

মুখ তুলিয়া সরোজ জিজ্ঞাসা করিল, "কে করবে?"

উগ্রস্বরে গোপীনাথ বলিল, "সে ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি তো আজ চার মাস এসেছ। এতকাল কে করেছে?"

"দিদি।"

"আজও দিদি করবে।"

"আর আমি হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবো।"

"হাঁ। দু'দিনের তরে হাত পা ছড়িয়ে তোমাকে এত বাহাদুরি দেখাতে হবে না।"

সরোজ কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না। সে যে বাহাদুরি দেখাইবার জন্য কাজ করিতে যায় না, পরন্তু কর্ত্তব্যের অনুরোধেই তাহা করে, এ কথাটা বুঝাইয়া বলিবার ইচ্ছা হইলেও স্বামীর সহিত বাদ প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না। সে নিরুত্তরে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। গোপীনাথ একটা সিগারেট ধরাইয়া টানিতে লাগিল।

এমন সময় বিন্দু ডাকিল, "সরি, ওলো সরি, ও ছোট বৌ!"

সরোজ আর দাঁড়াইল না, ত্রস্তভাবে বাহির হইয়া গেল। বিন্দু বলিল, "এখনো কি তোদের গল্প শেষ হয় না? বেলা চারটে বেজে গেল, এঁটো বাসন ঘাটে পড়ে, সে হুঁস নাই কি?"

বিন্দু মনে করিয়াছিল, সরোজ এখনো মোহিনীর সহিত গল্প করিতেছে। ইহার মধ্যে গোপীনাথ যে ঘরে আসিয়াছে, তাহা সে লক্ষ্য করে নাই, সুতরাং কাজ ফেলিয়া এতক্ষণ বাজে গল্পে নিমগ্ন থাকায় সে সরোজের উপর একটু রাগিয়া উঠিয়াছিল, এবং এই কারণেই তাহার সুরটা কতক চড়া হইয়াছিল।

সরোজও যে ইহা বুঝে নাই তাহা নহে; বুঝিলেও কিন্তু সে যে এতক্ষণ স্বামীর সহিত কথা কহিতেছিল, ইহা দিদিকে বলিতে পারিল না। সে লজ্জিতভাবে তাড়াতাড়ি খিড়কীর ঘাটে চলিয়া গেল। বিন্দু এ-কালের মেয়েগুলার গল্পপ্রিয়তা সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল।

কিন্তু তাহার মন্তব্যের উপসংহার হইবার পূর্ব্বেই গোপীনাথ ঘর হইতে বাহির হইয়া ডাকিল, "বৌদি!"

বিন্দু চমকিয়া উঠিল। একি, ঠাকুরপো কখন্ আসিয়াছে? ছোট বৌ এতক্ষণ উহার সহিত গল্প করিতেছিল, আর এই কারণে সে তাহার উপর এমন কড়া মন্তব্য প্রকাশ করিতেছে! ছি ছি, ঠাকুরপো কি মনে করিবে? লজ্জিতভাবে বিন্দু বলিয়া উঠিল, "তুমি কখন্ এলে ঠাকুরপো? অনেকক্ষণ এসেছ বুঝি?"

গোপীনাথ উত্তর করিল, "খুব বেশীক্ষণ নয়।"

বিন্দু অতঃপর আপনার মন্তব্য সম্বন্ধে কি কৈফিয়ৎ দিবে তাহাই ভাবিতে লাগিল। গোপীনাথ কিন্তু তাহা শুনিবার অপেক্ষা না করিয়াই বলিল, "এক কাজ করলে হয় না বৌদি?"

"কি কাজ?"

"একজন ঝি রাখলে হয় না?"

একটু আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে বিন্দু বলিল, "ঝি! ঝি রাখতে হবে কেন ঠাকুর পো?"

গোপী। সংসারের কাজ কর্ম্ম বেশীর ভাগই তো তোমাকে কত্তে হয়।

বিন্দু। আগে সবই কত্তে হ'তো, এখন কম ভাগই কত্তে হয়। বেশীর ভাগ করে ছোট-বৌ।

গোপী। মিথ্যা প্রশংসা ক'রো না বৌদি।

বিন্দু। মিথ্যা নয় ঠাকুর পো, সত্যিই সে যা ক'রে তা তার বয়সের চাইতে ঢের বেশী।

গোপী। ঢের বেশীগুলো ঝির উপর পড়লে তোমার কমের ভাগটা আরও কম হয়।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া গম্ভীর মুখে বিন্দু বলিল, "বেশ তো আমার উপর যদি এত দরদ হ'যে থাকে, তবে তাই কত্তে পার।"

বলিয়া সে খিড়কীর দিকে চলিয়া গেল এবং ঘাটে যেখানে বসিয়া সরোজ বাসন মাজিতেছিল, সেখানে উপস্থিত হইয়া সরোজকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "নে, ওঠ ছোট বৌ।"

সরোজ তাহার দিকে একবার বিস্মিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আপনার কাজ করিতে লাগিল। বিন্দু এবার একটু চড়া গলায় বলিল, "শুনতে পাস্ না?"

সরোজ থালায় দ্রুত হাত ঘষিতে ঘষিতে বলিল, "এই যে, আর এই ক'খানা আছে।"

"যে ক'খানাই থাক্, তোমাকে আর মাজতে হবে না" বলিয়া সে সরোজের হাত হইতে থালাখানা টানিয়া লইয়া নিজে মাজিতে বসিল। সরোজ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হতবুদ্ধির মত বসিযা রহিল। বিন্দু তাহার দিকে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রোষকঠোর স্বরে বলিল, "হাঁ ক'রে বসে রইলে যে? উঠে যাও না।"

সরোজ হাত ধুইয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া পড়িল।

এমন সময় বিদ্যানিধির স্ত্রী অপর পাশের ঘাটে আসিলেন। তিনি বিন্দুকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ যে নিজেই বাসন মাজচো বৌমা?"

তাঁহার দিকে না ফিরিয়াই বিন্দু উত্তর করিল, "কি করবো মা, আমরা তো বড় লোকের স্ত্রী নই যে, দাসী চাকর রেখে কাজ করাবো। আমাদের স্বামী তো মুঠো মুঠো টাকা রোজগার কত্তে পারে না।"

বলিয়া সে সরোজের দিকে শ্লেষপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। সরোজও এই সময় পিছনে ফিরিয়া চাহিতেই উভয়ের দৃষ্টি সম্মিলিত হইল। সরোজ সলজ্জভাবে তাড়াতাড়ি দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

বিদ্যানিধি-গৃহিণী যেন একটু কৌতূহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছোট বৌমা দাসী চাকর রাখবেন না কি?"

বিন্দু রাগের মাথায় যেটুকু বলিয়া ফেলিয়াছিল, তাহাতেই যেন অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিল। এক্ষণে সেটাকে ঢাকিবার জন্য বিদ্যানিধি-গৃহিণীর প্রশ্নের উত্তরে বলিল, "হাঁ, তুমিও যেমন খুড়ী মা, দাসী চাকর রাখবে। অনেক টাকা তো আয়। আর সংসারে কাজই বা কত? দাসী চাকর রাখবে তো নিজেরা করবে কি?"

বিদ্যানিধি-গৃহিণী বলিলেন, "সে তো ঠিকই মা, মেয়ে মানুষ খাটবে না তো কি করবে? কিন্তু আজকালকার মেয়েরা কি তা মনে করে? তারা ব'সে ব'সে গল্প কত্তে পেলে আর কিছুই চায় না।"

বিন্দু বলিল, "ওটা বয়সের ধর্ম্ম মা। ওরকম বয়সে আমরাও কি কম গল্প করেছি?"

বলিয়া সে একটু হাসিল। বিদ্যানিধি-গৃহিণী একটু অপ্রতিভ ভাবে বলিলেন, "আমরাও গল্প করেছি বটে, কিন্তু এমন কাজকর্ম্ম ফেলে সংসার ভাসিয়ে দিয়ে গল্প কত্তাম না।"

সে বিষয়ে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকায় বিন্দু ইহার বিষয়ে প্রতিবাদ করিতে পারিল না। বিদ্যানিধি গৃহিণী বলিতে লাগিলেন, "এই যে আমাদের ঘরে একটি, ভাত এক মুঠো পেটে পড়েছে তো আর ঘরের তলায় দেখতে পাবে না। কবে সেই ভাত খেয়ে বেরিয়েছিল, এই মাত্র বাড়ীতে ঢুকলো।"

বিন্দু বলিল, "হাঁ হাঁ, আমাদের বাড়ীতে এতক্ষণ ছিল বটে।"

বিদ্যা-গৃ। তোমাদের বাড়ীতে থাকা সে নিজের বাড়ীতেই থাকা ধরতে হবে। কিন্তু ধর, যদি অন্য বাড়ীতেই হ'তো? একে তোর এই বয়স, তায় কপাল পুড়েছে, তোর কি এখন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ান্ ভাল দেখায়?

বিন্দু। তা বটে?

বিদ্যা-গৃ। দিন রাত বোঝাই মা, কিন্তু বোঝে কি? বরং উল্টে রাগ। রাগ করিস্ নিজেই মরবি। আমিও আর কিছু বলি না মা; লোকে শুনলে বলবে, বৌটার কপাল পুড়েছে ব'লে তাকে দিন রাত খুঁচিয়ে মাচ্চে। কি বল বৌমা, ঠিক কি না?

তাঁহার উক্তিতে সায় দিয়া বিন্দু ক্ষিপ্রহস্তে মাজা বাসনগুলা ধুইয়া ফেলিল, এবং সেগুলা সাজাইয়া লইয়া "বেলাটা গেছে মা" বলিয়া যেন বিদ্যানিধি-গৃহিণীর এই আলোচনা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য দ্রুতপদে ঘাট হইতে উঠিয়া পড়িল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

যজ্ঞেশ্বর দত্তের বৈঠকখানায় পাশার আড্ডা সেদিন খুব জমিয়া উঠিয়াছিল। যাহারা নিত্যক্রীড়ায় যোগদান করিত, তাহারা ছাড়া সেদিন অনেকগুলি দর্শকেরও সমাগম হইয়াছিল, এবং তাহাদের মধ্যে দুই চারিজন প্রবীণের উপস্থিতিতে আড্ডাটা খুব বেশী জমকাইয়া উঠিয়াছিল। দত্তজা নিজে সেদিন খেলায় বসেন নাই, আগন্তুকগণের তত্ত্বাবধানেই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং ভাল করিয়া তামাক দিবার জন্য ভৃত্য নফরকে বারবার ধমক দিতেছিলেন। নফর কলিকা ভরিয়া তামাক দিয়াও যখন প্রশংসার পরিবর্ত্তে কেবল তিরস্কার পাইতে লাগিল, এবং বুড়া অম্বিকা ঘোষাল কাশির প্রাবল্য হেতু হুঁকায় জোর টান দিতে অসমর্থ হইয়া কলিকার আগুন নিবাইয়া ফেলিতে থাকিলেন, তখন নফর বিরক্তচিত্তে এই ভদ্রলোকগুলির ভদ্রতার উপর দোষারোপ করিতে করিতে দোক্তা মিশাইয়া তামাকটাকে অতিরিক্ত কড়া করিয়া লইল।

সেই কড়া তামাকে দুই একটা টান দিয়া ধূমপানের বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক অপরের হাতে হুঁকা দিয়া প্রবীণগণ অপেক্ষাকৃত নবীনগণের সহিত সে কালের সঙ্গে একালের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এবং সেই আলোচনার ফলে একাল অপেক্ষা সেকালটা এত বড় ও এত লোভনীয় হইয়া উঠিয়াছিল যে, সেই অতীত কালটাকে বর্ত্তমানে ফিরিয়া পাইবার জন্য অনেকেরই মনে একটা প্রবল আগ্রহ উপস্থিত হইতেছিল। সে কালে দুই আনায় এক সের তৈল, আট আনায় এক সের ঘৃত, টাকায় এক মণ চাউল পাওয়া যাইত। যে দুগ্ধ আজ দুষ্প্রাপ্য, তাহার সের ছিল দুই পয়সা; মাছের তো কথাই নাই: অনেক সময়ে জলে স্থানাভাবপ্রযুক্ত মাছগুলা ডাঙ্গায় চরিয়া বেড়াইত। দ্রব্যাদি যেমন সুলভ ছিল, লোকে তেমনই খাইতে পারিত। গ্রামে গ্রামে দশ বিশজন মুগকে রঘু সব খুঁজিয়া পাওয়া যাইত, আশানন্দ ঢেঁকীর মত বীর ঘরে ঘরে বিরাজ করিত। মানুষ এক শত বৎসর বাঁচিত, এবং এখনকার মত তিরিশে বুড়া হইয়া চল্লিশে লোকলীলাসংবরণ করিত না, ইত্যাদি।

অপ্রত্যক্ষ অতীতের এই প্রশংসাবাদের যে প্রতিবাদ না হইতেছিল এমন নহে। কোন কোন বর্ত্তমানপ্রিয় নবীন ইহার প্রতিবাদে বলিতেছিল, সেকালে দ্রব্যাদি যে এত সুলভ ছিল তাহার কারণ ক্রেতা বা অর্থের অভাব। তখন দ্রব্য সুলভ থাকিলেও পয়সা নিতান্ত দুর্ল্লভ ছিল, এবং তজ্জন্যই টাকায় এক মণ চাউল মিলিলেও অনেককে অর্দ্ধাশনে দিনাতিপাত করিতে হইত। দুই আনায় এক সের তৈল পাওয়া গেলেও লোকে খড়, পাতা জ্বালিয়া আলোকের কার্য্য সম্পন্ন করিত। জীবনসংগ্রামে উন্নতির কোনও চেষ্টা ছিল না; এজন্য স্বীয় বাসগ্রামের পরপারেই পৃথিবীর শেষ সীমা নিরূপণ করিয়া মোটা ভাত মোটা কাপড়েই সন্তুষ্ট থাকিত, এবং দাশুরথির ও কৃত্তিবাসী রামায়ণকেই শিক্ষার শেষ সোপান জ্ঞান করিত, ইত্যাদি।

এইরূপ প্রতিবাদী নবীনগণকে অর্ব্বাচীন বিশেষণে বিশেষিত করিয়া প্রবীণগণ স্বমতের প্রাধান্য স্থাপনার্থ উপন্যাসের অবতারণা করিতেছিলেন। ওদিকে ছ' তিন নয়, পোয়া বারোর শব্দে তাঁহাদের সে উপন্যাস চাপা পড়িয়া যাইতেছিল। ইহাতে তাঁহারা বিরক্তি প্রকাশ করিতেছিলেন বটে, কিন্তু পোয়া বারোর দান তাঁহাদের সে বিরক্তিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া যাইতেছিল।

কেবল যে সেকালের ও একালের আলোচনার জন্যই যে এতগুলি প্রবীণ ও নবীনের সমাগম হইয়াছিল তাহা নহে, ইহা ছাড়া তাঁহাদের অন্য একটা আলোচনার বিষয় ছিল এবং সেই আলোচনার জন্যই তাঁহারা যজ্ঞেশ্বর দত্তের বৈঠকখানায় সমবেত হইয়াছিলেন। শ্রীপতি ঘোষের মাতৃদায় উপস্থিত হইয়াছিল এবং এই দায় হইতে উদ্ধার লাভের জন্য সে পাঁচ জনের পদধূলি লইতে অভিপ্রায় করিয়াছিল। পাঁচজনে মনে মনে শ্রীপতিকে পদধূলি প্রদানে উৎসুক হইলেও বাহিরে এমন একটা বাধা ছিল, যাহার জন্য মনের ঔৎসুক্য মনে চাপিয়া তাঁহাদিগকে মৌখিক অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে হইয়াছিল, এবং সেই ইচ্ছা অনিচ্ছার সমাধানের জন্য সকলে দত্তজার বৈঠকখানায় সমবেত হইয়াছিলেন।

রাজগঞ্জের হরিশ সরকার মারা গেলে এবং মহাজনে তাহার জমি জায়গা সব বেচিয়া লইলে তাহার বিধবা স্ত্রী যামিনী যখন নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়া পড়িল, তখন গ্রামের মৃত্যুঞ্জয় দত্ত দয়া-পরবশ হইয়া তাহাকে আশ্রয় দিলেন। কিন্তু তাঁহার এই দয়াবৃত্তির অন্তরালে আর একটা বৃত্তি যে লুক্কায়িত ছিল, আশ্রয় লইবার সময় যামিনী তাহা জানিতে পারে নাই। যখন জানিতে পারিল, তখন সে মৃত্যুঞ্জয়ের কোঠাবাড়ী ছাড়িয়া নিজের ভাঙ্গা মেটে ঘরে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু ইহাতেই যামিনী নিস্তার পাইল না, পাঁচজনে তাহার এই মহদাশ্রয় ত্যাগের কারণ জানিতে উৎসুক হইল। অগত্যা যামিনী প্রকৃত কারণ প্রকাশ করিলে লোকে মৃত্যুঞ্জয়কে ছি ছি করিতে লাগিল। তখন মৃত্যুঞ্জয় ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে, যামিনীর অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা; তাহার কলুষিত চরিত্রের জন্য তিনি যামিনীকে তাড়াইয়া দিয়াছেন। দুই জনের নিকট দুই রকম কথা শুনিয়া লোকে আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তবে অবশেষে লোকে মৃত্যুঞ্জয়ের কথায় বিশ্বাস করিল; যামিনীর কথায় খুব কম লোকেই আস্থা স্থাপন করিল। সুতরাং যামিনীর চরিত্র লইয়া পাড়ায় পাড়ায় আন্দোলন চলিতে লাগিল। সে আন্দোলনের প্রভাবে যামিনীর গ্রামে বাস করা দায় হইয়া উঠিল। ইহার উপর মৃত্যুঞ্জয় দত্ত তাহাকে বাসচ্যুত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি যামিনীর স্বামীর নামে একটা মিথ্যা দেনা বাহির করিয়া নালিশ করিলেন, এবং সহজেই তাহার ডিক্রী পাইয়া ভিটাটুকু নীলামে ডাকিয়া লইলেন। অগত্যা যামিনীকে বাধ্য হইয়া গ্রাম ত্যাগ করিতে হইল।

গ্রামত্যাগ করিয়া যামিনী গঙ্গাপুরে শ্রীপতি ঘোষের আশ্রয় লইল। যামিনী একটু দূর সম্পর্কে শ্রীপতির শ্যালিকা হইত। সুতরাং শ্রীপতি এই আশ্রিতা কুটুম্বিনীকে তাড়াইয়া দিতে পারিল না। রাজগঞ্জ হইতে গঙ্গাপুরের ব্যবধান দুই ক্রোশের অধিক হইবে না। সুতরাং যামিনীর কলঙ্ককাহিনী গঙ্গাপুরে প্রচলিত হইতে বিলম্ব হইল না। তখন গ্রামের পাঁচ জনে শ্রীপতিকে চাপিয়া ধরিল, এবং এই কলঙ্কিনীকে ত্যাগ করিবার জন্য শ্রীপতিকে অনুরোধ করিল। শ্রীপতি কিন্তু তাহাদের অনুরোধ রক্ষা করিল না। সে অনুসন্ধান লইয়া যখন জানিতে পারিল যে, যামিনীর কলঙ্ককাহিনী সম্পূর্ণ মিথ্যা, তখন সে এই অকলঙ্কিতা অনাথাকে ত্যাগ করিতে কিছুতেই সম্মত হইল না। ইহাতে সমাজের কর্ত্তৃপক্ষগণ শ্রীপতির উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেও শ্রীপতি তাঁহাদের সেই অহেতুক ক্রোধ উপেক্ষার সহিত উড়াইয়া দিল। সমাজ তাহার এই উপেক্ষার প্রতিশোধ লইবার জন্য সুযোগের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

এই সময়ে শ্রীপতির মাতৃবিয়োগ হইলে সমাজ স্বীয় অবমাননার প্রতিশোধ লইবার উত্তম সুযোগ প্রাপ্ত

হইল। সামাজিকগণ স্থির করিলেন, পাপসংস্পর্শে কলুষিত শ্রীপতি ঘোষের গৃহে কেহ পদার্পণ করিবে না। শুনিয়া শ্রীপতি চিন্তিত হইল এবং সমাজকে উপেক্ষা করার ফল কিরূপ ভয়ানক তাহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিল।

শ্রীপতি সমাজপতিগণের দ্বারস্থ হইয়া অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল। তাহার এই অনুনয়ে প্রত্যেক ব্যক্তিই কৃপা-পরবশ হইলেও কেহই তাহাকে সম্পূর্ণ আশ্বাস দিতে পারিলেন না; সকলেই পাঁচজনের দোহাই দিয়া আপনাকে নিষ্ঠুরতার অপবাদ হইতে মুক্ত রাখিলেন। শ্রীপতি কিন্তু প্রত্যেকের দ্বারস্থ হইয়াও যখন এই পাঁচজনের সন্ধান না পাইল, তখন সে নিতান্ত হতাশ হইয়া স্থির করিল যে গঙ্গাতীরে গিয়া মাতার শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিবে।

তাহার এই সঙ্কল্প শ্রবণে পাঁচজনে বুঝিতে পারিলেন যে চতুর শ্রীপতি তাঁহাদের হাতছাড়া হইবার উপক্রম করিতেছে, তখন তাঁহারা আপনা হইতেই ধরা দিলেন, এবং শ্রীপতিকে আশ্বাস দিয়া বিচারের জন্য যজ্ঞেশ্বর দত্তের বৈঠকখানায় সমবেত হইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সকলে সমবেত হইলে অম্বিকা ঘোষাল শ্রীপতির প্রতিনিধিরূপে সকলকে জ্ঞাপন করিলেন যে, শ্রীপতির মাতৃদায় উপস্থিত। মাতৃপিতৃদায়ের ন্যায় দায় আর নাই। এইজন্যই লোকে ইহাকে 'হাড়ীদায়' বলিয়া থাকে। শ্রীপতি এক্ষণে এই কঠিন দায়গ্রস্ত, এবং এই দায় হইতে উদ্ধার লাভের জন্য সে সমাজপতিগণের করুণা ভিক্ষা করিতেছে। এখন তাহার প্রতি সমাজের কি আজ্ঞা হয়।

বিস্তৃত ভূমিকাসহকারে ঘোষাল মহাশয় এইরূপে সমাজের নিকট শ্রীপতির প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলে সভামধ্যে একটা মৃদু গুঞ্জনধ্বনি উত্থিত হইল, পাশার আড্ডার চীৎকারও যেন একটু কমিয়া আসিল। প্রবীণগণ ধূমপানে গভীর মনোনিবেশ করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষার পর ঘোষাল মহাশয় সমাজের আদেশ শ্রবণ জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে বৃদ্ধ রামধন চক্রবর্ত্তী ধীরগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তুমিও তো সমাজের একজন; সমাজের যা বক্তব্য, তা তুমিই বল না হে ঘোষাল।"

বলিয়া তিনি কলিকা লইবার জন্য বোসজার দিকে হস্তপ্রসারণ করিলেন। ঘোষাল মহাশয় ঈষৎ হাসিয়া সবিনয়ে বলিলেন, "আপনারা হচ্চেন প্রবীণ বয়োজ্যেষ্ঠ। আপনারা থাকতে কি আমার কোন কথা বলা শোভা পায়?"

নরহরি বোস উত্তর করিলেন, "তাতে দোষ কি? 'বয়সেতে বিজ্ঞ নয় বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে।' আমাদের মধ্যে বলতে কইতে তেমন কে আছে? আগে ছিলেন গোবিন্দ আকুলি মহাশয়। তাঁর স্বর্গলাভের পর হ'তে তুমিই এখন মুখপাত্র হ'য়েছ। বুদ্ধিতেই বল, বিবেচনায় বল, কথাবার্ত্তায় বল, তোমার মত এ গাঁয়ে আর ক'টা লোক আছে?"

এই প্রশংসায় যেন একটু লজ্জিত হইয়া ঘোষাল মহাশয় মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ গোপাল গাঙ্গুলি বোসজার উক্তির প্রতিধ্বনিরূপে বলিলেন, "বোসজা যথার্থই বলেছে হে অম্বিকাচরণ। আমরাও এক সময়ে দলাদলি বিচার বিতর্ক নিয়ে অনেক মাথা ঘামিয়েছি। কিন্তু এখন আমরা বুড়ো হ'য়ে পড়েছি, আমাদের সে শক্তি আর নাই। এখন তোমরা উপযুক্ত হ'য়ে সমাজকে চালনা করবে এই আমাদের ইচ্ছা, তাতে আমাদের আনন্দ ছাড়া দুঃখ নাই।"

ঘোষালমহাশয় নফরের আনীত সদ্যঃপ্রস্তুত কলিকা লইয়া গম্ভীরভাবে হুঁকায় টান দিতে লাগিলেন। তারপর হুঁকাটা গাঙ্গুলির দিকে বাড়াইয়া দিয়া বারকতক কাশিয়া লইয়া বলিলেন, "পাঁচজনে যখন অনুমতি কচ্চেন, তখন আমাকেই বলতে হবে। আর আর যা বলছি এটা মনে কত্তে হবে পাঁচজনের কথা। (শ্রীপতিকে লক্ষ্য করিয়া) কি জান শ্রীপতি, কথাটা হচ্চে এই, আমাদের হিন্দুসমাজের বাঁধন বড় শক্ত। এমন শক্ত বাঁধন আর কোন সমাজেই নাই। যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ হিন্দুসমাজ এই বাঁধন দিয়ে আপনার ধর্ম্ম কর্ম্ম সব আগ্‌লে রেখে আসছে, কারো এমন সাধ্য নাই যে, সমাজের এই বাঁধন খুলে ফেলে স্বাধীনভাবে চলতে পারে। আজকাল দু'চার পাতা ইংরিজী প'ড়ে কেউ কেউ চলবার চেষ্টা করে বটে, কিন্তু সে দু'চার দিন। ঢেঁকী যে দিকেই মাথা নিয়ে যাক, শেষে তাকে যেমন গড়ে এসে পড়তেই হবে, তেমনি আজকালকার ছোকরারা যতই মাথানাড়া দিক্, শেষে তাদের সমাজের কাছে এসে মাথা নীচু কত্তেই হবে। এ তো মোছলমান বা খিরিষ্টানের সমাজ নয়—এ হিন্দু সমাজ। এ সমাজে মাতৃদায় আছে, পিতৃদায় আছে, কন্যাদায় আছে, বার মাসে তের পর্ব্ব আছে। এখানে শালগ্রাম সামনে রেখে মন্ত্রপাঠ না করলে বিবাহ সিদ্ধ হয় না, দশবিধ সংস্কার না হ'লে

মানুষ মানুষই হয় না। কাজেই এ সমাজে স্বেচ্ছাচার চালানো বড়ই কঠিন।"

এই দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া ঘোষাল মহাশয় প্রফুল্ল দৃষ্টিতে চক্রবর্ত্তীর মুখের দিকে চাহিলে চক্রবর্ত্তীও তাঁহার দিকে প্রশংসাসূচক সহাস্য কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। অন্যান্য সকলেই সাগ্রহে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। ঘোষাল মহাশয় বলিতে লাগিলেন, "বেশী ভূমিকার প্রয়োজন নাই, এখন আসল কথা এই, তুমি সকলের নিষেধ অগ্রাহ্য ক'রে সমাজে স্বেচ্ছাচার চালাতে চেয়েছ। কিন্তু সমাজের হাতে এমন কোন ক্ষমতা নাই যে, জোর দেখিয়ে তোমার স্বেচ্ছাচার নিবারণ করবে। তার ক্ষমতা এইটুকু, যে তার বিধি নিষেধ অমান্য করবে, তার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখবে না।"

বলিয়া তিনি শ্রীপতির দিকে তীক্ষ্নদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। শ্রীপতি নীরবে নতমস্তকে ব সয়া রহিল। ঘোষাল মহাশয় একটা দম লইয়া বলিলেন, "যদি বল, সমাজ কি অপরাধে আমাকে ত্যাগ কচ্চে? অবশ্য অপরাধ না থাকলে সমাজ বৃথা যে তোমার উপর অন্যায় উৎপীড়ন করবে এমন কথা মনের কোণেও ঠাঁই দিও না। কেন না, সমাজ তোমার শত্রু নয়—মিত্র; সে তোমাকে সৎপথে রাখবার চেষ্টা করে, অসৎপথে যেতে দিতে চায় না। এই কারণেই তুমি যে একটা দুশ্চরিত্র স্ত্রীলোকের সংস্রবে এসে পাপ অর্জ্জন করবে সমাজ সেটা সইতে পারে না। আর সে স্ত্রীলোকের চরিত্র যে দূষিত, সে পক্ষেও কোন সন্দেহ নাই। প্রমাণ মৃত্যুঞ্জয় দত্ত, প্রমাণ রাজগঞ্জের লোকেরা। বলতে পার, তাদের কথা মিথ্যা; কিন্তু গ্রামশুদ্ধ লোকে মিথ্যাবাদী, আর সেই বিধবাই যে সত্যবাদী তার প্রমাণ কি? এমন কথাও বলতে পার না যে, গ্রামশুদ্ধ লোক তার শত্রু। সুতরাং তার চরিত্র যে দূষিত তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আর তাকে আশ্রয় দিয়ে তুমিও দূষিত হওয়ায় সমাজ তোমার সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ কত্তে চায়।"

শ্রীপতি তীব্র ভ্রূকুটী করিল। তাহা লক্ষ্য করিয়া ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "অবশ্য এ কথায় তোমার রাগ হ'তে পারে। কিন্তু বাপু, বুঝে দেখতে গেলে সে রাগে ক্ষতি তোমার নিজের, সমাজের তাতে বিন্দুমাত্র ক্ষতি নাই। রাগে তুমি আর যাই কর, সমাজকে ত্যাগ কত্তে পার না। আজ তুমি সমাজকে অগ্রাহ্য ক'রে গঙ্গাতীরে গিয়ে শুদ্ধ হতে পার, কিন্তু কাল তোমার মেয়ের বিয়ে আছে, ছেলের বিয়ে আছে, লোক লৌকিকতা আছে; তখন তো তুমি সমাজকে ঠেলে পালাতে পারবে না?"

শ্রীপতির মুখে ভীতির ছায়া পড়িল। ঘোষাল মহাশয় তখন তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "কিন্তু তোমার ভয় নাই। তুমি সমাজের প্রতি যতই রূঢ় আচরণ কর, সমাজ তোমার উপর ততদূর রূঢ় আচরণ কত্তে পারবে না। 'কুপুত্র যদিও হয় কুমাতা কখন নয়।' সমাজে দণ্ডও আছে, ক্ষমাও আছে। তুমি যখন সমাজের দ্বারে ক্ষমাপ্রার্থী, তখন সমাজ নিশ্চয়ই তোমাকে ক্ষমা করবে।"

অতঃপর কর্ত্তব্য কি ইহা জিজ্ঞাসিত হইয়া ঘোষাল মহাশয় শ্রীপতিকে জানাইলেন যে, ব্যাভিচারের ন্যায় পাপ নাই; বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের পক্ষে এ পাপ ক্ষমার অযোগ্য। সেই ব্যাভিচারদোষে দুষ্ট স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে থাকিয়া শ্রীপতি যে অপরাধ করিয়াছে, তজ্জন্য তাহাকে শাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে এবং কিছু সমাজের দণ্ড দিয়া উক্ত ব্যভিচারিণীকে ত্যাগ করিলেই পুনরায় সমাজে গৃহীত হইবে।

শ্রীপতি প্রায়শ্চিত্ত করিতে সম্মত হইল, কিন্তু যামিনীকে ত্যাগ করিতে রাজি হইল না। বলিল, "বিনা দোষে একজন অনাথাকে তাড়িয়ে দিতে পারি না; তাড়িয়ে দিলে সে যাবে কোথায়?"

ক্রুদ্ধভাবে বোসজা বলিলেন, "চুলোয় যাবে। তার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি?"

শ্রীপতি বলিল, "অপর কোন সম্বন্ধ না থাক, মানুষের সঙ্গে মানুষের একটা সম্বন্ধ আছে তো? আমি সমাজের সব উৎপীড়ন সইতে পারবো, কিন্তু একটা অনাথাকে আশ্রয়চ্যুত কত্তে পারবো না।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "উত্তম তাকে নিয়েই তুমি মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করবে। সমাজের একটি প্রাণীও তোমার ঘরে পাতা পাড়বে না।"

"সে আমার অদৃষ্ট" বলিয়া শ্রীপতি উঠিয়া দাঁড়াইল। তারণ এতক্ষণ পাশার ছকগুলা হাতে ধরিয়া নিঃশব্দে সমাজের বিচার রহস্য শুনিয়া যাইতেছিল। এক্ষণে সে হাতের ছকগুলা আসনের উপর আছাড়িয়া ফেলিয়া সহর্ষ চীৎকারে বলিয়া উঠিল, "জীতা রও শ্রীপতি ভায়া! ব্রাহ্মণভোজন করালে তোমার মা বেটী কোথায় যেতো বলতে পারি না, কিন্তু এই অনাথাটাকে ত্যাগ করলে তোমার বুড়ো মা বৈকুণ্ঠ থেকে আছাড় খেয়ে নরকের গর্ত্তে পড়ে যেতো, সেটা আমি জোর ক'রেই বলতে পারি। আমি তো এ পর্য্যন্ত কোথাও পাত

পাড়ি নাই, কিন্তু তোমার মায়ের শ্রাদ্ধে পাতা না পেড়ে ছাড়চি না তা ব'লে রাখছি।"

সভাস্থ সকলেরই বিস্ময়স্তব্ধ দৃষ্টি তারণের উপর পতিত হইল। তারণ পাশা ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ঘোষাল মহাশয়ের দিকে ফিরিয়া সহাস্যে বলিল, "কিছু মনে ক'রো না অম্বিকে খুড়ো, আমার মত সন্ধ্যা-গায়ত্রীবিবর্জ্জিতা বামুনকে খাওয়ালে শ্রীপতির মা বেটী তো স্বর্গে যাবেই না, শ্রীপতিরও এক তিল পুণ্যি হবে না, লাভের মধ্যে আমাকে খাওয়াবার খরচটাই বাজে খরচের খাতায় পড়বে।"

বলিয়া তারণ হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল এবং হাসিতে হাসিতেই সভাস্থল ত্যাগ করিল। সভাস্থ প্রবীনগণ তাহার মস্তিষ্কের অস্থিরতা লইয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বাড়ী আসিয়া তারণ স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "তোমাদের এক বেলার খোরাক বাঁচিয়ে দিলাম বড় বৌ।"

বিন্দু সহাস্যে উত্তর করিল, "তবে আর কি, বাড়ীখানা দোতলা হচ্ছিল, এবার তিনতলা হবে।"

তারণ হাসিয়া বলিল, "বাড়ীখানা তিনতলা হোক আর চার তলাই হোক্ বড় বৌ, গাঁয়ের বুড়োগুলোর কীর্ত্তিকাণ্ড দেখে অবাক হয়ে গিয়েছি। মরে সব সাত দোরের পাত চেটে, আর শ্রীপতি ঘোষের বাড়ীতে কেউ পাত পাড়বে না। কেন তার অপরাধটা কি বল তো?"

বলিয়া সে জিজ্ঞাসাসূচক দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিল। ঈষৎ হাসিয়া বিন্দু বলিল, "তার অপরাধ—তোমার মত ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ায়।"

গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া তারণ বলিল, "উহুঁ, তার অপরাধটা কি জান, ঐ যে তার একটা শ্যালী না কে খেতে না পেয়ে তার ঘরে আশ্রয় নিয়েছে, এই আর কি, কর্ত্তাদের রাগ। সে মেয়েটাকে তাড়িয়ে দাও, তবে আমরা তোমার ঘরে খাব। ওরে বাপ্‌রে, ওঁদের খাওয়ালেই শ্রীপতির মা যেন রথে চড়ে বৈকুণ্ঠে চলে যাবে। উঃ, বুড়োগুলো আজ বাদে কাল মরবে, তবু বেটাদের কি ভণ্ডামী—কি নিষ্ঠুরতা, বড় বৌ।"

বিন্দু বলিল, "হাঁ হাঁ, ঘাটেও ঐ কথা হচ্ছিল, মেয়েটার চরিত্রের দোষ আছে না?"

তারণ বলিল, "দোষ আছে বৈকি, এত কষ্টের মধ্যে পড়েও আপনার চরিত্রটাকে ঠিক রেখেছে এটা কি কম দোষ? তা দোষই হোক আর গুণই হোক, আমি তো শ্রীপতির ঘরে খাচ্চি। দেখি কোন্ বেটা আমার কি করে।"

বিন্দু হাসিয়া বলিল, "করবে আর কি, তোমারই ঘরের একবেলার খোরাক বেঁচে যাবে।"

"যথা লাভ" বলিয়া তারণ হাসিতে লাগিল। বিন্দু বলিল, "তুমি তো এক বেলার খোরাক বাঁচিয়ে খরচ কমাতে চাইচো, আর এদিকে তোমার ভাই যে ঝি রেখে খরচ বাড়াতে চাইচে।"

আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে তারণ জিজ্ঞাসা করিল, ঝি রাখ্‌বে কেন?"

বিন্দু বলিল, "কেন কি? সংসারে আমাকে কত খাটতে হয়।"

দৃষ্টিটাকে বিস্ফারিত করিয়া তারণ বলিল, "ওঃ, তোমার খাটুনি কমাতে ঝির দরকার? বাহবা! তা হ'লে আমারও যে একজন চাকরের দরকার আছে।"

বিন্দু বলিল, "তা আছে বৈকি। তোমার আফিসের জুতো জোড়া ইষ্টিশান পৌঁছে দিয়ে আসা, আমায় তালি দেওয়া—চাকর একটা চাই বৈকি।"

মাথা নাড়িয়া তারণ বলিল, "আহা তা কেন, এই ধর আমার তামাকটা সেজে দিলে, বাজারে গেল, তেলটা মাখিয়ে দিলে, চাই বৈকি। আর আমি কি চিরকালই আফিসে যাব মনে কর? হুঁ, বড় জোর আর মাস কতক।"

একটু শ্লেষের সহিত বিন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি নাকি? ক'মাস?"

তারণ বলিল, "এই ডিসেম্বরটা পর্য্যন্ত দেখবো, এর মধ্যে বেটারা যদি মাইনে না বাড়ায়, তা হ'লে নিশ্চয় জেনো চাকরীতে ইস্তফা।"

"ঠিক!"

"ঠিক।"

"সত্যপীরের সিন্নীর টাকা তুলে রাখি?"

গম্ভীর ভাবে মস্তক সঞ্চালনপূর্ব্বক তারণ বলিল, "তুমি কি এটা তামাসা মনে কচ্চো? বাস্তবিক বলছি বড় বৌ, এই ক'টা টাকার তরে এত কর্ম্মভোগ আর ভাল লাগে না।"

বিন্দু। কোন্‌টা ভাল লাগে?

তারণ। দিব্যি পায়ের উপর পা দিয়ে ঘরে বসে খাব, চাকরে হুকুম তামিল ক'রবে, বামুনের ছেলে—সকালে উঠে এক সাজি ফুল তুললাম, নিশ্চিন্ত হ'য়ে

বসে সন্ধ্যা আহ্নিক পুজো আচ্ছা করলাম, ব্যস্। আর ধরনা বড় বৌ, বয়স তো হ'য়েছে, এখনও যদি শুধুই ইহকালের ভাবনা নিয়েই থাকি, তবে পরকালের ভাবনা ভাববো কবে?"

সহাস্যে বিন্দু বলিল, "সে ভাবনা তোমার আছে নাকি?"

তারণ বলিল, "দস্তুর মত আছে। তবে কি জান, আফিসের ভাবনা থাকতে ও সব কিছু হবে না। আগে চাকরীটা ছাড়ি, তারপর দেখে নিও, এই তারণ ভট্‌চাজ্যি কি রকম ধর্ম্ম নষ্ঠা দেখাতে পারে।"

হাসিতে হাসিতে বিন্দু বলিল, "আচ্ছা আচ্ছা, বেঁচে থাকি তো দেখ্‌বো।"

বলিয়া সে স্বামীর মুখের উপর হাস্যোজ্জ্বল কটাক্ষ নিক্ষেপ পূর্ব্বক রন্ধনশালার দিকে অগ্রসর হইল। তারণ তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "শোন না, যাও কোথায়?"

বিন্দু ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "ইহকালের যেটা সব চেয়ে বড় ভাবনা, তাই ভাবতে যাচ্চি। পরকালের ভাবনার তো আমার সময় নাই।"

তারণ হাসিয়া বলিল, "এবার খুব সময় থাকবে। গুপে তো ঝি রাখচে।"

বিন্দু বলিল, "বেল পাকলে কাকের কি? ঝি এসে তো আমার রাঁধুনিগিরি কেড়ে নেবে না।"

বলিয়া সে কৃত্রিম কোপে মুখখানাকে যেন একটু ভারী করিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। তারণ বসিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

এমন সময় গোপীনাথ বাটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তারণ তাহাকে ডাকিল, "হাঁরে গুপি!"

গোপীনাথ তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তারণ বলিল, "তুই না ঝি রাখবি শুনছি?"

গোপীনাথ উত্তর দিতে একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। তারণ বলিল, "বেশ তো, ভিতরের অবস্থার পরিবর্ত্তন হ'লে বাইরের চাল চলনেরও কতকটা পরিবর্ত্তন কত্তে হয়।"

মাথার চুলের ভিতর অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে গোপীনাথ বলিল, "তা নয়, তবে বৌদির শরীর তেমন ভাল নয়, অথচ সংসারের এত কাজ—"

বাধা দিয়া একটু তীব্র কণ্ঠে তারণ বলিল, "অথচ এই 'তেমন ভাল নয় শরীর' নিজেই এতকাল একা চালিয়ে আসছে, আর আজ দু'জনে সেই কাজের তরে ঝি না রাখলে চলে না?"

গোপীনাথ কোন উত্তর না দিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তারণ বলিল, "স্পষ্ট কথা বলি গুপি, তুমি এখনো এমন বড় লোক হওনি যে ঝি চাকর রেখে চালাবে। আর ছোট বৌমাও এমন বড় মানুষের মেয়ে নয় যে, খেটে খেতে তাঁর অঙ্গে ব্যথা লাগে।"

গোপীনাথের মুখখানা অন্ধকার হইয়া আসিল। বিন্দু ত্রস্তভাবে রন্ধনশালার বাহিরে আসিয়া বলিল, "আমিও উচিত কথা বলি, ছোট বৌ তো বলে নি যে, কাজ কত্তে আমার অঙ্গে ব্যথা লাগে?"

তারণ বলিল, "মুখে কিছু বলেন নি, অথচ ব্যথা লাগবার ভয়ে কাজও তো করেন না।"

ঝঙ্কার দিয়া বিন্দু বলিল, "তবে কাজগুলো কচ্চে কে শুনি? তোমাদের ইচ্ছা হয় ঝি চাকর দাসদাসী রাখতে পার, কিন্তু মেয়েদের নামে মিছে দোষ দিও না বলছি।"

বলিয়া সে পুনরায় রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল তারণ আর কিছু না বলিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া তামাকের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। গোপীনাথ ঘরের দিকে না গিয়া ধীর গম্ভীর পদে পুনরায় বাহিরে চলিয়া গেল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

রৌদ্রোজ্জ্বল নির্ম্মেঘ আকাশের এক প্রান্তে একখণ্ড মেঘ উঠিয়া যেমন তাহা আকাশের উজ্জ্বল নীলিমাকে কতকটা মলিন করিয়া দেয়, এবং ক্ষুদ্র হইলেও সেই মলিন আবরণ ভেদ করিয়া আকাশের স্বাভাবিক নীলিমা আপনাকে ফুটাইয়া তুলিতে পারে না, তেমনই একটা সামান্য কথায় বিন্দুর মুখের এক পাশে যে একটা অভিমানের মেঘ আসিয়া সঞ্চারিত হইল, অনেক চেষ্টাতেও বিন্দু সেটাকে উড়াইয়া দিতে পারিল না; উড়াইবার জন্য যতই চেষ্টা করিতে লাগিল, সেই ক্ষুদ্র মেঘটা ততই জমাট বাঁধিয়া মনের একটা পাশকে আরও বেশী অন্ধকারময় করিয়া তুলিল।

কি একটা সামান্য কথা! গোপীনাথ ঝি রাখিতে চাহে; ইহাতে তাহাদেরই তো পরিশ্রমের লাঘব হইবে! সুতরাং তাহাতে দুঃখ বা অভিমান কি আছে? কিন্তু কৈ, আজ প্রায় বিশ বৎসর সে এই সংসারে খাটিয়া আসিতেছে, সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত অবিরাম পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া এক এক দিন সে স্বামীর উপর কত তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়াছে, তখন তো কেহ ঝি রাখিবার কথা ভুলিয়াও তুলে নাই? অসুস্থ শরীরে পারি না পারি না করিয়াও সব কাজ

করিয়া আসিয়াছে, তখন তো এক স্বামী ছাড়া আর কেহই বলে নাই, আহা, তোমার বড় কষ্ট হইতেছে? তবে আজ তাহার কষ্ট অপরের চোখে পড়ে কেন! তাহার এই কষ্ট লাঘব করিবার জন্য ঠাকুরপোর এত আগ্রহ কেন? তাহার এই আগ্রহের মূলে কি অন্য কোন অভিসন্ধি নাই?

না না, তখন ঝি রাখিবার সামর্থ্য ছিল না, এখন তাহা হইয়াছে। কিন্তু সামর্থ্য অসামর্থ্যের উপর কি দৈহিক কষ্ট নির্ভর করে? তখন যে দেহ ছিল এখনও তো সেই দেহ; তখন অভাবের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে যাহা পারিয়াছি, এখন সচ্ছলতার মধ্যে বসিয়া তাহা না পারিব কেন? ঠাকুর পো কি এই সহজ কথাটা বুঝে না? অবশ্যই বুঝিতে পারে। বুঝিয়াও যে এমন প্রস্তাব করিয়াছে, তাহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, ইহার মধ্যে তাহার একটা গূঢ় উদ্দেশ্য রহিয়াছে; সে উদ্দেশ্যটা বিন্দুর কষ্টের লাঘবের জন্য নয়, ছোট বৌকে খাটিতে না দেওয়া। উঃ, ঠাকুর পোর কি স্বার্থপরতা! তাহার এত কালের পরিশ্রমকে উপেক্ষা করিয়া ছোট-বোয়ের কয়টা দিনের সামান্য পরিশ্রমটাকেই এত বড় করিয়া দেখিল?

দূর, ইহাকেই বলে মেয়ে মানুষের মন। ঠাকুর পো কি ভাবিয়া কথাটা বলিয়াছে, তাহা না বুঝিয়াই তাহার ঘাড়ে এতবড় একটা দোষের ভার চাপান ঠিক কি? কিন্তু বাস্তবিক কি দোষ তাহার কিছুই নাই? ছোট বৌকে কাজের জন্য ডাকিবার আগে কৈ সে এমন কথা একবারও তুলে নাই? সুতরাং ছোট বৌকে কাজ হইতে নিষ্কৃতি দিবার জন্যই যে উহার এত আগ্রহ, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ক্ষোভে দুঃখে বিন্দুর মনটা যেন ফুলিয়া উঠিল। ছি ছি, কি নির্লজ্জ ব্যবহার! সে কেরাণীর স্ত্রী, আর ছোট বৌ ডাক্তার বাবুর ঘরণী, তাই এতটা পার্থক্য! এই পার্থক্য জ্ঞানের ফলে শুধু যে তাহাকেই উপেক্ষা করা হইয়াছে তাহা নহে, ওই যে একটা মানুষ, সারা জীবনটা শরীরের রক্ত জল করিয়া খাটিয়া আসিতেছে, তাহাকেও কি অবমানিত করা হইল না? তাহার সমগ্র জীবনের প্রাণান্ত পরিশ্রমটাকে একটা কথায় কি সম্পূর্ণ ব্যর্থ করিয়া দেওয়া হইল না? উঃ, কি কঠোর অকৃতজ্ঞতা!

নিজের জন্য যতটা না হউক, এই একটা লোকের উপর এরূপ বিসদৃশ ব্যবহারে বিন্দুর মনটা যেন নিতান্ত তিক্ত হইয়া উঠিল এবং এই ঘৃণিত ব্যবহারের উপযুক্ত প্রতিশোধ লইবার জন্য তাহার চিত্তটা যেন উন্মুখ হইয়া রহিল।

মনের ভিতর এইরূপ তীব্র বিরক্তি লইয়া সকালে শয্যা ত্যাগ করিতেই বিন্দু বিস্ময়ের সহিত দেখিল, রন্ধনশালা হইতে ধূম উত্থিত হইতেছে। সে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দরজায় গিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে অবাক্ হইয়া, গালে হাত দিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, সরোজ উনান ধরাইয়া রন্ধন কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছে। দিদিকে দেখিয়া সরোজ যেন একটু থতমত খাইয়া গেল। বিন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "একি লো সরি?"

সরোজ নতমুখে উনানের ভিতর কাঠখানা ঠেলিয়া দিয়া সলজ্জ হাস্য সহকারে বলিল, "রাঁধচি দিদি।"

বিন্দু একটুও না হাসিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল, "তাতো দেখতেই পাচ্চি। কিন্তু কেন?"

কেন যে রাঁধিতে গিয়াছে ইহার উত্তর সরোজ দিতে পারিল না। তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া বিন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর পো বলেছে বুঝি?"

উত্তরে সরোজ মৃদু হাসিল। সে হাসিটা কিন্তু বিন্দুর কাছে ভাল ঠেকিল না; সে ভারী মুখে 'বেশ' বলিয়া দ্বারপ্রান্ত ত্যাগ করিল। সরোজ ডাকিল, "তুমি চলে গেলে দিদি?"

বিন্দু ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কেন?"

সরোজ বলিল, "ডাল চাপিয়েছি, বাটনা কখন্ দেব?"

বিন্দুর হাসি আসিল, তাহা চাপিয়া সে একটু গম্ভীরভাবেই বলিল, "যে রাঁধতে বলেছে তাকেই জিজ্ঞাসা ক'রে আয় না।"

ব্যগ্রতার সহিত সরোজ বলিল, "তোমার পায়ে পড়ি দিদি, কি কি বাটনা, কতটা নুন দেব ব'লে দাও না। আর ডালটা ফুটচে, কিন্তু রঙটা তোমার মত লাল হচ্চে না কেন বল দেখি?"

বিন্দু আর থাকিতে পারিল না, হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল, সেই হাসির সঙ্গে তাহার ভিতরকার অনেকটা বিরক্তির ভার বাহির হইয়া মনটাকে যেন হাল্কা করিয়া দিল। সে হাসিতে হাসিতে বলিল, "ঠাকুরপো আচ্ছা রাঁধুনি পেয়েছে যা হোক। আমি মুখ হাত ধুয়ে আসছি, তোকে ব্যস্ত হ'তে হবে না।"

বলিয়া সে খিড়কীর ঘাটের দিকে চলিয়া গেল। বিদ্যানিধি গৃহিণীও হস্তমুখ প্রক্ষালনার্থ ঘাটে আসিয়াছিলেন। তিনি বিন্দুকে ডাকিয়া বলিলেন, "আজ যে এত বেলা গা বৌমা?"

বিন্দু উত্তর করিল, "ঘুমিয়ে পড়েছিলাম খুড়ী মা।"

খুড়ীমা ঘাটের উপরের পৈঠায় উঠিয়া আঁচলে মুখের জল মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "আমারও মা আজ উঠতে একটু বেলা হ'য়ে গিয়েছে। একে গরম, তায় পোড়া ছেলেগুলোর উৎপাত। ভোরের বেলা ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুমে যেন চোখ জড়িয়ে এল।"

উত্তরে বিন্দু একটু হাসিয়া ঘাটে নামিল। খুড়ীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছেলের তো আপিসের ভাত; এর পর রাঁধবে কখন্?"

বিন্দু বলিল, "ছোট বৌ রান্না চাপিয়েছে।"

যেন খুব একটা নূতন কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত-ভাবে খুড়ীমা বলিলেন, "ছোট বৌমা আজকাল রাঁধেন নাকি?"

সহাস্যে বিন্দু বলিল, "আজ তো রাঁধতে গিয়েছে।"

খুড়ী। তা যাবে না কেন, ডাগরটি হ'য়েছে তো। তুমি কি চিরকালই ক'রে দেবে? কেনই বা দেবে? গুপী না হয় বেশী টাকাই রোজগার ক'রে। কিন্তু সংসার তো দু'জনারি।

খুড়ীমার কথাগুলা বিন্দুর নিকট তেমন প্রীতিকর হইল না। এই অপ্রিয় আলোচনা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে সে তাড়াতাড়ি বলিল, "কাজ ও কত্তে যায়, তবে ছেলে মানুষ, পারে না।"

খুড়ী। তা'হলে কাজে উৎসাহ আছে বল। লক্ষ্মী বলতে হয় তো! আমাদের এই যে বাইশ বছরের থুবড়ী কাজকে যেন বাঘ মনে করে। যেটুকু করে, শুধু ভয়ে ভয়ে। এই দেখ না সকালে উঠে বাসনগুলি মেজে ন্যাতা দিতেই বেলা দশটা বাজিয়ে দেবে। তারপর রাঁধতে হবে সেই দু'টো। তোমার খুড়ো তো রাগে গর্ গর্ করে। তা আমি বলি, রাগলে কি হবে, যেমন ক'রে পারে করুক। আমি রাগবোও না, কিছু করবোও না; কত্তে গেলেই আস্কারা পাবে। ঠিক কিনা বলনা মা?

অনুকূল উত্তর প্রাপ্তির আশায় খুড়ীমা সোৎসুক দৃষ্টিতে বিন্দুর মুখের দিকে চাহিল। বিন্দু কিন্তু সেরূপ সন্তোষজনক কোন উত্তর দিতে পারিল না; কেবল মাথা নাড়িয়া সংক্ষেপে বলিল, "হুঁ!"

এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে খুড়ীমা কিছুমাত্র নিরুৎসাহ না হইয়া বলিতে লাগিলেন, "এদানী আবার পেটে ভাতটি পড়লে আর বাড়ীর তলায় থাকচে না, চলল্যো পাড়া-বেড়াতে। আমি কিছু বলি না মা, বললে আর কিছু না পারুক, চোখের জলে ঘরদোর ভাসিয়ে দেবে। তা বলি মরুক গে, এর পর নিজেই টের পাবে। কাল বুঝি তোমাদের ওখানে গিয়েছিল। এসে অবধি মাথা ভার, গা হাত কন্ কন্, দেহ ম্যাজ ম্যাজ করে। তা বলি, শরীরের সুখ অসুখ তো আছে, আমিই না হয় করি। তাই কি কত্তে দেবে? ঠেকার কত। যেমন ঠেকার ফলও তেমনি পেয়েছে। তবু তো লজ্জা নাই।"

বলিয়া খুড়ীমা যেন ঘৃণার সহিত মুখটা ঘুরাইয়া লইলেন। বিন্দু এই সকল কথার উত্তর দিতে ঘৃণা বোধ করিয়া আপনার কার্য্যের ব্যস্ততা জানাইয়া তাড়াতাড়ি ঘাট হইতে উঠিল। তাহার এই ঔদাসীন্যে ব্যথিত হইয়া খুড়ীমাও ক্ষুণ্ন মনে গৃহাভিমুখী হইলেন।

তাড়াতাড়ি কাপড় ছাড়িয়া রন্ধনশালায় উপস্থিত হইয়া বিন্দু যাহা দেখিল, তাহাতে সে ভয়ে বিস্ময়ে যেন আঁৎকাইয়া উঠিল। দেখিল, ডালের হাঁড়ীটা ভাঙ্গিয়া দুইখান হইয়াছে। গরম ডা'ল কতকটা উনানে, কতকটা সরোজের পায়ের উপর পড়িয়াছে; সে একটা হাত পায়ের উপর রাখিয়া অপর হাতে চোখের জল মুছিতেছে। দেখিয়া বিন্দু সভয়ে বলিয়া উঠিল, "একি লো সরি?"

সরোজ জলভরা দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই ফিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বর্ষণশীল মেঘের কোলে চিক্‌চিকে রোদটুকুর ক্ষণিক বিকাশের মত সেই হাসি দেখিয়া বিন্দু রাগিয়া উঠিল; তর্জ্জন করিয়া বলিল, "মুখে আগুন! হাঁড়ী ভেঙ্গে পা পুড়িয়ে আবার হাসি হচ্চে। পা দু'টো একেবারে গিয়েছে যে?"

একটু লজ্জার হাসি হাসিয়া সরোজ বলিল, "না যায় নি, বাঁ পায়ে একটু লেগেচে।"

"একটু কেন, বেশ লেগেচে; কৈ দেখি।" বলিয়া বিন্দু উপুড় হইয়া দগ্ধ পায়ের অবস্থা দেখিতে যাইতেই সরোজ পা সরাইয়া লইয়া বলিল, "ও থাক্ দিদি, তুমি রান্না দেখ। বেলা হ'য়ে গেল।"

"তোর মাথা হ'লো। পা'টা যে একেবারে ঝল্‌সে গিয়েছে।"

তারণ উঠিয়া তামাক খাইতেছিল; বিন্দু তাড়াতাড়ি গিয়া তাহাকে ডাক্তারখানায় যাইতে বলিলে সে বিরক্তভাবে বলিল, "উনি যদি পারবেন না, তবে রাঁধতে গিয়েছিলেন কেন?"

বিন্দু তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে, না পারিলেও রাঁধিতে যাওয়া অন্যায় হয় নাই, শিখিতে হইবে তো। শিক্ষার অবস্থায় এমন অনেক হাঁড়ী ভাঙ্গে, হাত পা পুড়িয়া যায়। ইহাতে রাগ করিলে চলিবে কেন?

অগত্যা বিরক্তিটুকু দমন করিয়া তারণ ডাক্তারখানা হইতে ঔষধ লইয়া আসিল। বিন্দু পুনরায় উনান ধরাইয়া কোনরূপে ভাতে ভাত করিয়া দিলে তারণ তাহা খাইয়া আফিসে গেল।

সেদিন গোপীনাথ বাড়ীতে আসিলে বিন্দু তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। গোপীনাথ কিন্তু সে তিরস্কার নীরবে সহ্য করিল না; সে একটু চড়া গলায় প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "অন্যায় কথা ব'লো না বৌদি, যে মেয়েমানুষ এক মুঠো রেঁধে দিতে গিয়ে হাত পা পোড়ায়, তার গলায় দড়ী দেওয়া উচিত।"

বিন্দুও একটু কড়া সুরে বলিল, "কিন্তু আমি থাক্‌তে ওকে যদি হাত পা পোড়াতে হয় ঠাকুরপো, তা'হলে আমারি আগে গলায় দড়ী দেওয়া দরকার।"

শ্লেষতীব্র কণ্ঠে গোপীনাথ বলিল, "কেন না উনি ডাক্তার বাবুর স্ত্রী।"

বলিয়া সে একটু কঠোর দৃষ্টিতে বিন্দুর দিকে চাহিতেই বিন্দু মুখ ফিরাইয়া লইয়া সহাস্যে বলিল, "তোমার সবই অন্যায় কথা ঠাকুর পো।"

গোপীনাথ গম্ভীর ভাবে বলিল, "কিন্তু তোমার কথাটাও ঠিক ন্যায়সঙ্গত হলো না বৌদি।"

"অন্যায়টা কিসে হ'লো।

"কারণ, এটা ঠিক আপনার লোকের মত কথা হ'লো না।"

"কার মত কথা হ'লো আবার?"

"পরের মত।"

"পর!"

বিন্দু বিস্ময়স্তব্ধ নেত্রে গোপীনাথের মুখের দিকে চাহিল।

গোপীনাথ বলিল, "রাগ ক'রো না বৌদি, উচিত কথা বলবো, ধর আজ তুমি আমাকে রেঁধে খাওয়াচ্চো, কাল যদি না খাওয়াও?"

বিন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "তাই বুঝি সরিকে আজ রাঁধতে পাঠিয়েছিলে?"

কঠোরস্বরে "হাঁ" বলিয়া গোপীনাথ উঠিয়া গেল। বিন্দু বিস্ময়বিমূঢ় ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

——

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

একটা প্রবাদ আছে, এক গ্রামে ঢেঁকি পড়িলে তাহার শব্দে অন্য গ্রামের লোকের শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়। এই প্রবাদটা সহানুভূতি-সম্পর্কশূন্য লোকের অযাচিত সহানুভূতি প্রকাশ সম্বন্ধে যেমন খাটে, এমন আর কোন বিষয়েই খাটে না। সুতরাং পা পুড়িয়া যাওয়ায় সরোজ যতটা না কাতর হইল, সহানুভূতিশালিনী পল্লীবাসিনীরা তদপেক্ষা অধিকতর কাতর হইয়া উঠিল, এবং তাহাদের মধ্যে অনেকেই সহানুভূতির প্রাবল্যে স্থির থাকিতে না পারিয়া বাড়ীতে আসিয়া এমনই সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিল যে, তাহাতে কেবল সরোজ নহে, বিন্দু পর্য্যন্ত যেন ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল।

রজনী সরকারের ভগ্নী সাবিত্রী বাড়ী ঢুকিয়াই সম্মুখে বিন্দুকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "হাঁ বড় দিদি, ছোটবৌ রাঁধতে গিয়ে নাকি পুড়ে গিয়েছে?"

হাসি চা'পয়া বিন্দু বলিল, "পোড়ে নি, আধপোড়া হয়েছে।"

সাবিত্রী বলিল, "আহা গো, ছেলে মানুষ! আমি তো রমার মার মুখে শুনেই ছুটে আস্‌ছি।"

তাহার ছুটিয়া আসিবার কি প্রয়োজন ছিল তাহা জানিবার জন্য বিন্দু কোনরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিল না দেখিয়া সাবিত্রী ঈষৎ ক্ষুণ্ণভাবে বলিল, "তা ভাই, মনে করলেই কি আসবার যো আছে। সংসারের কত জ্বালা! চার চালের ভার ঘাড়ে, এক পা নড়বার উপায় নাই।"

বিন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, বৌ তো আছে?"

আক্ষেপের সুরে সাবিত্রী বলিল, 'হায় হায়, আছে এই মাত্র, সংসারে একটি কুটির উপকার নাই। সাধ ক'রে ভায়ের বিয়ে দিলুম, মনে কল্লুম ভাই ভাজ নিয়ে সুখী হ'ব। কিন্তু পোড়া কপালে সুখ থাকলে তো হবে। এমন ছারকপালী আঁটকুড়ীর বেটীকে ঘরে এনেছি বোন, জ্বলে পুড়ে খাক্ হ'য়ে গেলুম। কপাল, কপাল!"

অদৃষ্টের উদ্দেশে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সাবিত্রী বলিতে লাগিল, "সবই কপালে করে। এই যে তোমাদের ঘরেও তো বৌ এয়েচে, ওর কতই বা বয়স, তার ওপর সোয়ামী মুঠো মুঠো টাকা আনচে। ধত্তে গেলে ও তো ঝি রেখে রাঁধুনী রেখে পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে খেতে পারে। তবু ও রাঁধতে গিয়ে হাত পা পোড়ালে কেন?"

তাহার এই আক্ষেপের মধ্যে নিজের উপর শ্লেষের কটাক্ষ অনুভব করিয়া বিন্দু যেন একটু বিরক্ত ভাবে বলিল, "সে ওর কপাল। আমি কি হাত পা পোড়াতে বলেছিলাম?"

সাবিত্রী বলিল, "তুমি বলবে কেন, কিন্তু ও তো জানে, নিজের ঘর, দু'দিন বাদে আলাদা হ'লে তখন তো সব কত্তে হবে। কাজেই শিখতে যায়। কিন্তু

আমাদের ঐ যে আঁটকুড়ীর বেটী, এ দিকের কুটিটি ও দিকে নাড়বে না। মনে করে, আমি ওর সোয়ামীর রোজগারের ভাত খাচ্চি, আমাকে দাসী বাঁদীর মত খাটতে হবে, আর উনি রাজরাণী বসে বসে খাবেন। তোমাদের সব ঘর হ'লে এতদিন টের পেতেন। কি বলবো, পেয়েছিল আমার মত ননদ, তাই তরে যাচ্চে। দুটি ঠোঁট এক করি না ভাই, বলি মরুক গে, যতদিন আমার গতর চলে চলুক। কিন্তু এমন জা জাউলীর ঘরে পড়লে কি হ'তো বল দেখি? কেউ তো বসিয়ে ভাগের ভাত খাওয়াতো না।"

সাবিত্রীর সহিষ্ণুতার জন্য আত্মগরিমা প্রকাশ বিন্দুর নিকট অসহ্য বোধ হইল। সে বিরক্তির সহিত কোনরূপে একটা উত্তর দিয়া কার্য্যান্তরে মনোনিবেশ করিল। তাহার উপেক্ষায় অধিকতর দুঃখিত হইয়া সাবিত্রী ছোট বোয়ের নিকট আত্মদুঃখ প্রকাশ করিবার জন্য তাহার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইল।

কেবল সাবিত্রী নহে, এমন রামের মা, শ্যামের মা, গোবরার পিসী প্রভৃতি অনেকেই অনাহূত ভাবে আসিয়া ছোট বোয়ের ব্যথায় ব্যথিত হইয়া যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিল, এবং সেই সহানুভূতির সঙ্গে কথার ছলে বিন্দুর স্কন্ধেই সম্পূর্ণ দোষারোপ করিয়া বলিয়া গেল যে, ছোট বোয়ের স্বামী যখন এত টাকা রোজগার করে, তখন তাহাকে রন্ধনশালায় যাইতে দেওয়া আদৌ উচিত হয় নাই; বিন্দুর স্বামীর রোজগার অল্প, সুতরাং তাহারই স্থায়িভাবে এই কাজের ভার লওয়া কর্ত্তব্য।

এই সকল কথায় বিন্দু যে কেবল উপদেশদাত্রী প্রতিবেশিনীদের উপরেই বিরক্ত হইল তাহা নহে, সরোজের উপরেও তাহার ক্রোধের সীমা রহিল না। এ আবাগীই তো যত গোলযোগের মূল। বিন্দু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, কাল হইতে যদি সে ঐ আবাগীকে দিয়া না রাঁধায়, তবে তাহার নাম বিন্দী বামনীই নয়। দেখি, তাহার ব্যথায় ব্যথিত হইয়া কে কি করে।

বিন্দু বেশ রাগতভাবেই এই সঙ্কল্পটা আদেশ স্বরূপে সরোজকে জানাইয়া দিলে সরোজ যখন হাসিমুখেই তাহা শিরোধার্য্য করিয়া লইল, তখন রাগে বিন্দুর প্রতিজ্ঞাটা আরও দৃঢ় হইয়া আসিল।

পরদিন সকালে সরোজকে রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃত দেখিয়া তারণ বিন্দুকে জিজ্ঞাসা করিল, "কাল ছোট বৌমার পা পুড়ে গিয়েছে, আজ আবার তিনি রাঁধতে গিয়েছেন যে?"

বিন্দু গম্ভীরভাবে উত্তর করিল, "রাঁধবে না তো কি? একদিন একটু পা পুড়েচে ব'লে রান্না শিখতে হবে না? আমি কি কারো কেনা বাঁদী যে বারোমাস রেঁধে দেব।"

এ কথায় তারণকে নিরুত্তর হইতে হইল।

কিন্তু আহারের সময় তারণ যখন এক একটা তরকারি মুখে দিয়াই বিকৃতমুখে সেগুলাকে ঠেলিয়া রাখিতে লাগিল, এবং অর্দ্ধেক ভাত পাতে ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল, তখন বিন্দুর দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মনের গায়ে কে যেন চাবুকের ঘা মারিল। সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া আহারের স্থান হইতে পলাইয়া আসিল। তারণ নীরবে আহারকার্য্য শেষ করিয়া আফিসে চলিয়া গেল।

গোপীনাথ কিন্তু এরূপ নীরবে আহার শেষ করিয়া উঠিল না। সে শ্লেষ করিয়া বিন্দুকে বলিল, "তোমার হাত যে পেকে উঠেছে বৌদি।"

বিন্দু উত্তর করিল, "আমার হাত অনেক আগেই পেকে গিয়েছে। এখন যার হাত নেহাৎ কাঁচা, তার হাত পাকিয়ে তোলবার চেষ্টায় আছি।"

গোপীনাথ বলিল, "তোমার উদ্দেশ্য সাধু। কিন্তু রাঁধুনীর হাত পাকতে ভোক্তাদের প্রাণটুকু পেকে দেহ-বৃক্ষ হ'তে খসে পড়বে যে।"

বিন্দু ভারীমুখে বলিল, "তা বললে তো চলে না। মেয়ে মানুষের শেখা দরকার। পাঁচ দিন মন্দ হ'য়ে একদিন ভাল হবে।"

ঈষৎ হাসিয়া গোপীনাথ বলিল, "সেটা ঠিক, 'ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ।' কিন্তু আগে দাঁড় টানিয়ে তবে হালে বসাতে হয় বৌদি।"

গোপীনাথই যে আগে দাঁড়ে অনভ্যস্ত সরোজকে হাল ধরিতে পাঠাইয়াছিল ইহা মনে আসিলেও বিন্দু সে কথাটার উল্লেখ না করিয়া একটু তীব্রকণ্ঠেই বলিল, "অত খুঁটিনাটী ধরলে চলবে না বলছি। যে শিখছে, তার চাইতে কি তোমাদের কষ্টটা বেশী হ'লো?"

গোপীনাথ ইহার উত্তর দিতে না পারিয়া নিরস্ত হইল।

প্রতিজ্ঞা করা যত সহজ, প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা যে তদপেক্ষা অনেক কঠিন, ইহা বিন্দু সেইদিন স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, যেদিন সে রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃতা সরোজকে ধূম রক্তিম বাষ্পপূর্ণ নেত্রে অগ্নি ও ধূমের সহিত যুদ্ধ করিতে দেখিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া বিন্দুর বুকটা যেন কেমন করিয়া উঠিল। সে অনেক কষ্টে স্বরে কতকটা কঠোরতা আনিয়া বলিল, "এ তোর কি হচ্ছে সরি?"

সরোজ জলভরা দৃষ্টিটা তাহার মুখের উপর স্থাপন করিয়া, একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "আজ উনানটা কিছুতেই জ্বলতে চাইচে না দিদি।"

ভ্রূভঙ্গী সহকারে বিন্দু বলিল, "তা চাইবে কেন। 'অরাঁধুণীর হাতে পড়ে কই মাছ কাঁদে।' আমি দেখবো?"

আঁচলে মুখের ঘাম মুছিতে মুছিতে সরোজ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "না না, এই যে জ্বলে উঠেছে।"

এটা অভিমান, না অহঙ্কার? আচ্ছা, অহঙ্কার লইয়াই থাকুক। বিন্দু আর সেখানে দাঁড়াইল না, দ্রুত সশব্দ পদক্ষেপে রন্ধনশালা হইতে চলিয়া আসিল।

চলিয়া আসিল বটে, কিন্তু স্থির থাকিতে পারিল না। প্রতিজ্ঞার কৃত্রিম কঠোরতাকে ঠেলিয়া দিয়া ভিতরের স্নেহের স্বাভাবিক কোমলতাটা বাহিরে আসিবার জন্য যেন প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। আহা, হাজার হোক ছেলেমানুষ। ছেলেমানুষের ঘাড়ে এত বড় একটা ভার চাপাইয়া দেওয়া, এটা যেন চোরের উপর রাগ করিয়া মাটীতে ভাত খাওয়া হইতেছে।

খানিক পরে বিন্দু পুনরায় গিয়া দেখিল, সরোজ ডান হাতের বুড়া আঙ্গুলটা টিপিয়া বসিয়া রহিয়াছে; তাহার চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল গড়াইতেছে। বিন্দু তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল, "আঙ্গুলে কি হ'লো? ফেন পড়েছে নাকি?"

সরোজ চমকিত ভাবে চোখের জল সামলাইয়া লইয়া বলিল, "না, বেশী পড়েনি, ফেন ঝাড়তে গিয়ে একটু লেগেছে।"

"খুব জ্বালা কচ্চে?"

"না না" বলিয়া সরোজ মৃদু হাসিয়া তরকারীর কড়াটা উনানে চাপাইয়া দিল। বিন্দু তাহার দিকে একটা তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া আস্তে আস্তে সরিয়া আসিল।

বিন্দুর এই রাগে প্রতিবেশিনীদের কিছুমাত্র ক্ষতি হইল না। বরং তাহাদের হিতৈষণাবৃত্তি আরও যেন বাড়িয়া উঠিল। তাহারা ঘাটে নাছে সর্ব্বত্র আন্দোলনের প্রবল তরঙ্গ তুলিয়া ইহাই প্রমাণিত করিতে লাগিল যে, ভট্টচাজ্যিদের বড় বোয়ের মত ক্রুর ও হিংসক মেয়েমানুষ দ্বিতীয় নাই। যাহার পয়সায় এত তেজ অহঙ্কার, তাহারই বৌটাকে খাটাইয়া মারিতেছে। আহা, মেয়েটার দুর্দ্দশা দেখিলে চোখে জল আসে।

মেয়ে-মহলে বিন্দুকে লইয়া যখন এইরূপ কঠোর সমালোচনা চলিতেছিল, তখন পুরুষমহলেও তারণের বিরুদ্ধে একটা প্রবল অন্দোলন উত্থিত হইয়াছিল। সমাজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীপতি ঘোষকে অভয় দেওয়ায় কেহ যে তারণের সৎসাহসের পরিচয় পাইল তাহা নহে, পরন্তু ইহাতে তাহার অহঙ্কারের পরিচয় পাইয়া অনেকেই তাহার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল, এবং দর্পহারী মধুসূদন যে অচিরাৎ তাহার এই অহঙ্কার চূর্ণ করিবেন, আম্বিকা ঘোষাল এ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করিয়া মর্ম্মাহত সামাজিকগণকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। ভগবানের বিচারের উপর দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলেও সমাজপতিগণ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না; তাঁহারা শ্রীপতি ঘোষের অপরাধ ক্ষমা করিয়া এবং একটা লোক দেখানো প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া লইয়া আপনাদের বিচার কার্য্য শেষ করিলেন, এবং অহঙ্কারী তারণের উপর দিয়া ভগবানের বিচারফল দেখিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

মানুষের যতগুলা অভাব আছে, তাহার মধ্যে একটা প্রধান অভাব এই যে, একজন অপরের মনের ভিতরটা দেখিতে পায় না। আর এই অভাবের জন্য সংসারে যত অনর্থপাত হইয়া থাকে, অন্য কোন কারণেই তাহার শতাংশের একাংশও হয় কিনা সন্দেহ। দুই হাজার মাইল দূরবর্ত্তী স্থানের সংবাদ জানিয়া কাজ করা যায়, কিন্তু একঘরে পাশাপাশি লোকটার মনের খবর জানিবার কোনই উপায় নাই। অথচ এই দুর্জ্ঞেয় বিষয়টাকে শুধু অনুমানের সাহায্যে যতটুকু জ্ঞানগোচরে আনা যায়, ভুল হউক, নির্ভুল হউক তাহার দ্বারাই মানুষটাকে চিনিয়া লইবার একটা ব্যর্থ প্রয়াস করে মাত্র, এবং সেই প্রয়াসের ফলে অনেক সময় একটা ভ্রান্ত ধারণার অন্তরালে মানুষের আসল প্রকৃতিটা চাপা পড়িয়া যায়।

এই ভ্রান্ত ধারণার অন্তরালে গোপীনাথও যেন চাপা পড়িয়া গেল। সেদিন আহারে বসিয়া গোপীনাথ বিন্দুকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি রান্নাঘরের কাছ হ'তে একেবারে পেন্‌সন নিলে বৌদি?"

বিন্দু উত্তর করিল, "মনে তো তাই করেছি। তোমার দাদা আপিসে পেন্‌সন নেবে নেবে কচ্চে, আমিও মনে কচ্চি রান্নাঘর থেকে পেন্‌সন নেব।"

গোপীনাথ বলিল, "দাদা যাই করুক, তোমার কিন্তু এই মনে করাটা আদৌ ভাল হয়নি।"

"কেন বল দেখি ?"

গোপীনাথ কোন উত্তর করিল না। বিন্দু একটু হাসিয়া বলিল, "ছোট বোয়ের খুব কষ্ট হচ্চে, না ?"

সরোজের পরিশ্রমকে লক্ষ্য করিয়া যে গোপীনাথ কথাটা তুলিয়াছিল তাহা নহে, পত্নীর অশিক্ষিত হস্তের রান্নাটা তাহার আদৌ রুচিকর হইতেছিল না এবং এইজন্যই সে বৌদির নিকট অনুযোগ উপস্থিত করিয়াছিল। কিন্তু বিন্দু যখন সেটাকে ঠিক স্নেহের অনুযোগরূপে গ্রহণ না করিয়া বরং গোপীনাথকেই একটা মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করিল, তখন গোপীনাথও ইহার প্রতিবাদ না করিয়া গম্ভীর ভাবেই উত্তর দিল, "খাটতে হ'লে সকলেরই কষ্ট হ'য়ে থাকে।"

হঠাৎ বাতাসের ঝট্‌কায় প্রদীপের শীষের মত বিন্দুর মুখের হাসিটুকু মুহূর্ত্তে নিবিয়া গিয়া মুখখানাকে যেন অন্ধকার করিয়া ফেলিল। সে ক্ষুণ্নস্বরে বলিল, "আমিও যে আজ বিশ বচ্ছর খেটে আসছি ঠাকুরপো, কৈ আমার উপর এত দরদ কেউ দেখায়নি তো ?"

গোপীনাথ বলিল, "তোমার উপর কেউ দরদ দেখায় নি ব'লে তুমিও কি অন্যের উপর দরদ দেখাবে না ?"

রোষক্ষুব্ধ কণ্ঠে বিন্দু বলিল, "আমার প্রাণে দরদ থাক্‌লে তো দেখাবো।"

গোপীনাথ বলিল, "তোমার প্রাণে দরদ নাই ব'লে আর কারো প্রাণেই যে দরদ থাক্‌বে না এমন কথা মনে করা তোমার অন্যায়।"

ক্রোধে নাসাগ্র কুঞ্চিত করিয়া বিন্দু বলিল, "সেটা আমি হু'শো বার স্বীকার করি। কিন্তু তোমাদের প্রাণের ভিতর এত দরদ আছে জানলে আমি কখনই এমন অন্যায় করতাম না ঠাকুরপো।"

তাহার রাগ দেখিয়া গোপীনাথ যেন একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল; এবং তিল ক্রমে তালের আকার ধারণ করিয়াছে দেখিয়া সে আর কিছু বলিতে সাহস করিল না। একবার মনে হইল, সে বৌদিকে বুঝাইয়া বলে যে, বাস্তবিক সরোজের উপর মমতা বশত সে এত কথা বলে নাই, শুধু নিজের সুবিধার জন্যই তাহার এই অনুযোগ। কিন্তু সেটা যেন নিতান্ত অনাবশ্যক বলিয়া মনে হইল। বৌদি কি তাহাকে এতই ভুল বুঝিবেন ? তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া এমন নির্লজ্জভাবে সে সরোজের পক্ষপাতিত্ব করিবে এই ঘৃণিত বিশ্বাসটাকে মনের ভিতরে স্থান দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। এমন অসম্ভবটা যদি অসম্ভবই হয়, তবে তাহার প্রতিবাদ করাও বৃথা। সুতরাং গোপীনাথ এ সম্বন্ধে বিন্দুকে কিছু বলা প্রয়োজন বোধ করিল না।

কিন্তু বিন্দু তাহার মনের ভাবটা ঠিক মত বুঝিতে পারিল না। সে স্নেহের অনুযোগ অপেক্ষা তাহার অকৃতজ্ঞতাকেই খুব বড় করিয়া দেখিল। ছি ছি, সেদিনের সরি, তাহার উপর এত দরদ যে সেজন্য বিন্দুর পর্য্যন্ত অন্যায় দেখাইতে কুণ্ঠিত হইল না। কি বিষম অকৃতজ্ঞতা! গোপীনাথের এই অকৃতজ্ঞতা ও নির্লজ্জতায় বিন্দুর চিত্তটা ক্ষোভে দুঃখে আলোড়িত হইতে লাগিল, এবং কি করিলে এই অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত হয় তাহাই তাহার চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িল।

সেদিন সন্ধ্যার সময় সরোজ রন্ধনশালায় যাইবার পূর্ব্বেই বিন্দু গিয়া উনান ধরাইয়া দিল। সরোজ তাড়াতাড়ি আসিয়া বলিল, "তুমি আবার এলে কেন দিদি ?"

বিন্দু তাহার দিকে কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিযা যোড়হাতে ক্রোধসমুচ্চ কণ্ঠে বলিল, "আমার অপরাধ হ'য়েছে গো, অপরাধ হ'য়েছে। এখন কি করলে আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হয ব'লে দিতে পার ?"

সরোজ তাহার মুখের দিকে চাহিযা স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া পড়িল; ভীতি ও বিস্ময়ের আতিশয্যে তাহার মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না। তাহার ভীতিবিহ্বল মুখের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে বিন্দু কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় তারণ আসিয়া ডাকিল, "বড় বৌ!"

শুধু স্বামীর আহ্বান শুনিয়া নয, সে আহ্বানের স্বরে একটা অস্বাভাবিক উদ্বেগ ও ব্যাকুলতা অনুভব করিয়া বিন্দু আর কিছু বলিতে পারিল না; তাহার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল; তাড়াতাড়ি রন্ধনশালা হইতে বাহির হইয়া নিজের ঘরের দিকে ছুটিল।

আফিসের জামা কাপড় সমেত তারণকে মাথায় হাত দিয়া দাবার উপর বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বিন্দু ব্যস্ততার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "ও কি গো. অমন মাথায় হাত দিয়ে বসলে কেন ?"

উত্তরে তারণ জোরে একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিল মাত্র। বিন্দু তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর হইতে প্রদীপ আনিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া শঙ্কা-কম্পিত কণ্ঠে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'য়েছে ?"

পুনরায় একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তারণ বিষাদ-গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর করিল, "সর্ব্বনাশ হ'য়েছে

বড় বৌ; চার চারশো টাকা জুয়াচোরে কেড়ে নিয়েছে।”

শঙ্কিত স্বরে বিন্দু বলিয়া উঠিল, “সর্ব্বনাশ!”

তারণ বলিল, “কাঠওলার চারশো টাকা পাওনা হ’য়েছে। আজ তার দেনা মিটিয়ে দেব ব’লে যাবার সময় টাকাটা নিয়ে গিয়েছিলাম। আফিসে ৪টার সময় ছুটি নিয়ে বড় বাজারের একটা গলী দিয়ে তাড়াতাড়ি তার গদীর দিকে যাচ্চি, হঠাৎ পিছন থেকে একটা লোক এসে এমন ধাক্কা দিলে যে, রাস্তার উপর উপুড় হ’য়ে পড়ে গেলাম। একটু সামলে নিয়ে দেখি, সামনে যমদূতের মত একটা লোক মস্ত এক ছোরা নিয়ে দাঁড়িয়ে।”

আতঙ্কে শিহরিয়া বিন্দু বলিয়া উঠিল, “মাগো!”

তারণ বলিল, “ছোরা দেখেই তো আমার চক্ষু স্থির! একটা কথা কইলেই ছোরাটা বুকে বসিয়ে দেবে। কথা কইবার সময়ও হলো না। দুটো লোক এসে আমাকে জাপটে ধ’রে পকেট থেকে নোটের তাড়াগুলো বা’র ক’রে নিয়ে কোন্ দিকে যে চলে গেল কিছুই বুঝতে পারলাম না।”

তারণ শুষ্কমুখে পত্নীর মুখের দিকে চাহিল। বিন্দুও ভয়ে বিস্ময়ে হতবুদ্ধির ন্যায় স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তারণ সশব্দ নিশ্বাসের সহিত বলিল, “উঃ, চার চার শো টাকা, এক কথায় চলে গেল!”

বিন্দু এবারি মুখ হইতে শঙ্কার ভাবটাকে দূর করিয়া দিয়া সান্ত্বনার স্বরে বলিল, “তা যাক্। তুমি যে ভালোয় ভালোয় ফিরে এসেছ, তোমার যে কিছু হয় নি, এই যথেষ্ট।”

শুষ্কমুখে তারণ বলিল, “কিন্তু অনেকগুলা টাকা বড় বৌ!”

বিন্দু ঝঙ্কার দিয়া বলিল, “হাঁ অনেক টাকা—একটা রাজার রাজত্ব। এখন উঠে কাপড় জামা ছাড়বে চল দেখি।”

“যাই” বলিয়া তারণ বসিয়া রহিল। বিন্দু তাহার হাত ধরিয়া বলিল, “ব’সে রইলে যে? উঠে মুখে হাতে জল দাও।”

তারণ বলিল, “হাঁ, দিই। কিন্তু গুপী শুনলে কি বলবে বড় বৌ।”

কৃত্রিম রোষে মুখখানা গম্ভীর করিয়া বিন্দু বলিল, “বলবে, টাকাগুলোর বদলে তোমার জীবনটা দিয়ে এলে না কেন? আচ্ছা মানুষ যা হোক্!”

একটু ম্লান হাসি হাসিয়া তারণ উঠিয়া কাপড় ছাড়িতে গেল।

বিন্দুর মুখে সমস্ত শুনিয়া গোপীনাথ চুপ করিয়া রহিল। তাহার এই গাম্ভীর্য্যটুকু কিন্তু বিন্দুর নিকট ভাল লাগিল না; তথাপি সে ঈষৎ হাস্য দ্বারা মনের সেই গ্লানিটুকুকে যেন মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, “ওঁর ভয় কি জান, বলেন গুপী কি মনে করবে?”

ভ্রূকুটী করিয়া গোপীনাথ বলিল, “মনে করবো, জুয়াচোরের নাম ক’রে দাদা টাকাগুলো গাপ্ করেছে।”

বিন্দু পাংশুমুখে নীরবে রহিল। গোপীনাথ বলিল, “সেই ভয়েই বুঝি দাদার আজ খাওয়া হ’লো না?”

ম্লানমুখে বিন্দু বলিল, “না, বড্ড মাথা ধরেছে, শরীরটাও ভাল নয়।”

রাত্রিতে তারণ পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিল, “গুপী শুনে কি বললে বড় বৌ?”

বিন্দু তাড়াতাড়ি বলিল, “বলবে আবার কি? ক’টা টাকা গিয়েছে তার কি হবে? অমন গিয়েই থাকে। কত লোকের দু’হাজার দশ হাজার যায়, কিন্তু তার শোকে কেউ উপোস দিয়ে থাকে না।”

তারণ হাসিয়া বলিল, “এই দেখ, গুপে এক পাগল। মাথাটা বড্ড ধরেছিল ব’লেই খেতে ইচ্ছা হ’লো না। নয় ত টাকা—ওঃ ভারী তো চারশো টাকা।”

বলিয়া তারণ অবজ্ঞাসূচক মুখভঙ্গী করিল। বিন্দু একটু শ্লেষের হাসি হাসিয়া বলিল, “তবু ভাল, টাকার উপর এত হেনস্তা ব’লেই চল্লিশ টাকা মাইনের চাকরী ছাড়তে পার না।”

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া তারণ বলিল, “ছাড়তে না পারলেও এবার বোধ হয় ছাড়তে হবে বড় বৌ। যে নূতন বড় বাবু এসেছে, বেটা চাষা আফিসটাকে চাষ দিয়ে তবে ছাড়বে।”

মুখখানা বিকৃত করিয়া তারণ পাশ ফিরিয়া শুইল।

সকালে তারণ আফিসে যাইতে উদ্যত হইলে বিন্দু বাধা দিয়া বলিল, “কাল শরীর খারাপ গিয়েছে, কিছু খাওয়া হয়নি, আজ আফিসে গিয়ে কাজ নাই।”

তারণ কিন্তু তাহার নিষেধটা হাসিয়াই উড়াইয়া দিল। বলিল, “একদিন না খেলেই যে আফিস্ কামাই কত্তে হবে, এমন কথা কোন শাস্ত্রেই নাই। বিশেষ আফিসের বড় বাবুর শাস্ত্রে এর বিপরীত কথাই লেখা আছে।”

বিন্দু কিন্তু সে শাস্ত্রের দোহাই মানিল না, সে রাগ দেখাইয়া বলিল, চুলোয় যাক বড় বাবু, চুলোয় যাক তার শাস্তর। তোমার শরীর যখন খারাপ, তখন কিছুতেই যেতে দেব না।”

তারণ বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে, তাহার শারীরিক অবস্থা এমন কিছু মন্দ নয় যে, সেজন্য তাহাকে আফিস কামাই করিতে হইবে। সন্ধ্যার সময় মনের চাঞ্চল্যবশতঃ মাথাটা ধরিয়াছিল মাত্র, ঘুমাইবার পর তাহা সারিয়া গিয়াছে।

বিন্দু তাহার কথায় বিশ্বাস করিল না; সে গোপীনাথকে ডাকিয়া হাত দেখিতে বলিল। গোপীনাথ নাড়ী টিপিয়া তারণের উক্তিরই পোষকতা করিল। তারণ হাসিয়া বলিল, "এবার বিশ্বাস হ'লো তো?"

বিন্দু বলিল, "একটুও না। ঠাকুরপো সেদিন-কার ছেলে, ও সুখ অসুখের কি জানে।"

তারণ বলিল, "ও কিছু জানে না, জান বুঝি তুমি?"

জোরে মাথা নাড়িয়া বিন্দু বলিল, "আমি জানিই তো। আমি, আজ বিশ বচ্ছর তোমাকে দেখে আসছি তা জান? তোমার সুখ অসুখ আমি যতটা বুঝি, তিন দিনের ডাক্তার তার কি বুঝবে বল তো?"

তাহার এই সগর্ব্ব উক্তির মধ্যে অসত্য যে কিছুই নাই, তারণ ইহা অস্বীকার করিতে না পারিলেও মুখে একটু জোর দেখাইয়া বলিল, "তুমি যে একজন মস্ত সিবিল সার্জ্জন তা আমি জানি, কিন্তু আমার অসুখের চিহ্নটা কি আছে?"

বিন্দু বলিল, "কি চিহ্ন আছে না আছে তুমি তার কি বুঝবে? তোমার চোখ মুখ কি রকম বসে গিয়েছে, তা দেখতে পাচ্চো?"

উপেক্ষাসূচক মুখভঙ্গী করিয়া তারণ বলিল, "ও কিছু নয়। না হোক টাকাগুলো গিয়েছে কিনা, তাই এমনটা হ'য়েছে।"

বিন্দু বলিল, "সেই ভাবনায় তো তোমার ঘুম ধরেনি। ঘরে চাল নাই, পয়সা নাই, উপোষ দিয়ে আফিস করেছ, তখন তো ভাবনায় তোমার চোখ মুখ এমন বসে যায় নি।"

"তা হ'লে তোমার সিদ্ধান্ত এই যে আমার একটা সাংঘাতিক রকমের অসুখ হ'য়েছে।"

বিন্দু ক্রোধগম্ভীর মুখে স্বামীর মুখের উপর সরোষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। তারণ হাসিতে হাসিতে আফিসে চলিয়া গেল।

স্বামীর উপর রাগে বিন্দু সারাদিনটা বড়ই অস্বস্তিতে কাটাইল। এমন কি লাটের চাকরী যে, কাহারও অনুরোধে একটা দিন কামাই করা যায় না? বিন্দু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, আর কোনদিনই সে এমন অনুরোধ করিয়া আপনার মর্য্যাদা নষ্ট করিবে না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

চারিশত টাকা হঠাৎ নষ্ট হওয়ায় গোপীনাথ কিছু বলিল না বটে, অপর সকলে কিন্তু কথাটা শুনিয়া আক্ষেপ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিল না। দুই একটা টাকা নয়, দশ বিশ টাকা নয়, রোক চার শো টাকা। এক কথায় এতগুলা টাকা খোয়ান সহজ কথা কি? গোপীনাথ লক্ষ্মণের মত ভাই বলিয়াই কিছু বলিল না; নতুবা আজকালকার বাজারে অপর কোন্ ভাই নিঃশব্দে এমন ক্ষতি সহ্য করিতে পারে? আর কেহ হইলে এই অসম্ভব কথায় আদৌ বিশ্বাসই করিত না। দিন দুপুরে কলিকাতার মত সহরের প্রকাশ্য রাজপথে জুয়াচোরে জোর করিয়া টাকাগুলো কাড়িয়া লইল, আর কেহই তাহা দেখিতে পাইল না, যাহার টাকা গেল সে একটি টু শব্দ করিয়াও লোক ডাকিল না। ঠিক আরব্য উপন্যাসের পরীর মত চোরে টাকা লইয়া উড়িয়া গেল। গোপীনাথকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে, এমন গল্পটাকে সে নীরবে পরিপাক করিয়া লইল। শত শত কণ্ঠে গোপীনাথের ভ্রাতৃভক্তির প্রশংসা কীর্ত্তিত হইতে লাগিল।

এই সকল প্রশংসা যে কেবল পরোক্ষেই কীর্ত্তিত হইল তাহা নহে, ইহার অধিকাংশই গোপীনাথের সমক্ষে কীর্ত্তন করিয়া লোকে এই বিষম কলিযুগের মধ্যভাগেও ত্রেতাযুগের আগমন সম্ভাবনায় পুলকিত হইয়া উঠিল। এই প্রশংসার ফলে গোপীনাথের ভ্রাতৃভক্তির কিছু হ্রাসবৃদ্ধি হইল কি না তাহা কেহই জানিতে পারিল না বটে, কিন্তু তাহার গম্ভীর নীরবতা দ্বারা এইটুকু প্রমাণিত হইল যে, জ্যেষ্ঠের উপর সন্দেহটুকু সে বাহিরে প্রকাশ করিতে অক্ষম।

গোপীনাথের এই অক্ষমতা পাঁচজনে সংশোধন করিয়া দিল। তাহারা অসঙ্কোচে প্রকাশ করিল যে, জুয়াচোরের গল্প সম্পূর্ণ মিথ্যা; ভাইকে ঠকাইয়া তারণ ভট্টচাজ্যি টাকাগুলা আত্মসাৎ করিয়াছে।

গোপীনাথ রোগী দেখিয়া ফিরিতেছিল। অম্বিকা ঘোষাল তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভায়া নাকি সাত শো টাকা হারিয়ে এসেছে?"

গোপীনাথ উত্তর দিল, "সাত শো নয়, চার শো।"

সপ্রতিভ ভাবে ঘোষাল বলিলেন, "তাই বা কম কি, একটা লোকের এক বৎসরের রোজগারেরও বেশী।"

গোপীনাথ ম্লানমুখে বলিল, "তা বৈকি।"

গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালন করিতে করিতে ঘোষাল বলিলেন, "কিন্তু ভায়া, যাই বল, তারণের খুব সৌভাগ্য যে, তোমার মত সাক্ষাৎ লক্ষ্মণ ভাই পেয়েছিল। হিংসা ক'রে বলছি না, তোমার এখন চল্তি খাতা, দু'চার শো গেলে কিছুই ক্ষতি হবে না। কিন্তু আমি এই জোর গলায় বলছি, তারণ কক্ষনো সুখী হবে না।"

গোপীনাথ বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া তাঁহার গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ঘোষাল বলিতে লাগিলেন, "অবশ্য, তুমি মনে মনে জানলেও মুখ ফুটে কিছু বলতে পারবে না; আর সেটা বলাও উচিত নয়। কিন্তু পাঁচজনের মুখে তো সবা চাপা দিতে পারবে না। কথাতেই আছে, পাঁচের মুখে ভগবান্"

গোপীনাথের মুখখানা যেন অন্ধকার হইয়া আসিল। ঘোষাল বলিলেন, "রাগ ক'রো না ভায়া, তারণকে আমরা চিরকালই সরল লোক ব'লে জানতাম। কিন্তু আজকাল তার মতিগতিটা যেন কি রকম হ'য়েছে। এই দেখ না, সেদিন শ্রীপতি ঘোষকে নিয়ে কি কাণ্ডটাই বাধাতে বসেছিল। তোমাকে এতদিন বলি নাই ভায়া, ঘোষেদের ঐ জমিটা নেবার সময় তারণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, ওটা বেনামীতে কেনা যায় কি না।"

গোপীনাথ ভ্রূকুটী করিয়া দ্রুতপদে সেস্থান ত্যাগ করিল। ঘোষাল মহাশয় আপনমনে গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতে গাহিতে চলিলেন—

"সকলি তোমারি ইচ্ছা
ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা
লোকে বলে করি আমি।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

তারণ আফিস হইতে ফিরিয়া বিন্দুকে বলিল, "কাল হ'তে আমার ৭টার সময় ভাত চাই বড় বৌ।"

বিন্দু বলিল, "সাতটা তো বিছানা হতে উঠতে না উঠতেই বাজে।"

একটু উগ্রভাবে তারণ বলিল, "বিছানা হ'তে উঠতেই বাজুক, বা ঘুমিয়ে থাকতেই বাজুক, মোদ্দা সাতটায় আমার ভাত চাই।"

সহাস্যে বিন্দু বলিল, "বেশ, যে রাঁধুনী তাকে ব'লে রাখ। সে পারে তোমাকে সাতটায় ভাত দেবে।"

মাথা নাড়িয়া তারণ বলিল, "পারা পারির কথা আমি জানি না। আজকাল এত বেলা হয় যে খেতেই আটটা বেজে যায়। সাড়ে আটটার গাড়ী ধ'তে পারি না। আটটা পঞ্চান্নর গাড়ীতে যেতে হয়। আর সে বেটার গাড়ীও গরুর গাড়ীর সঙ্গে পাল্লা দেয়। আফিসে পৌছাতে পৌনে এগারটা বেজে যায়। বড় বাবু বলেছে, কাল হ'তে এত লেট্ হ'লে বড় সাহেবের কাছে রিপোর্ট করবে।"

বিন্দু যেন একটু ম্লান ভাবে বলিল, "শুধু রিপোর্ট করবে?"

তার। তা নয় তো ধ'রে মারবে নাকি?

বিন্দু। মারে কি না তাই জিগ্যেস্ কচ্চি।

মুখখানাকে গম্ভীর করিয়া তারণ বলিল, "মারলে বোধ হয় তোমার খুব আহ্লাদ হয়?"

উচ্ছ্বসিত হাস্যে মুখখানা ফুলিয়া উঠিলেও তাহা চাপিয়া বিন্দু ঘাড় দোলাইয়া উত্তর করিল, "না না, আহ্লাদ আমার একটুও হয় না। তবে আমি হরির লুট দিই বটে।"

"আহা, তোমার মত পতিব্রতা জগতে দুর্ল্লভ!"

তারণ কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে বিন্দুর মুখের দিকে চাহিতেই বিন্দু আর থাকিতে পারিল না, খল্ খল্ শব্দে হাসিয়া উঠিল।

পরদিন সাতটার সময় তারণ ভাত চাহিলে বিন্দু যখন বলিল যে, ভাতের একটু বিলম্ব আছে, তখন তারণ রাগে যেন আগুন হইয়া উঠিল। বিন্দু তাহাকে বুঝাইয়া বলিতে গেল যে, ছোট বৌ ভুলক্রমে আগে ডাল চাপাইয়া দিয়াছিল, এই কারণেই একটু দেরী হইয়া গিয়াছে; কাল হইতে আর এরূপ বিলম্ব হইবে না। তারণ কিন্তু তাহার কোন কথাই কাণে তুলিল না; সে আফিসের জামা কাপড় পরিয়া বাহির হইতে উদ্যত হইল। বিন্দু বাধা দিয়া বলিল, "ওকি, না খেয়েই বেরুচ্চো যে?"

তারণ উত্তর করিল, "কাজেই।"

বিন্দু বলিল, "ছেলেমানুষ, একদিন ভুল ক'রে ফেলেছে—"

ক্রুদ্ধভাবে তারণ বলিল, "ছেলেমানুষের ভুল ব'লে সাহেব তো আমাকে রেয়াৎ করবে না।"

তারণ আর দাঁড়াইল না, দ্রুতপদবিক্ষেপে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। বিন্দু গুম্ হইয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল।

সরোজ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বড়ঠাকুর বেরিয়ে গেলেন দিদি ?"

বিন্দু গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, "হুঁ।"

সরোজ বলিল, "ওমা, না খেয়েই চলে গেলেন ?"

তীব্রকণ্ঠে বিন্দু বলিল, "যাবে না তো কে তার জন্যে সাতটার সময় ভাত বেড়ে বসে আছে ?"

সরোজ ভীতিচঞ্চল দৃষ্টিতে বিন্দুর মুখের দিকে চাহিতেই বিন্দু তাহার দিকে একটা রোষ-কঠোর কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিল।

সে দিনটা যে বিন্দুর নিকট আদৌ শান্তিময় হইল না ইহা বলাই বাহুল্য। এই লোকটা এতকাল আফিস করিতেছে, কিন্তু এক দিনের জন্যও তাহাকে না খাইয়া আফিসে যাইতে হয় নাই। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা, কি সুখ, কি অসুখ, বারোমাস সমানভাবে সে এক মুঠা ভাতে ভাতও দিযা আসিতেছে, কোনদিন ইহার একটু অন্যথা হইতে দেয় নাই। কিন্তু আজ সেই লোকটা না খাইয়া গেল ইহা তাহাকে দেখিতে হইল। দুই দিনের জন্য ছোট বোয়ের হাতে হাঁড়ী পড়িতেই এই কাণ্ড, বারোমাস রাঁধিতে হইলে না জানি আরও কি করিবে। ছোট বোয়ের উপর রাগে বিন্দু গর্‌গর্ করিতে লাগিল।

কিন্তু দোষটা কাহার বেশী—সরোজের, না তাহার নিজের ? সরোজই বেশী দোষী হইত, যদি তাহাকে আপন জানিয়াও তাহার উপর ভার দিয়া বিন্দু নিশ্চিন্ত না থাকিত। সে শুধু সরোজকে বলিয়া দিয়াছিল, কাল সাতটার সময় ভাত চাই। কিন্তু সাতটায় ভাত দিতে হইলে কোন্‌টা আগে, কোন্‌টা পরে রাঁধা দরকার, সে অভিজ্ঞতা তো সরোজের নাই; বিন্দুও তাহাকে এ সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দেয় নাই। সুতরাং সরোজ অপেক্ষা তাহার নিজেরই তো দোষ বেশী। নিজের উপর রাগে বিন্দু গর্‌গর্ করিতে লাগিল। অথচ এই রাগটা প্রকাশ করিবার কোনই উপায় ছিল না। সুতরাং মনের রাগ মনে চাপিয়া, শুধু এক একটা তুচ্ছ কারণে সরোজের উপর তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বিন্দু বহু কষ্টে মধ্যাহ্নটা কাটাইয়া দিল।

আহারান্তে পান দোক্তা গালে দিয়া বিস্তানিধি-গৃহিণী বিন্দুর নিকট উপস্থিত হইয়া ব্যস্ততার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ বৌমা, সত্যি নাকি ?"

বিন্দু সত্য মিথ্যা বুঝিতে না পারিয়া উৎকণ্ঠিত ভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কি খুড়ী-মা ?"

খুড়ী-মা ডান হাতটা গালের উপর রাখিয়া অতি-মাত্র ভীতবিজড়িত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "ও মাগো এমন সর্ব্বনাশও হয় ! এ যে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত গো !"

খুড়ীমার বক্তব্য বুঝিতে না পারিয়া বিন্দু ভয়ে যেন আঁৎকাইযা উঠিল, এবং ভীতিচঞ্চলনেত্রে নীরবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিযা রহিল। খুড়ীমা তাঁহার এই ভযের কারণটা না বুঝিয়াই আপন মনে বলিতে লাগিলেন, "কি বলবো বৌমা, শুনে অবধি তো যেন পেটের ভিতর হাত পা ঢুকে গিয়েছে। তাই কি ছুটে আসবার যো আছে ? পোড়া সংসার নিযে জ্বালাতন। ছোট গিন্নী তো কাল থেকে মাথা ধ'রে পড়ে আছেন। সকালে উঠে বাসী পাটটি সেরে, ঠাকুর ঘরের জো ক'রে, বাটনাটি বেটে দিযে শুয়ে পড়েছেন; কিন্তু আমার তো পড়ে থাকলে চলে না। রাঁধা বাড়া দেওযা থোওযা সব সেরে, নাকে মুখে এক মুঠো দিয়ে তাড়াতাড়ি আসচি। তা হাঁ বৌমা, হাজার টাকা সব কেড়ে নিযেছে ?

দুর্গা দুর্গা ! টাকার কথা ! বিন্দুর ধড়ে যেন প্রাণ আসিল। সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া উত্তর দিল, "হাজার নয় খুড়ীমা, চার শো।"

খুড়ীমা বলিলেন, "চার শো ! তবে শুনছিলাম হাজার টাকা। তা চার শো টাকাই কি কম গা, এক আঁজলা টাকা। আহা, এমন দুষমন কে ছিল গা ? দিন দুপুরে ডাকাতি। এ ডাকাতির পযসা কি ভোগ হবে ? ভগবান্ আছেন।"

হস্তদ্বয় ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া খুড়ীমা বিচারের জন্য ভগবানকে আহ্বান করিলেন। বিন্দু আসন পাতিয়া দিল। খুড়ীমা আসন গ্রহণ করিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছোট বৌমা কোথায় ?"

"ও ঘরে শুয়ে পড়েছে।"

খুড়ীমা সেই ঘরের দিকে একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া বিন্দুর কাছে ঘেঁসিয়া বসিলেন, এবং স্বরটাকে খুব মৃদু করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "গুপী কিছু বলছে ?"

বিন্দু বলিল, "কি আর বলবে মা; কেউ তো ইচ্ছা ক'রে ফেলে দিয়ে আসেনি ?"

খুড়ীমা বলিলেন, "তাও কি কেউ দেয় বাছা; দু'টাকা নয়, দশ টাকা নয়, এক রাশ টাকা। মনে করলে আমাদেরি বুকটা ফেটে যায়।"

বিন্দু নীরবে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। খুড়ীমা মুখ মচ্‌কাইয়া বলিলেন, "আর গুপীই বা বল্‌বে কি? আজ সে মুঠো মুঠো টাকা আনছে বটে, কিন্তু সেটা কার দৌলতে? তারণ কষ্ট ক'রে পড়িয়েছে, তবে তো?"

ঈষৎ বেদনাজড়িত স্বরে বিন্দু বলিল, "কষ্ট ব'লে কষ্ট! কতদিন নিজেরা উপোস দিয়ে ওর কলেজের মাইনে দিতে হ'য়েছে।"

সপ্রতিভভাবে খুড়ীমা বলিলেন, "আমি কি তা জানি না মা, সবই দেখে আসছি। তবে কি জান বৌমা, কালটা হচ্চে কলি; যার যতই ভাল কর, শেষে দেখবে সে তত মন্দ ক'রে বসে আছে।"

বিন্দু বলিল, "সে কথা মিথ্যে নয় খুড়ীমা। তবে ঠাকুরপো তেমন নয়।"

খুড়ীমা একটু শ্লেষের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "কে যে কেমন মা, কার মনের ভিতর কি আছে তা কি বলা যায়। কথাতেই আছে—'নরের মন দেবতার অগোচর।' গুপী বাইরে তো বেশ, কিন্তু ওর মনের কথা তুমি আমি কি জানব বল।"

বলিয়া তিনি বিন্দুর মুখের দিকে অর্থসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। বিন্দুও সন্দিগ্ধভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। খুড়ীমা কিন্তু তাহার সন্দেহ উদ্রিক্ত করিয়া দিয়া নীরবে গম্ভীর ভাবে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার এই গাম্ভীর্য্য বিন্দুর নিকট অসহ্য বোধ হইল। সে একটু অপেক্ষা করিয়া সন্দেহ-জড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন খুড়ীমা, ঠাকুরপো কি—"

বাধা দিয়া খুড়ীমা তাড়াতাড়ি উত্তর করিলেন, "কে জানে বাছা, আমি এত পাঁচ কথায় থাকি না। তবে ঘাটে আজ কথা হচ্ছিল, তারি দু'টো কথা কানে এল। মতি চাটুজ্যের মা বলছিল—"

খুড়ীমা থামিয়া গিয়া সম্মুখের ঘরের দিকে একবার সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। কথাটা শুনিবার জন্য বিন্দু উদ্‌গ্রীব হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলছিল?"

খুড়ীমা তাচ্ছীল্যসূচক মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন, "ঘাটে নাছে কত কথা হয়, কে তা'তে কান দেয় মা, যে যার নিজের জ্বালায় ব্যস্ত। তবে গুপী নাকি মতির ছোট ছেলেটাকে দেখতে গিয়েছিল, সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন মা, গুপী বুঝি বলেছে, কে যে জুয়াচোর তা বলা শক্ত।"

ক্ষোভে ঘৃণায় বিন্দুর কপালের শিরাগুলা স্ফীত হইয়া উঠিল। জ্যেষ্ঠের বিরুদ্ধে গোপীনাথ যে এত বড় কথাটা বলিতে পারে, ইহা সে ধারণাতেই আনিতে পারিল না। সে স্তব্ধভাবে রোষ-গম্ভীর মুখে বসিয়া রহিল। তাহার মনের ভিতর যে একটা বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে ইহা বুঝিয়া লইয়া খুড়ীমা সান্ত্বনার ছলে বলিলেন, "তা বাছা, আমি বলি, ওসব কথায় কাণ দিও না। গুপী যখন সাক্ষাতে কিছু বলবে তখন বোঝা পড়া। ফাঁকে কে কোথায় রাজার মাকে ডাইনী বলে তাতে কাণ দিতে নাই।"

এ সকল কথায় কাণ দিবার জন্য বিন্দুর বিন্দু-মাত্রও আগ্রহ ছিল না, খুড়ীমা নিজেই আসিয়া যে তাহা কর্ণগোচর করাইতেছেন, ইহা বলিবার ইচ্ছা হইলেও বিন্দু খুড়ীমার মুখের উপর তেমন স্পষ্ট কথাটা বলিতে পারিল না। সে নীরবে বসিয়া খুড়ীমার কথাগুলা শুনিতে লাগিল। কিন্তু আর বেশী কথা শু'নতে হইল না; ছোট বৌ ঘরের বাহির হইল। তাহাকে উঠিতে দেখিয়া খুড়ীমা এ প্রসঙ্গ চাপা দিবার জন্য অন্য কথা পাড়িলেন, এবং সেই সঙ্গে নিজের সংসারের কথা আনিয়া ফেলিয়া তাঁহার সংসারের মত জ্বালার সংসার যে আর একটিও নাই, তাঁহার সহিষ্ণুতা-গুণটা নিতান্ত অসীম বলিয়াই তিনি এই সকল জ্বালা যন্ত্রণা নিঃশব্দে সহ্য করিয়া যাইতেছেন, অন্য কোন রমণী হইলে সে এতদিন পরিধেয় বস্ত্রখানি পর্য্যন্ত ফেলিয়া পলাইয়া যাইত, ইহাই আক্ষেপের সহিত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার এই গভীর আক্ষেপোক্তিতে কিছুমাত্র সহানুভূতির আভাস না পাইয়া যখন তিনি ব্যথিত-চিত্তে বিদায় গ্রহণ করিলেন, তখন সরোজ ধীরে ধীরে বিন্দুর সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "গোবরার মা কি এখনো আসেনি দিদি?"

তাহার মুখের উপর একটা তীক্ষ্ণদৃষ্টি স্থাপন করিয়া বিন্দু গম্ভীরস্বরে উত্তর দিল, "কৈ না।"

বলিয়াই সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং যেন নিতান্ত বিরক্তভাবেই মুখখানা ফিরাইয়া লইয়া সেই স্থান ত্যাগ করিল।

ইহাও কি সম্ভব? ঠাকুরপো কি উঁহার বিরুদ্ধে এত বড় কথা বলিতে পারে? যদিও মনের ভিতর এমন একটা সন্দেহের উদ্রেক হয়, সেটা কি যাহার তাহার কাছে প্রকাশ করিতে মুখে একটুও বাধিবে না? ঠাকুরপো কি এতই নির্ব্বোধ! কিন্তু না বলিলে মতির মা কিরূপে ইহা জানিবে, এবং খুড়ীমাই বা কি প্রকারে তাহা শুনিতে পাইবেন? অবশ্য ইহার মূলে নিশ্চয়ই একটু সত্য নিহিত রহিয়াছে, এবং সেই ক্ষুদ্র সত্যটুকু কত ক্ষুদ্র, তাহা জানিবার

জন্য বিন্দুর প্রবল আগ্রহ উপস্থিত হইল। সে আগ্রহ নিবারণের উপায় কি? ঠাকুরপোকে জিজ্ঞাসা করিলে হয়। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলেই কি সে তাহার নিকট সত্য বলিবে? অপরের কাছে বলিলেও তাহার মুখের উপর বলিতে সাহসী হইবে? সুতরাং ইহা জিজ্ঞাসা করিতে যাওয়াই ভ্রম।

তবে ঠাকুরপোর মেজাজটা আজকাল যেরূপ হইয়াছে, কেবল ঠাকুরপো কেন, ছোট বোয়ের প্রকৃতিতেও যে অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে তাহাতে কথাটা একেবারেই অবিশ্বাস্য বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। ঠাকুরপো তো কোনদিনই সংসারের কথায় থাকিত না, কিন্তু ইদানীং প্রায়ই সংসারে খুঁটী-নাটী লইয়া আলোচনা করে; ছোট বৌ দিদির অনুমতি না লইয়া কোলের ভাতে পর্য্যন্ত হাত দিত না, কিন্তু এখন দিদির অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই সে সংসারের অনেক কাজ করে; কেবল গৃহস্থালীর ছোট ছোট কাজ করে না, অনেক বিষয়ে সে নিজের কর্ত্তৃত্ব দেখাইতে চায়। এই যে কয়দিন আগু হইয়া রাঁধিতে যাইতেছে, সেটা কি শুধু দিদির পরিশ্রম লাঘবের জন্য? তাহা হইলে সেদিন হাত পোড়াইবার পর নিষেধ সত্ত্বেও কখনও রাঁধিতে যাইত না। কাল তো কি রাঁধিতে হইবে জিজ্ঞাসা না করিয়া নিজেই রান্নার ব্যবস্থা করিয়া লইল। আবার এই যে গোবরার মাকে ঝি রাখা হইয়াছে, সেজন্য সে কোনও কথাই তো জিজ্ঞাসা করিল না। সুতরাং ক্রমে ছোট বৌ যে সংসারের কর্ত্তৃত্বভার নিজের হাতে লইতেছে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। উপার্জ্জনক্ষম স্বামীর স্ত্রী সে, কেনই বা সংসারের কর্ত্রী হইয়া বসিবে না। তা সে কর্ত্রী হইয়া বসুক না, তাহাতে বিন্দুর লাভ ছাড়া ক্ষতি কি আছে? সরোজ যদি সংসারের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করে, তাহা হইলে সে তো বেশ নিশ্চিন্ত হইয়া বসিতে পারে। কিন্তু—কিন্তু এই যে একটা মানুষ মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া সংসারটাকে চালাইয়া আসিল, তাহাকে একেবারে সংসারের বাহিরে ঠেলিয়া দেওয়া—বিশেষ ক্ষতিবোধ না হইলেও আহত অভিমানের বেদনায় বিন্দুর বুকের ভিতরটা যেন কেমন করিয়া উঠিল, তাহার এতদিনের পরিশ্রমটা যেন এই কয়দিনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া আসিল। চেষ্টাসত্ত্বেও বিন্দু উদ্গত নিশ্বাসটাকে চাপিয়া রাখিতে পারিল না।

—

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

"বড় কর্ত্তা কি খাবে বড় মা?"

ঘরের ভিতর হইতে বিন্দু একটু রুক্ষস্বরে উত্তর দিল, "বড় কর্ত্তা কি খাবে তা বড় কর্ত্তাই জানেন।"

তারণ ঘরেই ছিল; সে বলিল, "বড্ড সর্দ্দিটা হ'য়েছে, রাত্রে ভাত আর খাব না, যা হয় কিছু খাওয়া যাবে।"

গোবরার মা বলিল, "তা কি খাবে বল, ময়দা টয়দা যদি খাও তো এর পর আবার ছোট মাকে তৈরী কত্তে হবে। ঠিক ক'রে বল কি খাবে।"

তারণ স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিল। বিন্দু ঝঙ্কারের সুরে বলিল, "না না, তোর ছোট মাকে বল্, অত কিছু কত্তে হবে না। ভাত না খায়, এক মুঠো মুড়ী খেয়ে প'ড়ে থাকবে।"

তারণ বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে বিন্দুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। গোবরার মা সরোজের কাছে গিয়া তাহাকে বিন্দুর আদেশ শুনাইয়া দিল। সরোজ কিন্তু সে আদেশ কর্ণপাত না করিয়া, ব্যস্তভাবে বলিল, "আমি পয়সা দিচ্চি গোবরার মা, তুই শীগ্‌গীর দোকান থেকে ময়দা এনে দে।"

গোবরার মা আশ্চর্য্য সহকারে বলিয়া উঠিল, "কি কথা বল ছোট-মা, বড গিন্নী বললে—মুড়ী খেয়ে থাকবে। আর খামকা ময়দা এনে হবে কি?"

তাহাকে ধমক দিয়া মৃদুস্বরে সরোজ বলিল, "হবে তোর মাথা! তুই এখন ছুটে যা দেখি।"

মুখ ভার করিয়া গোবরার মা বলিল, "হাঁ, এই আঁধার রাতে ছুটে যেতে রাস্তায় পড়ে মরি! না বাবু, বড় গিন্নীর সবটাই অন্যায়! ময়দা যদি খাবে, তা সকাল সকাল বললেই তো হ'তো; এতক্ষণ কোন্ কালে তৈরী হ'য়ে যেতো। তা নয়, এই রেতে হুকুম হ'লো—"

তাহার উচ্চকণ্ঠে ভীত হইয়া সরোজ বলিল, "চেঁচাস্ কেন গোবরার মা? ওঁরা শুন্‌তে পেলে কি মনে করবেন বল্ দেখি।"

গোবরার মা কিন্তু নিরস্ত হইবার পাত্র নয়; সে সমান অসঙ্কুচিতকণ্ঠে বলিল, "যে যা মনে করে করবে, আমি এত অনৈরন সইতে পারি না বাবু। সাঁজ পহর থেকে কর্ত্তা-গিন্নীতে মুখোমুখী বসে আছে, আর তুমি এই ছিষ্টির কাজ কচ্চো। কেন, তুমি দাসী বাঁদী নাকি?"

সরোজ কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "তা হোক, কাজ করলে তো গতর ক্ষয়ে যাবে না?"

গোবরার মা অন্ধকারেই মাথা নাড়িয়া আক্ষেপের স্বরে বলিল, "তোমার বাছা ঐ এক কেমন—'তা হোক্‌গে, তা যাক্‌'। কাজ করলে গতর ক্ষয়ে যায় না যদি, তবে বড় গিন্নী কাজে এগোয় না কেন বল তো? বড় কত্তা আপিস ক'রে বলেই কি ওনার গ্যাদা? আর ছোট বাবু যে মুঠো মুঠো টাকা আন্‌চে—"

বাধা দিয়া সরোজ বলিল, "চুপ্‌ চুপ্‌।"

বিন্দু তামাক সাজিয়া আগুন লইবার জন্য রান্নাঘরের দিকে আসিতেছিল; গোবরার মার উচ্চ কণ্ঠ শুনিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল। গোবরার মা সরোজের নিষেধে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সদর্পে বলিল, "চুপ করবো কার ভয়ে মা? কেন, গাঁয়ের কে না জানে যে, ছোট বাবু রাশ রাশ টাকা এনে বড় কত্তার পেট ভরাচ্চে। তাই তো আজ কাল ওদের এত গ্যাদা হ'য়েচে।"

বিন্দুর চোখ মুখ দিয়া আগুন ছুটিতে লাগিল। একটা সামান্য দাসী, তাহার মুখে এত বড় কথা! আর সরি তাহারই সঙ্গে এই সব ঘরোয়া কথা লইয়া আলোচনা করিতেছে! বিন্দু আর দাঁড়াইতে পারিল না, তাহার আগুন লওয়াও হইল না; তাড়াতাড়ি ফিরিয়া নিজের ঘরের দিকে চলিল। ঠিক এই সময়ে সরোজও গোববার মার অপ্রিয় আলোচনার পরিসমাপ্তির জন্য পয়সা আনিবার অছিলায় রন্ধনশালার বাহিরে আসিল, এবং আসিতেই সে বিন্দুকে সত্বরপদে চলিয়া যাইতে দেখিয়া লজ্জায় ভয়ে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। সর্ব্বনাশ! দিদি এই সব কথা দাঁড়াইয়া শুনিয়াছেন নাকি? ভাগ্যে সে কোন কথা বলে নাই! না বলিলেও গোবরার মার কথাগুলা—না, ও মাগী ভিক্ষা করিয়া খাক্‌, না খাইয়া মরে মরুক, উহাকে কিছুতেই রাখা চলিবে না।

সরোজ পয়সা আনিয়া গোবরার মাকে দিল। এত প্রতিবাদ সত্ত্বেও দোকানে যাইতে হওয়ায় গোবরার মা আপন মনে নির্ব্বোধ ছোট বৌটাকে তিরস্কার করিতে করিতে চলিল।

দাসী চাকরদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়, এক সংসারে সকলের অধীন হইলেও যে পক্ষটা প্রবল, সেই পক্ষেই তাহারা অধিকতর অনুরক্ত হইয়া পড়ে। এই পক্ষপাতিতার মূলে যে একটা স্বার্থ নিহিত থাকে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই, এবং দাসী চাকর ছাড়া সংসারের অতি অল্পসংখ্যক লোকই এই স্বার্থের প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারে। কিন্তু গোবরার মার মত অশিক্ষিতা সহায়সম্বলশূন্যা হীনজাতীয়া রমণী যে সেই স্বার্থের প্রলোভন ত্যাগ করিয়া পক্ষপাতশূন্য হইতে পারিবে, এমন আশা করা নিতান্ত দুরাশা মাত্র। সুতরাং ছোট বাবুর দিক্‌টা ভারী দেখিয়া গোবরার মা সংসারের গতানুগতিক ন্যায়ে সেইদিকেই ঢলিয়া পড়িয়াছিল।

তা ছাড়া গোবরার মার এই পক্ষপাতিতায় আরও একটু কারণ ছিল। সে জানিত, বড় কত্তা বা বড় গিন্নী তাহার উপর প্রসন্ন নহেন; কেন না, উহাদের অনভিমতেই শুধু ছোট বাবু দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে আশ্রয় দিয়াছেন। সুতরাং সে সর্ব্বতোভাবে ছোট বাবুর প্রীতিসাধনেই নিযুক্ত ছিল, এবং ছোট বধূর মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিলেই যে ছোট বাবুর ষোল আনা প্রীতি সাধিত হইবে, স্বল্পবুদ্ধি হইলেও গোবারর মা ইহা সহজজ্ঞানের দ্বারাই বুঝিয়া লইয়া তদনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিত। এই কারণেই গোবরার মা প্রতি কথায় বড় গিন্নীর অন্যায় প্রদর্শন ও ছোট বোযের অসাধারণ সহিষ্ণুতা কীর্ত্তনপূর্ব্বক আপনার নিরপেক্ষ মত ব্যক্ত করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিত না।

অবশ্য, ইহাতে ছোট বধূ কতটা সন্তুষ্ট বা কতটা বিরক্ত হইত, সেদিকে গোবরার মার আদৌ লক্ষ্য ছিল না। বাস্তবিক দিদির উপর কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করায় সরোজ যে আনন্দ অনুভব করিত তাহা নহে, বরং তাহাতে সে লজ্জায় ভয়ে জড় সড় হইয়া পড়িত; কিন্তু গোবরার মার মুখ কিছুতেই বন্ধ করিতে পারিত না। তাহাকে নিরস্ত হইবার জন্য অনুনয় করিলে সে আরও পঞ্চমে চড়িয়া উঠিত; ধমক দিয়া থামাইতে গেলে কাঁদিয়া কাটিয়া পাড়া মাথায় করিত, এবং যাহা প্রকাশ করার জন্য ধমক খাইত, সেই কথাটাকেই সাভিমান ক্রন্দনের সহিত উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ না করিয়া ছাড়িত না। তাহাতে সরোজ আরও ব্যতিব্যস্ত হইযা পড়িত এবং এই আপদকে একমুহূর্ত্তও বাড়ীতে রাখিতে ইচ্ছা হইত না। কিন্তু ইচ্ছা হইলেও সরোজ কাজে তাহা পারিয়া উঠিত না। স্বামী যাহাকে অনাথা বলিয়া আশ্রয় দিয়াছে, তাহাকে নিরাশ্রয় করিবার সাহস সরোজের ছিল না। সে স্বামীর কাছে দুই একবার গোবরার মার বিরুদ্ধে অনুযোগ করিল; কিন্তু গোপীনাথ তাহা হাসিয়াই উড়াইয়া দিল এবং সেই পাগলা বুড়ীর কথায় যে কাণ দিবে তাহাকে অচিরাৎ পাগলা-গারদে পাঠাইয়া দেওয়া সঙ্গত বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিল। স্বামীর কাছে কিছু না হওয়ায় সরোজ দিদিকে ধরিয়া বসিল, গোবরার মাকে তাড়াইয়া দেওয়া হউক। বিন্দু নিজে গোবরার মাকে রাখে নাই, রাখিবার সময় তাহার মত পর্য্যন্ত লওয়া হয় নাই; সুতরাং সে এ

সম্বন্ধে হাঁ না কিছুই বলিল না। কাজেই সরোজ কিছু বলিতে পারিল না; কিন্তু গোবরার মাকে লইয়া সে বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িল।

যাহা হউক, গোবরার মা ময়দা আনিয়া দিলে সরোজ খাবার প্রস্তুত করিতে লাগিল, আর গোবরার মা দাবার এক পাশে বসিয়া এই রাত্রে ময়দা আনিতে গিয়া কয়বার হোঁচট খাইয়াছে, কয়বার কাঁটাবনের ভিতর পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গিয়াছে তাহারই বর্ণনা করিতে লাগিল।

খাবার প্রস্তুত হইলে গোবরার মা বৈঠকখানা হইতে তারণকে ডাকিয়া আনিতে গেল। কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "ওগো, বাবু এখন গল্প কচ্চেন, দেরী আছে। খাবার আগলে হত্যা দিয়ে বসে থাক।"

অনুচ্চস্বরে সরোজ বলিল, "হত্যা দিয়ে থাকা আর কি, তবে খাবার ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে।

গোবরার মা বলিল, "তা তুমি কি করবে বল, যার যেমন কপাল! তুমি যেমন ছোট মা, পরের তরে আটুপাটু কর, কিন্তু ওরা কি তোমাদের মুখ তাকায়? বলে—চাঁচা আপন বাঁচা। এই যে হাতে হাতে এক রাশ টাকা—"

তাহার বক্তব্য শেষ না হইতেই তারণ বাড়ী ঢুকিয়া ডাকিল, "খাবার দিয়েছ কি ছোট বৌমা?"

মৃদুস্বরে গোবরার মাকে সম্বোধন করিয়া সরোজ বলিল, "বল্ গোবরার মা, দিয়েছি।"

গোবরার মা স্বাভাবিক রুক্ষকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "দিয়েছে গো দিয়েছে। কোন্ কালে খাবার তৈরী ক'রে ভাল মানুষের মেয়ে ঠায় আগলে বসে রয়েছে।"

"তা আমাকে এতক্ষণ ডাকলেই তো হ'তো।"

বলিয়া তারণ রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল। সরোজ খাবার ধরিয়া দিয়া এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। তারণ আসনে বসিয়া খাবারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সহাস্যে বলিল, "এত কাণ্ড কত্তে গেলে কেন ছোট বৌমা? এক মুঠো মুড়ী খেয়ে পড়ে থাকলেই হ'তো।"

তারণ গণ্ডুষ করিয়া রুটী একখানা ছিঁড়িয়া মুখে তুলিতে উদ্যত হইল।

গোবরার মা বলিল, "কেনে হবে না গা, গেরস্ত ঘরে ভাত না খেলে কে লুচী মণ্ডা ক'রে খায়। তা কেমন মেয়ে—শুনবে কি? দেখ না, সকাল থেকে নাকে দড়ি দিয়ে খাটচে, তবু কি—"

গোবরার মা কথা শেষ করিবার অবকাশ পাইল না। বিন্দু ঠিক একটা দমকা ঝড়ের মত আসিয়া তারণের সম্মুখে দাঁড়াইল, এবং তাহার সম্মুখ হইতে খাবারের থালাটা তুলিয়া লইয়া সজোরে উঠানের দিকে ছুড়িয়া দিল। থালাটার ঝন্ ঝন্ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গোবরার মা ভয়ে আঁৎকাইয়া একটা বিকৃত শব্দ করিয়া উঠিল। শান্ত প্রকৃতির মধ্যে হঠাৎ একটা ঘূর্ণাবর্ত্ত আসিয়া যেমন সর্ব্বত্র বিস্ময়-বিজড়িত ভীতি বিহ্বলতা জাগাইয়া দেয়, বিন্দুর আগমনে রন্ধনশালার মধ্যেও ঠিক তেমনই একটা বিক্ষোভ উপস্থিত হইল। তারণ ভীতিচঞ্চল দৃষ্টিতে নীরবে বিন্দুর কঠিন মুখের দিকে চাহিল। বিন্দু তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইয়া সশব্দ পদক্ষেপে রন্ধনশালার বাহির হইল; তারণ উঠিয়া ধীরে ধীরে তাহার অনুসরণ করিল। সরোজ ভয়ে কাঠের মত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল

ঠিক সেই সময়ে গোপীনাথ জুতার মস্ মস্ শব্দ করিতে করিতে বাড়ী ঢুকিল। গোবরার মা এতক্ষণ ভয়ে কাঠ হইয়া বসিয়াছিল, ছোট বাবুকে দেখিয়া তাহার ধড়ে যেন প্রাণ আসিল, ভীতি-শুষ্ক কণ্ঠে পুনরায় রস সঞ্চার হইল। সে গলাটা শানাইয়া লইয়া বলিয়া উঠিল, "বাবা, ধন্যি মেয়ে যা হোক, খাবার-গুলো উঠোনে ছুঁড়ে ফেল্‌লে গা? থালাখানা কুঁচি কুঁচি হ'য়ে গেল।"

গোপীনাথ থমকিয়া দাঁড়াইল; জিজ্ঞাসা করিল, "কে কি ফেললে গোবরার মা?"

গোবরার মা তখন জোর গলায় বড় বোয়ের কীর্ত্তিকাহিনী ছোটবাবুকে জ্ঞাপন করিয়া বড় বাবুর আহারে ব্যাঘাত জন্য যতটা আক্ষেপ প্রকাশ করিল, থালাখানা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তদপেক্ষা অধিক দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। শুনিয়া গোপীনাথ কিছুকাল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তার পর গম্ভীর পদক্ষেপে নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

ঘরে গিয়া তারণ বিন্দুর মুখের উপর সস্মিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া স্থির প্রশান্ত কণ্ঠে ডাকিল, "বড় বৌ!"

বিন্দু স্থির অনিমেষ নেত্রে স্বামীর দৃষ্টিতে দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল; থাকিতে থাকিতে তাহার রোষ-কঠিন মুখমণ্ডলে স্বাভাবিক কোমলতা ফিরিয়া আসিল, আরক্ত চোখ দুইটা জলে ভরিয়া উঠিল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হঠাৎ সে স্বামীর পায়ের উপর আছাড় খাইয়া পড়িল, এবং দুই পায়ের মাঝখানে মুখটা গুঁজিয়া দিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "ওগো, তোমার খাওয়া নষ্ট করেছি, এখন আমাকে যে শাস্তি দিতে হয় দাও; আমি কিন্তু প্রাণ থাকৃতে তোমাকে এমন হেনস্তার খাবার খেতে দেব না।"

তারণের উচ্চ হাস্যধ্বনিতে কক্ষ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

এমন সময় গোপীনাথ ডাকিয়া বলিল, "এ সব কি কাণ্ড দাদা ?"

হাসিতে হাসিতেই তারণ বলিল, "ভয়ানক কাণ্ড রে গুপী, ভয়ানক কাণ্ড ; আমি তো হতভম্ব হ'য়ে পড়েছি। এখানে আবার এক পাগলের কাণ্ড দেখে যা, বলে—ওদের হেনস্তার খাবার কক্ষনো খেতে দেব না।"

বলিয়া তারণ পুনরায় উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। গোপীনাথ গম্ভীরভাবে "বেশ" বলিয়া চলিয়া আসিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

পরদিন সকালে স্নান করিয়া আসিয়া তারণ যখন সরোজকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ভাত হয়েছে গা ছোট বৌমা ?" সরোজ তখন আস্তে ব্যস্তে ভাত বাড়িয়া ধরিয়া দিল। তারণ আসিয়া আহারে বসিল, মাছের ঝোলটা সাঁতলাইয়া দিবার জন্য সরোজ তাড়াতাড়ি করিতে লাগিল। তাড়াতাড়িতে কড়ার গরম তেল ছিটাইয়া হাতে লাগিল, ঢালিতে গিয়া কতকটা গরম ঝোল পায়ে পড়িল। সরোজ তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিলেও তারণ ইহা লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আহা, অত তাড়াতাড়ি কচ্চ কেন ছোট বৌমা ? হাত পা যে পুড়ে গেল।"

সরোজ মাথার কাপড়টা আরও একটু বেশী টানিয়া দিয়া ঝোলের বাটিটা তারণের সম্মুখে ধরিয়া দিল।

তারণ আহার শেষ করিয়া উঠিয়া গেলে গোবরার মা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি গো, বড় কত্তার খাওয়া হ'লো, না হ'লো না ?"

সরোজ অনুচ্চ কণ্ঠে ত্রস্তভাবে বলিল, "হাঁ হ'য়েছে। আমার এমনি ভয় হ'য়েছিল গোবরার মা।"

গোবরার মা বলিল, "তুমি এমনতর মেয়েই বট ছোট মা। কেন, ভয়টা কিসের বল তো ?"

সরোজ বলিল, "ভয় নয় ? কাল মুখের খাবার মুখে তুলতে পেলেন না, সারাটা রাত উপোসী পড়ে রইলেন।"

শ্লেষপূর্ণ স্বরে গোবরার মা বলিল, "কাল উপোস ছেল ব'লে আজও উপোস থাকবে নাকি ? হুঁঃ, তুমি যেমন পাগল ছোট মা, খাবে না তো যাবে কোথা ? কালও তো খাচ্ছিল; শুধু বড় গিন্নীর ফরজরানিতেই খাওয়া হ'লো না। তুমি যাই বল বাছা, বড় গিন্নীর মন ভাল নয়।"

বাহিরের দিকে সভয় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সরোজ বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা. ভাল হোক,মন্দ হোক, তুই চুপ কর্। ছিঃ, বল্‌তে আছে এমন সব কথা !"

ঠিক এই সময়ে বিন্দু আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল এবং একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল, "তোমার নিজ মুখে বল্‌তে নাই ছোট বৌ, কিন্তু তোমার চাকরাণীর মুখ দিয়ে বলাতে আছে !"

সরোজ লজ্জায় আড়ষ্ট হইয়া পড়িল। বড় গিন্নীর বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিলেও তাহার সম্মুখে কোন কথা বলিতে গোবরার মার সাহস হইল না ; সে কাজের অছিলা করিয়া সেখান হইতে সরিয়া গেল।

বিন্দু তখন সরোজের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রোষগম্ভীরকণ্ঠে বলিল, "দেখ ছোট বৌ, বল্‌তে কিছু হয় নিজে বল্‌বে, কিন্তু ঐ ছোটলোক মাগীকে দিয়ে পাঁচ কথা শুনিয়ে দেওয়া—সেটা ভাল হয় কি ?

সরোজের গলা শুকাইয়া তখন কাঠ হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং দিদির কথার কোন উত্তর সে দিতে পারিল না,শুধু নতমুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। বিন্দু বলিল,"আর এত কথা বলবারই তোমার কি অধিকার আছে, ছোট বৌ ? যাকে ঠেস্ দিয়ে বল্‌বে, সে এখনো নিজের রোজগারের পয়সা নিজে খাচ্চে। ঠাকুরপোর পয়সা সে এখনো খায়নি তা জান ?"

লজ্জা-কাতর কণ্ঠে সরোজ বলিল, "আমি তো সে কথা বলি নাই দিদি ?"

ক্রুদ্ধভাবে বিন্দু বলিল,"তুমি বলনি, কিন্তু তোমার চাকরাণী বলছে।"

"আমি ওকে বলতে বারণ করি।"

তুমি বারণ করলে ওর এমন সাধ্য নাই যে একটা কথা বলে।"

কথাটা খুবই সত্য এবং স্বাভাবিক। কর্ত্রীর শাসন থাকিলে দাসদাসীরা যে উচু কথা বলিতে সাহস করে না, ইহা সরোজও জানিত ; কিন্তু তাহার শাসন অতিক্রম করিয়া গোবরার মা যে এমন সব কথা বলিয়াছে উহা না বুঝিয়াই বিন্দু যখন তাহার উপর এত বড় একটা অন্যায় অভিযোগের আরোপ করিল, তখন এই মিথ্যা অভিযোগে সরোজ যেন অতিমাত্র ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িল, তাহার লজ্জানত দৃষ্টিটা যেন জ্বলিয়া উঠিল। সে মাথা তুলিয়া ক্ষোভরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "তা হ'লে কি মনে কর দিদি, গোবরার মাকে আমিই বল্‌তে শিখিয়ে দিয়েছি ?"

তাহার এই সতেজ উক্তিতে বিন্দু একটু বেশী রাগিয়া বলিল, "ঠিক শিখিয়ে না দিলেও তুমি যে আস্কারা দাও এটা ঠিক।"

ক্রোধে ক্ষোভে সরোজের কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল। তাহার সম্বন্ধে এত বড় মিথ্যা ধারণা দিদি পোষণ করিতে পারে? সে কি মানুষ নয়? তাহার ভিতরে কি মেয়ে মানুষের সলজ্জ কোমলতা বিদ্যমান নাই? ভাসুর—যিনি পিতৃতুল্য পূজনীয়; বড় জা—যাহাকে জ্যেষ্ঠা সহোদরা বলিয়াই মনে করে, তাহাদিগকে সে এত বড় কথা বলিতে পারে কি? সে কি গোবরার মায়ের মতই ছোটলোক! ঘৃণায় লজ্জায় সরোজের ওষ্ঠ কাঁপিয়া উঠিল; কিন্তু রুদ্ধ কণ্ঠ হইতে কথা বাহির হইল না।

বিন্দু কিছুক্ষণ গম্ভীর ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোর মতলবটা কি ছোটবৌ? আলাদা হ'বি?"

সরোজের অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠ হইতে বাহির হইল, "হাঁ।"

সে উত্তরে বিন্দু শিহরিয়া উঠিল। সে সরোজের মুখের উপর কঠোরদৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিল, "তাই বুঝি পাকে প্রকারে এত কথা শোনান হচ্চে?"

দৃঢ়স্বরে সরোজ উত্তর দিল "হাঁ।"

বিন্দুর রোষদীপ্ত মুখখানা মুহূর্ত্তে অন্ধকার হইয়া আসিল। সরোজ যে তাহার মুখের উপর এত বড় কঠিন সত্যটা নির্ভীকভাবে স্বীকার করিয়া লইবে, ইহা সে কখনও সম্ভাবনা করে নাই সুতরাং সরোজের দৃঢ় উত্তরে বিন্দু যেন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল এবং ইহার পর কি বলিয়া ছোট বোয়ের এই সদম্ভ উক্তিটাকে নিতান্ত ব্যর্থ প্রতিপন্ন করিয়া দিবে তাহা সহসা ভাবিয়া পাইল না। সরোজও তাহার দ্বিতীয় প্রশ্ন শুনিবার জন্য অপেক্ষা না করিয়াই প্রস্থানোদ্যত হইল। বিন্দু তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "শোন্।"

সরোজ ফিরিয়া দাঁড়াইল। বিন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুরপোরও কি তাই মত?"

কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়াই বিন্দু যেন অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। কেন না, ঠাকুরপোর মত না পাইলে ছোট বৌ নিজের ইচ্ছায় কি এমন একটা ভয়ানক মত প্রকাশ করিতে পারে? সুতরাং সে কথাটা জিজ্ঞাসা করাই বৃথা। তা ছাড়া যদিই ইহাতে ঠাকুরপোর অমত থাকে, তাহা হইলেও সেই মতামতটুকুর উপর নির্ভর করিতে গেলে কি ঠাকুরপোর মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ পায় না? কেন, তাহার স্বামী কি অক্ষম? সুখে-স্বচ্ছন্দে না হউক, দুঃখে কষ্টেও কি সে এতকাল সংসার চালাইয়া আসিতেছে না? তবে সে আজ কেন ঠাকুরপোর মুখাপেক্ষী হইয়া ছোট বোয়ের নিকট হীনতা স্বীকার করিবে? কথাটা বলিয়া ফেলিয়া বিন্দু অপ্রতিভভাবে সরোজের মুখের দিকে চাহিল। সরোজ তাহার প্রশ্নের উত্তরে বলিল, "কার কি মত তা আমি জানি না।"

নিজের ভ্রমটাকে সংশোধন করিয়া লইবার জন্য বিন্দু তাড়াতাড়ি বলিল, "বেশ, তা হ'লে কবে থেকে আলাদা হ'বি?"

"যেদিন তোমার খুসী।"

বলিয়াই সরোজ দ্রুতপদে সেস্থান ত্যাগ করিল। বিন্দু জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া আস্তে আস্তে নিজের ঘরে চলিয়া আসিল এবং ছোট বৌ প্রকাশ না করিলেও তাহার ইচ্ছার মধ্যে ঠাকুরপোর ইচ্ছাও নিহিত রহিয়াছে কি না বসিয়া বসিয়া তাহাই ভাবিতে লাগিল। সেই সঙ্গে সে স্বামীকে আলাদা হইবার কথা কিরূপে বলিবে এবং সে কথা শুনিলে তাঁহার মর্ম্মে কতটা আঘাত লাগিবে, তাহাও না ভাবিয়া থাকিতে পারিল না।

কিন্তু ঠিক সেই সময়েই সরোজ যে নিজের ঘরে উপুড় হইয়া পড়িয়া ছেলেমানুষের মত ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছিল, বিন্দু তাহা কল্পনাতেও আনিতে পারিল না। শুধু সরোজের উপর সঞ্চিত রোষ অন্তরে চাপিয়া সে কোনরূপে দিনটা কাটাইয়া দিল।

সন্ধ্যার সময় তারণ আসিয়া ডাকিল, "বড় বৌ!"

বিন্দু ধীরে ধীরে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহার বিষাদগম্ভীর মুখের দিকে লক্ষ্য না করিয়াই তারণ উল্লাস-সমুচ্চকণ্ঠে বলিল, "ব্যস্, এবার খতম্, তোমরা হরির লুট দাও বড় বৌ।"

তাহার এই সোল্লাস উক্তিতেও বড় বৌ কিছুমাত্র উল্লাস প্রকাশ করিল না দেখিয়া তারণ আরও উচ্চকণ্ঠে বলিল, "বুঝ্‌তে পাচ্চো না? চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে এলাম। এক মাসের নোটিশ দিয়ে 'রিজাইন লেটার' দিয়েছি। দেব না? বেটা নেমকহারাম লক্ষ্মীছাড়া আফিস, আজ যোল বছরের ভিতর যোল দিন লেট্ হ'য়েছে কি না সন্দেহ, আজমাত্র তিন মিনিট লেট্ হয়েছে ব'লে শা—সাহেব হাজিরিতে সই কত্তে দিলে না। ধ্যেৎ তোর হাজিরি! ধ্যেৎ তোর সাহেব! আজ একেবারে খতম ক'রে তবে এসেছি।"

শুষ্কমুখে বিন্দু বলিয়া উঠিল, "একেবারে জবাব দিয়ে এসেছ?"

তারণ হাসিয়া বলিল, "একেবারে নয় তো কি দু'বারে? তারণ ভট্টচাজ্যির যে কথা সেই কাজ। চাকরী কচ্চি তো কচ্চি, ছাড়বো তো আজি ছাড়বো।"

বলিতে বলিতে জামাটা খুলিয়া ফেলিয়া তারণ ধপ্ করিয়া দাবার উপর বসিয়া পড়িল, এবং গভীর আরামসূচক একটা "আঃ" শব্দ করিয়া বলিল, "যাক্, এতদিনের পর আমার কর্ম্মভোগের অবসান। আঃ বাঁচা গেল! কি বল বড় বৌ?"

বড় বোয়ের মুখে খুব একটা আনন্দের হাসি দেখিবার আশায় তারণ তাহার মুখের দিকে উৎফুল্ল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। কিন্তু যাহা দেখিতে চাহিল, তাহা দেখিতে না পাইয়া নিতান্ত হতাশচিত্তে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি বড় বৌ? হ'য়েছে কি?"

আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বিন্দু একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল, "না হয়নি কিচ্ছু। তা বলি এতকালের চাকরীটায় জবাব দিযে এলে?

তারণ হা হা শব্দে হাসিয়া বলিল, "চাকরীর আবার এতকাল ততকাল আছে নাকি? কথাতেই আছে—চাকরী তালপাতার ছায়া—এই আছে এই নাই! কিন্তু গোলামীর একশেষ। ঝড় বজ্রাঘাত কিছুই নাই, শরীরের সুখ অসুখ নাই ঠিক সময়ে হাজিরি দিতেই হবে! এমন যে মেল ট্রেণ—তারও দু'দশ মিনিট এদিক্ ওদিক্ হয়, কিন্তু চাকুরে বাবুর একটি মিনিট এদিক্ ওদিক্ হবার যো নাই। রামঃ রামঃ! এমন গোলামীর কাজও ভদ্রলোকে করে?"

বলিয়া তারণ উঠিয়া পড়িল, এবং গাড়ু লইয়া হাত পা ধুইতে গেল। তার পর জলযোগান্তে তামাক টানিতে টানিতে সে কিরূপে বড় বাবুর মুখের উপর চোটপাট জবাব দিয়াছে, 'রিজাইন লেটার' দাখিল করিলে বড় বাবুর সহিত অন্যান্য কেরাণীদের মুখে কিরূপ বিস্ময়চিহ্ন প্রকটিত হইয়াছিল, উৎফুল্লচিত্তে তাহাই বর্ণনা করিতে লাগিল। শুনিতে শুনিতে বিন্দু মনে দৃঢ়তা আনিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, "কালই পৃথক্ হ'তে হবে।"

যেন খুব একটা অসম্ভব কথা শুনিয়া তারণের চোখ দুইটা বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়া আসিল। বিন্দুও মাথা তুলিয়া তাহার দিকে চাহিতে পারিল না। তারণ জোরে হুঁকায় একটা টান দিয়া বলিল, "গুপী কিছু বলেছে নাকি বড় বৌ?"

নতমুখেই বিন্দু উত্তর করিল, "না।"

"তবে ছোট বৌমা বলেছে বুঝি?"

মাথা নাড়িয়া ঝঙ্কারের স্বরে বিন্দু বলিল, "অত শত আমি জানি না; এখন আলাদা হবে কি না তাই বল।"

তারণ নীরবে বসিয়া তামাক টানিতে লাগিল। বিন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "ভাবচো কি?"

"ভাবচি, গুপীর সঙ্গে আলাদা হ'তে পারবো?"

"কেন পারবে না? আজকাল সে মুঠো মুঠো টাকা আনে ব'লে বুঝি?"

তারণ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে আকস্মিক হাস্যধ্বনিতে শুধু বিন্দু চমকিয়া উঠিল না; গলায় তামাকের ধোঁয়া লাগিয়া তরণ কাশিতে লাগিল। খুব খানিক কাশিয়া হাস্যবেগ কতকটা সংবরণ করিয়া তারণ বলিল, "সত্যি বড়বৌ, টাকার মায়া ত্যাগ করা বড়ই শক্ত; কিন্তু তার চাইতে বেশী শক্ত তারণ ভট্টচাজ্যির বুকের পাটা। আবার সব চাইতে আমার কাছে শক্ত তোমার কথা। কাল হবে না, পরশু রবিবারে আলাদা না হ'য়ে যদি আমি জলগ্রহণ করি, তবে আমার নাম তারণ ভট্টচাজ্যিই নয়।

স্বামীর হাস্যপ্রদীপ্ত অথচ দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় স্থির মুখের দিকে চাহিয়াই বিন্দু মস্তক নত করিল। তারণ কলিকার আগুনে গোটা দুই ফুঁ দিয়া জোরে জোরে হুঁকায় টান দিতে লাগিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

"চোদ্দো পাশা চোদ্দো—তোমার ঘুঁটী সামলাও দত্তজা।"

দত্তজা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আমার কাঁচা ঘুঁটী, সামলাবার দরকার নাই। কিন্তু তোমার পাকা ঘুঁটী যে কেঁচে গেল ভট্চাজ?"

"ড্যাম পাকা ঘুঁটী!" বলিয়া তারণ পাশার ছক্ ফেলিল, এবং মহা উল্লাসে স্বীয় উরুদেশে প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিয়া বলিয়া উঠিল, "চোদ্দো—বাহবা পাশা! চোদ্দো!"

ঘুঁটীটা মারা যাওয়ায় ঈষৎ ক্ষুণ্ণভাবে দত্তজা ছক্ হাতে লইয়া নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "এবার পোয়া বারোর দান। তোমার ঘুঁটী সামলাও ভট্চাজ।"

তারণ হাসিয়া বলিল, "কচে বারোর দানে আমার ঘুঁটী অনেকদিন গিয়েছে দত্তজা।"

কিনু তলাপাত্র পাশে বসিয়া খেলা দেখিতেছিলেন। তিনি তারণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ভায়া কি সত্যিই আলাদা হ'লো নাকি হে তারণ?"

ঘুঁটীর দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তারণ উত্তর করিল, "ভায়া হ'ক না হ'ক, আমি তো হ'য়েছি।"

কিনু বলিলেন, "গুপীর কিন্তু এটা ধর্ম্ম হ'লো না, কি বল দত্তজা ? বড় ভাই খাওয়ালে পরালে, মানুষ করলে,—"

বাধা দিয়া তারণ বলিয়া উঠিল, "মা মাই-দুধ খাইয়ে কোলে পিঠে ক'রে ছেলেকে মানুষ করে, কিন্তু ছেলে কি চিরকাল মায়ের কোলটি জুড়েই ব'সে থাকে দাদা ?"

"কোল জুড়ে না থাকলেও কোন সুপুত্রই মাকে তাড়িয়ে দেয় না।"

উষ্ণস্বরে তারণ বলিল, "গুপীই আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে এ কথা কে বল্‌লে ?"

দত্তজা বলিলেন, "পাঁচজনে ব'লছে।"

তারণ রাগে আসনের উপর চপেটাঘাত করিয়া বলিল, "পাঁচজনে মিছে কথা বলছে। তারা জানে না যে, আমি নিজে গুপীকে আলাদা ক'রে দিয়েছি।"

কিনু একটু অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "সত্যি নাকি ?"

দৃঢ়স্বরে তারণ উত্তর করিল, "হাঁ।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কিনু মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন "তাহ'লে এটা তোমার নেহাৎ পাগলামী বলতে হবে তারণ, এমন উপার্জ্জনক্ষম ভাই !"

তারণ এ কথার কোন উত্তর করিল না, একটু হাসিল মাত্র। কিনু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার এদিকে চাকরীতেও নাকি ইস্তফা দিয়েছ ?"

জোরে মাথা নাড়িয়া তারণ বলিল, "দিয়েছিই তো। চিরকাল কি সাহেবের লাথি খাব ? আর এই মাসের ছিটু ক'টা দিন কিনুদা, তারপর তারণ ভট্‌চাজ্যি স্বাধীন—স্বাধীন !"

বলিয়া তারণ উচ্চ হাসি হাসিয়া উঠিল। দত্তজা পাশার ঘুঁটী চালিতে চালিতে বলিলেন, "তুমি যতই বল ভট্‌চাজ, লোকে কিন্তু গুপীর দোষ ছাড়া আর কারো দোষ দেখ্‌বে না।"

বিস্ময়সহকারে তারণ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, তার কি দোষ ?"

দত্তজা বলিলেন, "সম্পূর্ণ দোষ। সে এখন পয়সা চিনেছে, দোতালা পাকা বাড়ী হ'য়েছে, তাই সে তোমাকে আলাদা ক'রে দিলে।"

তারণ ভ্রূকুটী করিল। সে বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে, বাস্তবিক গুপীর কিছুমাত্র দোষ নাই, তাহার অমতেও তারণ নিজেই তাহাকে পৃথক্ করিয়া দিয়াছে এবং সে এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু আনিয়া দিয়াছিল, কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করিয়া সে স্বেচ্ছায় সমস্তই গোপীকে প্রত্যর্পণ করিয়াছে। ছোট ভাইকে মানুষ করিলেও তারণ ভট্‌চাজ্যি তাহার একটি পাই পয়সার প্রত্যাশা রাখে না।

তাহার এই আত্মগরিমাপূর্ণ উক্তিতে কেহ বিশ্বাস করিল কি না লক্ষ্য না করিয়াই তারণ সকলকে আপনার অভিপ্রায় বুঝাইয়া দিয়াছে বুঝিয়া সন্তুষ্ট হইল এবং সেদিন তাহার পাকা ঘুঁটীগুলা ক্রমশঃ কাঁচিয়া যাইতে থাকিলেও তজ্জন্য সে কিছুমাত্র ক্ষোভ বা ক্রোধ প্রকাশ করিল না।

কোথা হইতে যে কি হইল, দোষের ভাগটা কাহার কম কাহার বেশী, তাহা কেহ জানিল না, লোকে শুধু দেখিল, তারণ ভট্‌চাজ্যি ছোট ভাইকে পৃথক্ করিয়া দিল। বিভাগের সময় অবশ্য যজ্ঞেশ্বর দত্ত, অম্বিকা ঘোষাল প্রভৃতি পাঁচজন মধ্যস্থ—কেহ আহূত, কেহ বা অনাহূত ভাবেই উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের বিবেচনা অনুসারে বাড়ী ঘর, জমি জমা, তৈজসপত্র সব ভাগ হইয়া গেল। নূতন বাড়ীর কথা উঠিলে তারণ বলিল, "ও জমি বাড়ী সব গুপীর টাকাতেই হ'য়েছে, আমি ওর ভাগ চাই না !"

যজ্ঞেশ্বর দত্ত বলিলেন "গুপীর টাকা হ'লেও একান্নে থেকে যখন হ'য়েছে, তখন ও বাড়ী ত্র'জনারি।"

তারণ কিন্তু নূতন বাড়ীর ভাগ লইতে কিছুতেই রাজি হইল না ; সে স্পষ্ট জবাব দিল, "গুপীর পয়সায় তৈরী বাড়ীর ভাগ আমি কক্ষনো নেব না।"

তাহার এই ত্যাগ স্বীকার প্রশংসনীয় হইলেও গোপীনাথ ইহাতে আপনাকে অবমানিত জ্ঞান করিল, এবং তজ্জন্য একটু রাগিযাও উঠিল। এতক্ষণ ভাগ বিভাগ সম্বন্ধে সে একটি কথাও বলে নাই, এক্ষণে অগ্রসর হইয়া বলিল, "তা হ'লে এই ক'বৎসরে যে টাকাটা উপার্জ্জন করেছি, দাদা তারও ভাগ কি ছেড়ে দেবেন ?"

দত্তজা বলিতে যাইতেছিলেন যে, "সে টাকা উভয়ের সংসারেই খরচ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং যদি নগদ কিছু থাকে, তাহা ছাড়া বাকি টাকার কথা উঠিতেই পারে না।" কিন্তু তাহাকে কথা শেষ করিবার অবসর না দিয়াই তারণ বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল, এবং অবিলম্বে দুই খানা খাতা আনিয়া মধ্যস্থগণের সম্মুখে ফেলিয়া দিল। তাহার একখানা খাতায় গোপীনাথের উপার্জ্জিত টাকার জমাখরচ ছিল। সে যেদিন যত টাকা তারণের হাতে দিয়াছিল, একদিকে তাহার জমা—অন্য দিকে তাহার ডাক্তারখানা ও নূতন বাড়ীর জমি খরিদ ও বাড়ী তৈয়ারীর খরচ লেখা ছিল।. দত্তজা

জমায় খরচে মিলাইয়া দেখিলেন, এই সমস্ত খরচ বাদে হাজার দুই টাকা থাকে। তারণ তখন দ্বিতীয় খাতাখানা খুলিয়া দেখাইয়া দিল যে,—ব্যাঙ্কে গোপীনাথ ভট্টাচার্য্যের নামে দুই হাজার তিন শত পঁয়ত্রিশ টাকা সাত আনা ছয় পাই জমা রহিয়াছে। তারণ ব্যাঙ্কের খাতাখানা গোপীনাথের সম্মুখে ছুড়িয়া দিল। গোপীনাথ লজ্জায় অধোবদন হইল। উপস্থিত জনগণের মধ্যে কেহ বা প্রশংসাসূচক, কেহ বা তিরস্কারসূচক দৃষ্টিতে তারণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। হাঁ। তারণ ভট্‌চাজ্যি একজন মানুষের মত মানুষ বটে, কিন্তু সে হয় নিতান্ত নির্ব্বোধ, নয় বদ্ধ পাগল।

আর গুপী ডাক্তার—ছি ছি, ডাক্তার হইলেই কি চোখে মানুষের চামড়া থাকে না?

অম্বিকা ঘোষাল কিন্তু গোপীনাথের লজ্জাসঙ্কুচিত ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া অন্তরে বেদনা অনুভব করিলেন; সুতরাং তিনি গোপীনাথের পক্ষে দুই একটা কথা না কহিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি তারণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "গুপী বাবু (বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও অনেকে ডাক্তারের মর্য্যাদা স্বরূপে গোপীনাথকে বাবু বিশেষণে বিশেষিত করিতেন) অবশ্য এমন মনে করেননি যে, তাঁর রোজগারের টাকার ভাগ তোমাকে দিবেন না। তা তুমি স্বেচ্ছায় যখন ভাগ ছেড়ে দিলে, তখন উনি আর কি করবেন। তা তুমি যা করেছ ভালই করেছ, মন্দ কেউ বলতে পারবে না। তবে তুমি যখন এ টাকার পাই পয়সা নেবে না স্বীকার কচ্চো, তখন কাজেই বলতে হয়, এই সেদিন যে পাঁচ সাত শো টাকা না হক্ নষ্ট ক'রে এলে,—"

তাঁহার কথা শেষ না হইতেই তারণ বলিয়া উঠিল, "ঠিক বলেছেন ঘোষাল মশায়, ওটা আমার খেয়ালেই ছিল না।"

তখন যে টাকা জুয়াচোরে কাড়িয়া লইয়াছে তাহা বুঝাইয়া দিতে তারণ বাধ্য কি না, এ সম্বন্ধে মতভেদ হওয়ায় মধ্যস্থগণের মধ্যে তর্ক বিতর্ক আরম্ভ হইল। তারণ কিন্তু তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল, এবং মধ্যস্থগণের তর্কের অবসান না হইতেই তারণ সোণারূপার কয়েকখান গহনা আনিয়া গোপীনাথের সম্মুখে স্থাপন করিল। গহনাগুলা যে বড় বোয়ের, তাহা বুঝিতে গোপীনাথের বিলম্ব হইল না; তাহার মুখখানা ভ্রূকুটীভঙ্গে ভীষণ হইয়া উঠিল।

ঘোষাল মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া তারণ সহাস্যে বলিল, "আর আমার কিছু নাই ঘোষাল মশায়। তা এগুলো বেচলেও শ' চারেক টাকা হবে। যদিই কিছু কম হয়, গুপী মনে করবে দাদাকে পেন্নামী দিয়েছি।"

বলিয়া সে গোপীনাথের দিকে চাহিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। গোপীনাথ দাদার দিকে চাহিল না; সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া তাহার দাদার মুখের প্রতি চাহিল—বিনা বাক্যব্যয়ে গহনাগুলি লইয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। সকলেই বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার গমন-পথের দিকে চাহিয়া রহিল। কেহ কেহ মনে করিয়াছিল, গোপীনাথ কখনই গহনাগুলা লইতে পারিবে না, তারণকে ফিরাইয়া দিবে। কিন্তু সে যখন বিনা বাক্যব্যয়ে সমস্ত গহনা লইয়া চলিয়া গেল, ফিরাইয়া দিবার নাম মাত্র করিল না, তখন তাহারা মনে মনে গোপীনাথকে গালি না দিয়া থাকিতে পারিল না।

বিভাগান্তে প্রত্যাগমন কালে সিদ্ধেশ্বর ঘোষ বলিল, "তারণ ভট্‌চাজ্যি লোকটা কি নির্ব্বোধ ঘোষাল মশায়?"

ঘোষাল মহাশয় মৃদু হাসিয়া মস্তক সঞ্চালনপূর্ব্বক উত্তর করিলেন, "ওহে, নির্ব্বোধ তারণ নয়, নির্ব্বোধ আমরা। বুঝতে পাচ্চো না, লোকটা চাপা। ও কি চারটি হাজারের কম হাতে রেখেছে মনে কর?"

"কিন্তু খাতা?"

"সে তো ওর নিজের হাতের জমা-খরচ। পঞ্চাশকে পাঁচ করলে ধরে কে?"

"তা বটে, টাকা হাতে থাকলে স্ত্রীর গহনাগুলো এনে দেবে কেন?"

"দিয়ে খুব বুদ্ধিমানের কাজ করেছে। নইলে সকলেই মনে কত্তো, নগদ টাকা পেলে কোথায়?"

সুতরাং সিদ্ধান্ত হইল, সমস্ত বুঝাইয়া দিলেও তারণ ভাইকে ফাঁকি দিয়া অন্ততঃ তিন চার হাজার টাকা হস্তগত করিয়াছে।

তবে সকলেই যে এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করিল তাহা নহে; ঘোষাল মহাশয়ের মত বুদ্ধিমান্ ও সুক্ষ্মদর্শী লোক সংসারে বেশী নাই, সুতরাং গ্রামের অধিকাংশ লোকই তারণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল।

তারণের নিজের কিন্তু ইহাতে একটুও দুঃখ বা ক্ষোভ ছিল না, বরং গুপীকে সমস্ত বুঝাইয়া দেওয়ায় যেন একটা গুরুতর দায় হইতে সে মুক্তিলাভ করিয়া প্রভূত আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

"সই, ওলো সই! ও গঙ্গাজল!"

"কেন ভাই গঙ্গাজল?"

"বলি, আমার মাথাটা খাবে কবে?"

"তোমার মাথা খেতে কি আর বাকী আছে? একজন তো খেয়ে নিয়েছে।"

"সে কি গোটা মাথাটা খেয়েছে? কপালের দিকে খানিকটা খেয়ে গিয়েছে। বাকীটুকু আছে তোমার জন্যে।"

বলিয়া যামিনী একটু ম্লান হাসি হাসিল। সরোজও মৃদু হাসিয়া উত্তর করিল, "আসল জিনিসটাই সে খেয়ে নিয়েছে। বাকী যেটুকু আছে ওটুকু অসার, ওতে আর রস কস্ নাই।"

যামিনী বলিল, "হ'তে পারে; তাই যমেও ওটুকুকে খেয়েও খায় না।"

তাহার মাথায় হাত দিয়া সরোজ হাস্যতরল কণ্ঠে বলিল, "বালাই! আমার গঙ্গাজলের মাথা যমে খাবে কোন্ সাহসে! পড়েছিস্ তো—

"শতেক যোজনে থাকে যদি গঙ্গা ব'লে ডাকে
শমনের নাহি অধিকার।"

শুধু নামেই এই, আর তুই আমার সাক্ষাৎ গঙ্গাজল, তোকে কি যমে ছুঁতে পারে?"

সরোজের দুই কাঁধে হাত দুইটা রাখিয়া খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া যামিনী বলিল, "কথাটা ঠিক বটে। তা যমে না ছোঁয়, বিষ্ণুদূতেই না হয় নিতে আস্‌বে। কিন্তু জিগ্যেস্ করি, তুইও তো আমার গঙ্গাজল, তোকে হঠাৎ এমন যমে বাঁধলে কেন?"

সরোজ হাসিতে হাসিতে বলিল, "সাধে কি বেঁধেছে; গঙ্গাজল যে আমার উপর একবারে নিদয়। চাতক পাখীর মত গঙ্গাজল, গঙ্গাজল ক'রে চেঁচিয়ে মচ্চি, কিন্তু গঙ্গাজলের ছিটে ফোঁটাও দেখতে পাই না।"

সহাস্যে যামিনী বলিল, "মনের ভিতর পাপ থাকলে কি গঙ্গাজল পাওয়া যায়।"

বলিয়াই সে হঠাৎ যেন খুব গম্ভীর হইয়া পড়িল; মুখখানাকে ভারী করিয়া বলিল, "সত্যি তোর এমন মরণ-কুবুদ্ধি হলো কেন বল্ দেখি? দিদির সঙ্গে আলাদা হ'লি?"

ঈষৎ হাসিয়া সরোজ বলিল, "মর, এটা কুবুদ্ধি না সুবুদ্ধি? আমার পয়সা পরকে খাওয়াতে যাব কেন?"

যামি। পর কে? দিদি?

সরো। দিদি—ভারী তো দিদি! জা বৈ মায়ের পেটের বোন নয় তো?

যামি। জা ই কি পর?

সরো। না, বড্ড আপন! তাই তুই অসুখের ছল করে নিজের জাকে খাটিয়ে মারিস্।

যামি। আমার কথা ছেড়ে দে। কিন্তু তুই—না না, দিদিই তোকে আলাদা করে দিয়েছে, না? আমি কিছু কিছু শুনেছি।

গম্ভীর মুখে সরোজ বলিল, "মিছে শুনেছিস্। দিদির কিচ্ছু দোষ নাই, আমিই আলাদা হয়েছি।"

রোষগম্ভীর কণ্ঠে যামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন আলাদা হ'লি?"

সরোজ ভারী মুখে উত্তর করিল, "কেন হব না? আমার স্বামী মাস গেলে দেড়শো দু'শো টাকা আন্‌চে। অথচ আমি সংসারে দাসী বাঁদীর মত খেটে মব্‌বো।"

যামি। তবে কি রত্নসিংহাসনে বসে থাকবি? এখন বুঝি তাই আছিস্?

সরো। এখন আমার নিজের সংসার।

যামি। আর তখন ছিল বুঝি পরের সংসার। সাধে কি বলি, তোর মরণ-কুবুদ্ধি হয়েছে। তোর মুখ দেখলেও পাপ হয়।

মুখভঙ্গী করিয়া সরোজ বলিল, "ওরে আমার পুণ্যবতী রে! তবে মত্তে মুখ দেখতে এলি কেন?"

গভীর বিষাদব্যঞ্জক স্বরে যামিনী বলিল, "থাকতে পারি না ব'লে। কিন্তু আর আসবো না।"

সরোজ তাহার হাতখানা নিজের হাতের উপর রাখিয়া আঙ্গুলগুলা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "সত্যি আসবি না?"

যামি। সত্যিই আসবো না।

সরো। এ ভাই তোর অন্যায় রাগ। আমার ওদের সঙ্গে বনিবনাও হ'লো না, আলাদা হয়েছি, তাতে তোর রাগ কেন? তুই কেন আসবি না?

যামি। তোর খুসী হয়েছে, আলাদা হয়েছিস্। আমার খুসী আমি আস্‌বো না।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সরোজ বলিল, "তা না আসিস্ না আসবি, কিন্তু আসচে মাসে আমরা নতুন বাড়ীতে যাব, খুব ঘটা হবে, লোক জন খাবে। তখন আসবি তো?"

অন্যদিকে মুখ রাখিয়া যামিনী উত্তর করিল, "সে তখন দেখা যাবে।"

সরোজ তাহার হাতে একটু চাপ দিয়া বলিল, "দেখা যাবে নয়, তোকে আসতেই হবে। বুঝেছিস্?"

যামিনী কোন উত্তর করিল না। সরোজও নীরবে তাহার অঙ্গুলি লইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল।

এমন সময় গোবরার মা আধ-ভিজা কাপড়ে সেখানে উপস্থিত হইল এবং রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে উচ্চকণ্ঠে বাড়ী কাঁপাইয়া বলিল, "হ্যাদে ছোট মা, এমন ক'রে থাকা আমার পোষাবে না তা বল্‌ছি। কেনে গা, আমার কি ভাত জোটে না? গতর যেখানে খাটাব সেখানেই পেটের ভাত পাব। তার তরে ছোট লোকের এত কথা সইতে যাব কেনে গা?"

কথার সঙ্গে সঙ্গে গোবরার মা হাত দুইটা এত জোরে জোরে নাড়িতে লাগিল যে, তদ্দর্শনে সরোজ ভীত না হইয়া থাকিতে পারিল না। সে ব্যস্ততা সহকারে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে গোবরার মা?"

গর্জ্জন করিয়া গোবরার মা বলিল, "কি হয়েছে? ছোট লোক মাগী শুধু মারতে বাকী রেখেছে। কেনে গা, আমি তোর খাই না পরি যে আমাকে এত কথা বল্‌বি? আরে গোবরার মা অমন কারু কথার ধার ধারে না। আমি কি যে সে ঘরের মেয়ে! আমার বাপের দু'খানা হালের চাষ ছেল, বাবা আমার পদী বলতে অজ্ঞান হ'তো! আমাকে নাকি বলে ছোটলোক! এত বড় আস্পদ্দা!"

হাসি চাপিয়া প্রকৃত ব্যাপার অবগত হইবার জন্য যামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কে তোকে ছোট লোক বলে গোবরার মা?"

হাত মুখ নাড়িয়া গোবরার মা বলিল, "যে শত্তুর, যে দুষমন, পরের ভাল দেখে হিংসেয় যার বুক চড় চড় করে, সেই বলে! মাগী কি কম গা? কাকের পেছনে ফিঙের মতন আমার পাছে লেগেই আছে। ওই কে কল্লে? গোববার মা; ওটা কে ফেল্লে? গোববার মা। গোবরার মা যেন ওঁর বুকে ভাতের হাঁড়ী নামিয়েছে।"

গোবরার মার উদ্দিষ্ট এই মাগী কে, তাহা বুঝিতে সরোজের বিলম্ব হইল না। সে সভয়ে গোবরার মাকে থামাইতে ব্যস্ত হইল। গোবরার মা কিন্তু থামিল না; সে রাগে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "দেখ বাছা, তোমাদের আপনার নোক, সইতে হয় তোমরা সইবে, আমি কিন্তু সইতে যাব কেনে? এই আমি বল্‌ছি, হয় তোমারা একটা আলাদা ঘাট কর, নয় ওদের করে নিতে বল। নয় তো এক ঘাটে আমি দু'সন্ধ্যে ছোটনোকের মতন ঝগড়া কত্তে পারবো না। আমার বাছা এমন ঝগড়াটে স্বভাব নয়।"

আপনার অবিরোধী স্বভাবের উল্লেখ করিতে গোবরার মার স্বরটা গর্ব্বে যেন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে একটু থামিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, "আচ্ছা, আমার দোষটা কি শোন। মিছে যদি বলি, আমার জিভ খসে যাবে। খেয়ে বড্ড আলিস্যি হ'লো, আঁচলটা পেতে শুয়ে পড়লুম। একটু এ গোড় ও গোড় ক'রে উঠে দেখি, ওমা বেলাটা যে যায়। ঘাটে বাসন পড়ে আছে, ছুটোছুটি গিয়ে বাসনগুলি না তুলে সবে মাজতে বসেছি, বড় গিন্নী কোথায় ছেলো, হন্তদন্ত হ'য়ে গিয়ে রায়বাঘিনীর মতন আমার ওপর পড়লেন। সরে যা মাগী, সারা ঘাট জুড়ে বাসন নিয়ে বসেছে, উঠে যা, মত্তে এসেছে, ঝাঁটায় বিষ ঝেড়ে দেব। আমি ত অবাক্। আস্তে আস্তে বললুম, হাঁ গা বড় মা, অত কেনে বলচো বাছা, দাঁড়াও, আমি এঁটো বাসন সরিয়ে নিচ্চি। এই আর আছে কোথায়—ছোট লোক মাগী, হতচ্ছাড়া মাগী, তোর হুকুমে আমি দাঁড়াব? ওঠ্ বলচি ঘাট থেকে—"

"তারপর গোবরার মা?"

পশ্চাতে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াই গোবরার মা চমকিয়া উঠিল, তাহার বক্তৃতার উৎসাহে প্রদীপ্ত মুখখানা যেন শুকাইয়া গেল। বিন্দু কিন্তু তাহাকে কিছু বলিল না; সরোজকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দেখ্ ছোট বৌ, আমরা যদি তোদের কাছে কিছু দোষ ঘাট ক'রে থাকি, তোরা নিজে পাঁচ কথা ব'লে তার শোধ নিবি। কিন্তু ছোট লোককে দিয়ে পথে ঘাটে পাঁচজনের সামনে—"

গোবরার মা বলিয়া উঠিল, "কেনে গা বাছা, আমি তোমাকে কি বলেছি যে—"

"চুপ্ কর্ হারামজাদা মাগী।" বলিয়া বিন্দু জোরে একটা ধমক দিতেই গোবরার মা ভয়ে আর কিছু বলিতে পারিল না। বিন্দু তখন সরোজকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দেখ্ ছোট বৌ, মনে ক'রেছিলাম তোকে অনেক কথা শোনাব। কিন্তু এখন দেখছি শোনাবার কিছুই নাই। কেন না তোর সামনেই গোবরার মা আমাকে যা বলেছে, আমার সামনে তোকে এমন সব কথা বললে শত্রু হ'লেও বোধ হয় আমি তা সইতে পারতাম না। যাক্, তোর যদি শোনবার দরকার হয়, ও বাড়ীর খুড়ীমা ঘাটে ছিলেন, তাঁর মুখে শুনতে পারিস্।"

সরোজ একটি কথাও বলিল না; নতমুখে বসিয়া মাটীতে আঙ্গুল ঘষিতে লাগিল। গোবরার মা কিন্তু চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না; সে চিবাইয়া চিবাইয়া বলিল, "হাঁ গো হাঁ, শুনবে আর কি, আমি পাড়া-কুঁদুলি, আর সবাই গুড় খাকি।"

বিন্দু পুনরায় তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, "তুই চুপ্ কর্ গোবরার মা, তুই কথা কইলে তোর মনিবের অপমান হয়। ভাল, তোকেই জিগ্যেস্ করি, উনি যে ঘাটের পাশে ফুলগাছ ক'টা বসিয়েছিলেন, তার ডাল পাতাগুলো রোজ ভেঙ্গে দেয় কে?"

গোবরার মা কিন্তু এ অভিযোগ স্বীকার করিয়া লইল না; সে চন্দ্রসূর্য্যকে সাক্ষী করিয়া শপথ করিতে লাগিল যে, এমন কাজ যদি সে করিয়া থাকে, তবে তাহার হস্তদ্বয় দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে, হাতের আঙ্গুলগুলি খসিয়া পড়িবে ইত্যাদি। বিন্দু কিন্তু তাহার শপথ শুনিবার জন্য অপেক্ষা না করিয়াই গম্ভীর পদক্ষেপে চলিয়া গেল। গোবরার মাও এই সকল মিথ্যা অভিযোগের জন্য স্বীয় অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া, চোখের জল ফেলিয়া, ভদ্রলোকেরা যে ভয়ানক মিথ্যাবাদী, ইহাই আপন মনে ব্যক্ত করিতে করিতে স্বকার্য্যে প্রস্থান করিল।

সরোজের আনত মুখের উপর কঠোর দৃষ্টি স্থাপন করিয়া যামিনী ডাকিল, "সরি!"

সরোজ ধীরে ধীরে মুখ তুলিল। যামিনী বলিল, "এ সব কি?"

লজ্জাসঙ্কুচিত কণ্ঠে সরোজ উত্তর করিল, "আমি কি করবো সই?"

তীব্র ঘৃণায় যামিনী নাসা কুঞ্চিত করিল, এবং একটা কঠোর দৃষ্টিতে সরোজকে যেন বিদ্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সরোজ স্তব্ধ নিশ্চল ভাবে বসিয়া রহিল; তাহার দিকে না ফিরিয়াই যামিনী দ্রুত গম্ভীর পদক্ষেপে বাটী ত্যাগ করিল।

রাত্রিতে গোপীনাথ আসিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ বৌদি নাকি গোবরার মার সঙ্গে ঝগড়া করেছে?"

সরোজ উত্তর দিল, "হাঁ।"

ঈষৎ রুষ্টভাবে গোপীনাথ বলিল, "কেন তিনি ও গরীব বেচারীর সঙ্গে ঝগড়া করেন?"

একটু শ্লেষের হাসি হাসিয়া সরোজ বলিল, "ওর গালগুলো বোধ হয় মিষ্টি লাগে।"

গোপীনাথ ভ্রূকুটী করিল; বলিল, "গোবরার মা যদি গাল দিয়ে থাকে, খুব ভালই করেছে। কাল তাকে এক জোড়া কাপড় কিনে দিতে হবে।"

সহাস্যে সরোজ জিজ্ঞাসা করিল, "সুতোর কাপড়, না বেনারসী চেলী?"

পত্নীর দিকে রোষতীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গোপীনাথ দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া ধরিল। সরোজ আস্তে আস্তে স্বামীর সম্মুখ হইতে সরিয়া আসিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

"ও মাসের সাতুই নতুন বাড়ীতে যাবার দিন ঠিক হ'লো সরো!"

সরোজ নীরবে দাঁড়াইয়া হাতে হাত ঘষিতে লাগিল। খবরের কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া গোপীনাথ বলিল, "বাড়ীখানা কিন্তু চমৎকার হ'য়েছে। দাদাকে লোকে পাগলই বলুক আর যাই বলুক, দাদার পছন্দ কিন্তু আছে। সেদিনও গিয়ে দেখি, দাদা দাঁড়িয়ে মিস্ত্রীদের দেখিয়ে দিচ্চেন কোন্‌খানে কোন্ রঙ্‌টা দিতে হবে। আমাকে দেখে আমার হাত ধরে উপরকার বড় ঘরটায় টেনে নিয়ে গেল, কোন্‌খানে খাট পড়বে, কোথায় দেরাজ আলমারী বসবে, কোন্‌দিকে টেবিল থাকবে, জগদ্ধাত্রীর বড় ছবিখানা কোন্ জায়গায় টাঙ্গালে ভাল দেখায়, সব দেখাতে লাগলো। আমার এমন লজ্জা হ'লো!"

"এতে আর এমন লজ্জা কি?"

চাপা হাসিতে ঠোঁট দুইটা ফুলিয়া উঠিতেই সরোজ তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইল। গোপীনাথ বলিল, "তুমি একদিন গিয়ে দেখে এলে না কেন?"

মুখ মচ্‌কাইয়া সরোজ উত্তর করিল, "কি হবে এখন গিয়ে?"

"তুমি একটি জন্তু" তীব্রস্বরে কথাটা বলিয়া গোপীনাথ পুনরায় সংবাদপত্র পাঠে মনোনিবেশ করিল। সরোজ চুপ করিয়া পাশে দাঁড়াইয়া রহিল।

হঠাৎ মুখ তুলিয়া গোপীনাথ বলিল, "দেখ, তোমার সই দিন কয়েক আগে থাকতে এলে ভাল হয়।"

সরো। কেন?

গোপী। উদ্যোগ আয়োজন সব করবে কে? খুব সম্ভব বৌদি এ দিকে ঘেঁস্‌বেন না। কি বল?

সরো। ঘেঁস্‌বেন কোন্ লজ্জায়?

ললাট কুঞ্চিত করিয়া গোপীনাথ বলিল, "তা নাই আসুন। তবে আমার কর্ত্তব্য একবার বল্‌তে হবে; নিমন্ত্রণও কত্তে হবে।"

সরো। না বললেই ক্ষতি কি?

গোপী। ক্ষতি আছে বৈকি, লোকে কি বল্‌বে।

সরো। তোমার চক্ষুলজ্জাটা বড্ডই বেশী।

কথাটা বলিয়াই সরোজ ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। গোপীনাথ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সংবাদপত্রে দৃষ্টি স্থাপিত করিল।

বাহির হইতে বিন্দু ডাকিল, "ঠাকুরপো ঘরে আছ?"

গোপীনাথ উত্তর দিল, "আছি। কেন?"

বিন্দু দরজার কাছে আসিয়া বলিল, "কাল সন্ধ্যে থেকে তোমার দাদার জ্বরভাব হ'য়েছে। একবার হাতটা দেখে যাবে?"

গোপীনাথ কিয়ৎকাল মৌন থাকিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "আমার এখন সময় নাই, এখনি ডাকে যেতে হবে।"

বলিয়াই সে হাতের কাগজখানা ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বিন্দু মন্থর পদে দরজা হইতে ফিরিয়া আসিল।

ঘরে আসিলে তারণ জিজ্ঞাসা করিল, "গুপী আসচে?"

রুদ্ধকণ্ঠে বিন্দু উত্তর করিল, "না।"

"বেরিয়ে গিয়েছে বুঝি? না, ঐ যে জুতোর শব্দ। গুপী—

আহ্বানের স্বরটা উচ্চারিত হইবার পূর্ব্বেই বিন্দু হাত দিয়া স্বামীর মুখটা ধরিল; রুদ্ধশ্বাসে বলিল, "ডাকে বেরুচ্চে, এখন ডেকো না।"

জুতার মস্ মস্ শব্দ বাতাসে মিলাইয়া গেল। তারণ হতবুদ্ধির ন্যায় মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "তাই তো, আমার হাতটা দেখে আর বেরুতে পারুলে না?"

"নাঃ, সময় নাই।" বলিয়া বিন্দু ঘরের বাহির হইয়া গেল। একটু পরে গরম কাপড় গাযে জড়াইয়া তারণ ঘরের বাহিরে আসিলে বিন্দু তাহার সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় চলেছ আবার? পাশার আড্ডায় বুঝি?"

তারণ সহাস্যে বলিল, "না না, এই সকাল বেলায পাশা?"

ঈষৎ হাসিয়া বিন্দু বলিল, "কি জানি, পাশার কি সকাল বিকাল আছে?"

তারণ হাসিতে লাগিল। মুখখানা একটু ভারী করিয়া বিন্দু বলিল, "নাঃ, চাকরী কচ্চিলে তবু সময়ে নাওয়া খাওয়া ছিল। এখন সকাল নাই, দুপুর নাই সন্ধ্যে নাই, শুধু পাশা আর পাশা। আচ্ছা নেশা যা হোক্।"

হাসিতে হাসিতে তারণ বলিল, "না বড় বৌ, সত্যি বলছি এখন পাশার আড্ডায় যাচ্চি না।"

"তবে এমন সময় যাচ্চো কোথায়?"

"দেখি শ্রীপতি ঘোষ কাজটার কথা ব'লেছিল, যদি হয়।"

"কাজটা কি?"

"মাজের হাটের রায় বাবুদের তরফে একটা গোমস্তার পদ খালি আছে। মাইনে বেশী নয় বারো টাকা, তবে উপরি পাওনা আছে

বিন্দু বলিয়া উঠিল, "আবার সেই চাকরী করুবে?"

হাতের লাঠিটা মাটীতে ঠুকিতে ঠুকিতে তারণ বলিল, "চাকরী না ক'রুলে চলবে কেন বড় বৌ; এক মাসের মাইনে যা পেয়েছিলাম, তা তো শেষ হ'য়ে গেল। তারপর?"

এই কঠিন প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া বিন্দু মাথা নীচু করিল। তারণ বলিল, "মনে তো করে-ছিলাম বড় বৌ, চাকরী আর করবো না। কিন্তু এ কর্ম্মভোগ তো আমায় ছাড়চে না।"

ম্লান হাসির মধ্য দিয়া যে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইল, চেষ্টা করিয়াও তারণ সেটাকে ঢাকিতে পারিল না। সে আর দাঁড়াইল না, তাড়াতাড়ি লাঠির ঠক্ ঠক্ শব্দ করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল। বিন্দু ছল ছল চোখে তাহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ওঃ ভগবান্! এমনই কঠোরতার মধ্য দিয়া কি মানুষের সহিষ্ণুতার পরীক্ষা করিতে হয়। এত গভীর নৈরাশ্যে পাষাণও বুঝি বিদীর্ণ হইয়া যায়, মানুষ কোন্ ছার! হায়, যে আশায় চল্লিশ টাকা মাহিনার চাকরীতে জলাঞ্জলি দিল, সে আশায় নিরাশা হইয়া আজ আবার বারো টাকা মাহিনার চাকরীর জন্য উমেদারী করিতে হইতেছে! কেন সে চাকরী ছাড়িবার জন্য এত অনুরোধ করিয়া-ছিল, সাতটায় ভাত র'াধিয়া দিতে কেন এত বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিল, পরের উপর নির্ভর করিয়া কেন সে আত্মনির্ভরক্ষম স্বামীকে এমন পরমুখাপেক্ষী করিল? গভীর অনুশোচনায বিন্দুর সমগ্র অন্তরটা যেন মথিত হইতে লাগিল।

অনেকটা বেলায় ফিরিয়া গভীর নৈরাশ্যব্যঞ্জক স্বরে তারণ বলিল, "কাজটা হ'লো না বড় বৌ, শ্রীপতি অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু—"

বিন্দু বলিয়া উঠিল, "নাই হোক, বারো টাকা মাইনের চাকরী করে না।"

"কিন্তু এখন চলুবে কিসে?"

"ভগবান্‌ই চালিয়ে দেবেন।"

"সেই ভাল বড় বৌ, এতকাল নিজের উপর নির্ভর ক'রে এসেছি। এখন একবার ভগবানের উপর নির্ভর করেই দেখি। কি বল?"

বলিয়া তারণ এমন জোরে হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল যে, তাহাতে বিন্দু যেন চমকিয়া উঠিল।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

গোপীনাথের নূতন বাড়ীতে যাইবার উদ্যোগ আয়োজন চলিতে লাগিল। অম্বিকা ঘোষাল স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি গোপীনাথকে পরামর্শ দিলেন, বাস্তুযাগ উপলক্ষে গ্রামের ইতরভদ্র নির্ব্বিশেষে সকলকে পকান্ন দ্বারা পরিতুষ্ট করা হউক। দরজায় নহবত বসাইয়া একদিন গ্রামের লোকদের মণ্ডিরায়ের যাত্রাটা শুনাইয়া দিলে আরও ভাল হয়। গোপীনাথ তাঁহার প্রথম প্রস্তাবে সম্মতি দিল, কিন্তু দ্বিতীয় প্রস্তাবে রাজি হইল না। সুতরাং যাগের ও লোকজন খাওয়াইবার আয়োজনই হইতে লাগিল।

গোপীনাথ স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার তো ভাল গয়না কাপড় কিছুই নাই, কি চাই বল।"

সরোজ উত্তরে বলিল, "কিছুই চাই না।"

গোপী। সেদিন কি পরে বেরুবে?

সরো। দিদির গয়না ক'খানা তো পেয়েছ; তাই পরলেই চলবে।

এই কথার ভিতর শ্লেষের যে একটা তীব্র কষাঘাত ছিল, সেটা নীরবেই পরিপাক করিয়া গোপীনাথ বলিল, "তাও কি হয়, সে নয় সোণা, নয় পেতল। আমি এক সুট গয়না তৈরী কত্তে দিয়েছি।"

শুনিয়া সরোজ একটু হাসিয়া বলিল, "গয়নাগুলো একটু বড় মাপের তৈরী করাবে। চিরকাল তো আমি এমন রোগা থাকব না।"

সে ঘাটে যামিনীর সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাকে বলিল, "ওলো সই, নতুন বাড়ীতে যাবার দিনে এক সুট গয়না আর একখানা বেনারসী শাড়ী পাব।"

যামিনী বলিল, "শুধু এই? আর কিছু পাবি না?"

"আবার কি পাব?"

"দড়ী কলসী।"

"পাইতো সেটা তোকে দেব।"

"আমাকে দিবি কোত্থেকে? তোদের তো দু'জনের দুটো দরকার।"

মুখ মচ্‌কাইয়া সরোজ বলিল, "তুমি ভাই বড্ড কুঁদুলী।"

ঈষৎ হাসিয়া যামিনী বলিল, "তোর দিদির চাইতে নয় কিন্তু।"

রাগে মুখটা ভারী করিয়া সরোজ বলিল, "তোর সঙ্গে কথা কওয়াই ঝকমারী।"

"দু'শো বার" বলিয়া যামিনী হাসিতে হাসিতে ঘাট হইতে উঠিয়া গেল। সরোজ আপন মনে হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা পোড়ারমুখী, তোমার মুখখানা যদি ভাল রকমেই না পোড়াই, তবে আমার নাম সরি বামনী নয়।"

এদিকে আয়োজনের আড়ম্বর দেখিয়া তারণ একদিন গোপীনাথকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁরে গুপী, নতুন বাড়ীতে যেতে একটা রাজসূয় যজ্ঞ করবি নাকি?"

গোপীনাথের উত্তর দিবার পূর্ব্বেই অম্বিকা ঘোষাল উত্তর করিলেন, "গুপীবাবু তো সেই রকমই মনস্থ করেছেন। তোমাকেই বোধ হয় ভাঁড়ারের ভার নিতে হবে।"

তারণ বলিল, "তাতে তো তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না ঘোষাল মশায়? কেন না আমি তো দুর্য্যোধনের মত দু'হাতে লুটিয়ে দিতে পারবো না।"

বলিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। লজ্জা পাইলেও ঘোষাল মহাশয়কে একটু হাসিতে হইল; কিন্তু সেটুকু কাষ্ঠ হাসি মাত্র।

অতঃপর তারণ ভ্রাতাকে সাবধানে সকল দিক বজায় রাখিয়া কার্য্য করিতে উপদেশ দিয়া চলিয়া গেলে ঘোষাল মহাশয় গোপীনাথকে ধরিয়া বসিলেন, গ্রামের অনেক লোকই হিংসায় জরজর হইয়াছে; তাহাদের মুখে চুণকালি দিবার জন্য নহবত বসাইতে হইবে। নতুবা মান থাকিবে না।

গোপীনাথ হাসিয়া ইহাতে সম্মতি দিল। সেইদিনই সন্ধ্যার পূর্ব্বে নূতন বাড়ীর দরজায় নহবতের গম্ভীরতানে গ্রামখানা শব্দিত হইয়া উঠিল।

সে শব্দে চমকিত হইয়া বিন্দু স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় ন'বত বাজে গা?"

তারণ বলিল, "নতুন বাড়ীতে বোধ হয়।"

বিন্দু শুনিয়া একটু আশ্চর্য্য প্রকাশ করিল। তারণ বলিল, "তা গুপী আয়োজন করেছে মন্দ নয়! হাঁ, পরিচয় দিবার মত বটে। তবে মাঝে বুড়ো ঘোষাল এসে জুটেছে, তাই ভয় হয়।"

বিন্দু এ কথার কোন উত্তর দিল না। তারণ জিজ্ঞাসা করিল, "বসে রইলে, রাঁধবে না এ বেলা?"

ইতস্ততঃ করিয়া বিন্দু বলিল, "হ্যাঁ, রাঁধতে হবে, তবে—"

ঈষৎ হাসিয়া তারণ বলিল, "তবে না রাঁধবে তা নাই—চালের অভাব। কেমন এই তো?"

বিন্দু নীরবে নতমুখে বসিয়া রহিল। তারণ বলিল, "একটা ঘটী বাটি কিছু দাও, বাঁধা দিয়ে কি বেচে—"

বিন্দু দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তারণ গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিল, "আচ্ছা বড় বৌ!"

মুখ হইতে হাত সরাইয়া বিন্দু সজল দৃষ্টিতে

স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। তারণ বলিল, "আচ্ছা মনে কর, আবার যদি একটা তেমন চল্লিশ টাকা মাইনের চাকরীর যোগাড় কত্তে পারি ?"

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বিন্দু বলিল, "পার ?"

তারণ বলিল, "বোধ হয় পারি ! তবে আবার তো সত্যপীরের সিন্নী মানত করবে না ?"

মুখে হাত চাপা দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বিন্দু বলিল, "না গো না, আর কখনো আমি তা করবো না।"

সহাস্যে তারণ বলিল, "বেশ, কাল ভোরে উঠে আবার সেই সাতটায় ভাত তৈরী করে দিও।"

বিস্ময়পূর্ণ মুখে বিন্দু স্বামীর দিকে চাহিল। তারণ বলিল, "তোমরা আমাকে যতটা পাগল মনে কর বড় বৌ, সত্যি আমি ততটা পাগল নই যে, এক কথায় চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে আসবো। এই কর্ম্মভোগের মজাটা কি তাই দেখাবার জন্যে দু'মাসের ছুটি এনেছিলাম। কাল থেকে আবার বেরুতে হবে। ভয় নাই, কাল বেরুলেই দু'মাসের মাইনে পাব।"

বিন্দু হাসিয়া কাঁদিয়া স্বামীর গলা জড়াইয়া ধরিল।

তারণ তাহাকে শান্ত করিয়া বলিল, "কিন্তু কাল পরশু দু'দিন বেরিয়েই আবার দু'তিন দিনের ছুটি নিতে হবে, বুধবারে গুপীর নূতন বাড়ীতে যাওয়া তো।"

বিন্দু যেন খুব আশ্চর্য্যের ভাব দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি যাবে ?"

তারণ হাসিয়া উত্তর করিল, "তুমি বুঝি যাবে না ?"

বিন্দু মাথা নাড়িয়া ভারীমুখে বলিল, "না।"

"সত্যি ?"

তর্জ্জন সহকারে বিন্দু বলিল, "এত সত্যি মিথ্যে আমি জানি না ! আর আমি যাই, না যাই সে আমার খুসী। কিন্তু এত হেনস্তার পর তুমি কি ক'রে যাবে বল দেখি ?"

হাসিতে হাসিতে তারণ বলিল, "যে ক'রেই হোক যেতেই হবে যে বড় বৌ। না গিয়ে থাকতে পারবো কি ? গুপী মূর্খ হ'তে পারে, নির্ব্বোধ হ'তে পারে, কিন্তু আমার ভাই তো বটে। ভাল করুক, মন্দ করুক, লোকে বলবে তারণ ভট্টচাজ্যির ভাই করেছে। কেমন ঠিক কি না !"

বিন্দু বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল। তারণ বলিল, "শুধু আমি কেন, তোমাকেও যেতে হবে। যেতে হবে কেন, তুমি যাবে নিশ্চয়। না গিয়ে কক্ষনো থাকতে পারবে না। পারবে ?"

বলিয়া সে স্ত্রীর মুখের উপর দৃষ্টিপাত করিতেই বিন্দু হাসিয়া উঠিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

পুরোহিত ডাকিলেন, "এসো গোপীবাবু, সঙ্কল্প বরণ ক'রে দেবে।"

গোপীনাথ তখন আগন্তুক ভদ্রলোকগণের অভ্যর্থনায় ব্যস্ত ছিল, সুতরাং পুরোহিতের আহ্বানে কর্ণপাত করিল না। ক্ষণপরে পুরোহিত পুনরায় বলিলেন, "একটু শীগ্‌গীর এসো গোপীবাবু, আবার বারবেলা পড়বে, 'বুধে বাণ তৃতীয়কং'।"

গোপীনাথ উত্তর করিল, "বারবেলাই পড়ুক আর কালবেলাই পড়ুক, আমি গিয়ে কি করবো ?"

বিদ্যানিধি মহাশয় বলিলেন, "তুমি বরণ ক'রে না দিলে ক্রিয়া আরম্ভ হবে না।"

গোপীনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন হবে না ?"

বিদ্যানিধি বলিলেন, "তোমার যে কাজ।"

গোপীনাথ ভ্রূকুটী করিয়া চাকরকে ডাকিয়া আগন্তুকগণকে তামাক দিতে আদেশ দিল। পুরোহিত পুনরায় তাহাকে বারবেলার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া সস্ত্রীক বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া আসিতে বলিলেন। তারণ একটা থেলো হুঁকায় তামাক টানিতে টানিতে আগন্তুকগণের সহিত হাস্যালাপ করিতেছিল ; গোপীনাথকে পুরোহিতের আদেশ পালনে পরাঙ্মুখ দেখিয়া তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, "হাঁরে গুপী, পুরুত মহাশয়ের কথা তোর কাণে যাচ্চে না ?"

গম্ভীর ভাবে গোপীনাথ উত্তর করিল, "কাণে যাবার কোন দরকার নেই। আমার যে কাজ, আমি তা কচ্চি।"

"ও সব তো বাজে কাজ ; আসল কাজ সঙ্কল্পটা করবে কে ?"

"যার কাজ, যার বাড়ী।"

"বাড়ী তো তোরি রে।"

"কিন্তু জমিটা কার শুনি ?

তারণ মাথা চুলকাইয়া বলিল, "জমিটা বড় বোয়ের নামে আছে বটে, কিন্তু সে তো তুই নিজেই জোর ক'রে করেছিস্।"

উগ্রভাবে গোপীনাথ বলিল, "আমিই করি, আর যেই করুক, জমি তো আমার নয়। তুমি ছোট ভায়ের এক পয়সা খেতে পার না, আর তোমার ভাই আমি, পরের জমির ওপর বাড়ী ভোগ করবো ? কক্ষনো না। যার জমি তার বাড়ী ; আমার পৈতৃক পুরাণো ভাঙ্গা বাড়ীই ভাল।"

বলিয়া দ্রুতপদে একদিকে সরিয়া গেল। তারণ

তখন সম্মুখবর্ত্তী যজ্ঞেশ্বর দত্তকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দেখলে দত্তজা ছোঁড়ার রকমখানা। ওর সকল কাজেই দাদা। আমি জানি, ও ছোঁড়া কি আমাকে এত সহজে ছেড়ে দেবে? পাগল, পাগল!"

বলিয়া সে হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। দত্তজা হাসিয়া বলিলেন, "পাগলের ভাই কত আর ভাল হবে!"

উপস্থিত সকলেই হাসিতে লাগিল। তারণ তাড়াতাড়ি বস্ত্র পরিবর্ত্তন জন্য বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল।

বাড়ীতে ঢুকিয়া তারণ উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "বড় বৌ, ও বড় বৌ!"

বিন্দু সম্মুখে আসিল। তারণ তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "গুপের রকমখানা দেখলে বড় বৌ, 'সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কার ভার্য্যা।' এখন বলে কার বাড়ী, কার কাজ আমি কি জানি; যার বাড়ী সেই সঙ্কল্প করবে। যাক্ কাপড়খানা ছেড়ে ফেল। আমি জানি ও ছোঁড়া কি কর্ম্মভোগ হতে এত সহজে আমাকে নিষ্কৃতি দেবে!"

তাহার হাস্যপ্রফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া বিন্দু বিস্ময়বিহ্বল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তারণ বলিল, "আমাকেও কাপড়টা ছাড়তে হবে যে। ও ছোট বৌমা কাপড় একখান দাও গো।"

সরোজ এক জোড়া নূতন পট্টবস্ত্র আনিযা তাহার সম্মুখে স্থাপন করিল। তারণ স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "এই দেখ বড় বৌ, ও ছোঁড়া জানে, দাদা তো পেড়ে কাপড় প'রে সন্ধ্যা আহ্নিক করবে না। তাই আগে থাকতেই সাদা কাপড় আনিয়ে রেখেছে। ওর পেটে পেটে বুদ্ধি!"

সরোজ তখন বিন্দুর হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে তাহাকে অন্য ঘরে লইয়া আসিল। সেখানে আসিয়া বাক্স খুলিয়া এক রাশ নূতন গহনা বাহির করিল, এবং এক একখানি করিয়া স্বহস্তে দিদিকে পরাইতে লাগিল। বিস্ময়জড়িতকণ্ঠে বিন্দু বলিল, "এসব কি ছোট বৌ?"

সহাস্যে সরোজ জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ সব?"

"এই সব" বলিয়া বিন্দু অলঙ্কারের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলে সরোজ হাস্যতরল কণ্ঠে বলিল, "ও সব গয়না।"

বিন্দু বলিল, "গয়না তো জানি। কিন্তু ব্যাপারটা কি বল্ তো!"

হাসিতে হাসিতে সরোজ বলিল, "তোমার গা ছুঁয়ে বল্‌ছি দিদি, আমি কিছু জানি না; যে এ সব এনেছে—"

বক্তব্য শেষ না করিয়াই সরোজ তাড়াতাড়ি মাথার কাপড় টানিয়া দিল। দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া গোপীনাথ বলিল, "গয়নাগুলো পরলে তোমাকে কেমন সাজায় তাই দেখতে এসেছি ছোট বৌ!"

মৃদুস্বরে "এই দেখ" বলিয়া সরোজ একটু সরিয়া দাঁড়াইল। বিন্দুর দিকে চাহিয়া গোপীনাথ বলিল, "চমৎকার মানিয়েছে!"

উচ্ছ্বসিত হাস্যবেগ দমন করিয়া বিন্দু বলিল "তোমাদের ভিতরে ভিতরে এত ঠাকুরপো!"

হাস্যপ্রফুল্ল মুখমণ্ডলে কৃত্রিম কোপের ভাব আনিয়া গোপীনাথ বলিল, "হাঁ এত! তুমি তা কি করবে বল তো? আবার একবার আলাদা করে বাড়ী হতে তাড়িয়ে দেবে?"

বিন্দুর দুই চোখ দিয়া ঝর ঝর জল গড়াইয়া পড়িল। গোপীনাথ দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলিল, "তোমার এত বড় অহঙ্কার বৌদি, আমাকে আলাদা ক'রে দাও! ছোট লোকের মেয়ে গোবরার মা তার কথায় দাদার মুখের গ্রাস ফেলে দিয়ে দাদাকে উপোস করাও! ছোট বোয়ের উপর রাগ ক'রে তুমি আমার কে—সেটা পর্য্যন্ত ভুলে যাও! পুরোণো বাড়ীখানা নিজেরা নিয়ে আমাকে এই বাড়ীতে ঠেলে দাও! দাদা—যাকে আমি গুরুর গুরু মহাগুরু ব'লে জানি, যে না খেয়ে আমাকে খাইয়েছে, পয়সার অভাবে তাকে উপোস দেওয়াও?"

গোপীনাথের হাত দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া হাসিয়া কাঁদিয়া বিন্দু আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "আমি অনেক ভুল করেছি ঠাকুরপো, কিন্তু সব চেয়ে বড় ভুল হ'য়েছে, সরিকে আমি চিন্‌তে পারিনি।"

তারণ আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "ওদের দু'টোর কাউকেই চিনতে পারবে না বড় বৌ, ওদের পেটে পেটে বুদ্ধি! এখন এস, সঙ্কল্পটা ক'রে আসি যত কিছু আমারি কর্ম্মভোগ।"

যামিনী আসিয়া সরোজের গলা জড়াইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "ও পোড়ারমুখ, তোর ভিতরে ভিতরে এত! তবে কেন আমার কাছে গাল খেলি বল্ তো?"

তাহাকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিয়া সরোজ বলিল "তোর মুখের গাল যে মিষ্টি লাগে সই।"

বাহিরে শঙ্খ-ঘণ্টার রোলের সহিত নহবতে উচ্চতানে উৎসব-সঙ্গীত বাজিয়া উঠিল।

গ্রন্থাবলী সমাপ্ত